ছেলেমেয়েদের সর্বপুরাতন সচিত্র মাসিকপত্র

মৌচাক

৪৮শ বর্ষ, ১৩৭৪

ইং ১৯৬৭-৬৮

সুধীরচন্দ্র সরকার
প্রতিষ্ঠিত

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বর্ণানুক্রমিক সূচী

উপরে জাতীয় পক্ষী ঃঃ নিচে বিজাতীয় পক্ষী

ফটো ঃ শ্রীভোলনাথ দেব

✽ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✽
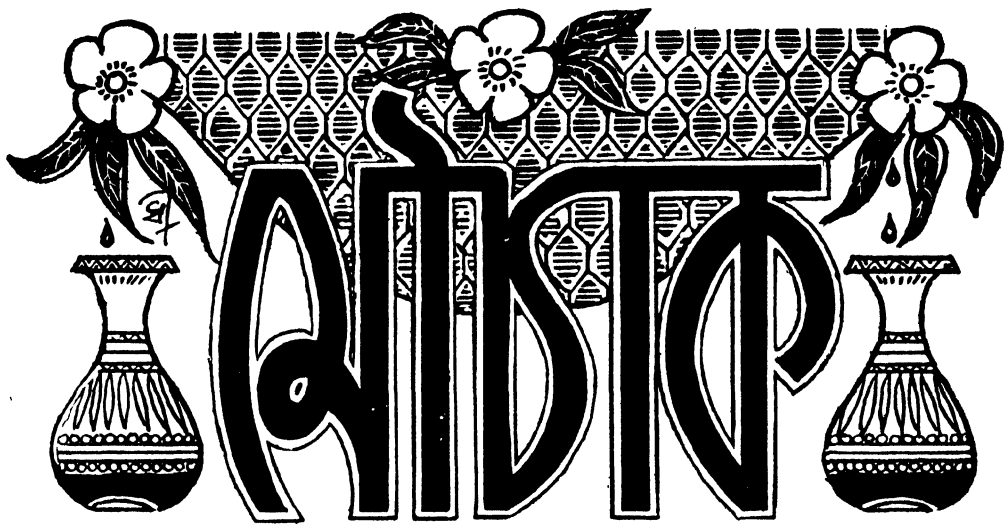
৪৮-শ বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৭৪ [১ম সংখ্যা

ভ্যাবাকান্তের গান

কাজী নজরুল ইসলাম

ওহে ভ্যাবাকান্ত !

ক্ষান্ত দাও হে গানে ক্ষান্ত !

তব তান শুনে তানসেন লুঙি নিয়ে ভেগে যায়

পড়শীরা বেঁকে যায় রাগে বঁড়শীর প্রায় !

ধরিয়া সুরের কাছা

করিছ গামছা কাচা

বেচারী গানেরে যেন করিছ বাপান্ত !

ক্ষান্ত দাও হে গানে ক্ষান্ত !!

তোমার পাড়ায় কেন

লইলাম বাড়ী ভাড়া

সা রে গা মা পা ধা শুনে

প্রাণ হ'ল খাঁচা-ছাড়া

হয় মনে সন্দেহ

ধরিয়া টানিছে কেহ

যেন জীব বিশেষের লাঙুল-প্রান্ত।

ক্ষান্ত দাও হে গানে ক্ষান্ত ॥

সুরের ভাস্থর তুমি গানের আফ্‌গান্‌

সরস্বতীরে ধ'রে পরাইছ চাপ্‌কান্‌

দেখে বীণা ফেলে দেয় নারদ পিঠ্‌টান

বাহনের গান শুনে শিব উদ্‌ভ্রান্ত !

ক্ষান্ত দাও হে গানে ক্ষান্ত ॥

মনোজ বসু

বিড়ালে তাড়া করেছে ইঁদুরকে। ইঁদুর পালাচ্ছে।

পুকুর পাড়ে তালবন। তলায় ন্যাড়া-সেজি আর উলুখাগড়া। বেড়ে জায়গা, ইঁদুরের বড় পছন্দ। বিড়ালের বাপের সাধ্য নেই এখানে এসে ঢুকবে। মনের মতন করে গোটা তিনেক গর্ত খুঁড়ে নিল। দরকার হলে ওর মধ্যে ঢুকে যাবে। আপাতত সে দরকার নেই। শুড়িকচুর পাতা পেতে নিল। আরাম করে এর উপরে শোওয়া যাক। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়ায় দু'মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ল

তোফা ঘুম দিচ্ছে। রাত দুপুরে—হুড়ুম! ইঁদুর ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। পুকুরের জলে আলোড়ন লেগেছে—জল খানিকটা ছিটকে এসেছে ইঁদুরের গায়ে। হুড়ুম করে আওয়াজ দিয়ে জল থেকে বিশাল কোন জানোয়ার উঠে আসছে।

ওরে বাবা! ওরে বাবা!

আর্তনাদ করে ইঁদুর দৌড় দেয়। এক খরগোশ ছিল কলাঝাড়ের মধ্যে। সে জিজ্ঞাসা করে: কি ভাই ইঁদুর, কি হয়েছে?

হুড়ুম। এসে পড়ল বলে। প্রাণে বাঁচতে চাও তো এক্ষুনি পালাও।

দু-জনে পড়ি কি মরি প্রাণপণে ছুটেছে। যে বিড়াল ইঁদুর তাড়া করেছিল, ইঁদুরকে ফিরতে দেখে সে মুকিয়ে এসেছে। খরগোশ বলে, বাঁচতে চাও তো পালাও বিড়াল মাসী। ইঁদুর ধরতে গেলে তোমাকেই তার আগে ধরবে।

থমকে গিয়ে বিড়াল শুধায়; কিসে ধরবে!

হুড়ুম। এসে গেল বলে। জল তোলপাড় করে ডাঙায় উঠেছে। প্রাণের চেয়ে খাওয়া বড় নয়। বেঁচে থাকলে বিস্তর খাওয়া যাবে। হুড়ুমের কথা শুনে বিড়ালও ছুটল।

ছুটছে। এক শিয়াল বাঁশবন থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে, হয়েছে কি, পালাচ্ছ তোমরা কিসের ভয়ে?

ওরা হাঁপিয়ে গেছে, বেশি কথা বলতে পারে না, মুখ দিয়ে শুধু বেরুল: হুড়ুম—

অতএব শিয়ালও ছুটল।

এক গোসাপ পথের উপর: কি হয়েছে?

হুড়ুম। রক্ষে নেই। এসে গেল বলে।

ছুটতে ছুটতে অবশেষে রায়মঙ্গলের জঙ্গলে। সুন্দরবনের এলাকায় পড়ে এটা। রয়াল বেঙ্গল টাইগাররা পাহারা দিয়ে বেড়ায়। সৈন্যদের হরেক রকম পদ-বিভাগ। প্রথমে যাঁর মুখোমুখি হ'ল তিনি দশমারি—অর্থাৎ দশটি মাত্র মানুষ মেরেছেন। নিচু পদ, রেজিমেণ্টের সাধারণ সিপাহী আর কি!

তোলপাড় করে হুড়ুম আসছে শুনে দশমারি ছুটলেন বিশমারির কাছে। তিনি এক কুড়ি ঘাড় ভেঙেছেন, পদমর্যাদায় কিছু উঁচু। দশমারি বলেন, হুড়ুম আসছে, সর্বনেশে ব্যাপার—

বিশমারি ছুটলেন তখন পঞ্চাশমারির কাছে। পঞ্চাশমারি শতেকমারির কাছে। আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপছে সকলে।

শতেক মারি হলেন সেনাপতি। প্রচণ্ড বীর। হুঙ্কার দিয়ে বলেন, আক্রমণ করে রণজয় করব আমরা। পালাব না। চলো কোথায় সেই হুড়ুম।

সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করে। পঞ্চাশমারি জিজ্ঞাসা করেন বিশমারিকে। বিশমারি দশমারি গোবাঘাকে। করতে করতে শেষটা ইঁদুর অবধি প্রশ্নটা এলো।

কোথায় সেই হুড়ুম? কতবড় প্রাণী, কেমন দেখতে!

ইঁদুর বলে, জল তোলপাড় করে ডাঙায় উঠেছিল। চোখে আর দেখলাম কই, পিছনে তাকানোর জো ছিল তখন?

জল থেকে কোথায় উঠেছিল, চলো সেই জায়গায়। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

ভয়ে ইঁদুর ঠকঠক করে কাঁপছে। শিয়াল বলে, ভয় পাচ্ছ কেন? এত জনে আমরা যাচ্ছি। খোদ সেনাপতি দলবল নিয়ে যাচ্ছেন—

ইঁদুর অগত্যা পথপ্রদর্শক হয়ে চলল। পুকুর ধারে সেই তালবনে এসে পড়ল। বলে, এইখানে—ঐ জল থেকে উঠেছিল। দেখলাম না কোন দিকে—আবার বোধহয় নেমে পড়েছে।

তখুনি পাকা তাল একটা জলে পড়ল।

হুড়ুম—

এই তোর জানোয়ার? কাপুরুষ কোথাকার!

ইঁদুর তাকিয়ে থাকে বিড়ালের দিকে। আজ মনের সুখে দুটিতে পাশাপাশি ছুটছিল—ভয় চলে গিয়ে সে দেখি হিংস্রচোখে চেয়ে আছে। ক্যাঁক করে টুঁটি কামড়ে ধরে আর কি!

ইঁদুর আর দেরি করে? লহমার মধ্যে গর্তে ঢুকে গেল।

ঘুমপাড়ানি গান

শ্রীদীনেশ দাস

সাগর যেমন মুক্তো নিয়ে
দোল দিতে চায় মুক্তধারায়,
যেমন করে আকাশ দোলায়
লক্ষ কোটি অযুত তারায়,
তেমনি করে দোলাই আমি
আমার মাণিক-নয়নতারায়।
নিশুত রাতের বাতাস যেমন
দোলায়, ফোলায় ধানের শিষ,
তেমনি করেই দোল দিতে চাই
মাণিক-সোনায় অহর্নিশ।
মহাকাশের খেলার ছাতে—
খেলায়, দোলায় একটি কোণে
অযুত কোটি সৌরজগৎ
জগন্মাতা সংগোপনে :

হাত দুটি তার ছুঁয়ে আছে আমার হাতে
আমি খোকার দোল্‌না দোলাই আপন মনে।

সন্ধানী

এ বছরের ফাশিং পরব

'ফাশিং' জার্মানীর একটি জাতীয় পর্ব, তবে দক্ষিণ জার্মানীতেই তার জাঁক বেশি। বেশ অনেক দিন ধরেই চলে এই উৎসব এবং সেই সময় স্থানীয় লোকে একেবারে বেপরোয়া উদ্দাম উল্লাসে মেতে ওঠে। গানবাজনা, নাচ আর পোশাকের জাঁকজমকে সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! ঈষ্টার অনুষ্ঠানের আগে এই পর্ব শেষ হয়। আর এই উৎসব দেখতে দেশ-বিদেশের মানুষ পশ্চিম জার্মানীতে আসে।

জার্মান শিশুদের কাছে অপছন্দ মার্কিন পুতুল

কিছুদিন আগে জার্মানীর পুতুলের দোকানে 'বার্বি' নামে আমেরিকার ডল পুতুল খুব দেখা যাচ্ছিল। 'বার্বি' নামের এই পুতুল কিন্তু জার্মান শিশুদের মনঃপূত হয়নি। তাদের কাছে সাধারণ ডল পুতুলেরই আদর বেশি। আর তারা ভালোবাসে যান্ত্রিক খেলনা, যেমন—চলন্ত রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, ইলেকট্রিক ট্রেন,

হাঁড়িকুড়ি ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী। ইদানীং যান্ত্রিক খেলনার চেয়ে বুদ্ধির খেলা জার্মানীর ছেলেমেয়েদের মন জয় করেছে। যুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টি করে এরকম খেলনা পশ্চিম জার্মানীতে বেশি চলে না। জার্মান ছেলেমেয়েদের জন্যে খেলনা তৈরীর পদ্ধতি নজর রাখেন জার্মান খেলনা বিক্রেতা সংস্থা।

জার্মানীর বৃহত্তম প্রতিফলক অ্যানটেনা
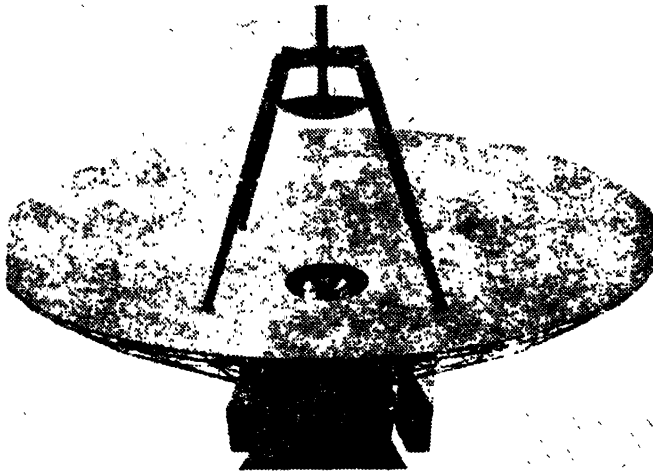
আমাদের ঊর্ধ্বাকাশে যেসব উপগ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলি থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে শীঘ্রই পশ্চিম জার্মানীর বকুমস্থিত মানমন্দিরে বৃহত্তম প্রতিফলক অ্যানটেনা লাগানো হবে। বিশ্বালয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত এই মানমন্দিরটিকে সম্প্রসারিত কোরে উপগ্রহ ও মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। এই মানমন্দিরের স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি অর্ধ-গোলাকার বেলুনের মধ্যে আচ্ছাদিত কোরে রাখা হয়। ২০০ টন ওজনের ২০ মিটার ব্যাসের নতুন প্রতিফলকটিকে আবৃত করার জন্যও একই রকমের আরেকটি আচ্ছাদন তৈরি হয়েছে।

সাইকেল দৌড়ে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান

পেশাদারি সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতায় এখন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হলেন কোলোনের রুডি আলটিক। সম্প্রতি দূরপাল্লার সাইকেল প্রতিযোগিতায় ইনি ফ্রান্সের জাঁ আঁকুতিলকে হারিয়ে এই সম্মানলাভ করেছেন। একাদিক্রমে পাঁচ ছয় দিনব্যাপী সাইকেল চালাতেও ইনি ওস্তাদ। ১৯৬০ থেকে তিনি পেশাদার হিসেবে সাইকেল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে দু'বার জার্মানীর চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন এবং একহাজার ও পাঁচহাজার মিটারের সাইকেল দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

অনুরাগী ও পেশাদারদের উপযুক্ত ডুবোজাহাজ

আন্তর্জাতিক জলযান প্রদর্শনীতে এবারকার আশ্চর্য জিনিসটি হ'ল একজন লোকের উপযুক্ত একটি ডুবোজাহাজ। ১২৬০ পাউণ্ড ওজনের এই ডুবোজাহাজটি ঘণ্টায় চার মাইল বেগে চলতে পারে ও দেড়শো ফুট জলের তলায় দুটি ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের সাহায্যে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে। জলের তলায় বিপদ ঘটলে ক্যাপ্টেন একটি প্যাডেলে পা দিয়ে চাপ দিলেই জাহাজের "ব্যালস্ট" বেরিয়ে যায় ও সেটি ওপরে উঠে আসে। কোনক্রমে যদি চালক অজ্ঞান বা আহত হন, তবে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাতেই এই জাহাজটি ওপরে উঠে আসতে পারে। এই ছোট্ট জাহাজের দাম ২৬,২১০ টাকা। বেতার সাজসরঞ্জাম লাগাতে আরও লাগবে ৫,৫২৫ টাকা।

৩২৫ বছরের পুরাতন হিসাবযন্ত্র

পশ্চিম জার্মানীর সবচেয়ে প্রাচীন হিসাবযন্ত্রটি রয়েছে ব্রাউন্সস্বাইকের হিসাবযন্ত্রের সংগ্রহশালায়। এই যন্ত্রটির এখন দাম প্রায় চার মিলিয়ন মার্ক অর্থাৎ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। এই সংগ্রহশালাতেই আছে ১৬৪২ সনে তৈরী ফরাসী দার্শনিক ও গণিতবিদ্ ব্লঁা প্যাসকেলের উদ্ভাবিত যোগকরার যন্ত্রটি। আবার একেবারে হালের তৈরী বৈদ্যুতিক টেবিল মডেল হিসাব করার যন্ত্রও এখানে রাখা হয়েছে যাতে পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়ে। হিসাবযন্ত্র কেউ যাতে চুরি করতে না পারে সেজন্য সে যুগে সেটিকে টেবিলের সঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই সংগ্রশালার আরেকটি মূল্যবান সংগ্রহ হচ্ছে ৪০০ বছর আগে সংকলিত অ্যাডাম রিজের হিসাব করার বই।

সিংখুড়োর মহাকাব্য

শ্রীবিমল দত্ত

ছেলেদের আসর জাঁকিয়ে বসে সিংখুড়ো গল্পের বস্তা খুলেছেন সবে। বিদ্যুৎ বল্লে, "সিংখুড়ো, আমি একটা কবিতা লিখে 'মৌচাকে' পাঠিয়েছিলাম সেটা ছাপা হয়েছে।"

উপে বল্লে, "কার থেকে টুক্‌লি? তুই তো এক লাইনের সঙ্গে আরেক লাইনের মিল দিতে পারিস্ না—অভিধান ঘাঁটিস্!"

বিদ্যুৎ আমতা আমতা করে বলে, "সেটা এক কৌশলে সেরেছি। আগে এক লাইন লিখে শেষ কথাটার সঙ্গে যত রকম মিল হতে পারে একটা টোক্‌চা কাগজে লিখি—যেমন ধর, বৃক্ষের ডালে বসেছিল এক কাক—এখন 'কাক'-এর সঙ্গে কত রকম মিল হবে আগে লিখি, যেমন—ডাক, হাঁক, ফাঁক, নাক, গা'ক (গাউক), বাক, শাক, টাক, চাক, ঝাঁক, জাঁক…এই রকম। তারপর মেলাই"—

উপে বলে, "যেমন—

বৃক্ষের ডালেতে বসে ছিল এক কাক
কুচ্ছিৎ কেলটে দেহ মাথাভরা টাক।"

সকলে হেসে উঠল।

বিদ্যুৎ রেগে বললে, "কাকের মাথায় কথ্‌খনো টাক থাকে না।"

নিতু বললে, "খুব থাকে, আমি মামার বাড়ীতে একটা টেকো কাক দেখেছি—"

উপে বললে, "এই ছাখ সাক্ষী। তাছাড়া কাক ঝগড়াটে পাখী। একটা কাকের মাথা অন্য কাকে ঠুকরে টাক পড়িয়ে দেয় হামেসাই। তা যদি না পড়ালে তো তোর কাক খামকা গাছের ডালে এসে বসে থাকবে কেন?"

সকলে বল্লে, "ঠিক।"

সিংখুড়ো বললে, "না।" অত্যন্ত গম্ভীর স্বর।

সকলে বেশ মজা পেলে। সকলে বললে, "আপনি 'না' বললেন কেন?"

সিংখুড়ো বললেন, "গাছের ডালে যে কাক বসেছিল তার মাথায় টাক ছিল না—কেমন রে, বিদ্যুৎ, টাক ছিল?"

উপে বললে, "আপনি কি করে জানলেন—সে কাক কি আপনি দেখেছেন নাকি? যত সব আনাড়ি কথা!"

সিংখুড়ো বললেন, "হ্যাঁ দেখেছি, কিন্তু এই চর্মচক্ষে অর্থাৎ চামড়ার চোখ দুটি দিয়ে নয়—কল্পনার চক্ষে। কাক সম্বন্ধে আমি এত অভিজ্ঞ যে তোরা আমাকে একেবারে ঠকাতে পারবি না—এক বিদেশী কাকতত্ত্ববিদের সঙ্গে আমায় রীতিমত করেস্‌পণ্ডেন্স্

(চিঠিপত্র লেনদেন) হয়। তাছাড়া "কাক বনাম ফিঙে" নাম দিয়ে এক মহাকাব্য এক সময় আমি বার করেছিলাম--"

বিদ্যুৎ বল্লে, "তবে যে একদিন বললেন, আপনি কবিতা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না!"

সিংখুড়ো বললে, "পারি না তো'—এতবড় মহাকাব্য লিখে নাম পেলুম না—পণ্ডশ্রম হ'ল মাত্র। তাই তো কবিতার ওপর চটা আমি। রবিঠাকুরের ছবি আছে আমার বাড়ীতে দেখেছিস্?"

উপে বললে, "মহাকাব্যটা একটু শোনান না সিংখুড়ো—সেটা কি ছাপা হয়েছিল না ইতিহাস কল্পদ্রুমের মত—"

সিংখুড়ো চটে গেলেন, "দেখ, ইতিহাস কল্পদ্রুমের শোক অনেক দিন আমাকে পাগল করে রেখেছিল। সে কথা যদি কেউ ফের বলিস তো এই আমি—"

সিংখুড়ো শপথ করতে যান আর কি, এমন সময়ে বাবলু বল্লে, "মিত্রাক্ষর না অমিত্রাক্ষরে লিখেছিলেন সিংখুড়ো?"

সিংখুড়ো বললেন, "সে এক নতুন ছন্দ—ভারী অদ্ভুত সে কাহিনী—খাঁটি সত্য —স্বপ্নে সরস্বতীর দেখা মিলেছিল। মা একটা পদ্মফুলে বসে, আরেকটায় পদ্মফুলের মুড়ি, পদ্ম-মৌ দিয়ে খাচ্ছেন—এমন সময় আমি দেখলাম মাকে—মা বললেন,

"স্বপ্নে তোরে দিয়ে যাই অমর প্রেরণা—আহা! ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।" সিংখুড়ো নীরব হলেন।

কেউ কেউ সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠলো, "আহা! আহা!"

কিন্তু সিংখুড়োর কোনই ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। খানিক পরে বললেন,

"উর দেবী বীণাপাণি।
উরি দাসে দেই পদছায়া"—

—বিদ্যুৎ বললে, "এত মাইকেল মাইকেল মনে হচ্ছে—"

সিংখুড়ো একবার তার দিকে তীব্র কটাক্ষ করে ঢোক গিলে বললেন, "হ্যাঁ, তাই বলছিলুম—ঐ রকম কিছু বলতে পারলুম না—চিরকালই আমি আদি ও অকৃত্রিম জিনিসের ভক্ত তাই যেমন দেখেছিলাম বর্ণনা সুরু করলাম—

পদ্মাসনে বসে মাতা,
সামনে পদ্মপত্র পাতা।
পদ্মমুড়ি তাতে মেখে
পদ্ম মৌ-এ; দেখ চেখে'।
দেখ না ভক্তকে হায়
কী ভীষণ সে হ্যাদায়!"

সকলে হৈ হৈ করে উঠলো। সিং-খুড়ো কিন্তু থামলেন না। সহসা জলদগাম্ভীর স্বরে আবৃত্তি ধরলেন—

"মনোবাঞ্ছা না পূরালে
বিষ ভখি' যুবাকালে
আত্মহত্যা করি আমি
জুড়াবো এ জ্বালা—"

উপে তিড়িক করে লাফিয়ে উঠলো, "মিল হ'ল না। 'আমি'র সঙ্গে 'জ্বালা' কি মেলে ?"

বিদ্যুৎ বল্লে, "তুই এর কি বুঝবি, এ এক অভিনব কাব্য—আদি ও অকৃত্রিম—এর মিলের ফাঁক-গুলোর মধ্যেই তো মজা—"

'বুঝলি ! কাক সম্বন্ধে ঐ 'কাক বনাম ফিঙ্গে' মহাকাব্যে একটা সর্গই লিখেছিলাম।'

সিংখুড়ো হেসে বললেন, "তখনকার নটবর শিরোমণি এই কথাই লিখেছিলেন 'সমাচারঃ চন্দ্রিকায়'—"

বাবলু বললে, "ছাপা হয়েছিল ? তবে যে বললেন, নাম পেলুম না ?"

সিংখুড়ো বললেন, "ছেপেছিলাম বৈকি—কিন্তু সে বই সব বড় বড় সমালোচকদের দপ্তরে আছে। একটা ব্রিটিশ মিউজিয়মে ছিল এই ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, কিন্তু বইটার লেখকের নাম লেখা পাতাটা পায়নি—তাই আমার নাম হ'ল না!" সিংখুড়ো মুষড়ে গেলেন একেবারে।

বিদ্যুৎ বল্লে, "সে যাক্, কাক সম্বন্ধে যা বলছিলেন তাই হোক্—"

"তাই তো' হচ্ছে," বললেন সিংখুড়ো, "তোদের কাছে আমি কি কাব্য আওড়াতে বসেছি ভাবছিস! ফুঃ! আমার দড়ি-কলসী জোটে না! এই সব দুগ্ধপোষ্য, সিনেমাখোর নস্তিটানা, বার্ডসাইফোঁকা ছোকরারা বুঝবে কাব্য! হ্যাঁ, তুই যে কথা বলছিলি সেই কথাতেই ফিরি। কাক, বিশেষ করে যার মাথায় টাক পড়েছে, সে কাক সহজে লোকচক্ষে আসে না—গাছের ডালের ধারে যায় না—খড়ের চালে, ঘরের ছাদে গুম হয়ে ঘোরে—সদা সতর্ক। বুঝলি! কাক সম্বন্ধে ঐ 'কাক বনাম ফিঙ্গে' মহাকাব্যে একটা সর্গই লিখেছিলাম—

"কাকের মহাত্ম্য কিছু করুন শ্রবণ
কাকের হরেক জাত প্রায় অগণন
কেলে কাক, হেঁড়ে কাক, পাতি ও কাগজী
দাঁড়কাক, খেড়ে কাক, এরা সব পাজী
কাক মধ্যে ব্রাহ্মণ যে ডাকেনাকো মোটে
যতই হুশহাস্ করো যায়নাকো চটে
ক্ষত্রিয় কাকেরা যোদ্ধা দল বেঁধে থাকে
পিঁপড়ের উঠিলে পাখা ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
শাদা কাক পাওয়া যায় ওশেনিয়া দেশে
নিষ্ঠাবান কাক তারা গেছে অন্য দেশে।
কাকিনীরা অতি বড় সংসারী সবাই
বাসায় যে ওঠে তার আর রক্ষা নাই—
আচম্বিতে ঠকাঠক্ ঠোকরায় মাথা
গর্ত্ত ক'রে রক্তপাত করিবে অযথা—"

উপে বললে, "একবার মামার বাড়ী চৈতনপুরে আমার মাথায় কাকে ঠুকরে দিয়েছিল—"

বাধা পেয়ে সিংখুড়ো খিঁচিয়ে উঠলেন, "তবে আর কি আমরা কেতাথ হয়ে গেলুম। হতভাগা আমার কাব্যের তোড়ে বাধা দিলি যে বড়! যাঃ, তোর সঙ্গে আর স্পিকটি নট্—এই উঠলাম। 'দিশি দিশি মে বান্ধবাঃ'— বলে ঝেড়ে উঠে পড়লেন সিংখুড়ো।

সকলের সাধ্যসাধনা উপেক্ষা করে সিংখুড়ো পিট্‌টান দিলেন।

বিদ্যুৎ বল্লে, "ওঃ! কী সাফ ব্রেণ—যেই গল্পের খেই হারায়, অমনি কপট রাগ আর প্রশ্নবাণ এড়াবার জন্য বেগে প্রস্থান! খাশা কায়দা সিংখুড়োর!"

নিতে বল্লে, "আরেক দিন ধরতে হবে পাকড়ে। সেদিন দত্তদের বৈঠকখানায় গুল্ ঝাড়ছিলেন, "উনি নাকি পাকিস্তানের যুদ্ধে 'ক্ষেম কারেণে' নিজস্ব সংবাদদাতা হিসাবে গিছলেন 'বিশ্ববার্তা' দৈনিক পত্রের তরফ থেকে!"

সব্বাই হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো—"বাবলু বললে, ক্ষেম কারেণ? কোন্ পথে যেতে হয় জানেন উনি?"

গণশা বল্লে, "সেটা উনি কৌশলে এড়িয়ে যাবেন। ঠকাতে পারবে না কেউ।"

বিদ্যুৎ বল্লে, "আরে 'বিশ্ববার্তা' বলে কোন দৈনিক পত্রই নেই, তার আবার নিজস্ব সংবাদদাতা!"

উপে বললে, "ঠেশে ধরলে হয়ত বলবেন—সুন্দরবনের কোন্ লাটের কাগজ। যা না দেখে আয়না—"

গণশা বললে, "বাপস্! শেষে বাঘে খাক আরকি? কাজ কি বাপু গণ্ডগোলে—চোখ বুজে হাই তুলে বিশ্বাস করাই নিরাপদ—কি বলিস—গল্প আবার সত্যি হয়? গল্প ইজ গল্প।"

বিদ্যুৎ বললে, "যা বলেছিস্! গল্পের গরু গাছে ওঠে--কথায় বলে না?"

সবাই তখন অন্য কথায় চলে গেল। এদিকে সিংখুড়ো তখন ধন্বন্তরী তলায় বসেছেন নেপাল বোসের রোয়াকে। আজগুবির তুলো ধুনছেন বসে বসে।

হে নূতন

শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষদস্তিদার

এসেছে আবার নূতন বরষ
নূতনের বাণী নিয়া
অজানা আশার আলোকে-পুলকে
নাচিছে সবার হিয়া।
আকাশ বাতাস ভরিছে আবার
বকুল চাঁপার গন্ধে,
ভরিবে বুঝি বা জীবন সবার
নূতন সুরভি ছন্দে।

সেই আশা লয়ে চলিব যে সবে
সম্মুখে অনিবার
সময় যে নাই পুরানো দিনের
লাভ-ক্ষতি গণিবার।
শুধু আজ বলি সেই পুরাতন
রেখে গেছে গ্লানি যত,
নূতন প্রলেপে তুমি হে নূতন
মুছে দাও সেই ক্ষত।

রশিদুল হোসেন

গতি

ফ্রিগেট (Frigate) পাখী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী জীব। এর গতি ঘণ্টায় ২০১ মাইল।

চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে দৌড়বাজ চিতার গতি হ'ল ঘণ্টায় ৭০ মাইল।

সেল মাছ (Sail fish) জলচর প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে গতিসম্পন্ন। এর গতি প্রায় চিতাবাঘের সমান।

কীটপতঙ্গের জগতে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ড্রাগন ফ্লাই-এর (Dragan fly) গতি সর্বাপেক্ষা বেশী। এরা ঘণ্টায় পাঁচ মাইল উড়তে পারে।

মানুষ ঘণ্টায় সর্বাপেক্ষা বেশী ২৩ মাইল পর্যন্ত দৌড়তে পারে।

কচ্ছপ চলে ঘণ্টায় মাত্র চার মাইল।

আর শামুক? সে ৩ সপ্তাহে মাত্র এক মাইল।

বিচিত্র বিবাহের প্রথা

মারকুইস দ্বীপের কনেরা বিবাহ সভায় নিমন্ত্রিত পুরুষদের পিঠের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে বিবাহ বেদীতে যায়।

প্রাচীনতম বিচারালয়

স্পেনের ভ্যালেনসিনা গীর্জার সামনে পৃথিবীর প্রাচীনতম বিচারালয় বসে ৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। সপ্তাহের একটিমাত্র দিনে ১১টার সময় এর কাজ বসে এবং সে দিনটি হচ্ছে বৃহস্পতিবার। প্রধানতঃ সেচ ও জলের বণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিচার এখানে চলে। এটি দেশের চাষীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মাত্র ৭ জন বিচারক আছেন, যাঁরা সমগ্র প্রদেশের চাষীদের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁরা একটি বিশেষ শ্রেণীর ভেলভেটের শোফায় বসে বিচারকার্য চালান। এখানে কোন কাগজপত্র, সাক্ষী বা উকীলের প্রয়োজন হয় না; তাছাড়া কোন রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। এখানকার রায় সকলেই মান্য করে। বিচারের জন্য দিন পালটানো বা অযথা সময় নেওয়া এখানকার রীতি নয়। বিগত সহস্র বৎসরে স্পেনের বহু রাজা ও একনায়কতন্ত্রী নায়ক এসেছেন ও গেছেন, কিন্তু কেউই এই বিচারালয়ের ক্ষমতা আজও সংকুচিত করতে পারেন নি।

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাঁটুলের হঠাৎ একটা খাপছাড়া কথা মনে পড়ল। ওদের গ্রামে একমাত্র দারোগার মামার একটা সাতকেলে গাদাবন্দুক আছে। শীতকালে কালেভদ্রে বাঘ বেরুলে সবাই গিয়ে তাঁকে ধরে। তিনি বন্দুক দিয়ে বাঘ মারেন। বাঘ মারেন বলে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছে বাঘমারা দস্তিদার। যদিও সে-কথা তিনি নিজে জানেন না। জানলে পরে ছেলেদের মাথায় টকাটক্ গাঁট্টা মেরে বসবেন।

বাঘমারা দস্তিদারের বউয়ের কিন্তু বেজায় বাজখেঁয়ে স্বভাব। কথায় কথায় ছড়াকাটা তার আরেক অভ্যাস। দস্তিদারকে বন্দুক নিয়ে নড়াচড়া করতে দেখলেই ও ঠোঁট টিপে বলবে—

চালে নেই খড় কুটো
উঠানে যেয়ে বন্দুক ফুটোস্?

অথচ বাঁটুল ওদের জামরুল গাছে চড়ে যখন জামরুল চুরি করে তখন কতবার দেখেছে দস্তিদারদের চালে দিব্যি খড় ছাওয়া। তাহলে এ রকম ছড়া কাটবার মানে কি, কে জানে!

সেই ছড়াটা মনে পড়ল বাঁটুলের। কিন্তু তক্ষুনি তার চোখ সামনের দিকে আটকে গেল।

খুব বুড়ো, ধবধবে সাদা চুল, ভুরু, মাথায় ধবধবে সাদা পাগড়ী, গায়ে সাদা জামা। হাতে একটা বিরাট লম্বা একনলা বন্দুক। কবেকার তৈরী কে জানে!

'ঠাকুর সায়েব! ঠাকুর সায়েব!' সবাই সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করল। বাঁটুলও করল। শুধু রাজাসায়েবের মুখটা লাল হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আমি কুমার চন্দ্রভাণ পরমার, বলাগড়ের ঠাকুর সায়েব!'

Uttarpara Jaikrishna Public Library.

'আমি জানতাম না দাদাজী, তুমি এখানে।' রাজাসায়েবের চোখ লালচে কেন?

'আর কোথায় থাকব?'

'দাদা, অর্জুনকে আমি বাঁচাতে পারিনি।' তা হলে বুড়ো ওর ঠাকুরদাদা।

'জানি।'

'তোমার ছেলে, আমার বাবা-ও বন্ধুকের গুলীতে—'

'তাও জানি।' সেইজন্যেই তো যার কাছে যা পেয়েছি সব বন্দুক, সব তরোয়াল ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসেছি। এবার আংরেজদের খতম করে শেষ করে দেব। আমার পূর্বপুরুষ রাজপুত। আমরা কি যুদ্ধ করতে ভুলে গেয়েছি?'

'না দাদাজী।'

'তবে আর দেরী কেন?' বুড়োর গলাটা যেন গমগম করে উঠল। বুড়ো রাজপুতের সেই গলাটা বাঁটুলের অনেক দিন অবধি মনে ছিল।

দেওয়ালের গায় দাঁড় করানো সারি সারি বন্দুক। সেই কবেকার সব বন্দুক, ইয়া লম্বা লম্বা নল, বারুদ ঠেসে পলতে জেলে ফোটাতে হয়। বুঝি পর্তুগীজদের সময়কার, বুঝি তারও আগেকার, মোগল আমলের। পুরনো মরচে ধরা বন্দুক, সেপাইদের কাছ থেকে পাওয়া বিলিতী বন্দুক, কোমরে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে এমনি ধারা পিস্তল।

বলাগড়ের বুড়ো ঠাকুরসায়েবের সঙ্গে দুটো দিন থাকলে বোধ হয় বাঁটুলের যুদ্ধটাও দেখা হয়ে যেত, কিন্তু তা আর হ'ল না।

সেইদিনই রাত ঘনালে রাজাসায়েব বাঁটুলকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, 'আমার ব্রিজলালদের কথাবার্তা খুব ভাল মনে হচ্ছে না, জানলে? ওরা বোধ হয় তোমাকে মেরে ফেলতে চায়।'

'কেন বল দেখি?'

'ওদের যে বাঙালীদের ওপর ভীষণ রাগ।'

'তোমার?'

'আমারও রাগ আছে, কিন্তু তোমার ওপর তা বলে কোন রাগ নেই।'

'তুমি তো ওদের রাজা। ইচ্ছে করলে ব্রিজলালকে তুমি মারতে পার না?'

রাজাসায়েব একটু হাসল। বলল, 'আমি ঠিক তেমন বড় রাজা নই, যদিও ওরা রাজাসায়েব বলে। আর একা ব্রিজলালকে মেরে কি করব বল? বাঙালী বলতেই ওরা সবাই মনে করে সায়েবদের দলের লোক।

'তুমিও কি তাই মনে কর?'

'না। আমি যে ছোটবেলা থেকে বাঙালী মাষ্টারমশাইদের কাছে পড়েছি। কাশীতে তো অনেক বাঙালী থাকেন! আর তোমাকে তো বলেছি তুমি ছোট ভাইটির বয়েসী।

'তোমার ছোট ভাই সত্যি সত্যি বেঁচে নেই?'

রাজাসায়েব একটু হাসল। বলল, 'ও যে জন্মরোগা আর তেমনি ভিতু ছিল। একবার ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিলে মানুষ কি আর বাঁচে?'

'তুমি তো বেঁচেছ!' বাঁটুলের এখন ভ্যাঁ করে কান্না পাচ্ছে।

'আমি যে ছোটবেলা গলায় আসল বাঘের চর্বি মাখতাম।' রাজাসায়েব খুব হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর কথা নয়। আজই তোমাকে আমি নদী পার করে দেব। কিন্তু শোন, নদী পার হয়ে কাজ নেই। তোমায় বরং নৌকো করে গোম্‌নীতে পৌঁছে দিই। ওখানে একজন সন্নেসী আছেন।'

'তার কাছে কেন যাব?'

'তাঁর নাম এখন রামদাস বাওয়া। তবে শুনেছি একসময়ে উনি নেপালে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। জাতে বাঙালী। নেপালে কোন এক সন্নেসীর পাল্লায় পড়ে সন্নেসী হয়ে গিয়েছেন। ওঁর আখড়ায় থাকলে তোমাকে কেউ মারবে না, ধরবে না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, ওঁকে সবাই ভীষণ মানে কিনা! মানে আমাদের সেপাইরাও। উনি বোধ হয় তোমাকে একটা হিল্লে করে দেবেন।'

'বাবাকে খুঁজে দেবেন?'

'সে কথা কি আমিই জানি? তবে এদের কাছ থেকে সেখানে তুমি অনেক নিরাপদ। ভাল কথা, তোমার সঙ্গে টাকাপয়সা কিছু আছে?'

'না তো!' বাঁটুল শ্রেফ মিথ্যে কথা বলল।

'এই মোহরটা রাখো। ভাঙালে পরে অনেক টাকা পাবে। তবে যাকে-তাকে দেখিও না। দেখালে এই মোহরটার জন্যেই হয়তো তোমার মুণ্ডুটা কেটে নেবে।'

'বল কি?'

'মানুষের মুণ্ডু যে এখন ভীষণ সস্তা! আমরা সায়েবদের মুণ্ডু দেখলেই তরোয়ালে ঘি মাখিয়ে ঘ্যাচ করে বসিয়ে দিচ্ছি, ওরাও তাই করছে।'

রাজাসায়েব বাঁটুলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, 'কি জানো, তোমার পায়ে, এই ধরো হাঁটুর নিচে একটা ভালমত দগদগে ঘা দরকার।'

তিব্বতী দাওয়াই

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

এই ছেলেটা, কি নাম তোর ? কি বললি ফটিকে ?
জানিস্ কি রে রোজ কতজন থাকে রোগে পটকে ?
রোজ কতজন হয় বা জখম দুর্ঘটনার পাল্লাতে ?
হিসেব কিছু রাখিস্ রোগে ক'জন মরে দিন-রাতে ?
জানি বলেই গিয়ে আমি হিমালয়ের পর্বতে,
এলুম শিখে আজব দাওয়াই লামার কাছে তিব্বতে।
এ চিকিচ্ছেয় নেই কো খরচ, নেই কো কিছু হাঙ্গামা,
করতে পারে দাদা, দিদি, মাসী, পিসী, মা মামা।
বহুল প্রচার করতে হবে দশজনেরই উব্গারে,
তোকে যেমন বলছি তেমন বলবি পথে পাস্ যারে।
দাঁতের ব্যথায় কেউ যদি রে চেঁচিয়ে করে মাত্ পাড়া,
উঠোনেতে রদ্দুরেতে রাখবি তাকে ঠায় খাড়া।
হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো করে দেখিস্ কারো যদি হয় হাঁচি।
নাকের ফুটোয় ছেড়ে দিবি ডজনখানেক ডাঁশ মাছি।
রাতের বেলায় ঘুমের মাঝে কারো যদি নাক ডাকে,
বোতলখানেক কেরোসিন ঢেলে দিবি তার নাকে।
চোখ উঠলে আর কিছু না মারবি টেনে এক ঘুঁষি,
অসুখ তাতে যাবেই সেরে, হবে রুগী খুব খুশি।
সন্ধ্যে রাতেই পড়তে বসেই কারো যদি ওঠে হাই,
মুখে ঠেসে গুঁজে দিবি আঁস্তাকুড়ের শুক্‌নো ছাই।
খেলা ধুলো করতে গিয়ে কারো যদি ভাঙ্গে ঠ্যাং,
বলবি তাকে ভাঙ্গা পায়েই দেয়ালেতে মারতে ল্যাং।
হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কোথাও যদি যায় কেটে,
তেলাপোকার রস লাগাবি শিলে করে বেশ বেটে।
যেমন করেই হোক্ না কেন চামড়া যদি যায় ছড়ে,
মুণ্ডুটা তার একেবারে ঘুরিয়ে দিবি এক চড়ে।
আর যা আছে তোকেই সে সব শিখিয়ে দেব সোমবারে,
পারিস্ যদি সঙ্গে আনিস্ ঘোষজা এবং বোসজারে।

টোকিও শহরের জ্যান্ত রুমাল

জাদুরত্নাকর এ. সি. সরকার

ভদ্রলোকের নাম মিঃ হাসিদা। এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের সিম্বাসী রেল স্টেশনে। আমি ফিরছিলাম ইয়াকোহামা শহর থেকে বিজলী-রেলে ক'রে। ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্ম পেরিয়ে একটা মোড় পেরুলেই মিয়াকো হোটেল। এই 'মিয়াকো হোটেলেই' সেবার আমি আস্তানা পেতেছিলাম।

সিম্বাসী স্টেশনে প্লাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে বেরুতে যাব, এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন পেছন থেকে আমায় ডাকছে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে, "হ্যালো মিসতাল সোরসার। ওয়েথ এ মিন্নুট প্লিজ।" হঠাৎ থেমে পেছনে দিকে তাকিয়ে যাকে দেখতে পেলাম তাকে এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

আমার অবাক হবার ভাব লক্ষ্য করে আগন্তুক কথা বললেন আগের মতই ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে। যা বললেন তার অর্থ হ'ল এই যে, আমার অগণিত গুণগ্রাহী ভক্ত দর্শকদেরই একজন তিনি। তবে হ্যা আমার ম্যাজিক ও কণ্ঠ-গীটার* সম্বন্ধে তিনি একটু বিশেষ কৌতূহলী, কারণ তিনি নিজেও একজন সৌখীন জাদুকর।

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। কথা বলতে বলতেই পৌছে গেলাম মিয়াকো হোটেলের সদরে। অভ্যর্থনা করতে হ'ল না। একবার বলতেই তিনি আমাকে অনুসরণ করে ঢুকলেন হোটেলের ভিতরে। হোটেলের বসবার ঘরের কোণে একটা সোফায় গিয়ে বসলাম। ভদ্রলোক যেন কি একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারছিলেন না। সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। তার সঙ্কোচ কাটানোর জন্তে তাঁকে বললাম, "আমাকে কিছু বলতে চান?" এক গাল হেসে তিনি বললেন, "একটা ছোটখাটো ম্যাজিক যদি শিখিয়ে দেন তো খুব ভাল হয়।" ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনের মধ্যে কেমন যেন একটা কমনীয় আবেদন ছিল। তার অনুরোধ না রেখে পারলাম না।

পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে তা দিয়ে মুখ ঘাড় সব মুছে, পকেটে রাখতে যাব এমন সময় সেটা হাত থেকে পড়ে গেল নীচে। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে তুলে আনতে গেলেন রুমালটা—আমি তাকে বাধা দিলাম। ভদ্রলোক চুপ করে বসে রইলেন। এর পরে আমি ডান হাত দিয়ে ইশারা করতেই রুমালটা আপনা থেকে আমার হাতে উঠে এলো পোষা কাঠবিড়ালীর মতো!

---

* জাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার 'গীটার-কণ্ঠ জাদুকর' নামে বিশ্ববিখ্যাত। শুধু মাত্র গলার স্বরের সাহায্যে তিনি গীটারের সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করতে পারেন বলেই তাঁর এই নাম দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আর কেউ এই অদ্ভুৎ বিভাটি জানেন বলে আমাদের জানা নেই।—মৌঃ সঃ

কেমন ক'রে এই মজার ব্যাপারটা করলাম তা শেখার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিঃ হাসিদা। "মিঃ সোরসার প্রিন্স! দয়া করে আমায় এ খেলাটা শিখিয়ে দিন না!"

"এই নিন খেলাটার আসল কৌশল," বলে আমি তার হাতে তুলে দিলাম আমার রুমালটা। ভাল করে লক্ষ্য করার পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে রুমালের কোণে একটা খুব সরু কালো সুতো বাঁধা রয়েছে। এই সুতো বাঁ হাতে ধীরে ধীরে তার অজ্ঞান্তে টেনেই যে আমি রুমালটাকে কাছে এনেছিলাম বুঝে মিঃ হাসিদা চুপষে গেলেন। তাঁর সব উৎসাহ ফুসমন্তরে জল হয়ে গেল। এই অতি সহজ কারসাজিটা বুঝতে না পারার জন্য তিনি খুবই অপ্রস্তুত হলেন। ঘরের কোণটায় ছিল একটা আলো-আঁধারী ভাব। সুতোটা ছিল খুব সরু আর কালো। তাই তো কৌশল ধরা পড়েনি।

তোমরাও এমনি ধারা জাদুর মজা করতে পারো। সরু, কালো সুতো নেবে আর বেছে নেবে ঘরের কোণের একটু আধ-অন্ধকার পরিবেশ। সোফার উপরে বসে বাঁ হাতটাকে পীঠের পেছনে দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সুতোর খোলা প্রান্ত ধরে টানবে তবেই সুতোর টানে অন্য প্রান্তে আটকানো রুমাল উঠে আসবে। ভাল করে অভ্যাস না করে এ খেলা দেখাতে যেও না। ধরা পড়ে যাবে।

কাগজ দিয়ে মজার পুতুল তৈরী
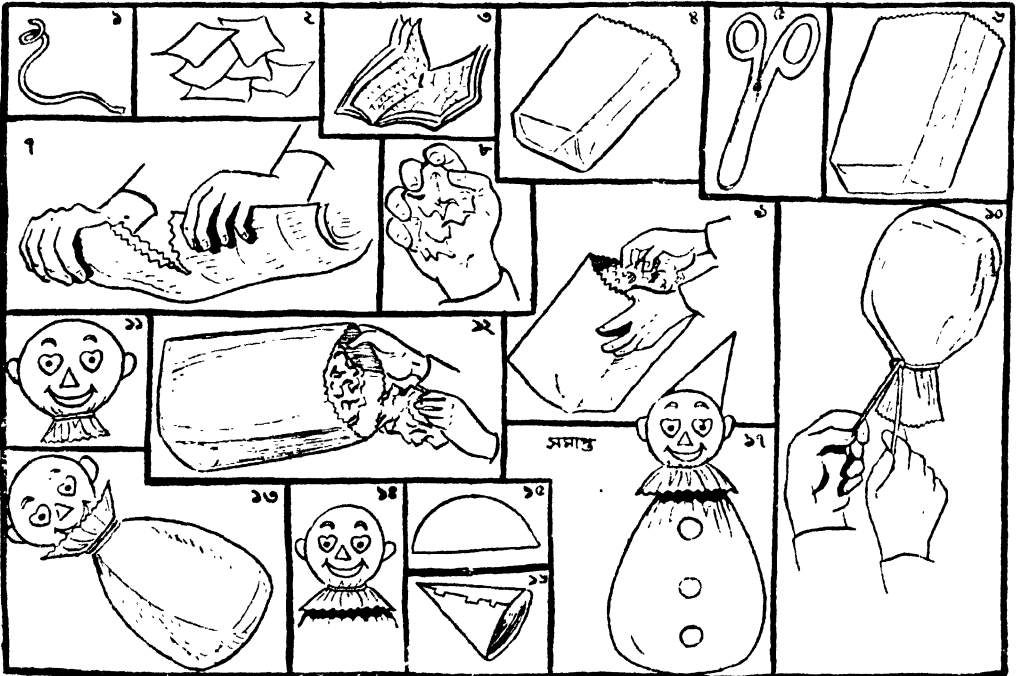
একটু সুতো, একটি কাঁচি, কিছু ছেড়া টুকরো কাগজ এবং কিছু রঙিন ভাল কাগজ নিয়ে কি ভাবে মজার পুতুল করা যায়, এই ছবিটির প্রথম সংখ্যা থেকে পর পর সংখ্যা ও অংশগুলি ভাল করে দেখে সেই ভাবে ১৭ সংখ্যার মত একটি সুন্দর পুতুল করতে পারবে তোমরা।

শ্রীরামপদ
মুখোপাধ্যায়

আড়াই হাজার বছর আগেকার সুদীর্ঘ রাজপথ। মগধ থেকে মধ্যপ্রদেশ—পাটলীপুত্র আর উজ্জয়িনী, মাঝখানে বেত্রবতী নদীর ধারে বিদিশা; সেকালের ধনিক, বণিক, ধার্মিক সকলকারই যাতায়াতের রাজপথ ছিল এটা। অশোকের সময়ে পাটলীপুত্র ছিল ভারতবর্ষের মধ্যমণি, উজ্জয়িনীর খ্যাতিও কম নয়। তারই কাছাকাছি বিদিশার রাজকুলের সঙ্গে মৌর্যবংশের নিকট আত্মীয়তা বন্ধন ছিল। তাছাড়া মহা কাচ্ছায়ন নামক একজন বৌদ্ধ সাধুর প্রচেষ্টায় এই দিকটায় বুদ্ধ মহিমায় আলোটিও হয়েছিল উজ্জ্বল। সেই আলোয় বেত্রবতীর এ পারে বিজন মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটি পাহাড় ধীরে ধীরে দৃষ্টির সামনে ভাস্বর হয়ে উঠছিল। নাম তার সাঁচী। এখন অবশ্য বিজন মাঠের চেহারা পালটে গেছে, এখানে-ওখানে বসতি-চিহ্ন দেখা যায়। তার চেয়েও বড় আশ্বাসের কথা চমৎকার একটি রেল-ষ্টেশন মাথা তুলেছে। স্টেশনের সামনে থেকে সুরু হয়ে পীচ বাঁধানো চমৎকার পথটি কয়েক ফার্লং এসে সেই পাহাড়ের কোলে মিশেছে। এবং তারপরেও পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে মাথা বরাবর। সেই পথে পায়ে হেঁটে ওঠার পরিশ্রম কম—মোটরের গতিও অনায়াস।

সমতল পথের দু'পাশে সারিবদ্ধ গাছগুলির এখনও কিশোর-কাল—শাখা-প্রশাখা পাতার ঘনত্বে ছাতার আকার নিয়ে পথের উপর বিছিয়ে দিয়েছে সুশীতল ছায়া। ক্লান্ত পথিককে আশ্বাস দিতে সেই পথের দু'পাশে রয়েছে দোকান-পসার। ভোজনালয়, যাত্রী নিবাস, সংগ্রহশালা। বড় বড় শহরগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে—বাস, মোটর, টাঙ্গা। সুতরাং দূর বিদেশে আহার, আশ্রয়, যানবাহন সব দিক দিয়ে যাত্রীরা উদ্বেগহীন।

দূর কালের সেই রাজপথ এখনও বেঁচে আছে কিনা সে কথা কেউ আলোচনা করে না—রেলের কল্যাণে সেই পথের দূরত্বও কেউ কল্পনা করে না—ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে সহজগম্য জায়গাটা। বাংলার কথাটাই ধরা যাক। হাওড়া থেকে কাটনি জংশন, সেখান থেকে গাড়ী পালটে বীণা জংশন হয়ে এক দৌড়ে সাঁচী। ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদ। সাঁচী ছুঁয়েই দিল্লী-মাদ্রাজ বা দিল্লী-বোম্বাই'এর গাড়ীগুলো ছুটোছুটি করছে। সাঁচীর একধারে গোয়ালিয়র, ঝাঁসী, বিদিশা, অন্য ধারে ভূপাল প্রভৃতি ইতিহাস-খ্যাত স্থান। একই যাত্রায় এগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মূল জিনিসের সঙ্গে ফাউ—অর্থাৎ পাওনা ষোল আনার উপরে আরও দু'আনা। যাক, এখন আসলের কথাতেই ফিরে আসি।

আমরা জানি সম্রাট অশোক ৩৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন (২৭৪-২৩৭ খৃঃ পূঃ)। বৌদ্ধধর্মের প্রসারকল্পে তিনি অকাতরে সর্বস্ব ব্যয় করেছিলেন, যার ফলে বৌদ্ধধর্ম অর্ধেক

পৃথিবীর ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তাঁরই সময়ে অসংখ্য চৈত্য, বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ, শিলালেখ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। সাঁচীর ইতিহাস এই সময় থেকেই সুরু। পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড স্তূপটি ভগবান বুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যবংশ বিলুপ্তির পথে এগিয়েছিল—তাঁর কীর্তিচিহ্নগুলিও একে একে ভেঙ্গেচুরে হতশ্রী হচ্ছিল। বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর শত্রু সুঙ্গবংশের পুষ্যমিত্র রাজা হওয়ার পর এইগুলির দুর্দশা চরমে উঠেছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র ধর্মদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে বহু বৌদ্ধবিহার স্তূপ সুসংস্কৃত হয়। সাঁচী স্তূপের চার ধারের রেলিঙ তিনিই তৈরী করিয়াছেন। ওই স্তূপের নীচের ছোটবড় আরও একটা স্তূপ নির্মাণ করান। সেটি অর্হৎ মোগালিপুত্ত তিসার স্মৃতি-মন্দির। কারও মতে ইনিই ছিলেন অশোকের ধর্মগুরু—যাঁর আর এক নাম উপগুপ্ত?

সুঙ্গবংশের পর সাতবাহন রাজারা সাঁচীকে আরও সুন্দর করে সাজাতে চেষ্টা করেন। রেলিঙের চারধারে কারুকার্যমণ্ডিত তোরণগুলি তাঁদের সময়েই তৈরী হয়। প্রধান স্তূপের সামনা-সামনি আরও দুটি স্তূপ সারিপুত্ত ও মহা মোগালায়নের নামে উৎসর্গকৃত হয়। সাঁচীর বর্তমান রূপটি এই ক'টি রাজবংশ মিলে সম্পূর্ণ করেছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর কালের পীড়নে, ধর্মদ্বেষীর অত্যাচারে, অনাদরে অবহেলায় সেই সম্পূর্ণ রূপটি আজ আর নেই—তবু যা আছে, তারও তুলনা নেই। এখনও পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে নানা মানুষ ছুটে আসে সাঁচীতে। শিল্পকর্মময় এমন তোরণ পৃথিবীর কোথায়ই বা আছে! মাত্র কয়েকমাস আগে আমারা গিয়েছিলাম বাংলা থেকে ভূপাল হয়ে।

ভূপাল থেকে সাঁচী ঘণ্টাখানেকের পথ। ট্রেন ছাড়া বাসেও যাওয়া যায়। ট্রেনের সময়টা অনিয়মিত বলে কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বাস বা রেল-স্টেশন থেকে সাঁচীর স্তূপটা কয়েক ফার্লং-এর নাগালে। পাহাড়ে উঠতে ১৫।২০ মিনিট সময় লাগে। খুব ছোট পাহাড়।

পথটা কিন্তু সুন্দর—মনে হয় কুঞ্জবনের মাঝখান দিয়ে চলেছি। পাহাড়ে উঠবার মুখে বাঁ ধারে সংগ্রহশালার দপ্তর। এইখানে স্তূপ ও সংগ্রহশালা দেখার টিকিট কিনে নিতে হয়। না হলে পাহাড়ের মাথায় স্তূপের এলাকায় প্রবেশ নিষেধ।

সংগ্রহশালা বা স্তূপ যে কোনটি আগে-পরে দেখা যায়, তবে উপরের কাজ সেরে নীচেয় আশাই যুক্তিযুক্ত।

পাহাড়ে খানিকটা উঠে ডান দিকে পুরনো পথটা পড়ল। সেটা এবড়ো-খেবড়ো ও খাড়াই, কিন্তু সংক্ষিপ্ত। দু'ধারে আতা গাছের ঘন ঝোপ। দুপুর বেলায় রোদের

সাঁচী বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান তোরণ

তাত ছিল—গাছের ছায়ায় পথটা ভালই লাগল। কিছু পরিশ্রম হ'ল বটে—সময় বাঁচল খানিকটা। সময় বাঁচানোর প্রয়োজন ছিল—সব দেখে শুনে ট্রেনে করে ভূপালে ফিরতে হবে।

অল্পক্ষণেই পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। মনে হ'ল সমতলের ছোট্ট একটি গ্রামে পৌঁছেচি। খুব পুরনো গ্রাম—ভাঙ্গাচোরা ইমারত, এধার-ওধার ইট ছড়ানো, খানিকটা উলুঘাসের জঙ্গল, ভাঙ্গা রেলিঙ, খিলানের অংশ, কানিসের টুকরো, উপড়ানো থাম—অতীতকালের কথাই মনে করিয়ে দিল। ঘুরতে ঘুরতে সেই কালের মধ্যে হারিয়ে গেলাম আমরা।

সাঁচীর বৌদ্ধ মন্দির

আবার পাহাড়ের একধারে সরে এসে দেখি—নীচের ছবিটা কি সুন্দর! আমাদের পায়ের তলায় কূলকিনারাহীন মাঠ;—এখানে-ওখানে ছোট ছোট বসতি-চিহ্ন, ক্ষেত-খামার, গাছপালা, পাতকুয়া, কুঁড়ে ঘর। দূরে স্টেশন—তারও ওপারে পাহাড়ের বেড়া। এই ছবি যে-কোন পাহাড়ে উঠলে হয়তো দেখা যাবে—। আমরা কালবিলম্ব না করে স্তূপের দিকে এগিয়ে গেলাম।

স্তূপের চেহারাটা যেমন-তেমন—যাঁরা মৃগদাবে ধামেক স্তূপ দেখেছেন—তাঁরা ছবিটা মিলিয়ে নিতে পারবেন—কিন্তু শোভায়, শিল্পকর্মে যার তুলনা আর কোথাও নেই—সে হ'ল তোরণ—স্তূপের প্রবেশ দ্বারগুলি। এর মধ্যে আবার সব চেয়ে প্রসিদ্ধ হ'ল উত্তরের তোরণ। এর আগাগোড়া শিল্পকর্মমণ্ডিত এবং ভাঙ্গাচোরাও কম। দক্ষিণের তোরণটি অর্ধভগ্ন—তেমন শিল্পকর্ম নেই। পূব ও পশ্চিম দিকের দুয়ারগুলিতেও যথেষ্ট কাজকর্ম আছে। তবে একটা কথা—এই সব শিল্পকর্ম চেয়ে দেখবার মত হলেও, সঙ্গে এমন একজন থাকা দরকার যিনি কাজগুলির পরিচয় মোটামুটি দিতে পারেন। তথাকথিত গাইডের কথা বলছি না। ওরা এত তাড়াতাড়ি বলে এবং একটা ছবি বুঝতে না বুঝতে আর একটার দিকে টেনে নিয়ে যায়, যা রীতিমত ক্লান্তিকর ও বিরক্তিজনক।

তোরণের আগাগোড়া যে সব মূর্তি দেখা যায়—তার মধ্যে অশ্ব, হস্তী, বাঘ, সিংহ চক্র, ছত্র, বোধিবৃক্ষ, সরোবর, মৃগ এবং নরনারীই প্রধান। এইসব মূর্তিস্থাপনার অর্থ ও কাহিনী জানতে পারলে দর্শনের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। অন্যথায় সবটাই হয় অন্ধের দর্শনের মত।

তবে মোটামুটি চারটি ছবি প্রত্যেকটি তোরণে দেখা যায়। বুদ্ধের জন্ম, তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ, প্রথম বাণী প্রচার ও মহাপরিনির্বাণ। ছবিগুলি সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতধর্মী। যেমন জন্মের সংকেত হ'ল একটি পূর্ণ বিকশিত কমল—পদ্মের সামনে সমাসীন মায়াদেবীর মাথায় হাতীরা স্নানের জল ঢালছে। বুদ্ধত্বলাভের দৃশ্যে—বোধিবৃক্ষতলে একটি আসন —সামনে কুশ হস্তে ব্রাহ্মণ মূর্তি; প্রথম বাণী প্রচারে—ধর্মচক্র ও হরিণ এবং মহাপরিনির্বাণে স্তূপ। চারটি মাত্র সঙ্কেতময় ছবির মাধ্যমে একটি মহাজীবনের প্রকাশ।

তোরণগাত্রে কোথাও বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল না—প্রতিটি তোরণ পার হয়ে স্তূপের গায়ে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। এগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন।

স্তূপের উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে আর আছে পরিক্রমার পথ। কিন্তু সেই পথে ঘুরপাক খাওয়া মানেই কৌতূহল নিবৃত্তি। স্তূপের গায়ে কিছু অস্পষ্ট লেখাও আছে —সাধারণ মানুষের কাছে তা মূল্যহীন।

আমরা তাড়াতাড়ি সবটা দেখে পাঁচিলের বাইরে এলাম।

পাঁচিলের বাইরেও সম্প্রতিকালে একটি বুদ্ধমন্দির তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে—সিংহলস্থ মহাবোধি সোসাইটির উদ্যোগে। এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। মন্দিরের সেবকদের ব্যবহার ভারী মিষ্টি।

সাঁচী সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে এঁদের সাহায্য পাওয়া যায়।—কিছু পুঁথিপত্রও এঁদের স্টলে দেখা গেল।

আধুনিক মন্দির দেখে আমরা মোটরের রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। পাহাড়ের নীচেতেই পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কয়েকটি নূতন ঘরে পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে পুরনো জিনিসগুলি। সংগৃহীত দ্রব্যের সংখ্যা প্রচুর নয়—আমরাও প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলাম না—কাজেই আধঘণ্টার মধ্যে সব দেখাশোনা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম স্টেশনে।

খবর এলো—তিন ঘণ্টা দেরিতে আসছে গাড়ী—কখন ভূপালে পৌছব জানি না। তা হোক—তার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল না। সমধুর অতীত-স্মৃতি রোমন্থনের আনন্দে মন এখন কানায় কানায় ভরে রয়েছে।

চাইছে যেতে মনটা যে

শ্রীমতী মায়া ঘোষদস্তিদার

মৌমাছিরা দল বেঁধে সব
যাচ্ছে কোথায় বল না রে
ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে
ভাই-বোনে যাই চল না রে।
শিউলি ফোটায় মিষ্টি সুবাস
ছড়িয়ে গেল বনটাতে
ঘর-পালানোর জাগলো নেশা
আজকে আমার মনটাতে।
ঐ দেখ্ না ভোমরাগুলো
গুন্‌গুনিয়ে যাচ্ছে রে
প্রজাপতি হয় তো এখন
ফুলের মধু খাচ্ছে রে।

গাল ফুলিয়ে যাচ্ছে বকুল
বুলবুলি আর চন্দনা
ফল্‌সা গাছে জলসা চলে
গাইছে কোকিল মন্দ না।
গান গেয়ে যায় পথে বাউল
বাজছে হাতের একতারা
ঐ সুরেতে মন যে আমার
চাইছে হতে ঘর ছাড়া।
আজকে ভাল লাগছে না রে
ছোট্ট ঘরের কোণটাতে
ওদের সাথে ডানা মেলে
চাইছে যেতে মনটা যে॥
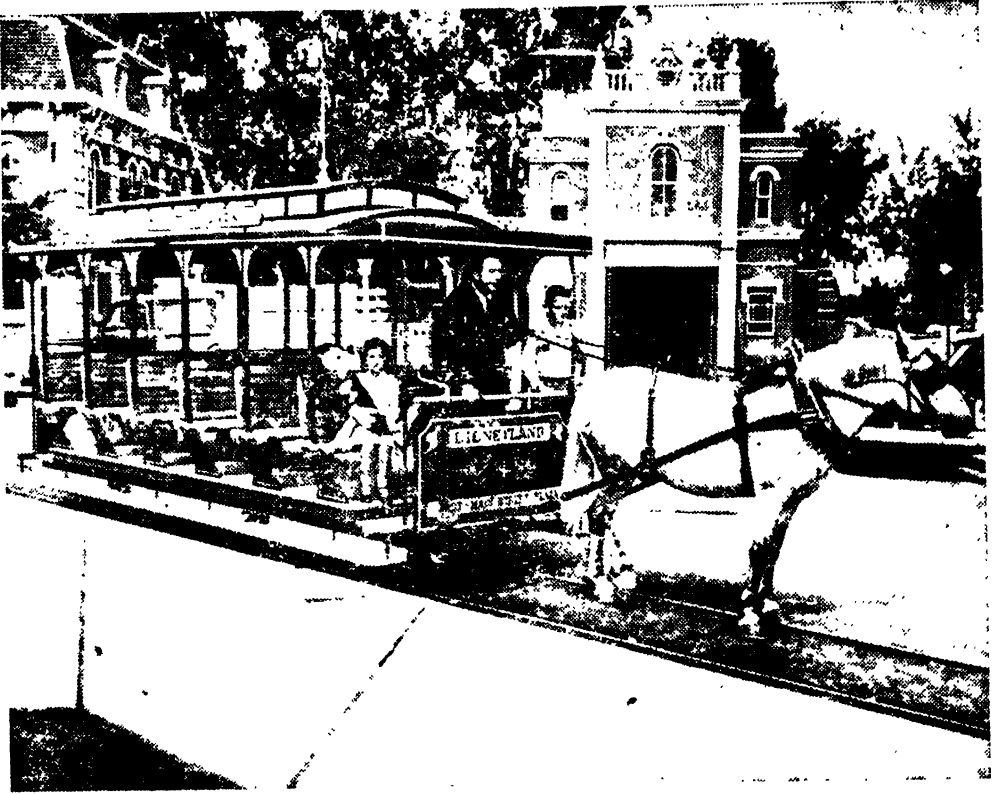
ডিসনীল্যাণ্ড-এর মধ্যে একটি ঘোড়ায়-টানা গাড়ি

ডিসনীল্যাণ্ড

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত

পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা আনন্দলোক কি এ প্রশ্নের জবাবে আমার মনে হয় একমাত্র উত্তর আসবে—ডিজনীল্যাণ্ড। সারা ভূগোলের পাতা উলটিয়ে তোমরা অবশ্য ডিসনীল্যাণ্ড বলে কোন দেশের সন্ধান পাবে না—এ হচ্ছে এক জাদুর জগৎ আর তার স্রষ্টা হচ্ছেন যাদুকর শিল্পী ওয়াল্ট ডিসনী। ছোটদের আনন্দের সব কিছু উপাদান জড়ো করে একে গড়েছেন ডিসনী যা ছোটদের সামনে খুলে দিয়েছে এক নতুন জগৎ। শুধু ছোটরা কেন বড়রাও এই আজব দেশ দেখে বিস্মিত ও পুলকিত হবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে ডিসনীর কল্পনায় ছিল ২ একর জায়গা নিয়ে একটা এমিউজমেণ্ট পার্ক। ডিসনীর ষ্টুডিও সংলগ্ন এই পার্কে দর্শকেরা আসবেন, তাতে কাজের কোন অসুবিধা

হবে না ষ্টুডিও কর্মীদের। পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা বদলাল। ডিসনীল্যাণ্ড গড়ার স্বপ্ন ছিল অনেক দিন থেকেই। ডিসনীর আঁকা মিকি মাউসের জন্মের বছর পাঁচ পর থেকেই এর পরিকল্পনা। আমেরিকান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর টেলিভিসনের জন্যে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে ছোটদের প্রোগ্রাম করবার সময় জাদুর জগৎ গড়ে তোলার জন্যে হলেন দৃঢ়সঙ্কল্প। একদিন নিজের দুই মেয়েকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেছেন, আমোদপ্রমোদের সাধারণ ব্যবস্থা দেখে তাঁর ভাল লাগল না। নিতান্ত মামুলী জিনিসে শিশুদের মন ভরে না, সেদিন তিনি ভালভাবে বুঝলেন।

কাজ সুরু হয়ে গেল। লস এঞ্জেলস থেকে মাইল তিরিশেক দূরে যোগাড় করা হ'ল একটা জায়গা, নাম আনাহাইম। ১৭০ একরের একটা বিরাট এলাকা নিয়ে কাজ চলতে লাগল। গোড়াতেই তৈরীর সময় খরচ করা হ'ল সতেরো মিলিয়ন ডলার (প্রায় তের কোটি টাকা), পরে আরো দেওয়া হয়েছে ৪০ কোটি টাকা। অনুমান করতে পারছ কি বিরাট ব্যাপার! ওয়াল্ট ডিসনীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ রূপায়িত হতে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর এল সেই শুভদিন—১৯৫৫ সালের ১৮ই জুলাই। উদ্বোধন হ'ল চিরবিস্ময়ের দেশ "ডিসনীল্যাণ্ড"। সারা বিশ্বের সামনে খুলে গেল সব পেয়েছির দেশ—যার একচ্ছত্র সম্রাট ওয়াল্ট ডিসনী। এই বিরাট ব্যাপারকে ভালভাবে চালান সোজা কথা নয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার লোক এখানে কাজ করেন। বছরে দেখতে আসে ৬০ লক্ষ লোক। উদ্বোধনের দিনে সারি দিয়ে এত দীর্ঘ সময় এত লোক দাঁড়িয়েছিল, যা পৃথিবীর ইতিহাসের স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যেতে পারে। অদম্য কৌতূহল নিয়ে সকলে গেছেন—যখন ফিরে এসেছেন তখন চোখে-মুখে বিস্ময় —বিস্ময়ের পর চরম পরিতৃপ্তি। যা তাঁরা দেখে এসেছেন, স্মৃতির মণিকোঠায় তা চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আমেরিকায় এসে যদি কেউ ডিসনীল্যাণ্ড না দেখে থাকেন, তাহলে তাঁর মত ভাগ্যহীন কেউ নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা রাণী, প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিরা আসেন এখানে নিয়মিত। প্রথম পাঁচ বছরের বরেণ্য আগন্তুকদের মধ্যে ছিলেন, জর্ডনের রাজা হাসান, গ্রীসের রাজকুমারী সোফিয়া, মরক্কোর রাজা মহম্মদ, বেলজিয়ামের রাজা বউদায়িন, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ প্রভৃতি। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৯৬১ সালে গিয়েছিলেন এই আনন্দ-উদ্যানে। সব কিছু ভুলে শিশুদের মতো আনন্দ উচ্ছ্বাসে কাটিয়ে দিয়েছিলেন সারা দিন। নিকিতা ক্রুশ্চেভও ডিসনীল্যাণ্ডের আনন্দের মাঝে ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর নানান গুরু দায়িত্বের কথা। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের আমেরিকা সফর-কালে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল ডিসনীল্যাণ্ডে।

ডিজনীল্যাণ্ডকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক এক ভাগের এক একটি নাম। এ্যাডভেঞ্চারল্যাণ্ড, ফ্রন্টিয়ারল্যাণ্ড, ফ্যাণ্টাসীল্যাণ্ড, টুমরোল্যাণ্ড। নাম শুনেই বুঝতে পারছ কি জাতীয় জিনিস এগুলো। প্রত্যেকটি ভাগেই হরেক রকম আকর্ষণীয় বস্তু।

এ্যাডভেঞ্চারল্যাণ্ডে আছে বন্য পরিবেশ। গহন অরণ্য, পাহাড়ী নদী, হিপোপটেমাস, গণ্ডার, হাতী—অসংখ্য জন্তু-জানোয়ার। আর আদিম অধিবাসীরা। গণ্ডারের তাড়া খাওয়া মানুষের গাছে উঠে আত্মরক্ষা, বনের মধ্যে ছুটে আসা পাগলা হাতী, জলের মধ্যে বিশালকায় হিপোর আবির্ভাব—এমনি ধারা ভয়-জাগানো দৃশ্য এখানে ঘটছে। এ তো গেল ওপরের ঘটনা। জলের তলায় রত্নদীপ—কত রকমের সামুদ্রিক জীব। অকটোপাস, তিমিমাছ ইত্যাদি।

ফ্রন্টিয়ারল্যাণ্ড—আদিম যুগ থেকে সভ্যতার আলোকে আসার সময়ের নানা রকমের যুদ্ধাদি ফ্রান্টিয়ারল্যাণ্ডের দ্রষ্টব্য। মার্ক টোয়েনের দেশ, রেড ইণ্ডিয়ানদের পাড়া, টম সায়রের দ্বীপ দর্শকদের নিয়ে যাবে হারিয়ে যাওয়া সেই অতীতে। তখনকার দিনের উপযোগী করে সব কিছু এখানে তৈরী করা হয়েছে। সে যুগের জলযান, গাছের ওপর ঘর ইত্যাদি চার দিকের আবহাওয়া দেখে মনেই হয় না বর্তমান যুগকে।

ফ্যাণ্টাসীল্যাণ্ড—তোমরা জান ডিসনী হরেক রকম রূপকথাকে ছবিতে সজীব করে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছেন চিরদিন। তাঁর সেই সৃষ্টিরা এখানে প্রাণ পেয়েছে। তাঁর এই রাজ্য রূপকথার দেশ। এখানে আছে তুষারকন্যা স্নো হোয়াইট আর সংগে সাত বামন, পিটারপ্যান, এলিস, সিণ্ডারেলা, পিনোকিও ইত্যাদি রূপকথার অবিস্মরণীয় চরিত্রেরা এখানে বেড়াচ্ছে, হাসছে, খেলছে। চারদিকে মনোরম স্বপ্নালু পরিবেশ। ডিসনীল্যাণ্ডের সবচেয়ে আনন্দদায়ক জায়গা সম্ভবতঃ এটি। ঘুরন্ত পেয়ালা, উড়ুক্কু হাতি, ডাম্বো ইত্যাদি যতই দেখা যায়, কৌতূহল ততই বেড়ে ওঠে।

টুমরোল্যাণ্ড—বিজ্ঞানের বলে আজ অসাধ্য সাধিত হচ্ছে। এই বিজ্ঞানের অবদানে ভবিষ্যতের কি রূপ হবে টুমরোল্যাণ্ডে তার প্রত্যক্ষ চেহারা দেখান হয়েছে! এটি শুধু আনন্দদায়কই নয়—জানবার জিনিসও এতে প্রচুর। মানোরেল, রকেট, উড়ন্ত চাকি ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস এতে আছে।

ডিসনীল্যাণ্ডের নতুন আকর্ষণ "টিকি রুম"। এতে আছে পাখী আর ফুলের নানা রকম গান-বাজনা।

ডিসনীল্যাণ্ডে বেড়াবার আছে নানারকমের যানবাহন। কোথাও বোটে, কোথাও সাবমেরিণে জলের তলায়, কোথাও মনোরেলে।

ডিসনীল্যাণ্ড-এর জাদুরাজ্যে যে চারটি বিশেষ আনন্দদায়ক স্থান আছে তার মধ্যে ফ্যান্টাসিল্যাণ্ড (আজব রাজ্য) একটি। এই আজবরাজ্যের 'স্লিপিং বিউটি' প্রাসাদে দর্শকদের অভিবাদন জানাবার জন্য প্রত্যহ যে ব্যাণ্ড বাজান হয়, মেজর মিকি মাউস সেই ব্যাণ্ডের দল নিয়ে প্যারেড করে চলেছে। মিঃ ভি সি ওয়াকার-এর প্রযোজনায় ডিসনিল্যাণ্ডের এই ব্যাণ্ডদল গঠিত এবং এটি ওয়াল্ট ডিসনীর জাদুরাজ্যের একটি বিশেষ আকর্ষণ।

ডিসনীল্যাণ্ডের কাজ চলছে যন্ত্রে। এখানে সবই নকল। হিপোপটেমাস, কুমীর হাতী, অকটোপাস, তিমি সবই খেলনা। যন্ত্রের সাহায্যে এদের চালিত করা হচ্ছে, যা দেখে কিছুতেই দর্শকদের বিশ্বাস হয় না এরা আসল না নকল। চারদিকের দৃশ্যসজ্জা ও অনবদ্য মেইন ষ্ট্রীট দিয়ে হাঁটলে মনে হয় এসে পড়া গেছে সেই পুরানো আমেরিকায় —সেই আমলের পোষাক, সেই আমলের দোকান—সেই আমলের সব বাড়ী গাড়ী।

মানুষের কল্পনালোকের সবকিছু, সম্ভব-অসম্ভবকে একত্রিত করেছেন ডিসনী তাঁর ডিসনীল্যাণ্ডে। ছোটদের মনের যা কিছু চাহিদা, সবকিছু তিনি উপস্থাপিত করেছেন এই কল্পনারাজ্যে। আজ ডিসনী জীবিত নেই, কিন্তু যে আনন্দলোক তিনি সৃষ্টি করে গেছেন কোনদিন তা ভুলবার নয়।

ডিসনীল্যাণ্ডের অনুকরণে এর চেয়ে আকারে দ্বিগুণ আর একটি শিশু-উদ্যান করবার জন্যে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ফ্লোরিডা অঞ্চলে আয়োজন করেছিলেন এ জন্যে। সে কাজ অসমাপ্ত।

"ডিসনীল্যাণ্ড আফটার ডার্ক" ও "ডিসনীস ম্যাজিকল্যাণ্ড" নামে সিনেমার ছবি দুটো দেখলে তোমরা কিছুটা অনুমান করতে পারবে কি অদ্ভুত, অতুলনীয় সৃষ্টি— ডিসনীর নিজের ভাষায় যা "জাদুর জগৎ"।

মজার ধাঁধা

শ্রীবিনয় বাগচী

ছন্দ (পয়ার—চতুর্দশপদী) বজায় রেখে প্রতি সারির শূন্য স্থান দুটি এমন দুটি করে শব্দ বেছে নিয়ে পূর্ণ কর যাতে প্রতি সারিতেই শেষ শব্দটি প্রথমটির বিপরীতার্থক হয়।

যেমন :— লঘু পাপে কেন তার দণ্ড দিলে গুরু
শেষ হল কবে কাজ কবে হল শুরু

আচ্ছা এবার তাহলে তোমরা চেষ্টা করে দেখ, কেমন।

··· দল খেলা করে দেখে বসে ···,
··· খেওনা ডিম, খাও করে ··· ।
··· আম বড় টক দাও বেছে ···,
··· কেন আছে মিষ্টি রাখ দিয়ে ··· ।
··· আজই চাই কাল চাই ···,
··· নয়তো এটা এতো বেশ ··· ।
··· হয়োনা ভাই রেখো মনে ···,
··· করোনা ইহা করিও ··· ।

··· চাল আনেনি সে এনেছে যে ···,
··· ডিম খাবনাক দিতে হবে ··· ।
··· না হয়ে কেন রহিলে ··· ?
··· তো নহে এটা হবে বুঝি ··· ।
··· গেল কেবা ভাই কেবা গেল···,
··· কথা বল সবে বলনাক ··· ।

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

এক যে ছিল রাজা—

তার বাপ ছিল মহারাজা, আর মা ছিল মহারাণী।

মহারাজা খায় খাজাগজা,—মহারাণী খায় ছানা ননী।

মস্তবড় রাজপাট।—সোনার সিংহাসনে রূপার ছাতা। মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল, পাত্রমিত্র, লোকলস্কর। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। অনেক ঠাট। নহবৎখানায় বাজনা বাজে। গম্‌গম্‌ ঝম্‌ঝম্‌! ··কিন্তু দিন যায়, তবু বহুদিন ছেলে না জন্মাতে জম্‌জমাট রাজ্যের মহারাজা আর মহারাণীর মনে দুঃখ কম ছিল না।—ছেলে হয়, আর আঁতুড়ে মরে যায়। বাঁচে না, একটু হাসে, একটু কাঁদে, একটু হাঁচে। তারপর কি যে হয়! যেন পেঁচোয় পায়। হিক্কা উঠে চোখ ওল্টায়! এখন এতবড় রাজপাটে কে গ্যাঁট হয়ে বসবে? মা ষষ্ঠী যে সব কাঁচিয়ে দেন!

মহারাজা আর মহারাণী ঠাকুর দেবতার পায়ে কপাল কোটে। পুজো দেয়, সিন্নি দেয়, ধন্না দেয়। তখন খুশী হয়ে একদিন মা ষষ্ঠী মহারাণীকে স্বপ্ন দেন। বলেন, "ভক্তি করে আমার পুজো কর। পুজোর আগঢোক খেও না। খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দিও না"

এদ্দিন মহারাণী তা করেছে। এবার স্বপ্ন দেখে ভয়ে তার কান্না পায়। বলে, "মা, আর না। এবারটি মাপ কর।"

তখন জাঁকজমকে পুজো করে। কাঁঠালতলায় মা ষষ্ঠীর প্রতিমা গড়ায়। হলুদ ছোপান নতুন কাপড়ে প্রতিমা জড়ায়। ধূপ, গুগ্‌গুল, চুয়া-চন্দনের ধুনো দেয়। ডালায় আম, কাঁঠাল, নারকেল, কলা, খেজুর, করমচা,—সাজিতে নানান ফুল সাজিয়ে দেয়। রেকাব ভরে দেয়—নকুল, সন্দেশ, বাতাসা, দৈ, ক্ষীর। মহারাণী স্থির ধীর হয়ে জিভ সাম্‌লে রাখে। উপোস থেকে পুজোর ডালি সাজায়। হাতপাখায় ধান-দুর্বা, করমচা, কলা, খেজুর বেঁধে পুকুরে ডুব দেয়। তারপর ভেজা কাপড়ে মা ষষ্ঠীর বেড়ালকে পাখার বাতাস দিয়ে ষাট্‌ ষাট্‌ করে। পুরুত ঘণ্টা বাজিয়ে ঘটা করে পুজো করে। পাঁচালী পড়ে শোনায়।

এবার মা ষষ্ঠীর দয়া হয়। এক বছর পর মহারাণীর ছেলে হয়। সকাল বেলা আতুড় ঘরে ওঙা-ওঙা কান্না ওঠে। কান্না শুনে আনন্দে মহারাণীর মুখ রাঙা হয়।

রোগা-পট্‌কা কাঁদিয়ে ছেলে। তা যত ইচ্ছা কাঁদুক। পটল না তুললেই হ'ল। মরে গিয়ে তাঁকে না কাঁদলেই হ'ল। পাট্‌কেলে রং নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বরং বেঁচে থাক—মহারাজার ছেলেকে রাজা হতে কে আটকায়?···

মহারাজা কান পেতে ছিল। কান্না শুনে ছুটে এল। মোটা শরীর। হাঁটতেই কষ্ট, তায় ছোটা! হোঁচট খেয়ে লুটোপুটি। তারপর শুরু করল হাঁকডাক।—"শাঁখ বাজাও, ঢোল বাজাও, ঢাক বাজাও।—জাঁকজমক কর।"

পুরুত এল, বাদ্যকর এল। পুরুতের মন্ত্রপড়া ঘণ্টানাড়ায় আর ঢাকঢোল টিকাড়া-নাকাড়ায় কান ঝালাপালা হ'ল!

ছেলের কপালে কালো দাগ। পুরুত বল্‌ল, "রাজটীকা! মহারাজার ছেলে রাজা রথে করে এলো! কপালে তাই আঁকা!" সুখবর শুনে মহারাজা হাঁক্‌ল, "হুঁকোবরদার!"

হুঁকোবরদার এসে কড়ি বাঁধা হুঁকোয় পুরুতকে মিঠে তামাক দিল। আর পুরুত কুৎকুতে চোখ বুজে, ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খেতে লাগল।

মহারাজা ডাকল, "ভাণ্ডারী!"

ভাণ্ডারী এসে হাতজুড়ে বলল, "মহারাজ!"

মহারাজা আঙুল নেড়ে ইশারা করল। আর ভাণ্ডারী নতুন কাপড় ও রঙিন্‌ গামছায় গুচ্ছের চাল ডাল ফল-ফলারির সিধে বেঁধে দিল। মহারাজা পুরুতকে প্রণাম করে প্রণামীর টাকা দিল। তার ওজনে পুরুত আশীর্বাদ করল। মন্ত্রপড়ে, ঘণ্টানেড়ে পুরুতের ক্ষিধে পেয়েছিল। সে সিধা নিয়ে সিধে বাড়ী চলে গেল!

সোরগোল শুনে মন্ত্রী এসেছিল, সেনাপতি এসেছিল, কোটাল এসেছিল।

মন্ত্রীর মস্তবড় দাড়ি। তাতে তার সমস্ত বুদ্ধি জড়াজড়ি করে আছে। তার মধ্যে হাতে বুলিয়ে সে বলল, "মহারাজ, আমি তখুনি জানি ছেলে হবে। রাজা ছেলে হবে।"

সেনাপতির লম্বা গোঁফ। তাতে গদের আঁঠা মাখানো। যুদ্ধে জিতলে, আর খোশ-খবরে হাসি পেলে, সে গোঁফের ডগা পাকিয়ে আকাশে তুলে দেয়। আবার যুদ্ধে হেরে গেলে আর মহারাজার ধমক খেলে, তা থেঁকি কুকুরের লেজের মত নিচে গুটোয়। এ দুয়ের মাঝামাঝিতে সোজা করে রাখে। সে গোঁফ উপরে তুলে বলল, "আমিও অমন অনুমান করেছিলেম, মহারাজ।"

কোটালের দাড়িও আছে গোঁফও আছে। সে ঝোপ বুঝে কোপ দেয়। মন্ত্রী আর সেনাপতি দু'জনে তার বড়। তাই তার গোঁফদাড়ি তাদের চেয়ে ছোট রাখা দরকার। সে তাদের গোঁফদাড়ি মেপে নিজেরটা ছোট করে ছাঁটে। সে তাতে হাত দিয়ে বল্ল, "আমিও অমন কথা ভাব্‌ব ভাবছিলেম, মহারাজ। তাইতে অভাব মিটে গেল।

মহারাজা হ'ল প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইচ্ছা হয় প্রজাদের রাখে, ইচ্ছা হয় মারে। কিন্তু এক সঙ্গে দু'কাজ করা সোজা নয়। তার এক হাতে প্রজাদের মুণ্ড ধরা আছে, অপর হাতে দণ্ড। তার নাম রাজদণ্ড। রুপোয় তৈরী, সোনার পাতে আগাগোড়া মোড়া। রাজাকে মন্ত্রণা দিতে হয় বলে, মন্ত্রীর ঘাড়ে বুদ্ধির নানান যন্ত্র। সেনাপতি যুদ্ধ জয় করে। তাই তার হাতে তলোয়ার। তা সে মাঝে মাঝে বালি দিয়ে শানায়। তা তাকে জুৎসই মানায়। আর কোটালের কারবার চোর হারমাদ ছ্যাচোড় নিয়ে। তাদের ঠেঙাবার জন্য তার আছে লোহার ডাণ্ডা। তা দিয়ে মেরে ঠাণ্ডা করে। তারা যার যার অস্ত্র তুলে বলে, "জয় মহারাজার পুত্র-রাজার জয়!"

তারা উচ্ছবের বন্দোবস্ত করে। ধুমধাম হয়। দুম্‌দাম্‌ বাজি ফোটে, হিজড়ারা দুদুম্‌ দুম্‌ ঢোল বাজায়। রাজবাড়ীতে ঘুম-তাড়ানো ধুমধাড়াক্কা!...

(২)

পরদিন মহারাজা গদ্‌গদ হয়ে রাজসভায় আসে। মন্ত্রী, সেনাপতী, কোটাল, আর সভাসদরা দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি করে, "জয় মহারাজা আর তার পুত্র-রাজাকী জয়!"

মহারাজা সিংহাসনে বসে। পাখাবরদার পাখার বাতাস করে, হুঁকোবরদার গড়গড়ার নল এগিয়ে দেয়।

কিন্তু আজ মহারাজ রাজকার্য করবে কি? হেসেই অস্থির।

খালি হি হি করে হেসে গড়ায়। ছেলে হওয়ায় মন-ভরা খুশীর কাঁতুকুতু। তাকে

হাসতে দেখে মন্ত্রী হাসে হু হু করে, সেনাপতি হো হো করে, আর কোটাল হোৎ হোৎ করে হাসে। কোটালের জবরদস্ত চেহারা। তেমন চোস্ত হাসি। তার ধাক্কায় আস্ত পাহাড় ফেটে যায়!

এখন রাজদরবারের ছাতের বরগার খোঁড়লে একটা হুতুম পেঁচা থাকত। অনেক দিন এখানে আছে। কিন্তু এমন অট্টহাসি কখনো শোনেনি। সে ভড়কে গেল। আর গোৎ মেরে পালাতে চাইল। দিনের বেলা চোখে দেখতে পায় না। উড়তে গিয়ে পড় তো পড় মহারাজার মুকুটে।

আর মুকুট মহারাজার মাথা থেকে ছিটকে পড়ল সেনাপতির হাতে! সেনাপতি আঁৎকে উঠল। উঠবার কথা! যেখানে মহারাজার মাথা সেখানেই মুকুট,—আবার যেখানে মুকুট সেখানেই মহারাজার মাথা! কাজেই মুকুট যখন হাতে এল, তার তলায় নিশ্চয় মহারাজার মুণ্ডু আছে!

মহারাজার শত্রুর অভাব নেই। নিশ্চয় কোনও শত্রু লুকিয়ে এসে তাঁর মুণ্ড কেটেছে। এখন রাজপাট রাজাহীন হয়ে গেল! একজন রাজা চাই। কিন্তু কে রাজা হবে?

সেনাপতি নিজের দিকে, মন্ত্রীর দিকে, আর কোটালের দিকে টেরা চোখে চেয়ে দেখে, কে রাজা হবার লায়েক? তার মনে হ'ল, মন্ত্রী টিঙ্‌টিঙে রোগা। ধাক্কা দিলে পড়ে যায়। তার গালে রামছাগলের দাড়ি। একটা ম্যাচের কাঠির ওয়াস্তা। দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলে পুড়ে অক্কা পাবে। আর কোটাল হ'ল হোঁৎকা। তার গালপাট্টা দাড়ি ধরে তলোয়ারের এক কোপে সাবাড়! তারপর তাকে কে আটকায়—কিন্তু হঠাৎ মহারাজা নড়েচড়ে উঠল। সেনাপতি অবাক হয়ে দেখে, মহারাজা সিংহাসনে বসে পিট্‌পিট্ করে চাইছে। ঘাড়ে মুণ্ডু আছে! কাজেই সেনাপতির টৈটম্বুর ভাব উবে গেল। তার বাড়াভাতে ছাই পড়ল। এখন মুকুট টুক্ করে মহারাজাকে না দিয়ে উপায় কি? মহারাজার মাথায় মুকুট নেই। তাই দোষীকে সাজা দেবার জো নেই। মনে মনে সে ভার মন্ত্রীকে দিয়ে, মহারাজা মুখে বলল, "দেখ্‌লে মন্ত্রী?"

মন্ত্রী দেখেছে। সিংহাসনে কে বসবে তা ভেবে দাড়ি চুলকাচ্ছিল। সে জবাব দেবার আগে সেনাপতি এগিয়ে গেল। মহাজাকে দণ্ডবৎ করে মুকুট পরিয়ে দিল। আর পাত্রমিত্রেরা জয়ধ্বনি দিল, "জয় মহারাজের জয়!"

মহারাজা দাঁত দেখিয়ে ভেংচি কাটল।—অর্থাৎ, ভেংচি কেটে জানাল যে, সেনাপতির ভাল কাজ তার মনে থাকবে।

মহারাজার অনেক কাজ তো! বেশী কথা বলার সময় নেই। তাই কমকথা কয়। কথার বদলে চোখ মট্‌কায়, ভেংচি কাটে, মাথা ওল্টায়, ফিক্‌ফিক্‌ শব্দ করে। আর সবাই তার অর্থ বুঝে নেয়। তা ঠিক হ'ক, আর বেঠিক হ'ক, কিছু আটকায় না! এবার মহারাজা চোখ মট্‌কায়। তারা বোঝে মহারাজা শক্ত প্রশ্ন করেছে,—"তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে?"

মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল আর পাত্রমিত্রেরা একজনের নাড়ি আর একজন টিপে দেখে। দেখে, তা টিকটিক করে ঠিক চলছে। তখন তাদের মধ্যে 'সাজ সাজ' রব ওঠে। তারা শুধু মহারাজার প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের মধ্যে আরও খোঁচা যা ছিল তাও বুঝেছে। অর্থাৎ, পরীক্ষায় একশো নম্বরের মধ্যে দুশো পেয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে—মহারাজা এ কথাও জান্‌তে চেয়েছে যে, বেঁচে থাকলে শত্রুকে সাজা দেবার কি করেছে তারা?

তারা শত্রুর খোঁজে এদিক-ওদিক তাকায়। মন্ত্রীর কুৎকুতে চোখ হলে কি হবে? সে হুতুম পেঁচার পেঁচোমী দেখেছে। সে কথা দাড়ি চুল্‌কে জানায়।

মহারাজা ফের চোখ মট্‌কায়। তার অর্থ দেখচ, তবু আট্‌কাতে পারনি! তোমাদের এত দাপট। আর হুতুমের ডানার ঝাপটে ভয় পেয়ে অত ডাঁটের কপাট বন্ধ করেছ!

সেনাপতি গোঁফ নাবিয়ে বলে, "হুতুম হাওয়ায় ওড়ে মহারাজ। হাওয়ার লড়াই জানা নাই। হ'ত ডাঙ্গায়, ঠ্যাং ভেঙ্গে দিতেম!"

মন্ত্রী দাড়ি চুলকে বলে, "মহারাজ, হাওয়া আর ধোঁয়া এক। আগে ধোঁয়ায় মগজ শানিয়ে তবে—"

যুক্তির কথা! মহারাজা হাঁকে, "হুঁকোবরদার—"

হুঁকোবরদার তখন মহারাজার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। কল্‌কে সাজিয়ে ফুঁ দিচ্ছিল। বলল, "উ মহারাজ।"

সে কল্‌কে গড়গড়ায় বসায়,—তারপর নল মহারাজার হাতে তুলে দেয়। মহারাজ সিংহাসনে কাত হয়। ধোঁয়া গড়িয়ে মুখে যাওয়া চাই। তারপর চোখ বুজে নল মুখে পোরে। ধোঁয়া মুখে ধরে রাখার জন্য বাঁ হাতে নাকের ছেঁদা বন্ধ করল। তারপর রসিয়ে রসিয়ে টান্‌ল।

সুগন্ধী মশলার তামাক। মিঠে গন্ধে রাজসভা ম ম করে। পাত্রমিত্রেরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে মহারাজার ধূমপান দেখে। মহারাজার লম্বা টান ওরা কান পেতে শোনে আর ফ এর মত নাক বাঁকিয়ে শোঁকে। মহারাজার মহা বিচারবুদ্ধি! সে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে

ধোঁয়া ছোঁড়ে। সভাসদরা কেউ যেন গন্ধ থেকে বঞ্চিত না হয়। শুধু তাই নয়। যারা ভাল কাজ করে তাদের ধোঁয়ার পুরস্কার দেয়।

আজ সেনাপতি ভাল কাজ করেছে। মহারাজা ডাকে, "সেনাপতি।"

সেনাপতি বলে "আজ্ঞে মহারাজ!"

মহারাজা বলে, "এদিকে এসো।"

সেনাপতি পায়ে পায়ে এগিয়ে যেয়ে দণ্ডবৎ করে। মহারাজা বলে, 'হাঁ কর।" সেনাপতি মস্তবড় হাঁ করে। আর মহারাজা একমুখ ধোঁয়া তার মুখে ফু করে দেয়।

মহারাজার প্রসাদী ধোঁয়া। সেনাপতি কোঁৎ করে গিলে ফেলে। আর হাতের চেটোয় করতালি বাজিয়ে সভাসদরা চেঁচিয়ে ওঠে—"জয় মহারাজার জয়।"

কিন্তু তামাকের অনেক ধূমই বার করা হ'ল। হুতুম পেঁচাকে সায়েস্তা করা গেল না। সে নিজেকে নিজেই কোথায় গুম্ করে রেখেছে। তখন মন্ত্রী দাড়ি চুলকে বলে মহারাজ, হাতি পিঁপড়ের সঙ্গে লড়ে না। আপনিও ছেড়ে দিন। হুতুম পেঁচা আর লক্ষ্মী পেঁচা হ'ল গিয়ে মাসতুতো ভাই। রাজরাজড়ার দরবারে ওদের ঠাঁই চাই। ওরা পয়মন্ত।

যুক্তির কথার শুক্তোর মত মান,—ঝাল, টক, মিষ্টি, সব হটিয়ে আগে হাঁটে।

মহারাজা বলে, "তা হলে ছেড়ে দাও। ঢোল দাও—"

কোটাল বলে, "হুতুম পেঁচার বোল?"

মহারাজা হে হে করে বলে, "গোলে হরিবোল নয়। ছেলে হ'ল সে কথা ভুলে গেলে? তার ঢোল।"

এবার আর গোল রইল না। কোটাল বাইরে ছুটলো। নকিবকে বল্ল, "ঢোল দাও।"

মহারাজার রাজত্বে-ঢোলাকথার ঢোল লেগেই আছে।

নকিব ঢুলে ঢুলে ঢুলিকে বলে, "ঢোল দাও।"

ঢুলি বলে, "কিসের ঢোল?"

নকিব বলে, "কিসের আবার? চামড়ার ঢোল। খুব সরগোল তুলে দাও। খোদ মহারাজার ঢালা হুকুম।" মহারাজার হুকুম শুনে ঢুলি ঢোল কাঁধে ছোটে। বাজারে গিয়ে মনে পড়ে, কি ঢোল দেবে? তা'ত জিজ্ঞেস করা হয়নি। তখন ভাবে ঢোল দিয়ে তার চুল পাকল। এতে আর গোলের কি আছে? মহারাজার ছেলে হয়েছে। তা ছেলের ঢোল। প্রজাদের ঢালা নেমন্তন্নের ঢোল।

সে সমস্ত হাটেবাজারে হাঁটে, আর ঢোলে কাঠি দেয়। জোর ভুড়ুম ভুড়ুম শব্দ হয়। আর সে মুখে বাকুম্ বাকুম্ করে বলে,—যে যেখানে আছো শুলে যাও—"

ঢুলির সর্দি হয়েছিল। তার মুখে ন ল শোনাল।

হাটের লোক ভয় পায়। বলে, "শূলে যাবার হুকুম?"

ঢুলি বলে, "শূলে লয়, শুলে (শুনে) যাও। সর্দিতে লাক (নাক) বুজে গেছে। বুঝছ না কেল? ল (ন) ল শোলায় (শোনায়)।"

তখন লোকেরা বোঝে।

ঢুলি বলে, "মহারাজার ওল্লা (ওঙা) হয়েছেল। তাই রাজবাড়ীতে সবার লেমলতন্ন। বুড়ো, যোয়াল, কাচ্চাবাচ্চা—"

ওল্লা শুনে আবার ওরা ভড়কে যায়।

বলে, "ওল্লা এসেছে ঢুলি মশাই? ভূত না পেত্নী? তা ছাড়াবার জন্য ওঝার নেমন্তন্ন?

ঢুলি বলে, "লা, লা। ভূত লয়,—শুল্ল, ওল্লা"—(ন, না, ভূত নয়, ওঙা, ওঙা)'। ওরা বলে, "তা কি বোঝা গেল না। সোজা করে বলুন"। ঢুলি বলে, "মহারাজার ছেলে হয়েছেল। আতুড়ে ওল্লা করে কাঁদেল, বেরিয়ে গোল্লা (গোঙা) করে হাস্‌বেল।"

ওরা বলে, "ঠোঙা ভরা মেঠাই নিয়ে দেখতে হবে?"

ঢুলি বলে, "উহুহু। উল্‌টো, মোল্‌ডা (মোণ্ডা) মেঠাই খাবার লেমলতন্ন।" তখন সবাই আহ্লাদে হৈহল্লা করে। আনন্দে তারা তারিখ জিজ্ঞেস করে না। ঢুলিও বলে না। তারা কর গুণে খাবারের হিসেব করে—দৈ চিড়ে থেকে মোণ্ডা মেঠাই সব কিছুর।...

(ক্রমশঃ)

হুলো-কাহিনী

শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হুলো বলেন, 'হুলোনী!
দুঃখের কথা ব'লো নি—
রাত বেজেছে বারোটা
বাবুরা খান পরোটা!'

হুলো যখন 'হালুম' করেন
গর্বে, নাচেন বাঘের মাসি;
নাই বা হ'লেন ডোরাকাটা
বিলেত ফেরত বাঘের ব্যাটা

কর্তা যে তাঁর উর্ধ্বে আরো—
একেবারে খাঁটি দিশি।
কেনরে হুলোর পিঠে কুলো,
কেনরে হুলোর কানে তুলো!

হুলো যাবেন এ্যাসেম্ব্লীতে
টরেটক্কার ভাষণ দিতে।

ভোটরঙ্গ

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়

বার বার তিনবার।

ইলেকসনে তিনবার হেরেছেন ষষ্ঠীচরণ সরখেল। প্রথমবার পেয়েছিলেন চারটি ভোট। দ্বিতীয়বার দুটি। সব শেষের বার তাঁর পক্ষে পড়েছিল 'সবে ধন নীলমণি' মাত্র একটি ভোট। তাও এই ভোটটা তাঁর নিজের।

তিনবারের পর এই চতুর্থ ইলেকসন। তাই ষষ্ঠীচরণ সরখেল খেপে উঠেছেন। নাঃ, ইলেকসনে না জিতলে তাঁর আর মান থাকছে না।

গেল, গেল সবই গেল।

ষষ্ঠীচরণ সরখেলের কোন কিছুরই অভাব নেই। কলকাতায় খান চারেক বাড়ি আর বড়বাজারে তিসির পেল্লায় কারবার।

লোকে বলে ষষ্ঠীচরণের এত টাকা যে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করতে হয়।

কিন্তু এত টাকা খাবে কে?

ষষ্ঠীচরণের কোন ছেলেপুলে নেই। শুধু কর্তা আর গিন্নী।

এখন শুধু তাঁর দরকার ইজ্জৎ আর নামের শেষে একটা সুন্দর পদবী এম. এল. এ। টেনেটুনে ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারেন নি ষষ্ঠীচরণ। অনেকের নামের পিছনে বি. এ., এম. এ., এল. এল. বি. কত সুন্দর সুন্দর পদবী থাকে, কিন্তু সে সব তো আর ষষ্ঠীচরণের ভাগ্যে নেই। তিনি বড় জোর যোগাড় করতে পারেন একটা এম. এল. এ'র ডিগরি। কিন্তু তাই বা হচ্ছে কই?

সত্যি তাঁর ভোটারদের মত বিশ্বাসঘাতক আর কে আছে! মীরজাফর আর কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! যেমন করেছে তাঁর গোবিন্দপুরের ভোটারেরা।

একমাস ধরে ভলানটিয়াররা তাঁর পয়সায় চব্যচোষ্য করে খেল। নিত্য নতুন তাদের বায়না। ষষ্ঠীদা আমাদের থিয়েট্রিকাল অপেরা পারটির পোশাক কিনে দিন। আমাদের গানের ইস্কুলের চারজোড়া ডুগি-তবলা কিনে দিন। আমাদের ফুটবল ক্লাবের প্লেয়ারদের জারসি আর বুট কিনে দিন।

তার উপর নিত্য নতুন খাওয়ার ফরমাশ। ষষ্ঠীদা, এখন আমাদের মালাই খেতে ইচ্ছে করছে।

এই শীতের দিনে মালাই?

হ্যাঁ। পঞ্চাশ টাকা দিন। আমরাই বাড়িতে বানিয়ে নেব।

না-না, এখন মালাই খেলে অসুখ করবে, ষষ্ঠীচরণ বোঝাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ফল হ'ল কি, সবাই মনমরা হয়ে গেল। হাত গুটিয়ে বসে থাকল। শেষ পর্যন্ত টাকা দিয়ে তবে রক্ষা পেলেন ষষ্ঠীচরণ।

আবার কেউ ফরমাশ করল, ষষ্ঠীদা এবারে কলকাতা থেকে যেদিন আসবেন, সেদিন নিউমারকেট থেকে দশ কেজি ডালমুট নিয়ে আসবেন।

আর একজন হয়ত বলল, ষষ্ঠীদা কল্পতরুর পান অনেক দিন খাইনি। এবার বাদশাহী পান শ'খানেক নিয়ে আসবেন তো।

আর একজন বলল, ল্যাংড়া আম খাওয়াতে পারেন?

এই মাঘ মাসে ল্যাংড়া আম?

বড়বাজারের ফলপটীতে পাবেন। বাছাই মাল, এক একটা একটাকা। শ'খানেক আনলেই চলবে।

সবই এনেছেন। কিন্তু ভোট-গণনার বাক্স খুলে দেখা গেল মাত্র একটি ভোট।

ষষ্ঠীচরণ তারপর একমাস শয্যা নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বার বার তিনবার। আর নয়, ও লাইন তাঁর জন্য নয়। তিনি সারাজীবন তিসির হিসেব করেই কাটাবেন।

কিন্তু আবার ভোট যেই এলো, আর তার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে বামাচরণ এসে তাঁকে যে পরামর্শ দিল, তাতে মনে আশার সঞ্চার হ'ল ষষ্ঠীচরণের।

—এবার ইলেকসনে দাঁড়াও মামা।

আরে দূর! আর না। বার বার তিনবার ঠকেছি! গোবিন্দপুরের লোকগুলো কি মানুষ! আর ও-পথে যাচ্ছি না।

কিন্তু বামাচরণ বলল: আরে আমি কি তোমায় আবার গোবিন্দপুর থেকে দাঁড়াতে বলছি? ওখানে কোন দলে যোগ না দিলে জেতা খুব মুশকিল! তুমি তো নির্দলীয়। নির্দলীয় প্রার্থীর উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে মুচকুন্দপুর।

সে আবার কোথায়?

খুব বেশী দূর নয়। কলকাতা থেকে সকালে ট্রেনে চেপে বিকেলে পৌছবে চড়কগাছা। সেখান থেকে বাসে পাঁচমাইল গেলে বৃষস্কন্ধপুর। ওখান থেকে দু'ক্রোশ হাঁটলে মুচকুন্দপুরে পৌছবে। ওখানকার প্রাইমারি ইস্কুলে আমি মাসটারি করতাম কিনা। ও জায়গায় সবাই আমার চেনা। ওখান থেকে বরাবর বগলাকান্ত বাবু বিনাবাধায় দাঁড়ান। বগলাবাবু সম্প্রতি দেহ রেখেছেন। ওর বিপক্ষে দাঁড়াতেন বটকৃষ্ণ বাবু তিনিও দাঁড়াতে চান না। এখন আর দাঁড়াবার কেউ নেই।

কিন্তু বিনা বাধায় এম. এল. এ. হয়ে যাব বলছিস? ফাইন্যালে ওয়াকওভার? না রে, ঠিক মনে লাগছে না কথাটা। লোকে বলবে বিনা বাধায় জিতে গিয়েছি। কোন ভোটাভুটি না হলে জেতার আনন্দ কিসের!

বগলা একটু ভেবে বলল: দি আইডিয়া।

কি আইডিয়া পেয়েছিস বল?

আমি যা যা বলছি তাই করতে হবে মামা। ইলেকসনের আর বেশী দেরি নেই মাত্তর দু'মাস। কাল সকালেই চল তুমি আর আমি দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা সুরু করে দেই।

কোথায়?

কোথায় আবার। মুচকুন্দপুরে।

কিন্তু প্ল্যানটা কি?

সে তোমাকে ট্রেনে যেতে যেতে বলব।

মুচকুন্দপুর এসে পৌছল মামা-ভগ্নে। তখন রাত বারোটা।

চড়কগাছা ষ্টেশনে ট্রেন থেমেছিল বিকেল পাচটায়। ষ্টেশনে নেমে ষষ্ঠীচরণ দেখলেন বাস দাঁড়িয়ে আছে। গোটা দুয়েক প্যাসেঞ্জার বাসে বসে বিড়ি টানছে। ষষ্ঠীচরণ জিজ্ঞাসা করলেন: বাস কখন ছাড়বে?

বাসের কনডাকটর একটা সিটে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। ডাকাডাকিতে চোখ দুটো খুলে বলল: কেন মশায় ঘুমের সময় বিরক্ত করছেন! প্যাসেঞ্জার হলে তবে ছাড়বে। আবার প্যাসেঞ্জার না হলে আজ নাও ছাড়তে পারে।

কিন্তু যে যাত্রী দুটি বিড়ি টানছিল তারা বলল, চারজন লোক মাইলখানেক দূরের একটা পুকুরে খেপলা জাল ফেলে মাছ ধরতে গেছে। তারা ফিরলে বাস ছাড়বে। এ ছাড়া আপনারা দু'জন তো আছেনই।

ষষ্ঠীচরণকে লোকগুলো বলল: কলকাতা থেকে আসছেন বুঝি? তবে একটু ঘুমিয়ে নিন স্যর।

বাস ছাড়ল রাত আটটায়। সাড়ে দশটার সময় পৌছল বৃষস্কন্দপুরে।

এখন?

বগলা বলল: এবার হণ্টন। তোমার কোন ভয় নেই মামা। রাত বারটার মধ্যেই পৌছব।

অতএব প্রচণ্ড হাড়কাপানো শীতের মধ্য দিয়ে হণ্টন।

ষষ্ঠীচরণ একটু আঃ উঃ করছিলেলেন। কিন্তু বগলা বলল, দেশের কাজ করতে গেলে একটু কষ্ট করতে হবে মামা।

রাত বারোটার সময় বগলা মুচকুন্দপুর গ্রামে একটা চালাঘরের সামনে নিয়ে এল। বলল: মামা এই আমাদের ইস্কুল। এখানে বেঞ্চের উপর বসে রাতটা কাটিয়ে দেই।

'তা তুমি বেঞ্চি থেকে পা'টা তুলি বোস মামা, বড় সাপের উৎপাত!'

হ্যাঁ বলিস কিরে! এখানে এই ঠাণ্ডায়? কি করব মামা। এখানে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সবাই শুয়ে পড়ে। তা তুমি বেঞ্চি থেকে পা'টা তুলে বস মামা। বড় সাপের উৎপাত।

ষষ্ঠীচরণের হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে লাগল। তিনি চিৎকার করে

উঠলেন, হতভাগা, খুনী কোথাকার। আমাকে ধনে-প্রাণে মারতে চাস?

বগলা বলল: রাত দুপুরে চেঁচামেচি কোর না মামা। তাহলে গাঁয়ের লোক ডাকাত মনে করে ধনে-প্রাণেই মারবে।

এখন মুখ বুঁজে বসে বসে ঝিমোও। দেশের কাজ করা কি চাড্ডিখানি কথা! সকাল হলে বগলা গিয়ে ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে গ্রামের লোকদের পরিচয় করিয়ে দিল।

বিখ্যাত সমাজসেবক ষষ্ঠীচরণ সরখেল। এবার নির্বাচনে আপনাদের ভোটপ্রার্থী। আপনাদের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্য এসেছেন।

গাঁয়রে লোকেরা বলল: শুনে খুব আনন্দ হ'ল। আমাদের এম. এল. এ. বগলাবাবু মারা যাওয়ার পর ভাবছিলাম কে এবার দাঁড়াবেন। তা আপনি দাঁড়াবেন শুনে খুব আনন্দ হ'ল। আমাদের গ্রামবাসীদের একটা নিবেদন গোবিন্দ অপেরার টিপুসুলতান পালার খুব নাম। আপনি যদি ঐ দলকে গাঁয়ে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে সব ভোট আপনার।

বামাচরণ বলল: ঠিক আছে তাই হবে। কিন্তু এখানে ষষ্ঠীবাবুর বিরুদ্ধে কে এক মকরাক্ষ গড়গড়ি দাঁড়াচ্ছে জান?

গ্রামের লোকেরা বলল: না তো। ও নাম কখনও আগে শুনিনি। আমরা ষষ্ঠীবাবু ছাড়া আর কাউকে চিনি না। মকরাক্ষবাবু দাঁড়াতে এলে তাঁর জমানত জব্দ করব।

দিন সাতেক পরে দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক মৃচকুন্দপুর গ্রামে এলেন। সঙ্গে এক অল্পবয়সী সাকরেদ। তারও মুখে দাড়ি।

ছোকরা এসে গ্রামের লোকদের বলল, আমার নাম দোলগোবিন্দ সেন। এর নাম মকরাক্ষ গড়গড়ি। বিখ্যাত ব্যক্তি। আত্মপ্রচার পছন্দ করেন না বলে খবরের কাগজে নাম বেরোয় না। নয়ত এঁর ত্যাগের কথা কে না জানে। ইনি এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। আপনাদের সমর্থন চাই।

গ্রামের লোকেরা বলল: খুব আনন্দের কথা। তবে এ গ্রামের লোক কোনদিন বায়স্কোপ দেখেনি। মকরাক্ষবাবু যদি বায়স্কোপ দেখার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে বড় ভাল হয়।

মকরাক্ষ বাবু বললেন, তথাস্তু। তবে এখান থেকে ষষ্ঠীচরণ নামে একটা লোক দাঁড়াচ্ছে শুনছি। তাকে ভোট দেওয়া চলবে না।

গ্রামের লোকেরা বলল, ষষ্ঠীচরণের ভোট নেই। মকরাক্ষ জিন্দাবাদ।

যথাক্রমে গ্রামে যাত্রা ও বায়স্কোপ দুই হয়ে গেল। ষষ্ঠীচরণ আর বামাচরণ গ্রামে

গ্রামে ঘুরছেন আর বক্তৃতা দিচ্ছেন, বন্ধুগণ, মকরাক্ষ বাবু লোকটা যে কত ধড়িবাজ তা তার দাড়ি দেখলেই টের পাওয়া যায়। ওর এক কাকা পাঁচবার স্কুলফাইন্যালে ফেল করেছে। ওর এক ভাইপো এক ভদ্রলোকের বাগানে চুরি করে আম পাড়তে গিয়ে উত্তমমধ্যম খেয়েছে। এ ছাড়া মকরাক্ষ বাবু গ্রাম সম্বন্ধে কি বোঝেন? আমার ঠাকুর্দা গ্রামে থাকতেন। আমি যতটুকু গ্রামকে বুঝি অমন কেউ বোঝে না। আমি শুনলাম, মকরাক্ষ এ গ্রামের হরিসংকীর্তনের দলকে একজোড়া খোল কিনে দিয়েছে। আমি পাঁচ ডজন করতাল কিনে দেব। করতালের প্রস্তাবে গ্রামবাসী করতালি দিয়ে উঠল।

মকরাক্ষ বাবু আর দোলগোবিন্দ গিয়ে বাড়ি বাড়ি বলতে আরম্ভ করল। ষষ্ঠীচরণ তিসির কারবারে বড়লোক। গরীবের মন ও কি করে বুঝবে! ওই তো চেহারা! আমি শুনলাম ওর মামাটাকেও দেখতে অমন খারাপ। দোলগোবিন্দ, আমার নিজ-মুখে আমার গুণের কথা বলা শোভা পায় না। তুমি বলে দাও। দোলগোবিন্দ বলল: হ্যাঁ, উনি বরাবর প্রচার-বিমুখ। গেল বার বন্যার সময় উনি একশ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। দেশের জন্য এখনও মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকেন। খাবারের সাশ্রয় করেন। কিন্তু কিছুই প্রচার করতে চান না।

ষষ্ঠীচরণ তারপরের এক বক্তৃতায় বললেন, যেদিন খান না সেদিন ওঁর স্ত্রী ঝগড়া করে হাঁড়িই চড়ান না। উনি রেসটুরেনট থেকে মুরগি খেয়ে আসেন। বরং আমিই একটা সত্যিকারের ভাল লোক। আমি দেশের কাজের জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি।

মকরাক্ষ বাবু একদিন বললেন, লেখাপড়া ছেড়েছেন দেশের কাজে? আহা মরে যাই! চারবার ফেল করার পর ঘায়েল হয়ে ছেড়েছেন।

গ্রামের লোকেরা একদিন ষষ্ঠীচরণকে ধরল, আপনি আর মকরাক্ষ বাবু একসঙ্গে কোনদিন গ্রামে আসেন নি। কারুর মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই। আপনি ও উনি একদিন একটা যুক্ত-সভা করুন।

সভা হ'ল। কিন্তু দেখা গেল মকরাক্ষ এসেছেন, ষষ্ঠীচরণ কিন্তু এলেন না। মকরাক্ষ সকলকে বললেন, দেখুন কাপুরষটা আসেনি। অতএব সব ভোট কিন্তু আমার।

ভোট পর্ব শেষ হয়ে গেছে। ফলাফল বার হলেই দেখা গেল, মকরাক্ষ বাবু জিতেছেন। তখন মকরাক্ষবাবু জিন্দাবাদ ধ্বনিতে গ্রামবাসীরা দিগবিদিক মুখর করে তুলল।

সকলে বলাবলি করতে লাগল, ষষ্ঠীচরণ ভোটের অবস্থা আঁচ করে তীর্থ করতে চলে গেছেন। হয়ত আর ফিরবেন না।

ওদিকে দিনকয়েক পরে ষষ্ঠীচরণের বাড়িতে ষষ্ঠীচরণ ও বামাচরণ নিভৃতে খুব হাসাহাসি করছে।

ষষ্ঠিচরণ বলছিল: অভিনয়টা খুব জমেছিল কি বল? বামাচরণ বলল: সে আর বলতে। আমার যে কত বুদ্ধি তোমায় কি বলব! আমার মাথায় প্ল্যান ঢুকেছিল ও ভাবে তোমাকে মকরাক্ষ সেজে লড়াইয়ে না নামলে খুব বেগ পেতে হ'ত। ষষ্ঠীচরণ বলল: কিন্তু আমার এই দাড়ির কি হবে! বামাচরণ বলল: এই নকল দাড়ির বদলে তোমাকে সত্যকারের দাড়ি গজাতে হবে। এখন আর ষষ্ঠীচরণ বলে কেউ নেই। থাকলেও সে পালিয়েছে। এখন থেকে শুধু মকরাক্ষ গড়গড়ি এম. এল. এ.।

নামের দাম

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

আমরা ছোটবেলায় একটি গল্প শুনেছিলাম, নাম নিয়ে বিভ্রাট। একটি গরীব চাষীর সন্তান লেখাপড়া শিখে আদালতের হাকিম হয়, তার মেজাজ ভারী কড়া, যা মুখে আসে সবাইকে তাই বলে ধমকায়, এমন সময় আদালতের লোকজন খবর পেল যে লোকটার বাবার নাম ঠনাঠন দাস, গরীব থেকে বড় হয়েছে বলে এত গরম, আর যায় কোথা, সবাই খালি ঠনাঠন করতে থাকে, কিছু আওয়াজ হ'ল, অমনি প্রশ্ন করে, কিসের আওয়াজ? অন্য ব্যক্তি জবাবে বলে ঠনাঠন। ছোকরা হাকিম ক্ষেপে গিয়ে তার বাবার হাতে গোটা পঞ্চাশেক টাকার একটা থলি দিয়ে বল্লে—একটা ভালো দেখে নাম কিনে নাও, হাকিমের বাবার নাম ঠনাঠন হওয়া উচিত নয়। ঠনাঠন দাস কি করে নাম কিনতে পথে বেরোল, দেখল একটি দল মড়া নিয়ে যাচ্ছে, ভাবল ভালোই হ'ল, মরা লোকের নামটা সস্তায় পাওয়া যাবে, কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে, ভাই মৃত ব্যক্তির কি নাম ছিল? সবাই বলে ওঠে—অমর। লোকটি ভাবে কি ভুল নাম, অমর কখনো মরে, যদি অমর তো মরল কেন! যাক্ আরও একটু অগ্রসর হয়ে দেখে একটি লোক ঘাস কাটছে, সমস্ত দিন ধরে ঐ তার কাজ, মানুষটা গরীব, সস্তায় নামটা ছেড়ে দিতে পারে, তাকে প্রশ্ন করলেন ঠনাঠন—কি নাম? লোকটি বলল—ধনপত! আরে ছো ছো! ধনপতি যার নাম সে ঘাস কাটছে! বাজারে তখনও একজন মাছ নিয়ে বসে আছে, বিক্রী হয়নি, ভারী গরীব, এত বেলায় নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঠনাঠন জানতে চাইলেন নামটা কি বাপু? লোকটি বলল—লছমন। হায় রাম, স্বয়ং রামচন্দ্রজীর ভাই কিনা মাছ বিক্রী করছে! তখন বুড়ো ঠনাঠন সেই টাকার থলি পুত্রের হাতে ফেরত দিয়ে বলল:

> "অমর ও তো মর গিয়া
> ধনপত কাটতে হ্‌ ঘাস,
> লছমন আউর মছলি বেচতে হ
> ভালাই ঠনাঠন দাস॥"

সত্যিই ঠনাঠন নামটাই বেশ ভালো। সেক্‌সপীয়র রচিত রোমিও জুলিয়েট নামক নাটকে জুলিয়েট বলেছিলেন: "What's in a name—!" নামে কি আসে যায়—কিন্তু নামে আসে যায়, নাম ইতিহাস রচনা করে আবার ভাঙে, জাতির ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করে আবার ধ্বংসও করে। মানসিক ব্যাপারে নামের প্রবল প্রতাপ।

সীজার, হানিবল, তৈমুরলুঙ, চেঙ্গিজখান, আওরঙজেব এমন কি সে দিনের হিটলার—কি সব নাম!

আবার ইংরাজী ভাষাটা এই রকম অনেক নামে বেশ গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ নামটাকেই একটি অর্থময় শব্দে রূপান্তরিত করেছে।

পঁচাশী বছর আগেকার একজন অজ্ঞাতকুলশীল আইরিশ জমির নায়েবের নাম ছিল ক্যাপ্টেন বয়কট। সেই অঞ্চলের কিষাণদের প্রতি উৎপাত করে তিনি সকলের ঘৃণা অর্জন করেন, সমাজচ্যুত হন। যেখানে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত সেইখানেই এই নাম আজ পরিচিত, আর আমাদের দেশে বিলাতী-বস্ত্র বয়কট আন্দোলন এমনই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিও বয়কট মানে জানে। এই কথার কোনোরকম আঞ্চলিক প্রতিশব্দ নেই।

ইংরাজী শব্দে অনেক নাম এইভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, অনেকে জানেন না তার উৎপত্তি কোথায়! আমরা বলি 'ম্যাকডামাইজড রোড্‌স', 'পাস্তুরাইজড্‌ মিল্‌ক', 'ম্যাকিয়াভেলিয়ান প্রিন্সিপলস' 'ম্যাড্‌লিন সেন্টিমেণ্টস' ইত্যাদি। প্রতিটির সঙ্গে একটি নাম এবং জীবনীযুক্ত।

এইভাবে 'স্পুনারিজম' কথাটি চালু হয়েছে। 'যশুরে কৈ' না বলে 'কশুরে যৈ' কিংবা ইংরাজীতে 'ক্লাসিং ক্রো'কে 'ক্রাসিং ক্লো' ইত্যাদির নাম স্পুনারিজম। স্পুনার সাহেবের নাম রেভারেণ্ড স্পুনার, তিনি পাটনা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, আজ তাঁর নাম ডিক্‌সানারিতে উঠে গেছে।

টমাস র‍্যালে ইংলণ্ডে তামাক প্রচলন করার পঞ্চাশ বছর আগে জাঁ নিকোট নামে একজন ফরাসী ফ্রান্সে তামাক আনদানি করেন, তাঁর নাম থেকে উৎপত্তি হয়েছে নিকোটি কথাটির। গিলোটিন বস্তুটির উদ্ভাবক ডাঃ গিলোটিন আজ অমর, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিলোটিন শব্দটি বহু প্রচলিত, কোনো প্রস্তাবকে মধ্যপথে থামিয়ে দেওয়ার নাম গিলোটিন করা। ফরাসী বিপ্লবের কালের অন্ধকার দিনে সহস্র মানুষের গলা ঐ যন্ত্রে ছিন্ন করা হয়, সেই থেকে নাম গিলোটিন হয়ে গেছে।

'বার্ক' কথাটি আমরা জানি এডমনড্‌ বার্ক নামক বিখ্যাত বাগ্মীর নাম, তিনি তাঁর কালের একজন বিখ্যাত পার্লামেন্টীয় বক্তা ছিলেন, কিন্তু 'burke an enquiory' কথাটিতে ব্যবহৃত বার্ক এই ব্যক্তি নন। আর একজন নোংরা ব্যক্তি মানুষের গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলত তারপর তাদের মৃতদেহ ডাক্তারদের কাছে বিক্রী করত। এই কুখ্যাত বার্ক ধরা পড়ে এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রাণদণ্ড হয়, সেই থেকে কোনো

কিছু তদন্ত করার সঙ্গে তার নাম যুক্ত আছে।

বিখ্যাত কবি আলেকজাণ্ডার পোপ বলেছিলেন—"Amos Cottle !—Phoebus, what a name !" কিন্তু তাঁর নিজের খেয়াল হয়নি যে তাঁর নামের সঙ্গে যেমন বীর আলেকজাণ্ডার যুক্ত, তেমনই আবার ধর্মগুরু পোপের নাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটা নাম খুব শোনা যেত, যে কোনো বিশ্বাসঘাতককে লোকে বলত 'কুইসলিঙ', এই নামটি পঞ্চমবাহিনীর নেতার নামাঙ্কিত। আমাদের দেশে যেমন বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ। কেউ যদি কোনোরকম বিশ্বাসহীনতার কাজ করে তাহলে তাকে বলা হয় বিভীষণ।

কোনো কোনো সময় আবার ব্যঙ্গ করে বলা হয় যে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, অর্থাৎ লোকটি প্রকৃত ধার্মিক নয়, ধর্মের ভড়ঙ করছে।

কেউ যদি বেশী ঘুমায় আমরা তাকে বলি 'বেটা যেন কুম্ভকর্ণ।' আবার রাবণের আর এক ভাইকে নিয়ে টানাটানি, সে বেচারী একটু বেশী ঘুমোত।

যদি আমরা স্নেহশীল অনুজের সন্ধান পাই তো বলি তাকে বলি আহা! অমন লক্ষ্মণ ভাই, দাদা অন্ত প্রাণ, তাকে কিনা পথে বসালে? এইখানে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমের প্রতীক।

কেউ যদি বেশ মুক্ত হস্তে খরচ পত্র করেন তাঁকে আমরা বলি যেন 'দাতাকর্ণ'। দাতাকর্ণ যেমন দান করে গেছেন তেমনই দু হাতে দান করছে লোকটা। একালের গৌরী সেন কে ছিলেন জানি না, তবে লোকে আজও বলে—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

রাগী লোকদের আমরা বলি 'দুর্বাশা', খুব কূটবুদ্ধির লোককে বলি 'চাণক্য'· দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত মানুষ সম্পর্কে বলি যে 'রাজা হরিশচন্দ্র', রাজার মত ঐশ্বর্য তিনি অকাতরে দান করেছিলেন।

অগস্ত্য মুনি সেই যে চলে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি, তাই যে লোক সহজে ফিরে আসে না, তাকে আমরা বলি কি হে—অগস্ত্য যাত্রা করেছিলে নাকি?

কৃপণ লোকদের নামকরণ আবার অন্যরকম, যার নাম করলে হাঁড়ি ফটে, হাঁড়ি ফাটে মানে অন্ন জোটে না, উপবাসে দিন কাটাতে হবে, তাই তাঁদের নাম বলার সময় লোকে বলে অকাদশী চাটুর্য্যের বাড়ির পাশেই আমাদের বাড়ি।

কারো মামা যদি খুব দুষ্ট প্রকৃতির হয় তাহলে আমরা বলি, আহা! যেন কংস মাতুল! অর্থাৎ স্নেহহীন মাতুল।

নিধিরাম সর্দার কে ছিলেন জানা নেই, তবে তাঁর নামটাও কম বিখ্যাত নয়। 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।' লোকটি নিঃসন্দেহে একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন। কার সঙ্গে লড়েছিলেন তা অবশ্য জানা নেই।

আর একজন বিখ্যাত বা কুখ্যাত ব্যক্তির নাম রঘু ডাকাত। ছোট বেলায় ঠাকুমা-দিদিমার কাছে 'রঘো ডাকাত' এই উপাধি লাভ করেনি এমন শান্ত-শিষ্ট ছেলে সংখ্যায় কম। যে সহজে ঘুমাতে চায় না তাকে বলেন ছেলে তো নয়, যেন রঘু ডাকাত।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, সবাই মিলে বরং ভাবা যাক আরো কত নাম খুঁজে পাওয়া যায়, যে নাম রীতিমত দামী।
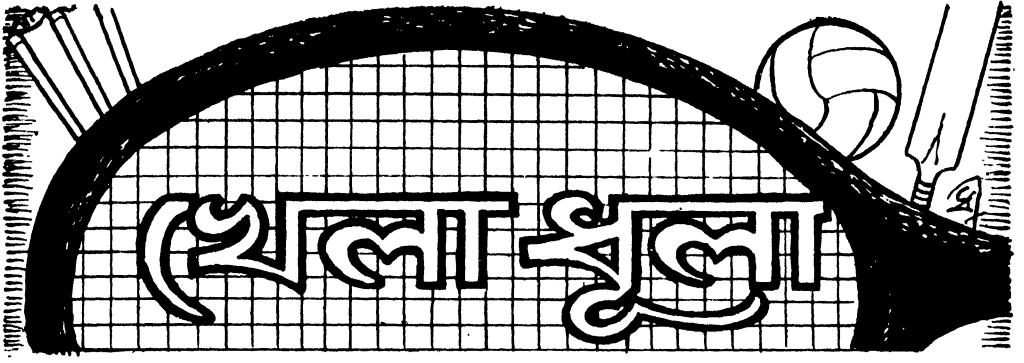
মেঠুড়ে

পক্-প্রণালী সন্তরণ

পক্-প্রণালী সাঁতার প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার বৈদ্যনাথ নাথ প্রথমস্থান অধিকার করেছেন। সিংহল-ভারতের অন্তর্বর্তী জলপথ পার হতে তাঁর সময় লাগে ১৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। তালাইমান্নারে ভোর চারটের কিছু পরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৈদ্যনাথ নাথ সন্ধে ছ'টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে ধনুষ্কোটির পাড়ে এসে ওঠেন। পাড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে সাইরেন বাজিয়ে বৈদ্যনাথের সাফল্যের খবর ঘোষণা করা হয়।

পক্-প্রণালী সাঁতার প্রতিযোগিতা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হ'ল। এই প্রতিযোগিতা সংগঠনে সক্রিয়ভাবে চিন্তা জাগিয়েছেন সাঁতারু মিহির সেন। গত বছর তিনি পক্-প্রণালী অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে পক্-প্রণালীতে সাঁতার প্রতিযোগিতা সংগঠনে সাড়া পড়ে যায় এবং প্রায় এক বছরের চেষ্টায় প্রস্তাবিত প্রতিযোগিতাটা বাস্তব রূপ নেয়।

এবার আটজন ভারতীয় সাঁতারু পক্-প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সাঁতার শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈদ্যনাথ নাথ অন্যদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকেন। রেলের কালীকিঙ্কর মণ্ডল সাড়ে বারো মাইল সাঁতরাবার পর বেলা সোয়া একটা নাগাদ জল ছেড়ে উঠে পড়েন।

তালাইমান্নার থেকে ধনুষ্কোটি জলপথের দূরত্ব উনিশ মাইলের কিছু বেশি হলেও স্রোতের টানে সাঁতারুদের আরো বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। তাছাড়া মিহির সেন যে পথে পক্-প্রণালী অতিক্রম করেছিলেন সেই পথের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার পথের কিছুটা পার্থক্য ছিল। পক্-প্রণালী সন্তরণে শীর্ষস্থান অধিকার করার জন্যে বৈদ্যনাথ নাথ পুরস্কার হিসেবে 'পক্ স্ট্রেট গোল্ড কাপ' পাবেন। ট্রফিটা দিয়েছেন ভারতীয় নৌবাহিনী।

রোভার্স কাপ

বোম্বাই থেকে রোভার্স কাপ নিয়ে ফিরে এসেছে মোহনবাগান ক্লাব। যদিও পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার রোভার্স কাপ লাভ

মোহনবাগানের নতুন সম্মান নয় এবং ফাইন্যালে গোয়ার ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবকে হারানো মোহনবাগানের পক্ষে বড় কথা নয়, তবু রোভার্স কাপ লাভ অবশ্যই কৃতিত্বের।

কলকাতার ফুটবল দলগুলোর বিপর্যয় এবং প্রথম দিকের কয়েকটা খেলায় মোহনবাগানের কষ্টার্জিত জয়ের নমুনা দেখে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছিল এবার মোহনবাগান রোভার্স কাপ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে কিনা, কিন্তু হারার মুখে দৃঢ়তা এবং খেলোয়াড়দের পারস্পরিক সহযোগিতা মোহনবাগানকে জয়ের সম্মান এনে দিয়েছে।

ফাইন্যালে গোয়ার ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবকে ১—০ গোলে হারাবার আগে মোহনবাগান ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে ১—০ গোলে, মাহীন্দ্র ও মাহীন্দ্র স্পোর্টস ক্লাবকে ২—০ গোলে এবং ই. এম. ই. সেণ্টারকে ১—১ ও ২—১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইন্যালে ওঠে। সেমি-ফাইন্যালে জলন্ধরের লাসার্ড ক্লাবের সঙ্গে দুদিন ১—১ ও ১—১ গোলে অমীমাংসিত খেলা শেষ করবার পর তৃতীয় দিন গোলশূন্য খেলার পর টসে জয়ী হয়ে মোহনবাগান ফাইন্যালে ওঠে। এর আগে মোহনবাগান সাতবার রোভার্স কাপের ফাইন্যালে উঠলেও সাফল্য মাত্র একবার—১৯৫৫ সালে ফাইন্যালে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে। এবার নিয়ে মোহনবাগান মোট আটবার এবং পর পর তিন বছর ফাইন্যালে খেললো। ১৯৬৫ সালে হেরেছে বি. এন. রেল দল এবং ১৯৬৬ তে ফুটবলে অখ্যাত মফতলাল মিলসের কাছে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

জাতীয় হকিতে এ বছর বাংলাকে এক রকম অনুশীলন ছাড়াই অংশ নিতে হয়। তার ওপর ইনাম-উর রহমানের মতন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় বাংলা দলের সঙ্গে মাদুরাই যেতে পারেন নি। তবু কোয়ার্টার ফাইন্যালে শক্তিশালী রেল দলের সঙ্গে চারদিন সমানে লড়ে বাংলা দল ১—০ গোলে হেরে যায়। সে-হারও আবার দুর্ভাগ্যজনিত পেনাল্টি স্ট্রোকের ফল। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো এক ঘণ্টা বাংলাকে দশজন খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। বাংলার যে খেলোয়াড় আহত অবস্থায় মাঠ ত্যাগ করেন তিনি দলের প্রধান স্তম্ভ এবং অধিনায়ক গুরুবক্স সিং। তবু রেল দলের সঙ্গে প্রাধান্য বজায় রেখে বাংলা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। রেল দলের তুলনায় বাংলা দল অনেক ভালো খেলে, কিন্তু ভাগ্য বাংলার সহায়ক ছিল না।

বক্সিং

মুষ্টিযোদ্ধার রাজা ক্যাসিয়াস ক্লের কাছে জোরা ফলি সপ্তম রাউণ্ডে নক-আউট হয়ে পরাজিত হন। খেলাটি ১৭ রাউণ্ডে হবার কথা ছিল।

রণজি ট্রফি

ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রণজি ট্রফির এবারের ফাইন্যাল খেলা বোম্বাই ও রাজস্থানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এই খেলায় বোম্বাই প্রথম ইনিংসের ফলাফলে রাজস্থানকে পরাজিত করে পর পর নয় বার ও মোট ১৮ বার রণজি ট্রফি লাভের সম্মান অর্জন করলো।

সম্পাদক ও গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা দু'খানি চিঠি

মৌচাকের প্রথম বছরের প্রথম চিঠি: সম্পাদকের লেখা

ওগো মৌচাকের ছোট্ট পাঠক-পাঠিকা, আজ তোমাদের দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তোমাদের জন্যেই তো আমরা মৌচাক বার করছি—তোমাদের যা-যা ভাল লাগে, তোমরা যা-যা পড়তে চাও, এই রকম লেখাই শুধু মৌচাকে ছাপা হবে। আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা কি রকম লেখা পড়তে বেশী ভালবাসো? কি রকম লেখা চাও। গল্প, না হাসির কবিতা? ভ্রমণ-কাহিনী, না দেশের কথা? বিজ্ঞানের কথা? কি রকম ছবি মৌচাকে চাও? সব কথা আমাদের তোমরা লিখে পাঠিয়ো—নিজের হাতে লেখা চাই, কিন্তু। বৈশাখ মাসের মৌচাক পেয়েই চিঠি লিখো। আমরা তা' হলে বুঝব, তোমরা কি চাও—মৌচাক কিভাবে চালালে তোমাদের ভালো লাগবে, তোমাদের মনের মতন হবে। আমরাও ঠিক সেই রকম করেই মৌচাক চালাবো।

আর একটা কথা শোনো—তোমরা সকলেই মৌচাকের জন্যে যে-যেমন পারো, লেখা লিখে পাঠাও দেখি। সব লেখা যদি ছাপাবার মত না-ও হয়, তাহলেও লিখতে লিখতে লেখার অভ্যাস হবে, তোমরাও একদিন খুব ভালো গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, এইসব লিখতে শিখবে। লেখা সম্বন্ধে কোন কথা জান্‌তে চাও যদি, তাহলে আমাদের চিঠি লিখো। আমরা জবাব দেব।

তোমরা কোনরকম লজ্জা করো না,—মনের কথা আমাদের নির্ভয়ে জানিও। আমরা তোমাদের মনের কথা শুনবো, তোমাদের সঙ্গী হব, সাথী হব, বন্ধু হব, এই কথাটি মনে রেখো। কেমন, লেখা, চিঠি সকলে পাঠাবে তো?

আর একটি কথা—চিঠির সঙ্গে তোমাদের গ্রাহক নম্বর লিখে দিয়ো। কেন না, এ-সব চিঠিপত্র চলবে শুধু মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের সঙ্গেই—বাইরের লোককে আমাদের ঘরের কথা, মনের কথা, বলতে যাব বা কেন? কি বল?*

তোমাদের সঙ্গী
"মৌচাকের" সম্পাদক।

*১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রকাশিত

পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকার একখানি চিঠি

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

ঠিক মনে নেই, সে আজকের কথা নয়, বহুদিন আগে, বিশ কিংবা পঁচিশ বছর হবে, যখন বাবা অফিস থেকে প্রতিমাসে বিশেষ একটা দিনের বিকেল বেলা হাতে একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে ফিরতেন, আর আমাদের মধ্যে তাড়া পড়ে যেত কে আগে বাবার কাছে পৌঁছতে পারে তাই নিয়ে। মাসের ঐ দিনটি আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না, কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে আগে পড়বে "মৌচাক"। সেদিনের সেই দিনগুলির কথা আজও মনে পড়ে যায়, যখনই নতুন "মৌচাক" দেখি। আর ভাবি কি মধুমাখা দিন হারিয়ে এসেছি অতীতের সেই হাসি-ভরা ছেলেবেলায়।

আশা করি আজও মৌচাকের ছোট মৌমাছিরা, "মৌচাক" হাতে নিয়ে তেমনি আনন্দে মেতে ওঠে।

আজ আমরা দু'জনাই জীবনের অনেকখানি পথে এগিয়ে এসেছি। গত ১৯৬০ সালে, আমি পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনার্স নিয়ে পাস করে, আজ রাঁচী হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেসানের ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার।

আমার দিদি শ্রীমতী দীপালি, শিক্ষা-জীবনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে জুয়োলজী অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তাঁর কলেজ-জীবন শেষ করেন। এখন তিনি দুই পুত্রের জননী। আমার ভগ্নীপতি ডঃ কমলেন্দু চ্যাটার্জী কেমিস্ট্রির প্রফেসর (সায়েন্স কলেজ, পাটনা)।

আমার একান্ত ইচ্ছা যেন সামনের নতুন বছরের নতুন "মৌচাক" দিদির দুই পুত্র (কলরব ও প্রভঞ্জন চ্যাটার্জী)-র নামে পাঠান হয়।

বাবা গভর্নরের এ্যাসিষ্টেন্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমাদের এতকালকার ঠিকানা এবার বদল হ'ল। "মৌচাক"কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ও তার দীর্ঘজীবন কামনা করে এবার বিদায় নিই—বহুদিনের সাথী "মৌচাক"-এর কাছ থেকে। চিরদিন মনে থাকবে "মৌচাকের" মধুর আস্বাদ। নমস্কার গ্রহণ করবেন।

ইতি—

শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী দীপালি চট্টোপাধ্যায়

কোয়ার্টার্স নং ই।২৩৭।২

রাঁচী ৪, (বিহার)

রূপাদের টিয়াপাখী

রূপাদের টিয়াপাখী
ভারী ভাল ভাই,
আম খেতে এ জগতে
জুড়ি তার নাই।
ছোট মুখে আম খাওয়া
দেখে হাসি পায়,
আম খেতে পেলে সে তো
সব ভুলে যায়।
শশা, কলা, পেয়ারাতে
মুখ ভার করে,
আম যদি দাও তারে
হাসি নাহি ধরে।
তাকে দেখে মনে হয়
হই যদি পাখী
সারাদিন আমি শুধু
আম খেয়ে থাকি।

শ্রীজয়িতা মুখোপাধ্যায়

একটুখানি হাসো

শিক্ষক: ধরের মাথায় এত বেশী কোটেশন মার্ক কেন?

সুমিত্রা: আজ্ঞে, ওগুলো হোল উদ্ধৃতি চিহ্ন।

শিক্ষক: তা তো দেখছি। কিন্তু এতগুল কেন?

সুমিত্রা: পাশের মেয়ের থেকে টোকা কিনা।

* * *

ভদ্রলোক:—একটা সিল্কের টাই দিন তো তাড়াতাড়ি।

দোকানদার: কি রঙের?

ভদ্রলোক: দুধের সঙ্গে কফি মেশালে যে রং হয় সেই রঙের।

দোকানদার: আজ্ঞে তাতে কি চিনি দেওয়া থাকবে?

শ্রীভাস্কর সেন

ছড়া

পড়তে বসে খোকা,
ব'নে গেল বোকা।
টেবিল পরে' বইটি রাখা,
যাচ্ছে নাকো কোথায় দেখা
তবে কি তায় নিয়ে গেছে চোরে?
অথচ সিঁধ নেই তো কোথাও ঘরে!
বাড়ীর লোক যারা
ভেবেই হ'ল সারা।
খোকার বন্ধু একটু পরে
বসল এসে খোকার ঘরে।
করল আবিষ্কার সে যে
বইখানাকে একটি ঘোঁজে।
পাতা ক'টি ছিন্নভিন্ন,
আসল বইয়ের নেইকো চিহ্ন।
ইঁদুর ভায়ার কাণ্ড সে এক
বন্ধু বলে: এই চেয়ে দেখ!

ফখরউদ্দিন তাপাদার

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

ক্যালেণ্ডারের কাহিনী—শ্রী অ জি ত সেন। গ্রন্থবিতান, ৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ রোড, কলিকাতা ২৬। মূল্য ২'০০

'ক্যালেণ্ডারের কাহিনী' ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য রচিত একটি অভিনব ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই। ছোটদের জন্য ঠিক এ ধরনের বই বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ।

বইখানি প্রধানতঃ ছোটদের জন্য লেখা হলেও, বড়রাও এ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন।

বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেণ্ডারের নানাবিধ বিষয়, ঐতিহাসিক কাহিনী অর্থাৎ কোথা থেকে কিভাবে এই ক্যালেণ্ডারের উৎপত্তি হ'ল, এবং এর প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক কিভাবে উপলব্ধি করে সে সম্বন্ধে লেখক একটি গবেষণার কাজ করেছেন বললেই হয়। ভারী সুন্দর এই বইটি পড়লে তোমরা সবাই উপকৃত হবে।

চিংচিং ফাঁক—শ্রীননীলাল দে। শ্রীমতী অমিয়াবালা দে কর্তৃক বাণীপুর, পোঃ বাইগাছি, হাবড়া হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান: ষ্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ১'০০

বড় টাইপে ছাপা ২৬টি মজার কবিতার বই 'চিংচিং ফাঁক'। সাধারণতঃ আলিবাবার কাহিনী থেকে যে কথাটি প্রচলিত, সেটি হ'ল 'চিচিং ফাঁক'। কিন্তু কবি এই বইটির নাম দিয়েছেন 'চিংচিং ফাঁক'। এই নামে একটি কবিতাও আছে। ছোটরা কবিতাগুলির রস খুবই উপভোগ করবে এবং কোন ছবি না থাকলেও রসগ্রহণে তাদের কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কতকগুলি বানান ভুল এবং একই বানান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হওয়া ছোটদের বইয়ে উচিত হয়নি।

হইচই হল্লা—শিশুমিত্র। ছাত্রবান্ধব ৯০, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৬। মূল্য ২'০০

নাম দেখেই বোঝা যায় মজার বা হাসির বই। সত্যিই এটি একটি সচিত্র মজাদার হাসির উপভোগ্য কবিতার বই। ছদ্মনামী লেখকের হাত এত মিষ্টি ও পাকা যে, প্রতিটি কবিতাই ছোটদের প্রচুর আনন্দ দেবে এবং সুকুমার রায় ও সুনির্মল বসু প্রভৃতিদের কথা মনে পড়িয়ে দেবে।

কবিতাগুলির সঙ্গে বিখ্যাত কার্টুন-শিল্পী চণ্ডী লাহিড়ীর ছবিগুলি যেন রাজযোটক মিল হয়ে কবিতার রসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে প্রচ্ছদপটটির দিকে চাইলেই কেউ না হেসে পারবে না।

নতুন বছর এলো! গত বছরের হিসাব-নিকাশ করতে গেলে ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগের যে ছবি দেখি, যে মানসিক পীড়ন অনুভব করি আমরা সবাই—বছরের প্রথম দিনটিতে সেই কথা মনে হয়ে এই কথাই বলি—এই দুঃখ-দুর্দশার পরিসমাপ্তি ঘটুক। নতুন বছরে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমরা এই প্রার্থনা করি—জীবনে আমাদের শান্তি-শৃঙ্খলা আসুক—সুপ্রভাতের উদয় হোক। যত অপচয়, যত দুঃখ, ক্ষতি, সব নতুন দিনের ধারাস্নানে ধুয়ে মুছে যাক। সকলে নববর্ষের স্নেহ-ভালবাসা ও শুভকামনা নিও।

এই তো সেদিন দেশে প্রদেশে প্রবল উত্তেজনা চলছিল ; ভোটগ্রহণ, নতুন পরিচালনা ইত্যাদি এই সবের উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে আমরাও দিন কাটাচ্ছিলুম। নির্বাচনেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন সব দিক থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলতে হবে। অকারণ হৈ চৈ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, কোন কিছু উপলক্ষ্য করে নাগরিক জীবন বিপন্ন করা, অকারণ ক্ষয়-ক্ষতি ও অসন্তোষের সৃষ্টি, এসব থেকে মুক্ত হতে হবে। দেশ ও দশের জন্য শুভচিন্তা করার মত সুবুদ্ধি আসুক আমাদের—একথা আজকের দিনের বড় কথা। পরীক্ষাগুলি আবার আরম্ভ হয়েছে এবং পরবর্তীগুলিও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—সব সুশৃঙ্খলায় সমাপ্ত হোক। কত ছাত্রছাত্রীর বিনা কারণে একটি বছর নষ্ট হলো, কত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। সব অশুভের পরিসমাপ্তি ঘটুক এই নতুন বছরে। নতুন বছরের শুরুতে তোমরা কি সঙ্কল্প বাক্য গ্রহণ করলে তা জানতে ইচ্ছা করছে—জানলে সুখী হবো।

বৈশাখ মাস পড়লেই মনে হয় পঁচিশে বৈশাখের কথা। আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই দিনটি জড়িয়ে আছে। এই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানাতে যেন আমরা কোনো দিন না ভুলি। আশা করি তোমরা ঐ দিনটি পবিত্রভাবে পালন করবে—তাঁর রচনা পড়ে, তাঁর গান গেয়ে—তাঁকে অর্থাৎ কবিগুরুকে প্রণাম জানিয়ে।

"…তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উন্মোচন সূর্যের মতন।"

চিঠির উত্তর—

শম্পা ও পম্পা রায়, শিলচর—এ বছর থেকে অর্থাৎ এই বৈশাখ থেকে মৌচাকের বার্ষিক চাঁদা কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্ম সর্ববিধ চেষ্টা করা হচ্ছে। তোমাদের সকলকেই বলা আছে, কি তোমাদের ভাল লাগে বা পছন্দ করো তা জানালে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করতে পারি।

মধুস্মিতা ও সুস্মিতা বাগচি, জামসেদপুর—তোমাদের চিঠিটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। বারান্তরে আর একটু পরিষ্কার করে যদি লেখো সুবিধা হয়। হ্যাঁ, তুমি যা শুনেছ তা ঠিক বলেই মনে হয়—আফ্রিকায় একরকম সাপ আছে তারা দূর থেকেই বিষ ছড়িয়ে দিতে পারে! সাধারণভাবে সাপের নাম শুনলেই আমরা শিউরে উঠি, ছোট বড় যে কোনো সাপের, এমন কি লাউ ডগা, জলঢোঁড়া সাপ পর্যন্ত—তাই সাপ শুনলেই কেমন যেন ভয় জাগে—তাই নয়? কিন্তু অনেক সাপের গায়ের উপর কত সুন্দর কাজ করা দেখেছ? ভরসা হয় না দেখতে, মনে হয় এখনি ফোঁস করে কামড়ে দেবে বুঝি—না? দেয়ও—তবে না রাগলে বিশেষ কিছু করে না। ছোট সাপের কথাই বলছি। সাপের খোলস ছাড়া দেখেছ? কাজ করা একটা প্লাষ্টিক কাগজের মত পাতলা জিনিস—যে সাপ ছেড়েছে তার মাপেই হয়।

শ্রীলেখা দত্ত, কোলকাতা—তোমার মতামত ভাল লাগলো। সম্পাদক মশাইকে জানিয়ে দেব নিশ্চয়।

তিস্যরক্ষিত রায়, লক্ষ্ণৌ—লিখবে বৈকি চিঠি! আর জানতে চাও তাও পরিষ্কার করে লিখবে।

দেবযানী বসু, নিউ দিল্লী—তোমার বাংলা লেখার অভ্যাস যে কম তা বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু অভ্যাস করো—তা না হলে খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। তাছাড়া নিজের ভাষা আর এমন শক্তিশালী ভাষা, ভাল করে জানতে হবে যে!

অনুরাধা শেঠ, কলকাতা—তোমার জন্মদিন যদিও এবছর চলে গেছে, তবু তুমি আমাদের শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীষ নিও।

কোলকাতা থেকে—হীরক ও মোহর, রাধা দত্ত, মলেবিকা, অনীতা, মহাশ্বেতা, দীপান্বিতা, সমর্পিতা, অনিন্দিতা, রাণা, সান্যাল, রাজর্ষি ও শ্বেতা। তেজপুর থেকে—রণেন্দ্র, শ্রীরূপা। শান্তিনিকেতন থেকে—কৌশিক ঘোষ। কোলকাতা থেকে গোপা, শম্পা পাল, ও জ্যোৎস্না দাস—সকলের চিঠি পেয়েছি।

তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত
মূল্য : ০·৫০ পয়সা
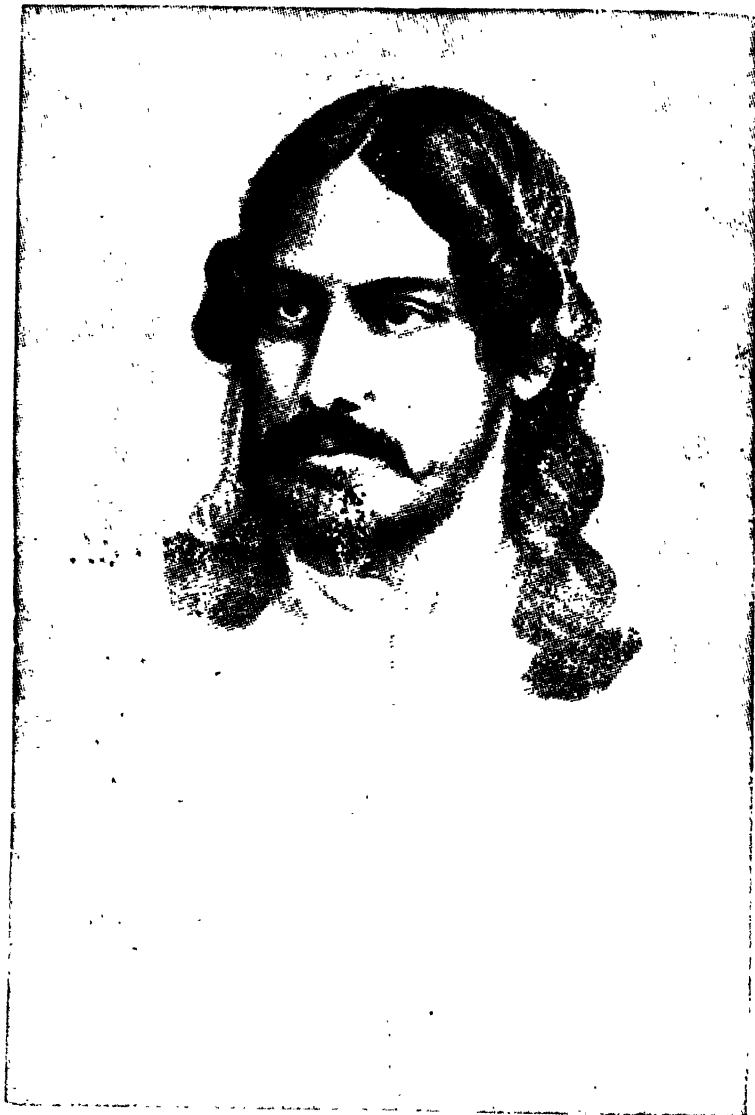
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋
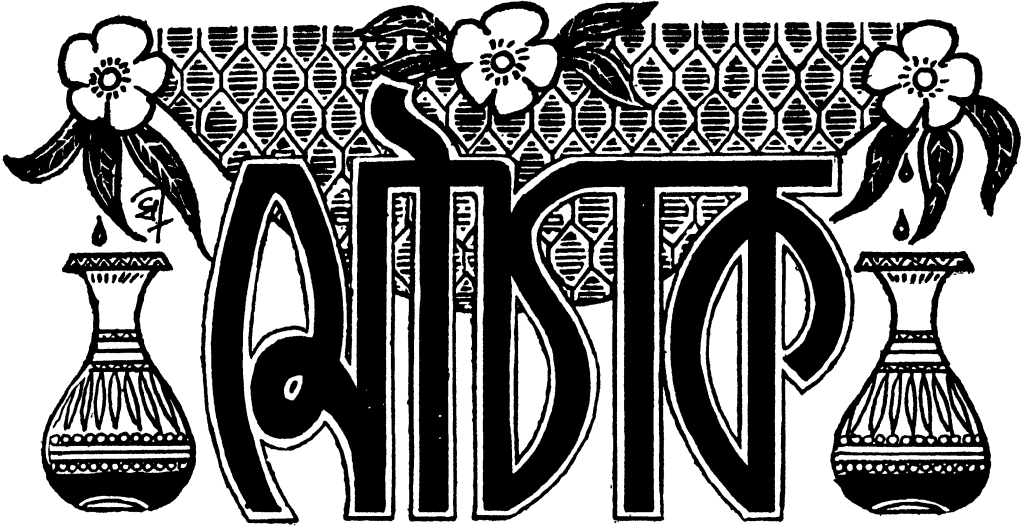
৪৮শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৭৪ [২য় সংখ্যা

মধু-ভরা মৌচাক

শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

গোল্লা কেন কেউ পাবে আর
কেউ পাবে এক শো।
অসাম্যটা কী নিদারুণ,
ছোঃ, আরে ছোঃ, ছোঃ!

মার্কা-বিতরণের বেলা
সাম্যটা দরকার।
ভালো নম্বর পায়নি জাদু
ঠ্যাঙালো মাস্টার।

ভাঙলো টেবিল, ভাঙলো চেয়ার
করলো ধর্মঘট।
দেখতে দেখতে ক্লাসের নেতা
বন্‌লো সে চট্‌পট।

দ্রাক্ষাফলে হাত না পেয়ে
শৃগাল সুপণ্ডিত
বুঝিয়েছিলো দ্রাক্ষাগুলো
অম্ল সুনিশ্চিত।

চাক নিঙড়ে মধু আনা —
বুঝে সেকাজ শক্ত
মৌচাকেতে ঢিল মারাটাই
করলো জাহ্নু রপ্ত।

চাবলরাম শেঠ বলেছে—
অবাক্ হবার কী আছে ?
দিনকালটা হলো এমন
কাঁকর ফললো ধান গাছে!

ও সব গিলেই ছেলেপিলের
মতিগতি এই রকম।
মৌচাকেতে কিন্তু মধু
ভরাই থাকে হরদম।

শম্ভুর ভাগ্য

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

শহর থেকে দূরে পাড়াগাঁয়ে বাস করত এক কৃষক। তার দুই ছেলে, নাম নন্দ আর শম্ভু।

কৃষকের অবস্থা ভাল, জোতজমি বিস্তর। নন্দ তার বাপের সঙ্গে খেত-খামারে কাজ-কর্ম দেখাশোনা করে, চাষবাস করে। কিন্তু ছোট ছেলে শম্ভু ও-সবের ধার ধারে না। খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়।

পাড়াগাঁয়ে থেকে থেকে শম্ভুর আর ভাল লাগছিল না। এক সময়ে শহরে যাবার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠল।

একদিন বাপকে বলল, সে শহরে যাবে।

কৃষক প্রথমে তাকে বোঝাল-সোঝাল; তারপর বকাবকি করল। কিন্তু ছেলে গোঁ ছাড়ল না। অগত্যা কৃষক রাগ করে বলল, তুমি যখন আমার কথা শুনবেই না, তখন যা খুশি করতে পার।

তারপর একদিন কিছু টাকাকড়ি নিয়ে শম্ভু চলে এল শহরে।

লোক নেওয়া হচ্ছিল সেনাবিভাগে। শম্ভুর স্বাস্থ্যটা ছিল বেশ মজবুত। সহজেই ভর্তি হয়ে গেল সৈন্যদলে।

তখন থেকে শম্ভুর চাল-চলন গেল বদলে। ক্রমে সে কিছুটা বেপরোয়া হয়ে উঠল, টাকাপয়সা খুশিমত খরচ করতে লাগল।

এক সময়ে তার বাবাকে মিথ্যা করে লিখল, সেনাবিভাগে তার প্রমোশন হয়েছে। গোটাকতক টাকার দরকার, বন্ধুদের মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

হাজার হোক, ছেলে তো? বাপের রাগ ক'দিন থাকে? টাকা পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু সৈন্যদলে ঐ ক'টা টাকা খরচ করতে ক'দিন লাগে? কিছুদিন বাদে আবার তার আগের অবস্থা।

দিন কাটে। কয়েক মাস কাটল।

'আচ্ছা, বাবাকে যদি জানাই, আমি ক্যাপ্টেন হয়েছি, তবে নিশ্চয় খুশি হয়ে তিনি আরো বেশি টাকা পাঠাবেন।' শম্ভু একদিন নিজের মনেই কথাটা ভাবল।

তারপর যেমন ভাবনা তেমনি কাজ।

ছেলে ক্যাপ্টেন হয়েছে জেনে কৃষকের আনন্দ দেখে কে! প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবরটা দিয়ে এল: আমার ছেলে শম্ভু ক্যাপ্টেন হয়েছে। হ্যাঁ, আমার শম্ভু একজন ক্যাপ্টেন।

খুশি মনে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়ে দিল ছেলেকে।

কিন্তু শম্ভুর উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলল দিন দিন। এবং শেষ পর্যন্ত যথেচ্ছ আচরণের দরুন সেনাবিভাগের আইনে শম্ভুর শাস্তি হ'ল তিনমাস জেল।

এদিকে কৃষক অনেককাল ছেলের কোন চিঠিপত্র, খবরাখবর না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে একদিন ধোপদোরস্ত কাপড়জামা পরে চলে গেল শহরে। সেখানে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে করে হাজির হ'ল একেবারে মিলিটারি ব্যারাকে। খোঁজ করল ক্যাপ্টেন শম্ভু মণ্ডলের।

ব্যারাকের লোকেরা বলল, ও নামে কেউ নেই এখানে।

—বল কি? ক্যাপ্টেন মণ্ডলের নাম শোননি, বাঙালী পল্টনে ভর্তি হয়ে যে ছোকরা বছর খানেকের মধ্যে ক্যাপ্টেন হ'ল?

অনেক বলা-কওয়ার পর ব্যাপারটা বুঝতে পারল ওরা।

সব শুনে বড় দুঃখ হ'ল কৃষকের মনে। রাগ ও হ'ল।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বৃদ্ধ জেলে দেখা করল ছেলের সঙ্গে। তিরস্কার ক'রে বলল, তুমি মিথ্যা বলে বলে প্রতারণা করেছ আমার সঙ্গে, আর কোন সাহায্য পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে, বাড়িতেও আর ঠাঁই নেই তোমার। এই বলে কৃষক রাগের মাথায় হন্‌হন্ করে বেরিয়ে এল এবং ফিরে গেল বাড়িতে।

জেল থেকে খালাস পেয়ে শম্ভু আর মিলিটারীতে স্থান পেল না। ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনঃকষ্টের অবধি নেই। নিজের স্বভাবের দোষে পিতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। এখন কী-করে বাপকে খুশি করা যায় এই হ'ল তার ভাবনা।

বেরিয়ে পড়ল দু'চোখ যেদিকে যায়। চলতে চলতে এসে পড়ল ভিন্ন এক রাজ্যে। সেখানে তখন মহা হুলুস্থুল কাণ্ড! কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রাজকন্যাকে। রাজা গিয়েছিলেন বনে শিকার করতে। সঙ্গে ছিল রাজকন্যা। কোথা থেকে একদল দস্যু এসে রাজকন্যাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। চারধারে খোঁজাখুঁজির অন্ত নেই। কিন্তু বৃথা! ডাকাতদের আড্ডা বের করা যাচ্ছে না।

রাজবাড়ি শোকে নিঝুম।

রাজা ঘোষণা করেছেন, যে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে এনে দিতে পারবে, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন।

শম্ভু ভাবল, একবারটি চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?

সে বনের পথ ধরল। চলতে চলতে এসে গেল এক গভীর অরণ্যে।

বন-জঙ্গলের কি আর শেষ আছে? বড় বড় গাছ-গাছড়া আর ঝোপেঝাড়ে সব অন্ধকার। দস্যুদের আড্ডা বা রাজকন্যার হদিস পাওয়া কি সহজ ব্যাপার? কোথায় দস্যুরা, কোন গুহা-গহ্বরে তাদের আস্তানা, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে রাজকন্যাকে না মেরেই ফেলেছে, কে জানে?

শম্ভু ক্লান্ত হতাশ হয়ে পড়ল।

আরো অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সে একটা গাছের তলায় বসল বিশ্রাম করতে।

'এসে দাঁড়াল এক থুনথুনে বুড়ী।' পৃঃ ৬২

এমন সময়ে কিম্ভুতকিমাকার চেহারার একটা বুড়ো লোক বেরিয়ে এল সামনের ঝোপ থেকে। বলল, আরে, শম্ভু মণ্ডল যে! তুমি এই ঘোর জঙ্গলে এসেছ কি করতে?

—এঁ্যা, আমার নাম তুমি জানলে কি করে? কে তুমি?—শম্ভু রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে।

—সে আমি জানি। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

—আমি রাজার মেয়েকে খুঁজতে বের হয়েছি।

—তাই নাকি? সে তো বড় কঠিন ব্যাপার। প্রাণে বাঁচলে হয়। আচ্ছা, দেখি আমি তোমাকে একটা উপায় বাৎলে দিতে পারি কিনা। এই বলে সে তার ঝোলার ভিতর থেকে কি সব বের করে এনে বলল: এই ধর তিনটি জিনিস, রেখে দাও। কাজে লাগবে। সামনেকার এই পথ ধরে এগিয়ে যাও। প্রথম যে গহ্বরটা দেখতে পাবে সেখানেই থামবে।

এই বুড়ো লোকটা সম্ভবতঃ এক ফকির-টকির হবে। বুড়ো একটা বাঁশি, একটা ছেঁড়া কোট আর একটা ছোট লাঠি শম্ভুর হাতে দিয়ে বলল: এই বাঁশিতে ফুঁ দিলে ভূতপ্রেত দৈত্যদানা কেউ তোমার কাছে ঘেঁষবে না, অনিষ্টও করতে পারবে না; কোটটা গায়ে চড়িয়ে যখন যেখানে খুশি মুহূর্তে চলে যেতে পারবে; আর এই লাঠির সাহায্যে তোমার শরীরটা যত ক্ষুদ্র ইচ্ছা ততো ক্ষুদ্র করা যাবে।

এই বলে বুড়ো আবার ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। শম্ভু এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট পথে।

কিছুদূর যেতেই দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড গর্ত। ওটার মুখের কাছে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে বিকট আওয়াজে কে বলে উঠল, কে রে ওখানে?

শম্ভু প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর সাহস করে বলল, আমি এক পথিক। পথ হারিয়ে ফেলেছি। বড় ক্লান্ত। আজকের রাতের জন্য আশ্রয় চাই।

—এটা যে দস্যুর আড্ডা তা জানিস না?

তাই নাকি? আমি তো এই আড্ডাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভালই হ'ল। রাজকন্যাকে এখানেই লুকিয়ে রেখেছে তো? আমি তাকেই নিয়ে যেতে এসেছি।

—বটে? তোর সাহস তো কম নয়। তা বেশ, ঢুকে পড়। আমি একা আছি। আমাকে পাহারায় রেখে দস্যুরা কোথায় বেরিয়েছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই।—বলতে বলতে গর্তের মুখে এসে দাঁড়াল এক থুনথুনে বুড়ী।

ঐ বুড়ী শম্ভুকে নিয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু কী কাণ্ড! গুহার ভিতরে কত সিঁড়ি কত গলি-ঘুঁজি। এ-ঘর, ও-ঘর, বারান্দা, কত-দরজা, চোরা-কুঠরি—যেন শেষ নেই! বুড়ী তাকে কোথায় নিয়ে চলল? ফাঁদে আটকাল নাকি। এখন উপায়? —শম্ভুর মনে ভয় হ'ল। দারুণ ভয়!

মনের আতঙ্ক মুখে প্রকাশ না করে বুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, সে তাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাচ্ছে কিনা?

—হ্যাঁ, তার কাছেই নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে তোকে তিনটে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। যদি না পারিস তবে অন্যদের যে অবস্থা হয়েছে তোরও তাই হবে, প্রাণ

নিয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে পারবি নে। কেউ পারেনি। এখন বুঝে দেখ।

মনে সাহস এনে শম্ভু বলল—পরীক্ষা? তা সেটা কী ধরনের বল তো?

—তা' হলে তুই রাজী?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, ঐ যে বড় বাক্সটা দেখছিস, ওর ভেতরে থাকে তিনটে ভূত। আজ তোকে ঐ বাক্সটার ভিতরে রাত কাটাতে হবে।

—বেশ।

শম্ভু বাক্সটার ডালা খুলে ভিতরে ঢুকে অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রে যথাসময়ে তিন-তিনটে ভূত-প্রেত এসে হাজির।

শম্ভুকে দেখতে পেয়ে একটা ভূত চেঁচিয়ে উঠল: এখানে কে শুয়ে আছিস রে?

আর একটা বলল: ভাল চাস তো শীগ্‌গির ভাগ্‌ এখান থেকে। পালা, পালা।

শম্ভু বলল, বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছ কেন? ভেতকে এস না? চারজনেরই জায়গা হবে।

—তোর মতলবখানা কি? জায়গা ছাড়বি নে তো? আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি! এই বলে ভূত তিনটে আক্রমণ করল শম্ভুকে।

কিছুক্ষণ হাতাহাতি জাপটাজাপটির পর শম্ভুর হঠাৎ মনে পড়ল ফকিরের দেওয়া জিনিসগুলির কথা। তাড়াতাড়ি বাঁশিটা বের করে বাজাতে শুরু করল আর অমনি ভূত তিনটে আর্তনাদ করতে করতে নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

শম্ভুর মনে একটু আশা হ'ল।

পরদিন সকালবেলা ঐ বুড়ী এসেছে শম্ভুর মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলতে। হঠাৎ দেখে শম্ভু তার সামনে দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে গেল বুড়ী। অবাক হবারই কথা। সে ভেবেছিল শম্ভু ভূতের হাত থেকে রক্ষা পায়নি; উল্টে ভূতই যে জব্দ হয়েছে তা তো আর সে জানত না?

যা হোক বুড়ী একটু সামলে নিয়ে বলল: একমাত্র তুইই এই বাক্সের ভিতর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিস। বরাত ভাল তোর। এবারে দ্বিতীয় পরীক্ষা। ঐ যে দূরে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওটার চুড়ায় আছে একটা পাখীর বাসা। ওখান থেকে পাখীর ছানাগুলো এনে দিতে হবে আমাকে। আজ দুপুরের মধ্যেই আনা চাই। কিন্তু খবরদার কোনো সিঁড়ি, মই বা দড়িদড়া ব্যবহার করা চলবে না। এই বলে বুড়ি চলে গেল।

শম্ভু ফকিরের দেওয়া সেই ম্যাজিক কোট গায়ে দিয়ে বলল, আমি ঐ মন্দিরের চূড়ায় যাব।

আর এক লহমায় সে উঠে গেল মন্দিরের চূড়ায়। অবাক কাণ্ড। সেখান থেকে পাখির ছানা ক'টা তুলে নিয়ে ফিরে এল গুহায়।

—এর মধ্যেই হয়ে গেল? বিশ্বাস হচ্ছে না! কী করে চূড়ায় উঠলি বল তো? বুড়ির চোখে-মুখে বিস্ময়।

—তর্‌তর্ করে বেয়ে উঠে গেলাম, আবার তেমনি হড়্‌হড়্ করে নিচে নেমে এলাম। এমন আর কি কঠিন কাজ?

—তুই তো দেখছি আচ্ছা চতুর লোক। তা বেশ। এখন শেষ পরীক্ষাটা হয়ে যাক। যে ঘরে রাজকন্যা আছে সে ঘর তালা বন্ধ করে দিচ্ছি। তুই যদি আজ রাত্রে সে ঘরে ঢুকে তার কাছে যেতে পারিস তবে রাজকন্যাকে ছেড়ে দেব।

রাজকন্যার কুঠরিতে বেশ করে তালা লাগিয়ে বুড়ী চলে গেল।

রাত হ'ল। শম্ভু খুঁজে-পেতে রাজকন্যার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার কুঠরি। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। দরজা ভাঙাও চলবে না। অগত্যা সেই জাদুকরের ক্ষুদে লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার ঘোরাল, অমনি সে একেবারে এই এতটুকু একটা পিঁপড়ের মত হয়ে গেল—অনায়াসে তালায় চাবি লাগাবার ফুটো দিয়ে গলে সে ঘরের ভিতর চলে গেল।

তখন অনেক রাত। রাজকন্যার চোখে ঘুম নেই। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে অদৃষ্টের কথা ভাবছে। হঠাৎ ঘরে লোক দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল; মূর্ছা যায় আর কি! শম্ভু তখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল, ভয় পেও না। আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি।

শম্ভু মণ্ডল সত্যি সত্যি রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজপুরীতে নিয়ে এল।

আর রাজপুরীতে সে কী আনন্দ, উৎসব।

সকলের মুখেই শম্ভুর প্রশংসা। রাজা লোকলস্কর পাঠালেন শম্ভুর পিতার কাছে। কৃষক হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত। সব বৃত্তান্ত শুনে বৃদ্ধের আনন্দ আর ধরে না, বুকে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে।

তারপর একদিন রাজবাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল। শুভলগ্নে শম্ভুর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(৩)

এদিকে মহারাজা জানে না যে ঢোল পিটিয়ে প্রজাদের ঢালা নেমন্তন্ন করা হয়েছে। প্রজারা পরের দিন দল বেঁধে খেতে আসে। মহারাজার বাড়ী নেমন্তন্ন। মণ্ডামেঠাই পরমান্ন খাবে বলে তারা আগে থেকেই ধন্য ধন্য করে।

বাড়ীতে তারা সামান্য খায়। আজ ভাল খেয়ে পুষিয়ে নেবার জন্যে তারা উপোস দিয়ে পেট শূন্য করে এসেছে।

রাজবাড়ীর বাইরে অনেক গাব, শ্যাওড়া আর তেঁতুল গাছের সার। তার ছায়ায় প্রজারা এসে সার বেঁধে দাঁড়ায়। তাদের সোরগোল শুনে মহারাজার তালগোল লাগে। প্রজারা দলবেঁধে খেতে এসেছে, অথচ কোনও আয়োজন নেই!

কোন্ ঢুলি এমন ঢোল দিয়ে গোল বাধাল? মহারাজা রেগেমেগে হাঁক দেয়, "মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল!"

তারা এসে বলে, "আজ্ঞে মহারাজ!" কিন্তু ব্যাপার দেখে তারাও বেহাল হয়। তারা বলে, "কোন্ ঢুলি এমন ঢোল দিল? খোঁজ, খোঁজ! খুঁজে মাথায় ঘোল ঢাল।"

কিন্তু টের পেয়ে ঢুলি ঢোলের বোল ভুলে গেল। সে মহল্লা ছেড়ে পালাল।

প্রজারা ছেলে দেখতে আসেনি। এসেছে নেমন্তন্ন খেতে। বেলা বাড়ে, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে। অথচ কেউ খেতে ডাকে না! মোড়লদের একজন লজ্জার মাথা খেয়ে কোটালকে বলে।

কোটাল বলে সেনাপতিকে। সেনাপতি বলে মন্ত্রীকে। মন্ত্রী দাড়ি চুলকে বলে মহারাজাকে। আর মহারাজা চোখ মট্‌কায়, অর্থাৎ মট্‌কির মধ্যে লুকিয়ে থাকা চল্‌বে না। ইজ্জত বাঁচাবার পথ বাত্‌লাও।

সেনাপতির হাতে তলোয়ার আর কোটালের হাতে ডাণ্ডা আছে। এক্ষুনি প্রজাদের মেরে-কেটে ঠাণ্ডা করা যায়।

কিন্তু মহারাজা বলে, "স্বপ্নে পাওয়া ছেলে। অপকম্ম চল্‌বে না।"

তখন মন্ত্রী দাড়ি বুলিয়ে, সেনাপতি গোঁফ নাবিয়ে, আর কোটাল গালপাট্টা হাতড়ে কানাকানি করে। মান রাখার বুদ্ধি আঁটে। তারপর মহারাজাকে জানায়, "ঠিক হয়ে গেছে মহারাজ।"

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "কি ঠিক হ'ল ?"

ওরা বলে, "আপনি যা বলেছেন তাই। অপকম্ম চলবে না। কিন্তু"—মন্ত্রী দাড়ি চুলকায়।

মহারাজা বলে, "কিন্তু কি ?"

মন্ত্রী বলে, "একরত্তি খাদ দিতে হবে মহারাজ। প্রজাকে ভোজ দেওয়া গয়না তৈরীর সামিল কিনা। খাঁটি সোনায় তো গয়না হয় না। তাই আট আনা খাদ।"

মহারাজা বলে, "ঠিক বাত, খুঁৎ না থাকলেই হ'ল।"

সেনাপতি বলে, "নাকে তেল মেখে, মজা করে ঘুম দিন গে মহারাজ। আমরা আছি কি জন্যে ? কত দিগ্‌বিজয় করি, আর এ তো সামান্য!"

মুখে আধখানি হাস্য করে, নস্য টেনে, মহারাজা বিশ্রাম করতে গেল। আর ওরা প্রজার মোড়লদের নিরালায় ডাকল।

মন্ত্রী বলেন, "মহারাজার ছেলে দেখতে প্রজারা এসেছে। তাতে অবিশ্যি মহারাজা ভারী খুসী। তোমরা পেট ভরে নেমন্তন্ন খাবে। কিন্তু একটি কথা। তোমরা রাজভক্ত প্রজা তো? রাজা হচ্ছে দেবতা। আগে তাকে খাইয়ে তবে প্রসাদ পেতে হয়। নৈলে পাপ হবে। তাতে পরজন্মে দত্যি হওয়া ভাল কথা নয়!"

মোড়লরা মাথা চুলকে বলে, "সত্যি কথা।"

মন্ত্রী বলে, "তোমরা রেঁধে-বেড়ে মহারাজার ছেলে রাজাকে আগে খাওয়াও,

রাজার খিদে পেয়েছে। তোমাদেরও পেয়েছে। তোমাদের বসাতে পারি। কিন্তু এমন দিনে অধর্ম করতে নেই। প্রজার জিনিসে রাজাকে খাওয়ান পুণ্যি।" মোড়লরা ধন্যি ধন্যি করে।

তারা খাবে বলে খালি হাতে এসেছিল। এখন রাজাকে রেঁধে খাওয়াবার সরঞ্জাম আনতে ছোটে। খিদেয় পেট টিপে ধরে, নানারকম খাবারের মোট বয়ে আনে। চাল, ডাল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস, দৈ, মিষ্টি। এমনকি চিড়ে-গুড়ও আনে। তারা রান্না চড়াবার আয়োজন করে।

সেনাপতি বলে, "আহা বেলা পড়ে যাচ্ছে। তোমরা কিছু জলটল খেয়ে নাও। রাজার পেসাদ করে দোষ কেটে দি। রাজা চিড়ে-দৈ ভালবাসে।" দোষগুণের আর বিচার নেই। ওরা এখন যা পায় তাই খায়। মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটালও তাই চায়। প্রজাদের আনা দৈ-এর ভাঁড়ে তারা আচ্ছা করে তেঁতুল লঙ্কা আর নুন মেশায়,—গুড়ে নিমের গোটা। ডঙ্কা মেরে তাদের কলার পাতায় চিড়ে দৈ এর ফলার করতে বসায়। কিন্তু এক গ্রাস খেয়ে তারা জিভ টানে আর ওয়াক্ ওয়াক্ করে। অথচ রাজার প্রসাদ ওগ্রাতেও পারে না!

মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল বলে, "আহা হাত গুটিও না। তোমরা এনেছিলে। রাজার পেসাদ করা হয়েছে। তা দিয়েই জল খেয়ে নাও। তারপর রাজবাড়ীর খাবার খাবে।"

খাওয়া মাথায় থাক! যে টক, তেতো, ঝাল আর নুন খেয়েছে, তার অনেক গুণ। পেটের মধ্যে যেন বোল্‌তা গুন্‌গুন্ করে হুল ফোটাচ্ছিল। "খুব খেয়েছি," বলে মুখ ধোবার নামে তারা সেই যে গেল আর ফিরল না! এদের শঙ্কা কাটল। তখন তাদের আনা জিনিসপত্তর মহারাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটালের ভাঁড়ারে উঠল। কতক দিয়ে খাবার বানিয়ে তারা খেল। ভুঁড়ি বানিয়ে তুড়ি দিল।

মন্ত্রী, সেনাপতি, আর কেটালের কেরামতি কম নয়। তারা প্রজাদের ভানুমতির খেলা দেখিয়ে ভাগিয়েছে। মহারাজা তাদের ডেকে বলে, "হাঁ কর।" আর তাদের মুখে তামাকের ধোঁয়া ছোঁড়ে। তা তাঁর মান রাখার পুরস্কার!

(৪)

মহারাজার বয়স হলেও চেহারায় চেক্‌নাই ছিল। সেজেগুজে গোঁফে আতর মেখে রাজসভায় যখন বসে, পাত্রমিত্ররা ডগমগ হয়। নহবৎ বাজে, নকিব চোঙা ফোঁকে। অর্থাৎ শুধু জয় নয়, শ্রীযুক্ত মহারাজার জয়। পশুর মধ্যে পশুরাজ, পাখীর মধ্যে বাজ, ঢোলের

মধ্যে পাখোয়াজ, তারের মধ্যে এস্রাজ, আর খোশবুঁর মধ্যে পিঁয়াজ,—জয়, জয়!

জয়ধ্বনি শুনে মহারাজার মনে ভয়ডর থাকে না। সভা-ঘরে হাতির মত দোর জানালা। বাইরে বড় বড় কলা আর পেয়ারা গাছ। বানরের পেয়ারের খাদ্য। একটা গোদা বানর নিত্য এসে খায়। আর খেতে খেতে রাজসভা চেয়ে দেখে। তার কিষ্কিন্ধ্যায় বাড়ী। পূর্বপুরুষ বালি আর সুগ্রীব রাজা ছিল। সিংহাসনে বসত। সে অমন বংশের ছেলে। তার ইচ্ছা হ'ল একদিন মহারাজার সিংহাসনে বসবে।

সে ফাঁক খোঁজে। নিরালায় উঁকিঝুঁকি মারে। কেউ কোথাও নেই। তখন রাজসভা শূন্য। তার মনে পড়ে, হনুমান একলাফে সমুদ্র ডিঙিয়েছিল, আর সে ঝাঁপ দিয়ে সিংহাসনে বসতে পারবে না! দে লাফ। কিন্তু তালগাছে ওঠা তার পক্ষে যত সোজা, তাল রাখা ততো নয়। সে সিংহাসন নিয়ে ছিট্‌কে পড়ল ক'হাত দূরে। সে লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল না, ভেংচি কাটল। তারপর বাপ বলে তার গাছের সিংহাসনে ফিরে গেল।

সভা-ঘর ঝাড়পোছ করতে এসে জমাদার সিংহাসন জায়গা মত বসিয়ে গেল। তা নিয়ে সোরগোল করল না। কিন্তু এটা মহারাজার পূর্বপুরুষের পুরানো সিংহাসন। তা নাড়াচাড়া করার নিয়ম নেই। তাই মেরামত হয় না। নড়বড়ে হয়ে আছে। তাতে আছাড়! আসনের তলার ক'টা পেরেক দাঁত বার করল। এ খবর মহারাজা জানে না। নিত্যকার মত বসল। তাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আজকের তামাকের গন্ধে পাঙ্খাদারের ঘুম পেল। সে মস্তবড় পাখা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে দোলাতে লাগল। কখন তা ঠকাস্ করে লাগল কল্‌কের গায়ে। তাতে গনগনে টিকার আগুন। একটা জ্বলন্ত টিকা পড়ল গিয়ে মহারাজার ঘাড়ে। আর 'বাবারে' বলে মহারাজা দিল লাফ। কিন্তু লাফ দিলেই তো আর শূন্যে থাকা যায় না। বরং জোর্‌সে নাবতে হয় নিচে। মহারাজা যেখানটায় বসল, সেখানে পেরেক দাঁত বার করেছিল। দিলো মহারাজার পেছনে আচ্ছা করে খোঁচা! বোচা পেরেকের ঠাট্টা নয়, চোখা পেরেকের চাঁছা-ছোলা গাঁট্টা!

মহারাজা গলা ছেড়ে চেঁচাল, "মেরে ফেললে! দেখ দেখি কী ওটা?" যার এট্টুখানি ইশারায় একটা রাজ্য চিৎপাত হতে পারে, তার গলায় হাঁড়িচাচার চিৎকার!

মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল হাতিয়ার বার করে। বলে, "শত্রু কিধার (কোথায়)?"

মহারাজা বলে, "ইধার (এখানে)। আমাকে শূলে চড়াল!"

সেনাপতি বলে, "শূলে! কোন শূওরের এমন সাহস?"

মন্ত্রী বলে, "নিশ্চয় গুপ্তচর আড়াল দিয়ে রয়েছে।"

কোটাল বলে, "সিংহাসনের তলায় আছে। পাকড়ো—"

তারা তিনজনে সিংহাসনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয়। রোগা মন্ত্রীর লম্বা নাক; আর সিংহাসনের তলায় ছিল একটা বোল্‌তার চাক। মন্ত্রী সেখানে নাক গলাতে বোলতা দিল কুট্টুস করে কামড়। আর তা ফুলে ঢাক হ'ল! মন্ত্রী চেঁচিয়ে মাথার চাড়া দিয়ে নাক বাইরে আনতে চেষ্টা করে। সিংহাসন খানিক উপরে ওঠে, তাতে পেরেকের খোঁচা রাজার পেছনে বেশী লাগে। রাজা আরও চেঁচায়, "মহাশূল!"

ওরা অবশেষে টের পায়, আসলে তা শূলই নয়। পেরেক আর বোলতার হুল। কোটাল চাক গুঁতিয়ে ভাঙে, আর রাজা চোখে সেনাপতি হুঙ্কার ছেড়ে বলে, "সিংহাসনে পেরেক বেরোয় কেন? কোটাল, কারিগরকে ধরে আন।"

মহারাজা বলে, "আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার সিংহাসন। মাকড়দা'র কারিগরের তৈরী। সে মরে ভূত হয়েছে।"

কিন্তু কুস্তি লড়ে ভূতকে তো কাত করা যায় না! অগত্যা কোটাল ডাণ্ডা ঠুকে পেরেক ঠাণ্ডা করে।

মহারাজা এবার জাঁক করে সিংহাসনে বসে। মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটালের মুখে তামাকের ধোঁয়া পুরস্কার দেয়।...

আবার দিন যায়, রাত আসে, রাত যায় দিন আসে।—

একদিন মন্ত্রী উঠে দু'হাতে দাড়ি চুলকায়।

মহারাজা জিজ্ঞেস করল, "কি হ'ল? ছারপোকা না শুঁয়ো পোকা?"

মন্ত্রী বলে, "তা নয়, মহারাজা। ধোঁকা লাগানো কথা।"

মহারাজা বলে, "নির্ভয়ে বল।"

মন্ত্রী মুখ এদিকে নেয়, ওদিকে নেয়। তারপর বলে, "লজ্জা করে মহারাজ।"

মহারাজা বলে, "তা হলে পাগড়ীর লেজে মুখ ঢেকে বল।"

মন্ত্রী মুখ ঢেকে বলে, "অ্যাদ্দিন আঁটকুড়ো ছিলেন মহারাজ। সে বদনাম বোধকরি পালটাবে!"

মহারাজা বলে, "বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা করে মা ষষ্ঠীর পুজোআচ্চা করেছিলে বুঝি?

মন্ত্রী বলে, "আমি করিনি। তিনি, অর্থাৎ মন্ত্রিনী করেছিলেন।" ইতিমধ্যে সেনাপতি গোঁফ মুচড়ে বলে, "আমারও হয়ত মহারাজা—"

কোটাল গালপাট্টা হাতড়ে বলে, "ওদের দেখাদেখি আমারও মহারাজা।"

মহারাজা মুখের সামনে তিনটা তুড়ি দেয়। তারা বোঝে তিনজনের খবরে মহারাজা বেজায় খুসী হয়েছে।

মহারাজা তাদের ডেকে বলে, "তোমরা তিনজন কাছে এসে হাঁ করে দাঁড়াও।" আর মহারাজা তামাকের ধোঁয়া তাদের মুখে দেয়। তারপর হেঁকে বলে, "বাস্তুকর, বাজাও।"

মন্ত্রী বলে, "কিন্তু যদি মেয়ে হয়?"

এ রাজ্যের নিয়ম ছেলে হলে বাজনা বাজায়, আর মেয়ে হলে সজনে ডাঁটা চিবোয়। তবে মহারাজ ও সভাষদের কথা আলাদা। তারা প্রজা থেকে খাজনা আদায় করে!

মহারাজ তিন মিনিট চোখ বুজে থাকে। তারপর বলে, "তোমরা দাঁত বার করো দেখি।"

তারা বার করে। মহারাজা তাদের দাঁতে তিনটে করে টোকা দেয়, আর কান পেতে শোনে। তারপর বলে, "ছেলে হবে।"

সভাষদরা জয়ধ্বনি করে, "জয় মহারাজের জয়।"

(ক্রমশ:)

ছড়া

শ্রীরথীন সরকার

[১]

পেয়ারা তলায় ঝিঁঝি ডাকে
পুকুর পাড়ে ব্যাঙ,
তা ধিনা ধিন নাচতে গিয়ে
হাতি ভাঙলো ঠ্যাং।
ঠ্যাং ভাঙলো হাতি—
ইঁদুর ছানার নাতি
হুলো বেড়াল দেখে দিলো
বেজায় রকম ল্যাং।

[২]

ছুট্ ছুট্ ছুট্ ছুট্—
শব্দ হলো খুট্।
কাঠবিড়ালী পুকুর পাড়ে গিয়ে
ফড়িং মাসীর বিয়ে দিলো উলুধ্বনি দিয়ে।
তাই না দেখে হুতোম পেঁচার
সেকি ভীষণ হাসি,
কাশতে গিয়ে অক্কা পেলো
রাম ছাগলের মাসী।

(নেফার সিংফো আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত উপাখ্যান)

একই দিনে সাত রাণীর সাতটি ছেলে হ'ল। কিন্তু কি সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। ছোটরাণীর ছেলেটির মুখখানা মানুষের মুখের মতো হলে কি হবে, শরীরটা তার হুবহু কাছিমের মতো। রাণী আদর করে ছেলের নাম রাখলেন কাছিমকুমার। কুমারের ছিরি দেখেই কিন্তু রাজার পিত্তি জ্বলে উঠল। রেগে আগুন হয়ে ছোটরাণীকে তিনি রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। রাজধানীর বাইরে জঙ্গলের ভেতর তাঁর জন্যে তৈরী হ'ল একটি কুঁড়েঘর। সেই নিরালা কুটীরে ভিখারিনীর মতো বাস করতে লাগলেন ছোটরাণী তার আদরের কাছিমকুমারকে নিয়ে।

দিনে দিনে বাড়তে থাকে কাছিমকুমার। কি অপরূপ তার মুখশ্রী—তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু একটু ভয় পেয়েছে কি তাড়া খেয়েছে, অমনি মুখখানা গুটিয়ে নেয় খোলের ভেতরে, আর মনে হয় পূর্ণিমার চাঁদকে গিলে ফেলছে যেন রাহু। একেবারে নট-নড়ন-চড়ন হয়ে কাছিমকুমার পড়ে থাকে মাটির 'পরে।

যথাসময়ে কথা ফোটে কাছিমকুমারের মুখে। সব কিছুই বুঝতে পারে সে। মা তাকে সকালবেলা উঠোনে রোদে ফেলে রেখে ঘর-সংসারের কাজকর্ম করেন, আর কাছিমকুমার অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে বনের প্রান্ত দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীটির দিকে। ঐ নদীর ঠাণ্ডা জলে ডুব দেবার জন্যে কি যেন ছটফটানি শুরু হয় তার—জলের ডাক যেন সে শুনতে পায়।

বাড়িতে ফিরে এসে দিনকতক খুব মন-মরা হয়ে রইল কাছিমকুমার। নদী আবার তার মনকে টানতে লাগল অগণিত তরঙ্গ-বাহু বিস্তার করে। ক্রমে ক্রমে অবশ্য ঘরের মায়ের স্নেহে নদী-মায়ের উপর তার আকর্ষণ কমে এল।

কিছুকাল পরে রাজ্যময় সাড়া পড়ে গেল যে, একই সঙ্গে ছয় রাজকুমারের বিয়ের আয়োজনে মেতে উঠেছেন রাজা। শুনে কাছিমকুমারের মনেও বিয়ে করবার সাধ জাগল। সে মাকে বলল, "মা, দাদারা সবাই বিয়ে করছে। আমাকেও একটি বৌ এনে দাও না, মা।" মা তো শুনে অবাক, কাছিমকুমারের পিঠের খোলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "তুমি হলে বাছা আধা-মানুষ, আধা-কাছিম। এখন তোমার বৌ হতে রাজী হবে এমন মেয়ে পাই কোথায় বলো দেখি!"

ধারালো নখগুলো দিয়ে মায়ের পায়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে কাছিমকুমার বলতে লাগল, "শোন মা, তবে আসল কথাটা। বাণিজ্য করতে গিয়ে কিছুদিন যে আমি জলে বাস করেছিলাম তা তো তোমাকে বলেছি। তখন একদিন ইন্দু গাঁয়ের কাছে জল থেকে নদীর তীরে উঠে রোদ পোয়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি কি, ঐ গাঁয়ের রাজার মেয়ে কিংকরীকে নিয়ে তার দাসীরা নাইতে এসেছে নদীতে। আমি তখখুনি জলে নেমে অনতিদূরে মণি-বাঁধানো ঘাটের একেবারে শেষ ধাপটিতে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। রাজকন্যা তো নদীর ঘাটে বসল জলে পা ডুবিয়ে, আর আমি করলাম কি ধীরে ধীরে ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠে, খুব আস্তে আস্তে তার পা কামড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার সে কি আকাশ-ফাটানো চীৎকার। রাজকন্যা কিংকরী পড়ি-তো-মরি করে দে ছুট। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল। ঘাটের উপরে উঠে আমি মুখ বাড়িয়ে হো হো করে হাসতে লাগলাম। সেই হাসির শব্দ শুনে একবার পেছন ফিরে তাকাল রাজকন্যা আর তার দাসী। তারপর দুটিতে ছুটতে লাগল আরো জোরে।

এই পর্যন্ত বলে থামল কাছিমকুমার এবং খুব একচোট হেসে নিল। তারপর বললে, "ঘটনাটা বলেছিলাম আমার নদী-মাকে।" নদী-মা বললে, "গাঁয়ে ফিরে তোমার ঘরের মাকে বলো, এই রাজকন্যার সঙ্গে সে যেন তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করে। রাজা যদি রাজী হয় তা' হলে বিয়ের দিন তোমার মা যেন তোমাদের গাঁয়ের তুকতাক-জানা বুড়ীটাকে একটা ঘড়া নিয়ে পাঠিয়ে দেয় আমার ঘাটে। ঘড়া ভর্তি করে জল নিয়ে যাবে সে, আর বিয়ের আসরে মন্ত্র পড়ে ঐ জল ছিটিয়ে দেবে তোমার গায়ে; তা 'হলেই ঘটবে এক তাজ্জব ব্যাপার।" একটু চুপ করে থেকে কাছিমকুমার আবার বললে, "কি ব্যাপার ঘটবে তা অবশ্য বলেনি নদী-মা—কিন্তু আর দেরি নয়, তুমি এখখুনি একবার রাজবাড়ীতে যাও মা।"

ছেলের পীড়াপীড়িতে ছোটরাণী তখখুনি রাজবাড়ীতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাড়লেন। পাত্রের বর্ণনা শুনে হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারেন না রাজা। হঠাৎ একটু কৌতুক করবার বাসনা জাগল তাঁর মনে, বললেন, "বেশ, তোমার ছেলেকে আমি জামাই করতে রাজী আছি। কিন্তু আমার এক শর্ত আছে। আজ থেকে দু'দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার সূর্য উঠবার আগে তোমার ছেলেকে সোনা এবং মণিরত্ন দিয়ে একটি নৌকো তৈরী করে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসতে হবে। যদি পারে তা'হলে কথা দিচ্ছি, ওর সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে হবে।"

বাড়ী ফিরে এসে ছোটরাণী রাজার শর্তের কথাটা বললেন কাছিমকুমারকে।

এবার ছোটরাণীর চোখের সামনে ঘটল অঘটন। কাছিমকুমারের খোলের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল তাল তাল সোনা আর রাশি রাশি মণিরত্ন। তার কথামত মা ডেকে নিয়ে এলেন কারিগরকে। আগাগোড়া সোনা আর মণিরত্ন দিয়ে তৈরী হ'ল চোখ ঝলসানো চমৎকার এক নৌকা। সেই সোনার তরীতে কাছিমকুমারকে বসিয়ে কারিগর আর কয়েকজন লোক কাঁধে করে রওনা হ'ল। রাজপুরীতে এসে যখন পৌঁছল তারা, দ্বিতীয় দিনের সূর্য তখনো ওঠেনি আকাশে।

শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন রাজা। দেখলেন অপূর্ব দৃশ্য। উষাকালে ছড়ানো তরল সোনালী আলো জমাট বেঁধে যেন একটি স্বর্ণতরীর আকার ধারণ করেছে, কালো খোলের ভেতর থেকে রক্তগৌর মুখখানি ঊর্ধ্বে বাড়িয়ে নৌকার উপর বসে আছে কাছিমকুমার। মেঘের ঢাকনা খুলে তরুণ সূর্য যেন উদিত হয়েছে ভোরের আকাশে।

মহা সমারোহে কাছিমকুমারকে নিয়ে যাওয়া হ'ল রাজপুরীর অন্দরমহলে।

সন্ধ্যার পরে বিয়ের আসরে রূপবতী রাজকন্যার পাশে কাছিমকুমারকে দেখে সবাই বলাবলি করতে লাগল, "হায় হায়, শেষে এই ছিল রাজকন্যার অদৃষ্টে!"

হঠাৎ ঘড়াভর্তি জল নিয়ে বিবাহবাসরে এসে হাজির হ'ল গুমগাই—সেই গুণী বুড়ীটা। মন্ত্রপূত করে সবটা জল ছিটিয়ে দিল কাছিমকুমারের দেহে। তারপর…

আচমকা প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠল সবাই। তাদের চোখের সামনেই চৌচির হয়ে ফেটে গেল কাছিমের খোলটা আর সঙ্গে সঙ্গেই পুরো মানুষে রূপান্তরিত হ'ল কাছিমকুমার। রাজকন্যা দেখলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অপূর্বসুন্দর দিব্যকান্তি এক তরুণ রাজপুত্র। মুখখানি যেন তার পরিচিত। কবে কোথায় চকিতের জন্যে একবার এই সুকুমার মুখখানি দেখেছিলেন, তাই মনে মনে ভাবছিলেন রাজকন্যা। বাজনার আওয়াজে আর লোকজনের হৈ-হল্লায় সরগরম হয়ে উঠেছে তখন বিয়ের আসর।

আশানন্দ ঢেঁকি

শ্রীঅমরনাথ রায়

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা তার কিছুকাল আগেকার কথা। নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। আশানন্দ ছিলেন সরল প্রকৃতির সহৃদয় মানুষ। দেহে ছিল তাঁর অমিতশক্তি। বিপন্নকে উদ্ধারের জন্যে সর্বদা তিনি প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর অসাধারণ শক্তি ও বীরত্বের কাহিনী বাংলার ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করে। আজ সেই কাহিনীরই একটি তোমাদের শোনাব।

আশানন্দের আমলে বাংলা দেশে ডাকাতের বড় উৎপাত ছিল। সেকালে জেলার জমিদারদের কালেক্টরিতে রাজস্ব পাঠাতে হতো। কালেক্টরি থাকে জেলার সদর শহরে। গ্রাম থেকে অনেক দূরে। অনেক টাকা দূরে নিয়ে যেতে জমিদারেরা ভয় পেতেন। ভয়—পাছে ডাকাতের হাতে পড়তে হয়। তাই নদীয়া জেলার অনেক জমিদার টাকা জমা দিতে যাওয়ার সময় বীর আশানন্দকে সঙ্গে নিতেন।

একবার এক জমিদারের টাকা যাচ্ছে সদরে—কালেক্টরিতে। সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ আছে। আর আছেন আশানন্দ। পথে রাত্রি হলো। আশানন্দ পাইক বরকন্দাজদের নিয়ে গ্রামের এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। ডাকাতেরা তা জানতে পারল। জেনে সেই রাতেই সেই ধনী গৃহস্থের বাড়ী হঠাৎ আক্রমণ করল। আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর অতর্কিত বিপদ দেখে মহাবীর আশানন্দ তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু হাতের কাছে কিছুই পেলেন না। তিনি সোজা ছুটে গেলেন ঢেঁকিশালে। সেখান থেকে একটি প্রকাণ্ড ঢেঁকি উপড়ে নিয়ে এসে তিনি ডাকাতদের সম্মুখীন হলেন। সেই ঢেঁকির সাহায্যেই বীরবিক্রমে তিনি ডাকাতদের তাড়িয়ে দিলেন। আশানন্দের এই অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী তারপর লোকপরম্পরায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আশানন্দ সেই থেকে ঢেঁকি উপাধিতে ভূষিত হলেন।

শান্তিপুরবাসীরা মহাবীর আশানন্দকে ভোলেন নি। তাঁরা আশানন্দের বাড়ীর সামনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছেন। সেই স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে :

আশানন্দ—স্মৃতিস্তম্ভ

প্রতিষ্ঠাব্দ ১৩৩৯

দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
সুমহান ব্রত যাঁর ছিল এ জীবনে
মুখো-বংশে অবতীর্ণ আশানন্দ বীর,
ঢেঁকি নামে খ্যাত যিনি বক্ষে পৃথিবীর,
প্রবাদ হয়েছে এবে গরীমা যাঁহার,
তাঁহারি এ স্মৃতিস্তম্ভে কর নমস্কার।

নবাবী গল্প

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালে নবাবদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খামখেয়ালী, এক কথায় কাউকে বড়োলোক ক'রে দিতেন, আবার এক কথায় কারও মাথা নিতেন। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। সেই রকম দুটো গল্প আজ তোমাদের বলব।

(এক)

এদেশের লোকের একটা সংস্কার আছে, সকালবেলা ধোবার মুখ দেখলে নাকি দিন ভালো যায় না। এক মস্ত নবাব বাহাদুর একদিন নহবতের সুরে ঘুম ভাঙতেই জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন, দেখলেন নবাব মহলের সিংদরজার বাইরে বড়ো রাস্তা দিয়ে এক ধোবা তার গাধার পিঠে কাপড়ের মোট চাপিয়ে চলেছে। নবাবের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কি সর্বনাশ! সকালবেলা এত বড়ো অলক্ষণ!—"এই, কৌন হ্যায়?"

হাঁকে-ডাকে সেপাই শান্ত্রী ছুটে এল, ঘরে-বাইরে তলোয়ার ঝনঝন করে উঠল। নবাবের মুখ থেকে কথা খসতে-না-খসতে একশ' সেপাই ছুটে গিয়ে বেচারা ধোবাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। গাধাটাকেও বাঁধত, নেহাৎ সেটা ভয় পেয়ে পিঠের বস্তা ফেলে চার পা তুলে ছুট দেওয়ায় বেঁচে গেল।

ধোবা তো হতভম্ব। না-রাম-না-গঙ্গা, কিছুই জানে না; "কি কশুর হয়েছে, বলে ধরম-বাপ! কার'ও ক্ষেতে গাধা ছাড়িনি, কার'ও ঘরে আগুন দিইনি! কাচতে গিয়ে দু'খানা কাপড় কদাচিৎ পাঁচখানা হয়েছে, দু'চারখানা পুড়ে-ঝুড়ে হারিয়ে গেছে, তাই বুঝি কেউ দরবারে নালিশ করেছে। তা পেয়াদা পাঠিয়ে ডাকলেই কুর্নিশ করতে করতে হুজুরে হাজির হতুম, বাঁধবার কি দরকার ছিল?"

কোতোয়াল গোঁফে তা দিয়ে বললে, "সাতসকালে নবাব সাহেবকে মুখ দেখিয়েছিস, তাঁর দিনটা খারাপ ক'রে দিয়েছিস, আজ তোরই একদিন, কি আমাদেরই একদিন! আবার বলে কিনা, কি কশুর হয়েছে?"

পাইক পিয়াদা সেপাই শান্ত্রীর দল ধোবাকে মারের চোটে আধমরা ক'রে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নবাবসাহেবের সামনে এনে ধড়াস ক'রে ফেলে দিলে। দ্বিতীয়বার ধোবার মুখ দেখে নবাবের মেজাজ সপ্তমে চ'ড়ে গেল। চোখ লাল ক'রে বললেন, "গর্দান লেও।" ডাক ডাক, জল্লাদকে ডাক। লোক ছুটল।

ধোবা তখন মরিয়া। এদিকেও মরেছি, ও দিকেও মরেছি, দু'টো কথা শুনিয়েই মরি। গর্দান নেবার হুকুম দিয়ে নবাবের রাগটা পড়েছে, বাঁদীর হাতের রেকাবী থেকে কালাকান্দ

'পেস্তার সরবতে চুমুক দিচ্ছেন।'

একটা তুলে নিয়ে মুখে ফেলে পেস্তার সরবতে চুমুক দিচ্ছেন। ধোবা বললে, "গোস্তাকী মাফ হয়, মেহেরবান। জান তো গেছেই, তবে মরবার আগে একটা নালিস জানিয়ে যাব।" আস্পর্ধা কম নয়, ধর্মবতার প্রাণদণ্ড দিয়েছেন, তার পরেও নালিস! তবু প্রজার নালিস, শুনতে হয়।

"কি নালিস? নির্ভয়ে বলো।"

ধোবা বললে, "খোদাবন্দ, সকালবেলা আপনি আমার মুখ দেখে ভালোই আছেন মনে হচ্ছে। সেপাই শাস্ত্রী হুকুম তামিল করছে, কুর্শিতে ব'সে মিঠাই সরবৎ খাচ্ছেন। এদিকে সকালবেলা আপনার মুখ দেখে আমার অবস্থা দেখুন, হুজুর। বিনাদোষে অপমান হলুম, মার খেলুম এখন একটু পরেই 'জান' যাবে। কার মুখ দেখায় কতটা অলক্ষণ হয়, আপনিই বিচার করুন।"

ধোবার স্পর্ধা দেখে সভাসুদ্ধ লোক অবাক। কিছুক্ষণ রাগে, বিস্ময়ে, লজ্জায় নবাবের মুখেও কথা নেই। খানিক পরে তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, "ঠিক বাত। মেরা গলদ্ হো গয়া।"

নবাবসাহেবের হুকুমে ধোবার বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল, নাইয়ে-ধুইয়ে বাবুর্চির রান্না পোলাও, কোফতা, কোর্মা, কাবাব খাইয়ে, শরীরে জরির জোব্বা, মাথায় মখমলের তাজ চড়িয়ে, হাজার আশরফি পুরস্কার দিয়ে তাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। নবাবের খাস ব্যবহারের আরবী ঘোড়ায় চড়ে যেতে পাছে তার অসুবিধা হয়, তাই একজন সিপাই চলল তার লাগাম ধরে, আর একজন ধরল মাথায় ছাতা, আগে আগে 'আসাসোঁটা' নিয়ে আর দু'জন লোক চলল রাস্তা সাফ করতে করতে। ঘোড়াটা কিছুতেই কাপড়ের মোট বইতে রাজি না হওয়ায় ধোবা সাতদিন পরে সেটাকে বেচে দিয়েছিল এক 'ওমরাও'-এর কাছে, তাতেও

পাঁচশ আশরফি পেয়েছিল শোনা যায়। মোটের ওপর সকালবেলা নবাবের মুখ দেখার ফল তার ভালোই হয়েছিল দেখা যাচ্ছে—লোকসান নবাবেরই কিছু হ'ল।

(দুই)

আর এক নবাবের নামেও অনেক মজার গল্প আছে। তিনি আবার যে সে লোক নন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। গল্পটা বানানো না সত্যি, তা এখন বলা শক্ত।

শিয়া-মুসলমানদের মস্ত পরব মহরম, ইমামবাড়া থেকে হাতিঘোড়া নিয়ে হাজার হাজার লোকের শোভাযাত্রা বেরুবে। তেরোশ' বছর আগে এজিদের চক্রান্তে হজরত মহম্মদের দুই দৌহিত্র মারা গেছলেন একজন নিজের স্ত্রীর হাতে, আর একজন কারবালার মাঠে যুদ্ধ ক'রে; তাঁদের স্মৃতিতে প্রতি বৎসর এই শোকের উৎসব হয়। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে শোভাযাত্রার মধ্যে শতশত লোককে তখন 'হাসান, হোসেন, কারবালা' ব'লে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে যেতে হয়। নবাব সাহেবের হঠাৎ খেয়াল হ'ল তাঁর হিন্দু কর্মচারীদের সকলকে ঐ উৎসবে যোগ দিতে হবে, 'হাসান, হোসেন' বলে বুক চাপড়াতে হবে।

'হাসান, হোসেন' খুবই ভালো ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, তাঁদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে হিন্দুমাত্রই দুঃখিত, কিন্তু তা'বলে প্রকাশ্যে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের ধর্মাচরণে যোগ দেওয়াতে অনেকেরই আপত্তি দেখা গেল। "সে হয় না হুজুর, আপনি আমাদের মাফ করুন। আমাদের জাত যাবে, ধোবা, নাপিত বন্ধ হবে, মরলে পোড়াবার লোক মিলবে না, ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে না।" নবাব সাহেবের ওসবে কিছু আসে যায় না। "জাত গেলে মুসলমান করে নেব, আমীর ওমরার ঘরে শাদীর ব্যবস্থা করে দেব, নিজের লোক দিয়ে কবর দিইয়ে দেব। আমার হুকুম, প্রত্যেককে যেতে হবে কাল শোভাযাত্রার সঙ্গে।" সভা ভঙ্গ হ'ল, নবাব সকলকেই ছুটি দিলেন পরদিনের পর্ব উপলক্ষ্যে।

যথাসময়ে মহরমের শোভাযাত্রা বেরোল। নবাবের সন্দেহ ছিল, হিন্দুদের গোঁড়ামী যে রকম বেশী তাতে অনেকেই হয় তো তাঁর হুকুম মানবে না, চাকরী খোয়াবে, শাস্তি নেবে, তবু শোভাযাত্রায় যোগ দেবে না। তিনি যথাসময়ে রাজপ্রাসাদের ছাদে উঠলেন শোভাযাত্রা দেখতে। দেখলেন, তাঁর হিন্দু সভাসদেরা চলেছেন। তাঁদের হাতগুলি তালে তালে অন্য সবার সঙ্গে উঠছে-পড়ছে, মুখেও অন্য সকলের সঙ্গে শোকের গুঞ্জন সুর উঠছে। হুকুম প্রতিপালিত হয়েছে দেখে নবাব ভারী খুশি। পরদিন সভা আরম্ভ হতেই তিনি হিন্দু সভাসদদের ডেকে বললেন, "আপনারা কাল আমাদের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন

আমার কথায়, এতে আমি ভারী খুশি হয়েছি। সবাই 'হাসান, হোসেন' বলে খুব বুক চাপড়াচ্ছিলেন, তাও দেখেছি।"

সভাসদ্দের মধ্যে একজন সাহসী মুখফোঁড় লোক ছিলেন; তিনি বললেন, "নবাব-সাহেব, আপনার দেখতে এবং শুনতে কিছু ভুল হয়েছে।"

"কি রকম?"

সভাসদ বললেন, "অপরাধ নেবেন না। আমরা পেটের দায়ে চাকরি করি আপনার কাছে, পেটের দায়েই আপনার হুকুম তামিল করতে গেছলুম। আমরা নিজেদের ধর্মের কাছে এবং সমাজের কাছে পাছে অপরাধী হই—সে ভয়ও ছিল, অথচ আপনার কথা অগ্রাহ্য করবার সাহসও হচ্ছিল না। সুতরাং মনের দুঃখে পেট চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিলুম, 'যখন যেমন, তখন তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন।" আমরা আস্তে আস্তে 'গোলে-হরিবোল' দেওয়ায় মুসলমান ভাইসাহেবেরা ভেবেছেন, আমরা বুঝি "হাসান হোসেন" বলছি। এখন সত্যি কথা স্বীকার করলুম, আপনার যা ধর্মে হয় করুন।"

নবাব সাহেবের ধর্ম বোধ ছিল, তিনি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, "যাও, এবারকার মতো তোমাদের মাফ করা গেল। তারপর আর কোন দিনও তিনি হিন্দুদের মহরমে যোগ দেবার জন্ত জবরদস্তি করেন নি।"

ঘুম

শ্রীগোপাল ভৌমিক

কি ঘুম ঘুমোতে পারে আমাদের কাকা
দেখ যদি চোখটাই হয়ে যাবে বাঁকা।
বিছানাটা করা যদি থাকে ঠিক খাসা
থাকে না কাকুর বড় জাগবার আশা।
চা খাবার সব কিছু চলে শুয়ে শুয়ে
পড়েন যদিও ঘুমে বার বার নুয়ে।

অফিসের বেলা হলে উঠে ঘুম চোখে
ভাত খান নাকে মুখে যেন কোন্ ঝোঁকে
অফিসে করেন কি যে নাই সেটা জানা
ঘুমিয়ে করেন কাজ ভাবতে কি মানা!
বাড়িতে ফিরেই যান বিছানায় সোজা
খোলার সময় কই জামা জুতো মোজা।

তারপর রাতভোর ঘুমে নাক ডাকে—
কার ঘাড়ে ক'টা মাথা জাগাবে যে তাঁকে!

এবারের (১৯৬৭) 'মৌচাক পুরস্কার' লাভ করেন অন্নদাশঙ্কর রায়। এখানের ছবিতে কলিকাতা ইনফরমেসন সেন্টারে নববর্ষের এক সাহিত্য-সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁকে পুরস্কার নিতে দেখা যাচ্ছে। ছবিতে আরও আছেন ডান দিক থেকে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ। সুনীতিকুমার ও অন্নদাশঙ্করের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় সরকার।

অন্নদাশঙ্কর ঃ জীবনশিল্পী

শ্রীসুকুমার বিশ্বাস

অভাবের ত্রাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এক নিশ্চিন্ত স্বচ্ছল জীবন অন্নদাশঙ্করের। বোধ করি বৈচিত্র্যহীনও। উড়িষ্যার ঢেঙ্কানল রাজ্যে ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শ্রীনিমাই রায় ছিলেন সে রাজ্যের দেওয়ান। শিক্ষা গ্রহণ করেছেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডনে। কর্মজীবনে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল অবধি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। সে সময় বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীরূপে তিনি চাকুরীজীবন থেকে সাহিত্য সেবার জন্য অবসর গ্রহণের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫১ সালে। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল অবধি তিনি সাহিত্য একাডেমীর সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭-য় তিনি জাপানে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. কংগ্রেসে ভারতীয় দলের সদস্য

হয়ে। ফিরে এসে লেখেন 'জাপানে'। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল, এই তিন বছরের মধ্যে লিখিত অসাধারণ সাহিত্য গুণসম্পন্ন বই হিসাবে 'জাপানে' ১৯৬২ সালের সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার পায়। জাপান থেকে ফিরে আসার পর, তিনি ওয়েষ্ট জার্মান গভর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে ঐ দেশে যান এবং ওখান থেকে ফিরে এসে 'ফেরা' নামে আর একখানি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করেন।

তাঁর ভাষায়, "বছর ষোলো যখন আমার বয়স, তখন আমার হাতে এলো টলস্টয়ের ছোটগল্পের বই। যার ইংরেজী নাম, 'টোয়েন্‌টি থ্রী টেল্‌স্'। বইখানি আমি পুরস্কার পেয়েছিলুম, সেই জন্য আমার চোখে তার এত দাম। তার একটি গল্পের বংলা অনুবাদ করে সেই বয়সেই 'প্রবাসী'-তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট-কার্ড আসে। মঞ্জুর! তার পরের সংখ্যাতেই ছাপা হয়। তাজ্জব!"

সাহিত্যে সেই প্রথম প্রবেশ। সেদিনের সেই কিশোরকে বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ছেড়ে দিয়ে চারুবাবু যে গতি সঞ্চারিত করেছিলেন, সে গতি আজও অব্যাহত। বিরামহীন।

অন্নদাশঙ্করের দ্বিতীয় রচনা একটি কবিতা প্রকাশিত হয় 'মৌচাক'-এ। অবশ্য রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর এক আত্মীয়ার নামে।

আত্মীয়ার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। সেখানে গিয়ে দেখেন 'মৌচাকে'র একটি সংখ্যা ওবাড়ীতেই রয়েছে। সে সংখ্যায় একটি রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা নেই অন্নদাশঙ্করের। বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে। কি আর করেন। একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। যে আত্মীয়ার বাড়ী অতিথি হয়েছেন, তাঁর নামে। যথাসময়ে সেটি ছাপা হ'ল।

অন্নদাশঙ্কর বললেন, "'মৌচাকে'র সঙ্গে কি আমার আজকের সম্পর্ক! 'মৌচাকে'র প্রথম দুটো সংখ্যা আজও আমার চোখে ভাসছে। প্রথম সংখ্যায় ছিল নরেন দেবের একটা ধাঁধা। 'বাদশা বেগম'—ইত্যাদি।"

১৯২৭ সাল। অন্নদাশঙ্কর তখন লণ্ডনে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদানের জন্য তালিম নিচ্ছেন। লণ্ডনে যাবার সময় জাহাজ থেকেই লেখা শুরু করেন 'পথে প্রবাসে'। 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হয়।

'মৌচাক' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্র সরকারের চিঠি অন্নদাশঙ্করকে ধাওয়া করল সেই সুদূর লণ্ডনে। 'মৌচাকে'র জন্য লেখা চাই। লিখতে শুরু করলেন 'ইওরোপের চিঠি'। ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হতে লাগল 'মৌচাকে'।

'মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্র কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন সংস্থা এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স-এর স্বত্বাধিকারী। লেখকের এলেম বুঝতে মোটেই তাঁর দেরি হয়নি। আজকের বাংলা সাহিত্যের বহু রথী-মহারথীর প্রথম বই প্রকাশ করার ব্যবসায়িক দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'নারীর মূল্য' ছেপেছেন। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি বহু অধুনাখ্যাত লেখকের প্রথম বই প্রকাশ করে নিজের দূরদৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এবং এখনও দিচ্ছেন।

সুধীরচন্দ্রের সেই দূরদৃষ্টির সীমানার মধ্যে পড়ে গেলেন অন্নদাশঙ্কর। আবার চিঠি গেল, 'মৌচাকে' লিখতে থাকুন, কিন্তু অন্য লেখা পাঠান। পুস্তকাকারে প্রকাশ করব। সেই দূর দেশ থেকে অন্নদাশঙ্কর পাণ্ডুলিপি পাঠালেন। প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল তাঁর রচনা 'তারুণ্য'। হৈ চৈ পড়ে গেল। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি বাঙ্গালী পাঠককে ভাবিয়ে তুলল। নিজের ধ্যান-ধারণা পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে প্রায় এক বিপ্লব ঘটালেন অন্নদাশঙ্কর।

আর তার ঢেউ মিলিয়ে যাবার আগেই প্রকাশিত হ'ল পুস্তকাকারে 'পথে প্রবাসে'। লেখক অন্নদাশঙ্কর। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র। আর একবার চমক খেল বাঙ্গালী পাঠক। বাংলা সাহিত্যের মূল ধরে যেন নাড়া দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। এমন করে লেখা যায় নাকি কোন দেশ-ভ্রমণের কাহিনী!

অন্নদাশঙ্করের ভাষায়, "সেই আমার উপনয়ন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখলেন ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ বললেন তুমি এর ইংরেজী অনুবাদ করে ছাপাও না কেন'?"

অন্নদাশঙ্করকে বললাম, "'মৌচাক' পুরস্কার নিতে রাজী হলেন কেন আপনি?"

বললেন, "সুধীরবাবুর কথা ঠেলতে পারি, এত মনের জোর আমার নেই। ওঁর কাছে যে আমি কত কৃতজ্ঞ তা তোমরা বুঝবে না। 'মৌচাকে'র সঙ্গে কি আমার আজকের সম্পর্ক! চল্লিশ বছরেরও বেশী হয়ে গেল। 'ইওরোপের চিঠি' শেষ হলো। দেশে ফিরলাম। ১৯২৯ সাল থেকে 'মৌচাকে' প্রকাশিত হতে লাগল আমার 'পাহাড়ী'। ছোটদের উপন্যাস। এর মধ্যে কোন সময় লিখেছি 'ছাগ-চরিত', কোন সময় বা লণ্ডনের কুয়াশা নিয়ে কবিতা। তারও পরে আজ অবধি কত অজস্র গল্প, কবিতা, ছড়া যে 'মৌচাকে' লিখেছি তার হিসেব নেই।" আজও লিখছেন।

'মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্রের সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের সম্পর্ক শুধু সম্পাদক-লেখক বা প্রকাশক-লেখকের বৈষয়িক সম্পর্ক নয়। আরও গভীর ব্যক্তিগত স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধায় মেশানো

সে এক মধুর সম্পর্ক! একের অনুপস্থিতিতে অন্যের প্রসঙ্গে এঁরা দুজনেই যখন কথা বলেন, তখন যে কেউ বুঝবেন একজনের সম্বন্ধে আরেকজন কি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন। এই দুটি পরিবারের নিবিড় ঘনিষ্ঠতাও পরিচিতজনের অজানা নয়। অন্নদাশঙ্করের বিদেশিনী স্ত্রী শ্রীমতী রায়ের একটি মন্তব্যই আমার বক্তব্যকে পরিষ্কার করে দেবে। "আমার বিয়ের পর সুধীরবাবুর স্ত্রী আমাকে ঠিক শাশুড়ীর স্নেহে আদর-আপ্যায়ন করেছেন। আমাকে আগলে রেখেছেন। তাঁর স্নেহ কি কোন দিন ভুলতে পারি! সব সময় আমার তাঁর কথা মনে হয়।"

বড়দের জন্য অনেক গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর। প্রত্যেকটির মধ্যেই নতুন চিন্তার খোরাক আছে, যা মানুষকে আনন্দদানের সঙ্গে ভাবায় ও নতুন পথের সন্ধান দেয়।

তোমাদের মত ছোটদের জন্য উপন্যাস ও ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়াও তিনি ছড়া লিখেছেন অজস্র। 'ডালিম গাছের মৌ' আর 'রাঙা ধানের খই' যারা পড়েছে তারাই জানে, তাঁর লেখা প্রতিটি ছড়া সাহিত্যের এক-একটি মণি-রত্ন বিশেষ এবং প্রতিটিই একটি বিশেষ বক্তব্যকে বহন করে। কখনও রূপকের সাহায্যে, কখনও বা অন্য কোন শৈলীর সাহায্যে শিশু-হৃদয়ে তা সরাসরি প্রতিফলিত হয়।

শেষ কথা লিখিতে বসিনি। এখনও তো লিখছেন উনি। ভাবীকাল বিচার করবে তাঁর সমূহ সৃষ্টির।

আপাতত:

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

অনিত্য এই জীবনটা যে,—সময় কেটে যাচ্ছে হু হু,
কি যে করি, কখন করি, ভাবছি বসে মুহুর্মুহুঃ।
ইচ্ছে, লিখি মস্ত কেতাব ঝলমলানো জ্যাকেট মোড়া,
সুস্থিরে না বসতে, দেখি, দিন ছুটেছে টাট্টু ঘোড়া।
সব তারকা হয়নি গোণা, এভারেষ্টে চড়াও বাকি,
সময়টা কি দিচ্ছে সুযোগ নায়লেকারের ধরতে ফাঁকি!
ঘড়ির কাঁটা টিক টিক টিক—এক নাগাড়ে যায় কি ছোটা!
কখন বা ভেদ করবো তবে প্যাসিফিকের রহস্যটা?
ভঙ্গুরতা, অনিত্যতা সব জিনিসে রয়েছে হায়,
খেলেই রসগোল্লাগুলো, কি বিচ্ছিরি ফুরিয়ে যায়!
দাসের কাছে নিলাম টাকা হপ্তাখানের কড়ার করে,
হুস্ করে দিন পেরিয়ে গেল, ঐ তাগাদায় আসছে হরে।
এক শত আটষট্টি ঘণ্টা এরি মধ্যে কখন গত,
অনিত্য এই জীবন নিয়ে লুকোতে যাই আপাততঃ।

জীবজন্তু পোষার বিচিত্র সখ

শ্রী [illegible]ন্তি মুখোপাধ্যায়

জওহরলাল, অষ্টম হেনরী ও স্যামুয়েল জনসনের জন্তু পোষার ছবি।

অনেক সখের মধ্যে জীবজন্তু পোষার সখ মানুষের চিরদিনের। সারা বিশ্বের লোকের মধ্যেই কি প্রাচীন কালে, কি আধুনিককালে এই সখ দেখা যায়। আর সেসব জীবজন্তু কুকুর, বেড়াল, খরগোশ বা পাখীই শুধু নয়, বিচিত্র রকমের জানোয়ারও আছে তাদের মধ্যে।

আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল পাণ্ডা নামে একরকম জন্তু পুষতে ভালবাসতেন। আবিসিনীয়ার রাজা হাইলেসেলাসির একজোড়া চিতাবাঘ ছিল ভারী আদরের। ছিল কেন, এখনও আছে। তাদের নিয়ে তাঁর আদিখ্যে-তার আর শেষ নেই! বাইরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা রাজা-রাজড়ারা তাঁর কাছে গেলে, আগে সে দুটিকে দেখতে হবে তাঁদের। ভাগ্যবান এই দুটি চিতার খাবার, শোবার, বেড়াবার, চান করবার সে কি বিরাট আয়োজন! রাজা-রাজড়ার ব্যাপার তো!

শুধু পণ্ডিতজী বা হাইলেসেলাসির ব্যাপার নয়, অতীত প্রাচীনকালের দিকে যদি তাকাও, তাহলে এমন অনেক নিদর্শন পাবে এবং জেনে মজাই লাগবে তোমাদের। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী বাজপাখী পুষতে ভাল-বাসতেন। এই বাজপাখীকে হাতে বসিয়ে রাজসভাতেও তিনি আসতেন এবং হেতা-হোতা ঘুরেও বেড়াতেন তাকে হাতে নিয়ে। স্যাকসনদের সময় থেকেই এই বাজপাখী পোষার সখ ছিল ইংলণ্ডের রাজা-রাজড়াদের মধ্যে। তাদের দিয়ে শিকার করাতেন অনেকে এবং শিকারের সময় ছাড়া অধিকাংশ সময় ঐ শিকারী বাজের চোখ দুটো ঢেকে রাখতেন তাঁরা ঠুলি দিয়ে।

ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের ছিল বেড়ালের সখ। বেড়ালের বাচ্চা হবে তো তার জন্যে তাঁর আহার-নিদ্রা ত্যাগ; বেড়ালের অসুখ করেছে তো সারা রাত্রি তার জন্যে

জেগে আছেন ; নিজের খাবার থেকে তুলে মাছ বা আমিষ জাতীয় খাদ্য তাকে খাওয়াচ্ছেন। তাছাড়া তাঁর বেড়ালের আদর কি ! ভাল সাটিনের জামা, ভাল রঙিন রীবন, গদির বিছানা প্রভৃতির ব্যবস্থা।

আমাদের দেশেও বেড়ালের সখ আছে অনেকের, বেড়ালের বিয়েও দেয় কেউ কেউ ঘটা করে, কিন্তু যত্ন জানে না বেশীরভাগ লোকই। বেড়ালগুলো হয় ছাইগাদায় গিয়ে লুটোপুটি খায়, আর পেট ভরায় চুরি-চামারি করে খেয়ে—এ বাড়ি সে-বাড়ির আঁস্তাকুড়ে কাঁটা-পোটা চিবিয়ে।

ইজিপ্টে এক সময় বেড়ালের ভীষণ সমাদর ছিল এবং অনেকে বলেন, সারা বিশ্বে ইজিপ্ট থেকেই বেড়ালরা গৃহপালিত পশু হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে মিশরে বেড়ালের নাম ছিল 'মিঙ'। ইজিপ্ট-এর মন্দিরে ও উপাসনাগৃহে শত শত বেড়াল ঘুরে বেড়াত এবং তারা অবধ্য ও মঙ্গলের চিহ্ন হিসাবে পুরোহিতদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেত। পারস্যের বেড়াল সারা পৃথিবীতে বহু ধনী লোক পুষে থাকে যত্নসহকারে এবং তার জন্য গৌরব অনুভব করে।

ভাল কুকুর পোষা তো বিশেষ মর্যাদার লক্ষণ। অত্যন্ত সাধারণ রাস্তার ভিখারী, সন্ন্যাসী থেকে ধনী মর্যাদাসম্পন্ন লোক, রাজা-মহারাজা অনেকেই বাড়িতে কুকুর পুষে থাকেন। অবশ্য

বেড়াল, কুকুর ও বানর প্রভৃতি পোষার প্রাচীন কয়েকটি ছবি।

অন্যান্য অনেক জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে কুকুর নিঃসন্দেহে মানুষের উপকারী বন্ধু। সেই জন্য অতীতকাল থেকে কুকুর মানুষের ঘরে সমাদর পেয়ে আসছে। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাবার সময়ও কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। বিদেশে কুকুরের অসাধারণ প্রভুভক্তি, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য বহু ষ্ট্যাচু তৈরি হয়েছে। কবি বায়রণ তাঁর প্রিয় কুকুরকে তাঁর সঙ্গে কবর দেবার জন্যে লিখে গিয়েছিলেন। রোম, গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে

কুকুর দ্বারপাল হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত এবং সে সময়কার রাজ-পরিবারের অন্তঃপুরেও সমাদর পেত।

বিশেষ বিশেষ বহু ব্যক্তি তাদের নিজের ছেলেমেয়ের চেয়েও বেশী আদর-যত্নে রাখতেন কুকুরদের এবং নিজের সঙ্গে বিছানায় নিয়ে শুতেন, টেবিলে বসে একসঙ্গে খেতেন।

কুকুর পোষা বা কুকুরকে ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক মজার মজার কাহিনী দেওয়া যায়। কিন্তু কুকুর ছাড়াও জীবজন্তু পোষার এত রকমের এত কাহিনী আছে যা গুছিয়ে লিখলে একখানি মজার বই হয়ে যায়।

কুমীর, পেঙ্গুইন, সীলমাছ, সাপ, কাটবেড়ালী, বেঁজী, হরিণ, সারস, বাঘ ও সিংহ প্রভৃতি শতাধিক বিচিত্র রকমের জন্তু এবং বিষাক্ত ভয়াবহ হিংস্র জন্তুও মানুষ পুষে থাকে এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকাতেই এইসব মানুষদের সংখ্যা বেশী।

এক সময়ে মধ্যযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের বহু জায়গায় বাঁদর পোষার খুবই সখ দেখা যেত লোকের মধ্যে। বাণিজ্যপোতে ব্যবসায়ীরা ভারত ও আফ্রিকা থেকে নানাজাতীয় এই দুষ্টু ও রসিক জীবদের নিয়ে গিয়ে পাশ্চাত্য দেশের খরিদ্দারদের কাছে বিক্রি করত।

ক্রমশঃ ব্যাপারটা এমনও হয়ে উঠেছিল যে, কোন ধনী লোকের বাড়িতে বেবুন জাতীয় এই জীবরা না থাকলে সে ব্যক্তি যথোচিত মর্যাদা পেত না। কুকুর, বেড়ালদের মত এদেরও সাজপোষাক পরান হ'ত নানারকম এবং অনেক রাজা-রাণী বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা'ও পরিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে বাঁদরকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত ডিনার বা লাঞ্চের সময়। দারুণ মজা হ'ত তাকে নিয়ে।

এরপর আর একদিন আমাদের দেশে প্রাচীনকালের বড়লোকেরা কে কি জন্তু ভালবাসতেন, সে সম্বন্ধে যে সব মজার মজার কাহিনী আছে তা তোমাদের শোনাবার চেষ্টা করব।

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'উনি ঘোড়া চড়েন?'

'ঘোড়া চড়েন, বন্দুক দাগেন, তরোয়াল খেলেন, এখনো বর্শা ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করেন। কিন্তু এই দেখ গোমুনীতে পৌঁছে গেলাম।'

নৌকোটা পাড়ে লাগিয়ে ওরা নামল। পাড়ে শুধু ঝোপঝাড় আর আকন্দ ধুঁতারার জঙ্গল। 'ওঃ, আমার দাদাজী খুব ভাত খায়।' রাজাসায়েব একবার বলল। তারপর আবার চুপ করে গেল। ওদিকে কাদের বাড়ীতে যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। কুকুর যদি ঘুণাক্ষরে বাঁটুলদের সাড়াশব্দ পায় তাহলেই তো দল বেঁধে চেঁচাতে সুরু করে দেবে।

সামনে পাঁচিল ঘেরা মস্ত বাগান। পাঁচিলের গায়ে পা রেখে ওরা উঠল আর বাগানের মধ্যে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল 'হল্ট! হু কাম্‌স দেআর?'

'সায়েব!' বাঁটুলের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল।

'ফ্রেণ্ড!' রাজাসায়েব চেঁচিয়ে বলল। বাঁটুলকে বলল, 'শুয়ে পড়, মাটিতে শুয়ে পড়।'

গোরা সেপাইয়ের পেছনে পেছনে কয়েকটা গেরুয়া পাগড়ী বাঁধা মাথাও উঁকিঝুঁকি মারছিল। রাজাসায়েবকে দেখেই তারা চোখ বড় বড় করলে।

বাঁটুলদের ওরা বন্দুকের ঠেলা দিয়ে তো রামদাসবাওয়ার কুঠিতে এনে হাজির করলে। সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রামদাস বাওয়া একদিকে বসে আছেন, এদিকে বিরাট একটা বারান্দা, তাতে কয়েকজন সায়েব বসে। সায়েবদের মাথাতেও যে টাক থাকে আর তামাক খেলে তাদের গোঁপও যে তামাটে হয়ে যায় তা বাঁটুল জানত না।

'তোমরা কারা?' রামদাসবাওয়া আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন। অবাক কাণ্ড! রাজাসায়েবের কথাবার্তায় তো মনে হয়েছিল সে রামদাসবাওয়াকে রীতিমত চেনে।

'এই ছেলেটিকে আমি আপনার আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিলাম। আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি।' রাজাসায়েব এমন করে কথা কইতে লাগল যেন এ ঘরে সে আর রামদাসবাওয়া ছাড়া আর কেউ নেই।

'আমরা বুঝতে পারছি না।' একজন সায়েব বিরক্ত হয়ে বলল।

রামদাসবাওয়া একসময়ে কমিসারিয়েটে ছিলেন, ইংরেজী ভালই বোঝেন। তিনি বললেন, 'পারলে ইংরেজীতেই বল না বাপু।'

রাজাসায়েব আস্তে আস্তে বলল, 'পারি, কিন্তু বলব না। আর, কথার ফাঁকে ফাঁকে আপনাকে যা বলব আপনি বুঝে নিন।'

'ও ইংরেজী জানে না।' সন্ন্যাসী হয়ে রামদাসবাওয়া বেমালুম মিথ্যে কথা বললেন। রাজা সায়েবকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি বল।' তারপর সায়েবদের চমক লাগাবার জন্যেই হয়তো ত্রিশূল মাটিতে ঠুকে গর্জন করে বললেন, 'তাড়াতাড়ি বল্!'

'আজ্ঞে!' রাজাসায়েব হাত দুটি জুড়ে বলতে লাগল, 'এই ছেলেটি কানপুরের কমিসারিয়েটের গোপাললাল বাঁড়ুজ্জের ছেলে। আমাকে আপনি পালিয়ে যেতে সাহায্য করুন। এর কাকাদের সঙ্গে কাশী আসছিল। আমাদের ঘাঁটিতে খবর দিতে চাই। কাশীর পথে এর কাকারা নৌকো নিয়ে চলে যায়। আমাদের ওখানে হানা দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই ছেলেটিকে দেখে হিন্দুস্থানী সেপাইরা মেরে ফেলতে যাচ্ছিল। আমি ওকে বাঁচিয়ে এনেছি। ওরা আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছিল জানেন?'

গলা থেকে চাদর সরিয়ে দাগটা দেখিয়ে রাজাসায়েব প্রায় কেঁদে ফেলল। রাজাসায়েবের কথার প্রথম লাইনটি বাঁটুলের বিষয়ে, আর দ্বিতীয় লাইনটি সন্নেসীর সঙ্গে আড়ে আড়ে, চুপিসাড়ে যে তা তো তোমরা বুঝেই নিয়েছ।

সন্নেসী বললেন, 'সায়েব, লোকটা ভাল, বিশ্বাসী। বুঝলে?'

শুনে-টুনে সায়বরা বললে, 'বাঁড়ুজ্জেকে তো আমরা চিনি না। তবে ওকে নিয়ে আমরা কানপুরে চলে যেতে পারি। যে কোন বাঙালী পরিবারে, অথবা আমাদের রেজিমেণ্টের বাঙালীদের কাছে ওকে রাখতে পারি। ছেলেটির বাপ তো ভাল কাজই করে। সো মেনি বেংগলীজ! তাই মুখটা মনে করতে পারছি না। আর ঐ লোকটার কথা তুমি বলছ যখন...তুমি অবশ্য রবার্ট মেমসায়েব আর তার ছেলেমেয়েদের আশ্রয় দিয়েছিলে, তোমাকে আমরা নিজের লোক বলেই জানি। তবু লোকটাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া...'

'না না!' সন্নেসী একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, 'ঐ ঘরে বেটাকে বন্ধ

রাখব। ছেড়ে দেব কি বলছ! তবে আমি ভাবছিলাম তোমরা তো নীলের সঙ্গে এক-সঙ্গে যাবে কানপুরে, তাই না?'

'তাই তো ইচ্ছে।'

'ছেলেটিকে এখনি নিয়ে যাবে?'

'তাই তো ইচ্ছে।'

তখন একজন সায়েব চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে বাবা! ওর বাবাকে আমার মনে পড়েছে। আরে ফ্রেড্! তুমি বক্সার ব্যানার্জিকে চিনতে পারছ না? আরে সেই যে আমরা যখন বক্সারে গেলাম, সেবার যে ব্যানার্জি বাঘ মেরেছিল।'

'তার ছেলে?' গোঁফ ঝোলা সায়েব রীতিমত আশ্চর্য।

'তাই তো মনে হচ্ছে। ব্যানার্জি তো এখন কাশীতেই বাপু। হাসপাতালে। ছুটি নিয়ে দেশে যাবে।'

'কি করে জানলে?'

'আমি কাশীতে ছিলাম। তা ছাড়া আমি ডাক্তার। এ সব খবর রাখাই তো আমার কাজ।'

'তবে তুমি কাশীতে চলে যাবে, কেমন?' সায়েবটি বললে।

রামদাসবাওয়া তখন বললেন, 'আমিই ওকে পাঠিয়ে দেব। তোমাদের সামনে এখন মস্ত বড় কাজ, তোমরা কানপুরে যাচ্ছ! এ লোকটাকেও আমি কয়েদ করে রাখব। ছেলেটা ভালই থাকবে। বাঙালীরা পালিয়ে-টালিয়ে এসে এখানেও দু'একজন আছে।'

'তোমার মত সন্নেসী যদি আর কয়েকজন থাকত!'

সায়েবরা তো রাত পোহাতেই চলে গেল।

সায়েবরা চলে গেল, এদিক থেকে রাজাসায়েবও রওনা হ'ল। তখন বাঁটুলকে অবাক করে রামদাস সন্নেসী পাশের ঘরের দোর খুলে সে কি হাঁকাডাকি!

'গোপ্লা কোথায়? ইধার আও। তুমি আমায় পেয়েছ কি! গ্রাম সম্পর্কে খুড়ো হই বলে যত রকম বজ্জাতি সব আমার ঘাড় দিয়ে চালাবে? চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে পালাচ্ছ তাই সায়েবদের সামনে বেরুলে না ওরা তোমাকেও মিউটিনীবাজ ঠাওরাবে, সে নয় বুঝলাম! কিন্তু রূপচাঁদের কাছে ছেলের খবর শুনে সেই যে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এখানে এসেছ, একবার এগিয়ে এসে দেখবে তো?'

কোন সাড়াশব্দ নেই।

ঘুমেচ্ছে বোধ হয়। কে আছিস, দে তো বেটার গায়ে জল ঢেলে!' বাঁটুলের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার বাপের মত গুটিকয়েক হতভাগার জন্যে আমার সাধুগিরিটা বুঝি ছাড়তে হয়। সায়েবদের আশ্রয় দিয়ে-টিয়ে যেটুকু সুনাম করেছিলুম তা আর টিঁকল না। এর চে' আমার রিষীকেশই ভাল!' কিন্তু গোপাল এল না?

বাঁটুলের বাবা গোপাললাল বাড়ুজ্জে এখানে! মামীমার লিখে দেওয়া সেই কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে নাকি বাঁটুল?

জোয়ান বয়স, দিব্যি বাজখেঁয়ে গলা, গোঁপে তা দেয়। যাদের মান্যি করে না তাদের পেন্নাম করে না?

এমন সময়ে রূপচাঁদবাবুর গলা শোনা গেল, 'এ তো বাঁটুল রে!'

'ও বাঁটুলদাদা!' পদ্ম চেঁচিয়ে বললে।

অমনি বাঁটুলের সব সাহস চলে গেল। আর বাঁটুল সেখানে থাকবে না, কিছুতে থাকবে না। এতদিন আগে কেন মামীমার কাছে এইটুকু বাঁটুলকে দিয়ে দিয়েছিল সেই দুঃখ, চাঁদবদন ভট্‌চাজ্জের কাছে বিলেয়ে দেবার দুঃখ, এতদিন ধরে বাবাকে খুঁজে বেড়াবার দুঃখ, সব রকম দুঃখে বাঁটুলের ছোট্ট বুক ফেটে যেতে চাইল। এক্ষুনি সে পালিয়ে যাবে, কিছুতে থাকবে না। কিন্তু ছুটে পালাবার আগেই তাকে কে যেন খপ্‌ করে ধরে ফেললে।

'তুই আমার বাঁটুল?' কই, বাজখেঁয়ে গলা তো নয়!

'আজ্ঞে আমি আঁটুল গাঁয়ের বাঁটুল!' বাঁটুল আস্তে আস্তে লজ্জা-লজ্জা চোখ তুলে ওর বাবাকে দেখল।

এইটুকু শুধু জেনে রাখ—একটুও ভয় পাবার মত নয়।

সমাপ্ত

আগামী আষাঢ় সংখ্যা থেকে

শ্রীবিমল দত্ত'র

আশ্চর্য নগর

নামে একটি অভিনব ও আশ্চর্যসুন্দর উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে

'মৌচাকে' প্রকাশিত হবে।

দাবার ছক্ সাজিয়ে বসে আছেন মেজদাদা। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। বাইরে আব্‌ছা অন্ধকার। বন্ধু সমীর আসতে দেরি করায় ছোট ভাই রামুকে পাঠালেন পাশের বাড়ী থেকে সমীরবাবুকে ডেকে আনতে। একটু পরেই, "সাপ সাপ" বলে রামুর বিকট চিৎকারে বাড়ী মাথায় উঠলো। দৌড়ে এল সবাই। হক্‌চকিয়ে মেজদাও লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় যা দেখা গেল, তাতে সকলেই হেসে খুন! সাতরাজ্যেও সাপের কোন হদিস নেই, শুধু এক টুকরো দড়ি পড়ে আছে! অবশ্য দড়ির সঙ্গে সাপের মিল আছে এবং অন্ধকারে তাকে সাপ বলে ভুল করার পেছনে যুক্তিও আছে যথেষ্ট।

এমনি নানাভাবে মানুষ ভয় পায়। জোছ্‌না রাত্রিতে কলাগাছকে কিংবা মান-কচুগাছের পাতাকে ঘোমটা দেওয়া ভূত ভেবে চিৎকার করে ওঠে। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দকে মনে করে কে যেন পা টিপে টিপে হাঁটছে! নিস্তব্ধ কোন রাস্তা দিয়ে রাত্রিবেলা একা যেতে যেতে গাটা ছম্‌ছম্ করে উঠে মনে হয়, পেছনেও যেন আরেক জন আসছে। আর সেক্ষেত্রে ভয় দূর করার জন্য আমরা যে যতটুকু পারি গানের রেওয়াজ সুরু করে দিই। নতুবা রাম নাম জপ করি।

এরকম হাজার কারণে মানুষ ভয় পায়—আঁৎকে ওঠে, মূর্ছা যায়, গা শিরশির করে, গায়ে কাঁটা দেয়।

ভয়টা আসলে সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার! মন যত দুর্বল হয়, ভয়ও ততো পেয়ে বসে। সাদা বাংলায় একটা কথা আছে, 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘেই খায়।' অর্থাৎ, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা আসল বস্তুর চেয়ে নকল বস্তু থেকেই ভয় পাই।

দুষ্টু ছেলেকে ঘুম পাড়াতে মা অনেক সময় রাক্ষস-খোক্কস বা জুজুবুড়ির ভয় দেখান। কিন্তু রাক্ষস-খোক্কস বা জুজুবুড়ির চেহারার সঙ্গে মা কিংবা শিশু কারোরই প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় নেই। হয়তো একেত্রে কুৎসিত ও ভয়ংকর কতকগুলি প্রাণীর কল্পনা করা হয় মাত্র। কাজেই আমাদের ভয়ের সঙ্গে কল্পনারও যোগসাজশ আছে—তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাহস পরীক্ষা করার জন্য আমরা হয়ত বলি, 'কে পারবে রাত্রি বারোটায় একা একা শ্মশানে যেতে? কিংবা কে পারবে লাসঘরের চারপাশে ঘুরে আসতে?' তাতে হয়তো বা অনেকে জয়ী হয়। কিন্তু এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সামান্য ঘটনাও ঘটে যা মানুষকে ভয়ে একেবারে কাবু করে ফেলে। এ জাতীয় ভয়ই মানুষের বেশী। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি লোপ পায় এবং শেষে যখন রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, তখন দেখা যায় সেটা দড়ির নকল সাপের মতোই হাস্যকর। এ সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটা ঘটনা বলছি। একেবারে সত্যি ঘটনা। শোন:

আমাদের বাড়ীতে উত্তর ও দক্ষিণে দুটো টিনের ঘর। মাঝখানে প্রশস্ত উঠান। অন্য দু'দিকেও আরো দুটি ঘর আছে। উঠানের উপর জামাকাপড় রৌদ্রে দেবার জন্য একটা মোটা তার উত্তর ও দক্ষিণের ঘরের কাঠে লম্বালম্বিভাবে টাঙান।

বেশ কিছুদিন ধরে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম যে, খেয়েদেয়ে রাত্রে যখন বিছানায় শুতে যাই, তখন তারটাতে একটা আঘাত হয়। একটু জোরেই। এবং তার ফলে একটা শব্দ হয়। শব্দের রেশও বেশ কিছুক্ষণ থাকে। আমি প্রায়ই রাত বারোটা নাগাদ ঘুমাই। বিছানায় শুয়েও চট করে ঘুমোতে পারি না। দুষ্টু ছেলের মতো চোখ বুজে ঘুমের ভান করে থাকি। আর সেই সময়ে শব্দটা হয়। একদিন, দু'দিন, তিনদিন। এমনি করে অনেক দিন কাটল। রীতিমত শব্দ হচ্ছে। প্রথম প্রথম মনে হতো বাতাসে-টাতাসে তারটা নড়ে—তাই শব্দ হয়। কিন্তু মন যেন তাতে সম্পূর্ণ সায় দিতে রাজী হলো না।

একা থাকি দক্ষিণের ঘরে। একটু একটু ভয় করতে লাগল—ভূতের ভয়। অবশ্য ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলের মাত্রাই ছিল বেশী। কারণ অনেক দিন ধরে ভূত দেখার সখ ছিল। অর্থাৎ 'রঙ-রঙও করে ভয়-ভয়ও করে' এই রকম একটা ভাব মনের মধ্যে খেলা করছিল। কাউকে কিছু বললাম না।

এমনিভাবেই কাটল আরও কিছুদিন। কৌতূহল দিনদিনই বাড়ছে। তারপর রাত্রি দশটা থেকেই কি করে শব্দ হয় তা বোঝার জন্য আরও বেশী মাত্রায় সজাগ থাকতাম। কোন কোনদিন দরজা খোলা রেখে, হাতে নেবানো টর্চ নিয়ে (কারণ টর্চ জেলে রাখলে ভূত আসবে না। আগুনকে ওরা ভয় পায়।) বসে থাকতাম। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হয়নি। শব্দ হ'ত ঠিকই। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জেলে কিছুই দেখতে পেতাম না। কোন কোন দিন বসে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে বিছানায় গেলেই শব্দ হ'ত টং করে, আর তারের কম্পন থামতে দেরি হ'ত।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারতাম না। শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, একটা তার টাঙান, তাতে রাত্তিরে শব্দ হয়। তাও আবার একবার মাত্র! কি করে হয়? কেমন রহস্য রহস্য লাগছিল। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, ওরা বোধ হয় ফন্দি-ফিকির করে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য এরকম শব্দ করে। ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখার জন্য ওদের কাউকেও কিছু বললাম না।

দিন যেতে লাগল। অবশেষে একদিন সত্যের খোঁজ পেলাম। ব্যাপার অতি সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য কথাটাই আমার মনে পড়ল না। কতকগুলি বাজে চিন্তা এবং অনর্থক ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি বলার আগে তোমারা কি কেউ বলতে পারো, কি করে তারে শব্দ হ'ত? পারবে কি?

আচ্ছা আমিই বলি। শোন:

তখন সন্ধ্যে আন্দাজ সাড়ে ছ'টা হবে। উত্তরের ঘর থেকে উঠান পেরিয়ে আমার (দক্ষিণের) ঘরের সিঁড়িতে পা দোব, এমন সময় হ'ল সেই শব্দ অবিকল সেই শব্দে তারটা কাঁপতে লাগল বহুক্ষণ ধরে। সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে চাইলাম। চেয়ে যা দেখলাম তাতে আমার এতদিনের ভয়, ভাবনা এবং কৌতূহলের ঘটলো অবসান। দেখলাম, একটা বেশ বড়সড় বাদুড় তারটা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে! সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে মনে হাসিও পেল কিছুটা। তবে দুঃখ হ'ল, ভূতের সঙ্গে আর মোলাকাত হবে না বলে।

এই নিশাচরেরাই আমাকে এতদিন ভয় দেখাত এবং আমার ভাবনা ও কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ ব্যাপার কত সামান্য। কিন্তু এই সামান্য কথাটাই আমার মনে কখনও উদয় হয়নি!

রাতে যখন ওরা (বাদুড় - পেঁচা প্রভৃতি রাতজাগা পাখীরা) উড়ে বেড়ায়, তখন তাদেরই পাখায় কাপড় শুকোবার তার আঘাত পায়। আঁধারে ওরাও তারের অবস্থিতি বুঝতে পারে না এবং সেই আঘাতেই শব্দ হ'ত বা হয়। তবে অবাক লাগে এই জন্য যে, প্রতি রাতে আমি শব্দটা একবারই শুনতাম। হয়তো আরও অনেকবারই হ'ত, কিন্তু আমি সাধারণতঃ একবারই শুনতাম।

আর রাত্রি দশটা থেকে বারোটার মধ্যে যে শব্দটা হ'ত বলেছি এও ঠিক। তবে এর কারণ হয়তো সন্ধ্যের দিকে শব্দ হলেও আমি লক্ষ্য করতাম না, খেয়ালও করতাম না। তা ছাড়া আমি সে সময়টা প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে কাটাই। কাজেই শব্দ (পূর্বের) শুনতে পেতাম না। দ্বিতীয়তঃ, আমার লক্ষ্যই থাকত 'রাত্রি বারোটা'।

আমি যেন রাত্রি বারোটার জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। আর এই গভীর রাতেই নিশাচর পাখীরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বেড়ায়।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ মানুষ কত সামান্য কারণে ভয় পায়। হয়তো তোমরা যারা বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী তারা ব্যাপারটা আরও আগে বুঝতে পারতে। কিন্তু আমি তো বলেছি এ অবস্থায় অন্য কথা মনে মনেও আসে না। এই তো মানুষের ভয়। এই ভয়ই মারাত্মক হলে জীবন নিয়ে টান দেয়। যতই মনে শক্তি থাকুক, মাথায় যতই বুদ্ধি থাকুক, এমনও তুচ্ছ বিষয় আছে বা ঘটনা ঘটে, যা মানুষকে অনেক সময় ভয়ে মারাত্মক ভাবে ভাবিয়ে তোলে—বিপদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে!

জ্যৈষ্ঠ

শ্রীবাউল দাস

মাস বৈশাখ শেষ হোলরে জ্যৈষ্ঠ এসেছে,
দিকে এবং দিগন্তরে আগুন হেসেছে।
চাতক ডাকে করুণ সুরে বৃষ্টি নামে না,
আকাশ জুড়ে কালো মেঘের নাচন থামে না।
ফুলগুলো সব মলিন হ'ল, একটু মধু নাই,
ভোমরা এবং মৌমাছিরা ঘুরছে না আজ তাই।
গাছের ডালে ক্লান্ত ঘুঘু দিচ্ছে কাকে ডাক?
শূন্য ধূসর তেপান্তরে বাজায় কারা শাঁখ!
উষ্ণ হাওয়া আসছে ছুটে উড়ছে ধূলো ঝড়;
জ্যৈষ্ঠ মাসের তপ্ত চড়ে ভাঙ্‌ছে পাখির ঘর।
ছুটছে আগুন জ্যৈষ্ঠ মাসে গল্‌ছে যতো পীচ,
নদীর পাড়ে রুক্ষ বালি উড়্‌ছে কিচির কিচ্।
আজ খারাপ লাগে ঘরে বসে করতে কোলাহল।
সবাই মিলে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি চল্॥

যখন প্রথম দেখি

শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

রাত্তিরে ঘুম নেই···অজানা আনন্দে মন ভরে উঠেছে এক কিশোরের। নানা কল্পনার জাল বুনছে সে। চোখ দুটিতে ঘুমের বুড়ি নিদ-কাটি বুলিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ···তবু 'নিদ নেই আঁখিপাতে'।

পরদিন ভোরবেলা আঁধারের মায়া কাটিয়ে সূর্যদেব সবে উঁকি দিয়েছেন, এমনি সময়ে একটি লোক এসে খবর দিয়ে গেলো: চটপট তৈরি হওয়ার জন্য। কিশোরটি যে সে-খবরেরই অপেক্ষায় ছিলো। বহুদিন মনে মনে যাঁর কথা ভেবেছিলো সে···পড়ার বইতে যাঁর কবিতা পড়ে প্রচুর শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করেছিলো সেই গৌরকান্তি, দীর্ঘদেহ প্রশান্ত বদনের মুখচ্ছবি আজ নয়ন ভরে দেখতে পারবে, এ কী কম সৌভাগ্যের কথা। শুধু তার প্রাণের তারে বেজে উঠেছিলো :

এ দ্যুলোকে মধুময়
মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি ॥

হ্যাঁ তিনিই আসছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ঢাকাতে বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণের গৃহে। কিশোরটির সঙ্গে জমিদার পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণের অতি ছোটবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। পড়াশোনা, খেলাধুলো, সাহিত্যচর্চা সব ব্যাপার একই সঙ্গে চলে।

জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণের ছিলো সুসজ্জিত এক ফুলের বাগান। নানা দেশ-বিদেশ থেকে রকমারি ফুলের গাছ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য জিনিসের বিচিত্র সমারোহ।

এ-উদ্যান তাঁর জীবনের এক মহান সৃষ্টি। মৌমাছি যেমন মধুর লোভে ঘুরে বেড়ায় তেমনি দেশ-বিদেশের রাজা, মহারাজা, সুধী, পণ্ডিত এ-দেখবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করতো। ইংরেজ আমলের গণ্যমান্য পদস্থ কর্মচারী ও খোদ গভর্নর পর্যন্ত চিঠি লিখে দিন ঠিক করে নিতেন। তা' ছাড়া মূল্যবান লাইব্রেরী ও নিজস্ব থিয়েটার হল দেখবার মতো ছিলো।

কিশোরটি তার বন্ধুর বাড়িতে পৌছবার মুখেই দেখতে পেলো এক সুন্দর নক্সা করা লাল রংয়ের কার্পেট বিছানো রয়েছে প্রবেশ-পথে। জানা-অজানা ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে তোরণ-দ্বার। সুমুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং জমিদার, পুত্র, ষ্টেটের ম্যানেজার, দারোয়ান, হেডমালী ও অন্যান্য লোকজন।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটার সময় মোটরের হর্ণ বেজে উঠলো। সবাই ব্যস্ত-

সমস্ত হয়ে পড়লো কবির অভ্যর্থনায়। অন্দরমহল থেকে পুরললনারা শাঁখ বাজিয়ে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষণা করলেন।

জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ প্রথমে গিয়ে কবিকে গাড়ি থেকে নামালেন। সভক্তি প্রণাম করলেন। তারপর ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এগোতে লাগলেন বাগানের লনের দিকে। এক পরম সুন্দর মানুষটিকে জানবার অদম্য আগ্রহ নিয়ে কিশোর দুটিও এগোতে লাগলো।

কবিকে প্রথমে নিয়ে আসা হলো বাগানের এক পাশে যেখানে রাখা হয়েছে পৃথিবী-খ্যাত ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার মহৎ পাতাটিকে রাজকীয় মর্যাদায়। একটি জলাধার পাতাটির আকারে তৈরি করা হয়েছে, ভেতরে সবুজ জলের ঢেউ বয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

কোথা থেকে এটি আনা হয়েছে নরেন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে জেনে নিলেন কবি।

দুটি কিশোর এতক্ষণ কবির ওই সুন্দর মুখাবয়বের দিকে চেয়ে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। এবার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই দু'জনে কবিকে ভক্তিভরে প্রণাম করলো। রবীন্দ্রনাথ চিবুক ধরে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মিষ্টি মধুর কণ্ঠে বললেন: আমার কী কী কবিতা পড়েছো এবং ক'খানি গান শুনেছ তোমরা।

আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। ভয়ে ভয়ে কাঁপা গলায় বললাম: আপনার লেখা দুটি কবিতা আমাদের পাঠ্য বইতে আছে। একটি হচ্ছে 'নদী' আর একটি 'বন্দীবীর' গান একটিমাত্র শুনেছি এক সভায়। সেটি হচ্ছে "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।" তবে আপনার কবিতার ও গানের অর্থ ঠিক আমরা ভাল করে বুঝতে পারি না।

কবি মৃদু হেসে বললেন: সে কী হে! ভাল করে মন দিয়ে পড়লেই অর্থ খুঁজে বার করতে কষ্ট হবে না। নিজের উপর আস্থা রেখো। এখন থেকেই কল্পনার ভেলাকে দূরে ভাসিয়ে দিও…তা হলেই হবে। আমরা কবির মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শুনে তন্ময় হয়ে গেলাম।

এক পুণ্য প্রভাতে কবিকে প্রথম দেখা, কথা বলা ও শোনার মধুময় স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।
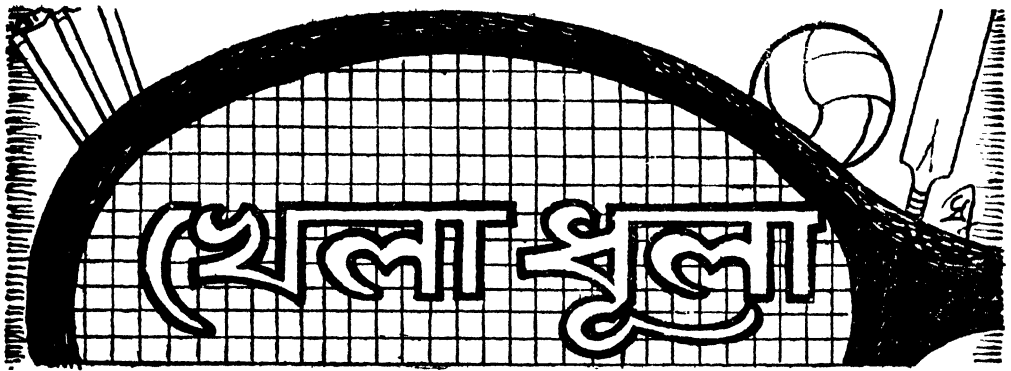
মেঠুড়ে

ক্রিকেট

গত ২০শে এপ্রিল পতৌদির নেতৃত্বে ভারতের তরুণ ক্রিকেট দল ইংলণ্ড যাত্রা করেছে। দলটি তিনমাস ইংলণ্ডে থেকে তিনটি টেস্ট সমেত মোট একুশটি খেলা খেলবেন। ২৯শে এপ্রিল থেকে সফরের খেলা সরু হবে। এবারের সফর হ'ল ভারতীয় ক্রিকেট দলের দশম ইংলণ্ড সফর।

ভারত ইংলণ্ড ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারত থেকে প্রথম পার্শী দল ইংলণ্ডে যায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। আর. জি. এফ. ভার্ণনের নেতৃত্বে ইংরেজের প্রথম ক্রিকেট দল ভারতে আসে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেই থেকে ইংলণ্ডের ন-টা দল ভারত সফর করেছে।

১৯৫৯ সালে ভারতীয় দল শেষবার ইংলণ্ড সফর করবার পর আট বছরের ভেতর সাতটা টেস্ট সিরিজ খেলেছে। এই সাতটা খেলার ছ-টা হয়েছে দেশের মাটিতে, একটা বিদেশে। টেস্টের সংখ্যা বত্রিশ। এই বত্রিশটা টেস্টের ভেতর ভারতের জয়ের সংখ্যা পাঁচ, হারের সংখ্যা আট। উনিশটি খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

স্পিন-নির্ভর ভারতের বোলিং শক্তির ধার বিচার করতে ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্মকর্তারা চন্দ্রশেখরকে 'গোপন অস্ত্র' খেতাব দিয়েছেন। তাঁদের ভয় চন্দ্রশেখরকে। আশা করা যায় ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা তাঁকে কড়া নজরে মনযোগ দিয়ে খেলবেন। এই সুযোগে বিষেণ বেদীর লেগব্রেকই হবে ব্রহ্মাস্ত্র। দলের অন্য স্পিনার বেঙ্কটরাঘবন রাণ আটকাতে কার্যকরী হলেও উইকেট পাবেন কম। কারণ ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা টিটমাস, অ্যালেন ও মার্টিমোরের মতন উঁচু দরের অফ-স্পিনারের সঙ্গে খেলতে বিশেষ অভ্যস্ত। অন্য দিকে ভারতের সীমিত সীম বোলিং সুব্রত গুহ ও মোহনকে নিয়ে গড়ে উঠবে। এঁরা দু'জনে যদি ওপেনিং জুটিদের কাত করতে পারেন, তাহলে স্পিনারদের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

খামখেয়ালী আবহাওয়ার কথা ভেবেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিবেশে পাতৌদিকে আবার ভারতীয় দলের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সহযোগী অধিনায়কের পদ পেয়েছেন চান্দু বোরদে। আমরা সকলেই আশা করব ইংলণ্ডের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দল ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুনভাবে উন্মোচন করবে।

টেবিল টেনিস

এবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহল্‌মে টেবিল টেনিসের ২৯ তম বিশ্ব আসর বসেছিল। প্রথম দিন বিমান থেকে রঙবেরঙের পঞ্চাশ হাজার টেবিল টেনিস বল-বৃষ্টি করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিপুলাকার বরফ-হকি স্টেডিয়াম জোহানেসভেতে চার হাজার গেমের জন্যে আঠারটা টেবিলে সকাল-সন্ধ্যে খেলার ব্যবস্থা ছিল।

বর্তমান দশকের পয়লা নম্বর টেবিল টেনিস দেশ চীন এই প্রতিযোগিতায় নাম পাঠায়নি। প্রতিযোগিতার শুরুতে চীনের বিকল্প বিজয়ীর মুকুট কে পাবে এ নিয়ে আলোচনার শেষ ছিল না। শেষে জাপানের জয় জয়কার। জাপানের পুরুষ ও মহিলা দল মোট সাতটা সোনার মেডেলের ভেতর ছ-টা দখল করেছে। ১৯৫৯ সালেও তারা রেকর্ডের প্রথম অধিকারী হয়, এবার দ্বিতীয়। একমাত্র পুরুষদের ডাবলস বিভাগে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন সুইডেন জুটি বিজয়ী হয়েছে। দলগত ক্রমপর্যায়ে পুরুষ বিভাগে উত্তর কোরিয়া ও সুইডেন পেয়েছে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। মহিলা বিভাগে জাপান প্রথম ও সোভিয়েট দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জাপানের উনিশ বছরের এক নম্বর খেলোয়াড় নবুহিকো হাসেগাওয়া তাঁরই দেশের কুড়ি বছরের মিৎসুরা কোনোকে ১৮—২১, ২০—২২, ২১—১৪, ২১—১৬, পয়েন্টের তীব্র লড়াইয়ে হারিয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। প্রতিযোগিতায় তাক লাগানো ফলাফল হয়েছে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে। জাপানের ফুকাশে সিঙ্গলস ফাইন্যালে সাচিকো মারিসাওয়ার কাছে ২১—১৮, ১৫—২১, ২১-১৮ ও ২১—১৭ পয়েন্টে হার স্বীকার করেন। ডাবলস ফাইন্যালেও তিনি ও সঙ্গিনী নোরিকো ইয়ামানাকা তাঁদেরই দেশের মারিসাওয়া ও হিরোহিতার কাছে ২১—১৯, ২১-১৭ ও ২২—২০ পয়েন্টের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যান।

ভারত নিজের গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকোকে শোচনীয়ভাবে ৫—০ ম্যাচে হারালেও ফ্রান্সের কাছে ৫—৪ খেলায় হেরে যায়। ভারত গ্রুপের শেষ খেলায় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর কোরিয়ার কাছে ৫—০ খেলায় হেরে যায়। এই খেলায় ভারতের

জগন্নাথ, মার্চেণ্ট ও খোদাইজী উত্তর কোরিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে সমানতালে খেলেও শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে।

হকি

সিনিয়র ডিভিসন হকি লীগে বি. এন. আর মোহনবাগানের সঙ্গে শেষ খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত রেখে পর পর তিনবার লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জন করেছে। মোহনবাগানের পক্ষে আজাহার এই দিন যে গোলটি করেন, এবারের মরশুমে বি. এন. আর দলের বিরুদ্ধে সেটিই ছিল প্রথম গোল। এবারের লীগে বি. এন. আর দলকে মোট উনিশটা দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এই উনিশটি খেলার ভেতর বি, এন. আর দল আঠারোটা খেলায় জিতেছে এবং মোহনবাগানের সঙ্গে এই একটা খেলাতেই ড্র করেছে। মোট উনিশটা খেলায় বি. এন. আর একচল্লিশটি গোল দিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

"টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দেশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফিরি করগে। দেখবি—ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর। আমেরিকায় দেখলুম, হুগলী জেলার কতগুলি মুসলমান ঐরূপে ফিরি করে ধনবান হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ্ না, এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীতে আর কোথায়ও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড় গাউন তৈরী করে বিক্রি করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।"
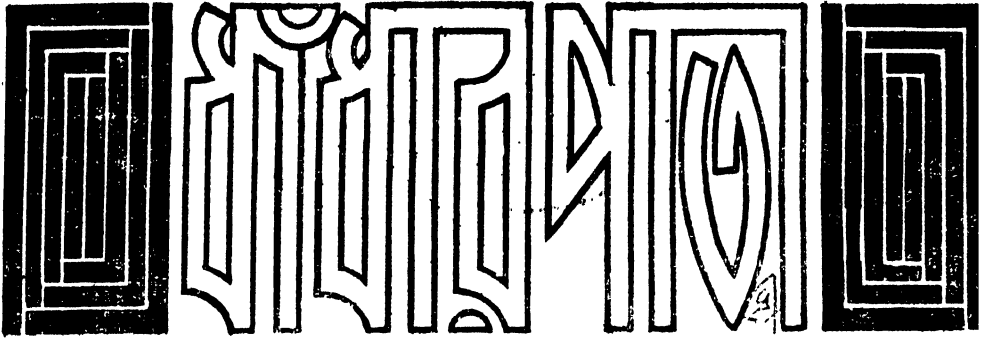
বাজিকর
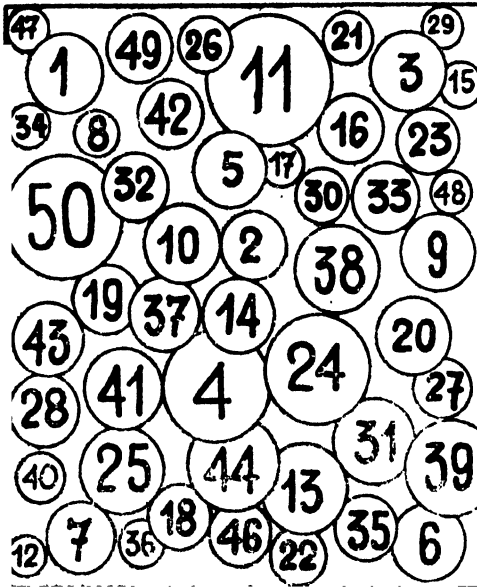
হারানো সংখ্যা বার করো

ছবিতে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি এঁকে দেওয়ার কথা ছিল। শিল্পী আঁকতে গিয়ে অনবধানতাবশতঃ একটি সংখ্যা বাদ দিয়ে ফেলেছে। তোমরা ছবিটি ভাল করে দেখে কোন সংখ্যাটি বাদ পড়ে গেছে বার করতে পারো কিনা দেখ।

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

গতমাসের 'মজার ধাঁধা'র উত্তর

বিপরীতার্থক

লঘুপাপে কেন তার দণ্ড হ'ল গুরু ?
শেষ হ'ল কবে কাজ কবে হ'ল শুরু।
শিশুদল খেলা করে দেখে বসে বৃদ্ধ,
অসিদ্ধ খেওনা ডিম, খাও করে সিদ্ধ।
কাঁচা আম বড় টক দাও বেছে পাকা,
খোলা কেন আছে মিষ্টি রাখ দিয়ে ঢাকা।
যাওয়া আজই চাই, কাল চাই আসা,
জঘন্য নয়তো এটা এ-তো বেশ খাসা।

নিরাশ হয়োনা ভাই রেখো মনে আশ,
গোপন করোনা ইহা করিও প্রকাশ।
সরু চাল আনেনি সে, এনেছে যে মোটা,
ভাঙা ডিম খাবনাক দিতে হবে গোটা।
সরব না হয়ে কেন রহিলে নীরব ?
পশ্চিম তো নহে এটা হবে বুঝি পূব।
আগে গেল কেবা ভাই কেবা গেল পিছে,
সত্য কথা বল সবে বলোনাক মিছে।
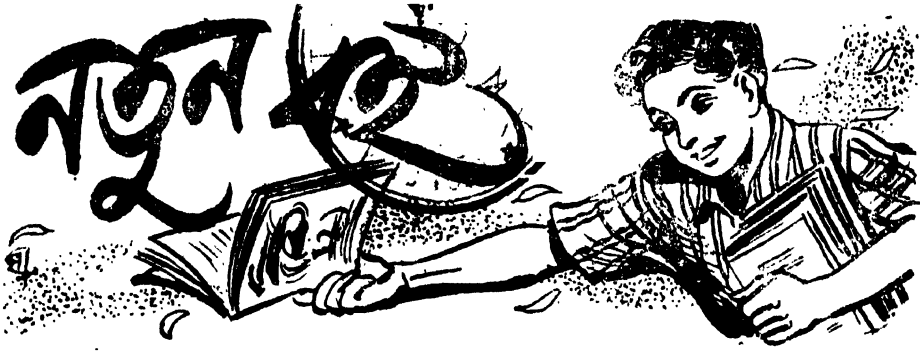
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

লালচাঁদের টাকা নিমচাঁদের লাঠি—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। লেখক কর্তৃক ৯, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। পরিবেশক: ক্যালকাটা পাবলিসার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ১.৫০

কেবলমাত্র গল্প-উপন্যাস ছাড়া ছোটদের জন্যে নানাধরণের উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় বই লিখেছেন ধীরেন্দ্রলাল। বিশেষ করে তাঁর ইতিহাসের গল্প ও ঐতিহাসিক চরিত্রের কাহিনীগুলি নিয়ে লেখা বইগুলির মধ্যে এই বইখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই লালচাঁদ ও নিমচাঁদকে নিয়ে যে রোমাঞ্চকর কাহিনী তিনি এই বইটির মধ্যে লিখেছেন, তা বাঙলার ইতিহাসের একটি বিখ্যাত যুগ। গোলাম হোসেন সে সময় সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করেছে, মীরণ সেই মৃতদেহ মুর্শিদাবাদের পথে পথে দেখিয়ে বেড়িয়েছে। এর মধ্যেই এসেছে লালাদচাঁদ আর নিমচাঁদ। ভারী সুন্দর করে লেখা এদের কাহিনী। তোমরা পড়লেই খুশি হবে। পাতায় পাতায় ছবি এবং সুন্দর ছবিওয়ালা রঙিন মলাট।

ছাই চাপা আগুন—শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়। প্রণব সাহা কর্তৃক ১০ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান: শরৎ পুস্তকালয়, ১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২.০০

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের নামটি শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন হলেও, বড়দের সাহিত্যে, বিশেষভাবে গবেষণামূলক নানা প্রবন্ধ সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত। অধ্যাপক ডক্টর চট্টোপাধ্যায় অচিরে ছোটদের সাহিত্যেও যে খ্যাতিবান হয়ে উঠবেন, এই রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীটিই তার নিদর্শন। অবিনাশ বাবুর রহস্য-কথা একবার পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়া যাবে না। এর সঙ্গে আছে 'প্রেম ও প্রতিহিংসা' নামে আর একটি বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্যময় কাহিনী। যে কোন ছেলেমেয়েই শুধু নয়, পরিণতরাও এই বই পড়লে আনন্দ পাবেন। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট এবং প্রচ্ছদপটটি মনোরম ও কাহিনীর ভাবব্যঞ্জক।

ভারতের সাধারণতন্ত্রের নির্বাচন হয়ে গেল—। নির্বাচনের শেষ কাজটুকু হয়ে গেল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। ভারতের ভূতপূর্ব উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে এই পদে আসীন হয়েছেন। জাকির হোসেন ভারত তথা বিশ্বের একজন শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ। আমরা আশা করি বিশ্বের দরবারে তিনি ভারতের সম্মান, শ্রদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। আমরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

প্রতিবেশী বন্ধু

ছেলেরা পড়াশুনা করছিল স্কুলে। মহারাষ্ট্রের কোলাপুর শহরের স্কুল। বেশ মন দিয়েই তারা পড়ে, কিন্তু অঙ্কের ক্লাস এলেই গুঞ্জন ওঠে—। শিক্ষক মশাই রাগ করে বলেন—তোমরা লেখাপড়া শিখছ, বড় হচ্ছো, কতকিছু জানতে পারছো আর অঙ্কের ক্লাস এলেই সব ভয় পাও কেন? বেশ মন দিয়ে যদি অঙ্ক কষো আর তা যদি ঠিক হয় তাহলে দেখবে নিজের কত আনন্দ হচ্ছে। নিজেই হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কেউ কেউ বলে, স্যার—বড্ড কঠিন লাগে যে।

শিক্ষক উত্তর দেন, সেটা লাগে। কিন্তু যখন সেটা সফল হয়, ঠিক মিলে যায় তখন—?

কেউ একটু হাসে, কেউ মনে মনে সাড়া দেয় না, কিন্তু একটি শান্ত ছেলে ক্লাসে কথা বলে না বটে, নীরবে কাজ করে যায়।

বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে এই গোপাল। বিশেষে কেউ লক্ষ্য করে না, দরিদ্রের ছেলে, কত কষ্টেই লেখা পড়া করতে হয় তাকে।

সেদিন অঙ্কের ক্লাসে কারুরই অঙ্ক ঠিক হলো না। কিন্তু একপাশে নীরবে বসে থাকা ছেলেটির অঙ্ক দেখে শিক্ষক ডাকলেন—বললেন, তুমি কেন সামনে বসো না? আজ বোসো এখানে।

গোপাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি কথা বলছো না কেন? আজকের ক্লাসে যে অঙ্ক কেউ পারেনি তা তুমি সহজেই

পেরেছ। খুব খুশী হয়েছি আমি। বসো এখানে।

মাথা নীচু করে গোপাল জবাব দিলো: অন্যদিনের কথা বলছি না, কিন্তু আজকের অঙ্কটি কয়েকদিন আগে আমায় একজন দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তাই সহজেই পেরেছি।

ছোট ছেলে গোপাল স্কুলে সেদিন তাঁর প্রশংসা নিজের প্রাপ্য নয় বলে গ্রহণ করলো না। সকলেই আশ্চর্য হলেন। শিক্ষক মশাইও আনন্দিত হলেন তাঁর এই সত্যাশ্রয়ী মনের পরিচয় পেয়ে।

একদিন স্কুলের গণ্ডী পার হলেন। কত বড় হয়ে উঠলেন তিনি আবার একদিন এমন সময় এলো যখন তাঁর লেখা অঙ্কশাস্ত্রের বই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হলো।

সদালাপী, সদাচারী ও তেজস্বী এই মহাপুরুষটি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ভারতবর্ষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন—স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ভারতের সেবায় নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছিলেন। বাংলা দেশের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলতেন—যে কথা "বাংলা দেশ ভাবে আজ, সারা ভারত ভাবে কাল।" নিজের সেবার দাক্ষিণ্যে, ত্যাগে, দেশের প্রতি মমত্ববোধে ও নিষ্ঠায় তিনি মানুষের অন্তর জয় করেছিলেন। আমরা পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করি।

চিঠির উত্তর—

কমলা মাঝি, মেদিনীপুর—তোমার চিঠি পেয়েছি ভাই, কলকাতায় আসার আগে চিঠি দিয়ো, সময় ও কোথায় দেখা করবে জানিয়ে দেব। অধীর চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-১১ তুমি এবারও গ্রাহক আছ শুনে খুশি হয়েছি, সেদিক থেকে, অর্থাৎ বয়সের দিক থেকে পঁচিশ কেন চল্লিশ বছর বয়সের লোকও মৌচাকের গ্রাহক আছেন। তবে ছোট বেলা থেকেই আছেন এবং নিজের নামই রেখেছেন গ্রাহক হিসাবে। সোমনাথ, পাটনা—বিহারে খরার জন্য খুবই মানুষের যে দুর্দশা যাচ্ছে তা ঠিক। সরকার যথাসাধ্য করছেন তো। এ সময় বাংলাতেও খুব গরম ভাই। সাবিত্রী সাহা, পুরুলিয়া—মৌচাক তোমার ভাল লেগেছে শুনে আনন্দিত হয়েছি। তোমার মত নতুন বছরের মৌচাকের সুখ্যাতি করে অনেকেই চিঠি দিয়েছে। সত্যিই ভাল হয়েছে বৈশাখের মৌচাক।

রবি রায়, ত্রিপুরা; কুমকুম মিত্র, কলিকাতা; নমিতা ভদ্র, পুনা; প্রণতি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; রেখা ঘোষ দস্তিদার, জামসেদপুর—তোমাদের চিঠি পেয়েছি। যাদের চিঠির সঙ্গে লেখা ছিল, তাদের লেখাগুলি সম্পাদকের দপ্তরে দিয়ে দিয়েছি। সকলে শুভেচ্ছা ও প্রীতি নাও। তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য: ০'৫০ পয়সা

কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিস

✻ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✻
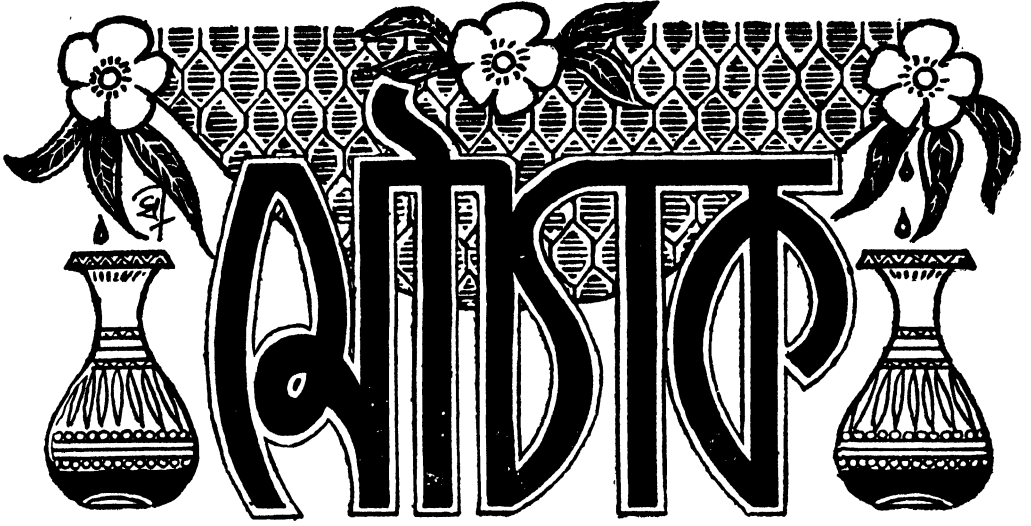
৪৮শ বর্ষ] আষাঢ় ঃ ১৩৭৪ [৩য় সংখ্যা

আজগুবী দেশ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

এক যে আছে আজব দেশ
পাবে না তার জুড়ি।
সেথায় বুড়োর মাথায় খোঁপা,
দাড়ি কামায় বুড়ি !

খোকার নাকে নোলোক ঝোলে,
খুকির ভীষণ ভুঁড়ি।
খুড়ো চিবোয় পুঁইয়ের ডাঁটা,
মুড়ো চিবোয় খুড়ি।

সেথায় কুকুর মুগুর ভাঁজে,
বেরাল ওড়ায় ঘুড়ি।
ইঁদুররা সব অ-আ পড়ে,
গানেতে দেয় তুড়ি।

বাদুড়গুলো হাট বাজারে
বেচে ফলের ঝুড়ি।
বাঁদর জড়ায় মুগার চাদর,
ছুঁচোয় পরে চুড়ি।

সেথায় উজির মিছরি দিয়ে
বানায় খাসা ছুরি।
চাপরাশি খায় সরের নাড়ু,
বাবুরা চায় মুড়ি।

ছেলে পড়ায়, বক্তৃতা দেয়
জাম-জারুলের গুঁড়ি।
মশারা সব কামড় ভুলে
চুষছে তালের মুড়ি।

সেথায় গজায় আঙুর-আপেল
ঘরের দেয়াল ফুঁড়ি'।
কোনো গরুই দুধ দেয় না,
ডিম পাড়ে এক কুড়ি।

ষাঁড়গুলো সব হাওয়া খেতে
যায় দীঘা ও পুরী।
ঘুম না এলে পরী এসে
দেয় গায়ে সুড়্‌সুড়ি।

অমিয়র হাতঘড়ি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নতুন টিউশনি, মাত্র তিনমাস পড়িয়েছে, এরই মধ্যে ছাত্রের বাবা অমিয়কে একটা সোনার ঘড়ি উপহার দিল। পঞ্চাশ টাকা মাহিনের মাস্টারকে চারশো টাকা দামের ঘড়ি দেবার মত ছাত্র-পিতা বাংলা দেশে নেই, তাছাড়া ছাত্র কোন পরীক্ষায় প্রথম হয়নি,—কোন পরীক্ষাই দেয়নি এর মধ্যে। তার উপর তিনি ঘড়ির কারবারীও নন, যে ঘড়ি নিয়ে চ্যারিটি করতে বসেছেন। তাহলে? এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে একটা ছোট ইতিহাস আছে, সেই কথাই বলি—

ছাত্রটি নিরুদ্দেশ হলো।

দশ বছরের ছেলে বিলু। বেশ চালাকচতুর ছেলে। পঞ্চম মানের ছাত্র। অমিয়র কাছে একবেলা পড়তো, অমিয় সেজন্য পেতো মাসে পঞ্চাশ টাকা। কনট্রোলের বাজারে লোহালক্কড়ের কারবার করে বাপ যথেষ্ট কামিয়েছে, একমাত্র ছেলেকে সে মানুষ করতে চায়। কুশলচাঁদ কালোয়ার বলে—আমি ক্লাস টেন অবধি পড়েছিলাম, আমার ছেলেকে গ্রাজুয়েট বানাতে হোবে মাষ্টারজী। টাকা-পয়সার ভাবনা আপনি করবেন না, যা খরচ হোবে আমি করবো। মানুষ কোরে দিন।

অমিয় বিলুকে মানুষ করতে লেগেছে।

লেগেছে মাত্র তিনমাস, এরই মধ্যে বিলু নিরুদ্দেশ।

রবিবার রাতে বিলুর মা বিলুকে নিয়ে সিনেমা গিয়েছিল, একখানি হিন্দী ছবি দেখতে। রাত্রে তাই নিয়ে বিলুর বাবা খুব বকাবকি করেছিল। কুশলচাঁদ বলে—সিনেমা দেখিয়ে ছেলেটাকে তুমি বখিয়ে দেবে।

মা বলে—ছবি দেখা যদি খারাপ হয় তাহলে এতো লোক দেখছে কেন?

বাবা বলে—কেউ দশ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না। হিন্দী ছবি দুনিয়ার ওঁচা।

মা বলে—বাংলা দেশে দু-পয়সা কামিয়েছ বলে আজ বাঙালী বনেছ, হিন্দী আজ বড় খারাপ হয়েছে, না?

—যাই হোক্, আমি চাই না যে হিন্দী সিনেমায় বিলু যায়, তুমি আর ওকে সিনেমায় নিয়ে যাবে না, আমি বার বার তোমাকে বারণ করেছি।

—ওকে সঙ্গে না নিলে আমি কার সঙ্গে যাবো?

—যাবে না। নয়তো একা যাবে।

—সে আমি যা বুঝবো তা-ই করবো!

বাপ-মায়ে রীতিমত কলহ বেধে গেল, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল, কুশলচাঁদ বিলুকে বললে—আমাকে না বলে আর কোনদিন সিনেমা যাবে না, বারণ করে দিলাম।

সারা বাড়ী থম্‌থম্‌ করতে লাগলো।

রাতে বামুনঠাকুর বিলুকে খেতে দিল, মা এলো না বিলু শুনলো—মাথা ধরেছে বলে মা শুয়ে পড়েছে।

বিলু গুম হয়ে গেল। পরদিন ভোর থেকে বিলুকে আর বাড়িতে পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যাবেলায় অমিয় যখন গেল, কুশলচাঁদ আকাশবাণী থেকে ফিরছে, বললে—বিলুকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, হাসপাতাল ও পুলিশে এত্তালা করেছি। এইমাত্র এলাম রেডিওতে খবর নেবার ব্যবস্থা কোরে। তুমি যখন এসেছ চল দিকি একবার খবরের কাগজের আপিসে যাই, একটা বিজ্ঞাপন লিখে দিয়ে আসবে। সন্ধান দিলে হাজার টাকা পুরস্কার দোব।

কুশলচাঁদ অমিয়কে মোটরে তুলে নিলে। মোটরে বসে সে বলে গেল গতরাত্রির সিনেমা যাওয়া থেকে আজ সারাদিন পুলিশ ও হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া অবধি। অমিয় সব শুনলো, বিলুকে খুঁজে পাওয়া নিয়ে তার দুর্ভাবনা হলো সত্যি, তবে তার চেয়ে বেশি মনঃক্ষুণ্ণ হলো, ছেলেটাকে যদি আর না পাওয়া যায় তাহলে পঞ্চাশ টাকার টিউশনিটা গেল।

ফেরার পথে অমিয়কে নামিয়ে দিয়ে কুশলচাঁদ বললো—বড় চিন্তায় আছি অমিয়বাবু, কাল সকালেই একবার আসবেন।

পরদিন সকালে অমিয়র অন্য কাজ ছিল, কিন্তু বড়লোককে খুশি রাখাও তো একটা বড় কাজ, যদি বিলুকে পাওয়া যায় তাহলে টিউশনিটা তো বজায় থাকবে। কাজেই অমিয় ঘুম থেকে উঠেই কুশলচাঁদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। কুশলচাঁদ তাকে দেখেই বললো এই যে, আপনার কাছেই গাড়ী পাঠাচ্ছিলাম, আপনাকে নিয়ে লালবাজার যাবো। কাল রাতে গুণ্ডারা চিঠি দিয়ে গেছে, এই দেখুন—

টেবিলের উপর পড়েছিল খাতার পাতা ছেঁড়া একখানা কাগজ। তাতে কাঁচা হাতে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা ছিল : Price 5000 rupees. Keep the money in the letter-box outside at night, and get back your kid in the morning. Inform the police and the kid is lost for good—Black Dragon.

কুশলচাঁদ বললো এটা নিয়ে লালবাজারে যাবো। তুমি চল।

—কিন্তু পুলিশে গেলে আপনার ছেলের তো বিপদ।

—তবে কি যাব না বলছ? টাকাটা দিয়ে দোব?

—সেটাই তো সহজ পথ।

—যদি বিলুকে তারা ফেরত না দেয়, আবার টাকা চায়, তখন ?

—সেও একটা কথা। দাঁড়ান আগে একটু ভেবে নিই।

—বেশ, তুমি ভাবো, আমি চুপ করে আছি।

কিন্তু কুশলচাঁদকে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে হলো না, সহসা অমিয় বললো—চলুন দিখি, আমি একবার বিলুর পড়ার ঘরে যাবো।

পড়ার ঘরে এসে অমিয় বিলুর হাতের লেখার খাতাগুলো টেনে নিয়ে চিঠির অক্ষরের সঙ্গে একে একে অক্ষর মেলাতে বসলো। তারপর দেখতে সুরু করলো বইয়ের র‍্যাক। পড়াশুনায় একটা নেশা ধরিয়ে দেবার জন্য অমিয় বিলুকে অনেক গল্পের বই পড়িয়েছে। বিলু ডিটেকটিভ বই পছন্দ করে; অমিয় তাকে অনেক বই কিনে দিয়েছে, বইগুলি সাজানো আছে র‍্যাকে। অমিয় সেইসব বই একে একে দেখতে সুরু করলো। কুশলচাঁদ বললো—এসব কি দেখছেন, ওখানে কি পাবেন ?

—এখান থেকেই হয়তো আপনার ছেলের সন্ধান পাব।

—এখান থেকে ?

হ্যাঁ।

কুশলচাঁদ চুপ করে গেল। অমিয় বই দেখতে লাগলো।

সহসা সন্ধান মিলে গেল, অমিয় একখানা বই খুলে পাতা ওলটাতে সুরু করলো। তারপর একটি পাতা খুলে কুশলচাঁদের সামনে ধরলো, বললো—পড়ুন তো ?

কুশলচাঁদ পড়লো—Price 5000 rupees. Keep the money in the letter box outside at night, and get back your kid in the morning. Inform the police and the kid is lost for good. You are a clever man, you have earned huge money—black money in black market, and we want five thousand out of it. It is a price to set your son free. If you try to play tricks with us, we shall show you a serious trick—the dead body of your son.—Black Dragon. [রাতে পাঁচ হাজার টাকা বাইরের চিঠির বাক্সে রাখবেন, আপনার ছেলেকে ফিরে পাবেন সকালবেলা। পুলিশে খবর দিলে ছেলেকে আর কোনদিনই পাবেন না। আপনি চালাক লোক। কালোবাজার থেকে অনেক কালো টাকা রোজগার করেছেন। তা থেকে আমরা পাঁচ হাজার টাকা চাইছি। এটা আপনার ছেলের মুক্তিপণ। আপনি চালাকি করার চেষ্টা করলে, আমরা আপনাকে

গুরুতর চালাকি দেখিয়ে দোব—আপনি দেখবেন আপনার ছেলের মৃতদেহ—কালো ড্রাগন।]

অমিয় বললো—এই চিঠির প্রথম দু'লাইন আপনি পেয়েছেন, এই কালো ড্রগনের লেখা। বাকিটা ড্রাগন লেখেনি, কারণ তার মনে ছিল না। আর লিখতে গিয়ে ড্রাগন ভুলে গিয়েছিল যে আপনার বাড়ীর বাইরে সারি সারি রেলিং দেওয়া বাগান, বাইরে কোন লেটার-বক্‌স্ নেই। আর এই হাতের লেখাটা আমার চেনা।

—কার হাতের লেখা ?

—আপনার ছেলের।

—আপনার ছেলের ?

হ্যাঁ। আপনার ছেলেকে কেউ চুরি করে নিয়ে পালায় নি। আপনার ছেলে কোথাও লুকিয়ে আছে।

—আপনি কি বলছেন মাষ্টার বাবু ?

'একখানা ভাঙা বেঞ্চির উপর শুয়ে বিলু ঘুমুচ্ছে।'
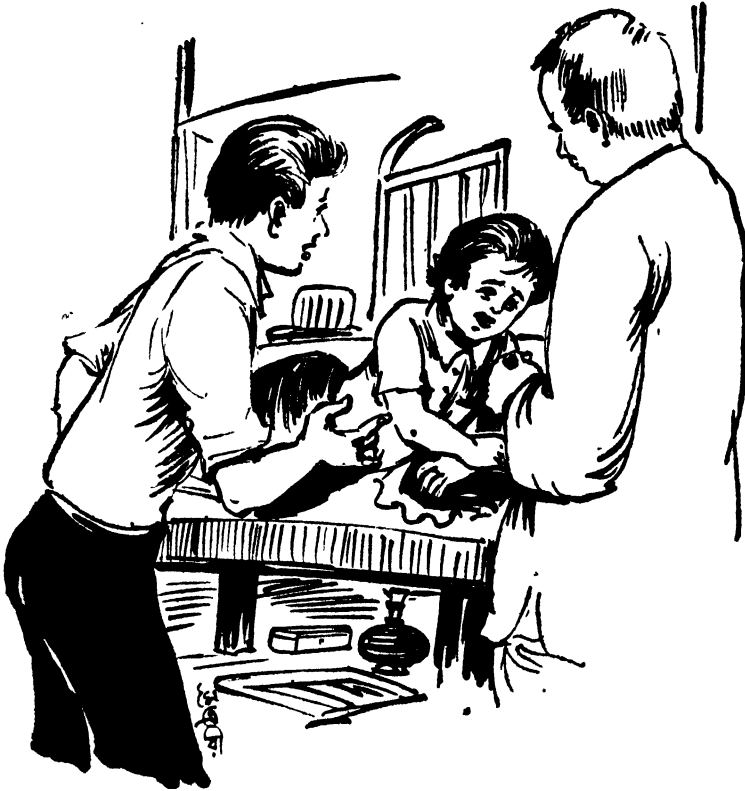
—আপনি সারা বাড়ীটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখুন তো ? এ চিঠি তো ডাকে আসেনি, দরজার সামনে ভোরবেলা পড়েছিল, যে লিখেছে, সে রাতে এখানে ফেলে গেছে।

রাতে ফটক বন্ধ থাকে, সে এই বাড়ীতেই আছে।

—ঠিক হ্যায়, এখনি দেখছি—কুশলচাঁদ তখনই বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সাড়া তুললেন। বাড়ীর সব ঘর দেখা সুরু হয়ে গেল। চিলে-কোঠার ঘরে দেখা গেল, একখানা ভাঙা বেঞ্চির উপর শুয়ে বিলু ঘুমুচ্ছে। সেটা ছিল ভাঙাচুরো জিনিস রাখার ঘর, কেউ সেখানে ঢুকতো না। নির্বিবাদে সেখানে সারাদিন বিলু কাটিয়ে দিয়েছে।

মা বললেন—কাল সারাদিন খেয়েছিস কি ?

বিলু বললে—কেন, বিস্কুটের টিন আর জলের কুঁজো নিয়ে গিয়েছিলাম।

বাবা বললেন—এতো দুষ্টবুদ্ধি মাথায় এলো কোত্থেকে ? কাল সারাদিন আমার হায়রানি হলো।

বিলু বললো—তুমি সিনেমা দেখা নিয়ে মাকে অতো বকলে, মা রাতে খেলে না, তাই তো আমি লুকোলাম।

কুশলচাঁদ আর কিছু বললো না, নীচে নেমে গিয়ে অমিয়কে বললো—আপনার খুব বুদ্ধি মাষ্টারবাবু—

অমিয় বললো—ছেলেকে ফিরে পেলে হাজার টাকা বকশিশ দেবেন বলেছিলেন সেটা দিন্।

কুশলচাঁদ বললো—আপনাকে আমি দোব, তবে হাজার দোব না। একটা সোনার হাতঘড়ি কিনে দোব। টাকা খরচ হয়ে যাবে, কিন্তু হাতঘড়ি যতদিন থাকবে আমার কথা মনে থাকবে।

—এবং আপনার টাকাও বাঁচবে—অমিয় বললো।

সেইদিনই বিকালে একটা ভালো সোনার হাতঘড়ি কুশলচাঁদ উপহার দিলেন অমিয়কে।

এমন ছেলে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

নাম দোব কি তোমরা বল
নাম দেওয়া কি সোজা ?
দেখবে দেখো দুষ্টুটাকে,
কিছু গেল বোঝা ?
বুঝবে কি আর ? বিচ্ছু ওটা,
কিচ্ছু তো নেই ভালো।
ছিঁচকাঁদুনে, গোমড়া মুখো
রঙটা বেজায় কালো।

সারাটা দিন চ্যাঁ-ভ্যাঁ ক'রে
বলবে ক্ষিদে ক্ষিদে
মা, দিদিমা হার মেনেছে
করতে ওকে সিধে।
হাসবে সে কি অট্টহাসি
ফাটল যেন বোমা।
রাগলে কোদো বাঘের মত
গর্জে ওঠে—ওমা !

চেহারাটা ? শুকনো কাঠি
হ্যাংলা, মাথা সার।
এমন ছেলে আছে ক'টা
বাড়ীতে বল কা'র ?
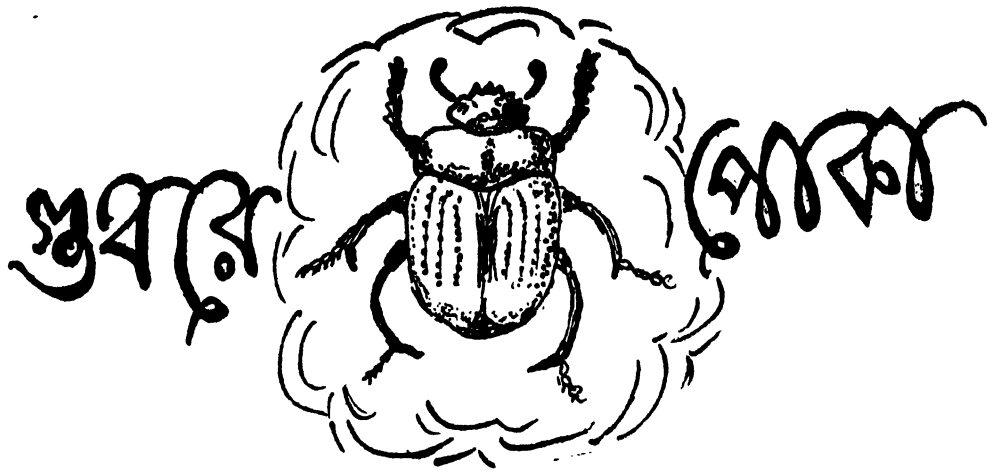
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

প্রায়ই দেখা যায়, কালচে রংয়ের মোটা একরকম পোকা—তার নিজের ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের একটা গোল ঢেলার মত পদার্থ তার পিছনের পা দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। এইগুলিই হচ্ছে গুবরে পোকা। গোবর এদের প্রিয় খাদ্য এবং গোবরের সঙ্গে আর আর অপরিষ্কার বস্তু যা পায় তাই মিশিয়ে এরা এদের খাদ্য-ভাণ্ডার তৈরি করে।

প্রাচীন ঈজিপ্টের লোকেরা এই গুবরে পোকাকে বিশেষ পবিত্র বলে মনে করত। তাঁদের ধারণা ছিল, গুবরে পোকা যে গোলাকার বস্তুটিকে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়—ওটা গোলাকার পৃথিবীরই একটা প্রতীক এবং ঐ গোল বস্তুটির মধ্যে থাকে ঐ পোকার ডিম।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গুবরে পোকা নোংরার এক শেষ এবং ঐ গোলাকার পদার্থটি তার খাদ্য-ভাণ্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই খাদ্য গোলকটি মোটেই সুন্দর জিনিস নয়; কারণ গুবরে পোকার কাজই হচ্ছে—রাস্তাঘাটের যত ময়লা কুড়িয়ে তারপর সেটা গোলাকার ক'রে জমা করে রাখা।

কি ক'রে গুবরে পোকা ঐ গোলকটি তৈরি করে তা বলছি: গুবরে পোকার চেপ্টা মাথাটায় আছে অর্ধবৃত্তাকারে ছ'টি দাঁত। এই দাঁতগুলি কতকটা বাঁকানো করাতের মত। এই করাত সে গর্ত করতে, কিছু কাটতে, যা সে চায় না সে সব বস্তু দূরে সরিয়ে দিতে এবং তার নির্বাচিত খাদ্যকে আঁচড়ে নিতে ব্যবহার করে। ধনুকের মত বাঁকানো তার সম্মুখের পা দু'খানিও যন্ত্র বিশেষ। ও দুটি খুব শক্ত এবং ঐ পায়ের প্রত্যেকখানিতে পাঁচটি করে দাঁত আছে। যেখানে খাদ্য-সংগ্রহ ব্যাপারে বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য খুব বেশি চেষ্টা করতে হয়, সেখানে গুবরে পোকা এই শক্ত পা দু'খানি ডাইনে ও বাঁয়ে চালিয়ে কাজ করে।

তারপর সে খাদ্যটাকে আঁচড়িয়ে নিয়ে তার পেটের নিচে, পিছনের চার পায়ের মধ্যে টেনে নেয়! এই পা চারখানি অপেক্ষাকৃত লম্বা, সরু এবং কিছুটা বাঁকানো। এগুলির মাথায় আবার হুল আছে। সংগৃহীত খাদ্যটাকে গুবরে পোকা তার পেটের নিচে ফেলে পিছনের পাগুলি দিয়ে একটা বলের মত ক'রে পাকিয়ে নেয়।

এইভাবে খাদ্য-গোলকটি যখন তৈরি হ'য়ে গেল, তখন চাই এটা রাখবার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা। গুবরে পোকা সেদিকে হুঁসিয়ার। সে ঐ জন্য চট্‌পট্ কাজ আরম্ভ করে দেয়। সে তার ঐ বলটি পিছনের পাগুলি দিয়ে চেপে ধরে সম্মুখের পা দিয়ে চলতে আরম্ভ করে। এই চলাটা অবশ্য উল্টো ভাবে ঘটে। সে তার মাথাটা নীচু ক'রে ও পিছন দিকটা উঁচু ক'রে পিছন দিকে চলতে আরম্ভ করে। একবার সম্মুখের ডান পা ও অন্যবার সম্মুখের বাঁ পা দিয়ে সে তার ঐ গোলাকার খাদ্য-ভাণ্ডারটি নিয়ে চলতে আরম্ভ করে। এরূপ স্থলে তার সমতল রাস্তা ধ'রে বা ঢালুর দিকে চলাই সহজ; কিন্তু সে তা মোটেই করে না! একটা খাড়াই জায়গা দেখে নিয়ে ঐ একগুয়ে গুবরে পোকা খাড়াইয়ের দিকে উঠবার চেষ্টা করবে! হয়ত এই ব্যাপারে এক সময় তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তখন বলটি নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তার মালিককেও নেয় টেনে। হয়ত পোকাটি কখনও উঁচু জায়গায় উঠে পড়ে; কিন্তু পরক্ষণেই তার নীচে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এইভাবে পনের-কুড়ি বার ওঠা-পড়ার মধ্যে এগিয়ে চলে গুবরে পোকা।

কখনও দেখা যায় গুবরে পোকাটি তার ঐ বলটি গড়িয়ে নেওয়ার কাজে কোনও বন্ধুর সাহায্য নেয়। সেটা এইভাবে হয়ঃ গুবরে পোকাটি হয়ত চলেছে তার বলটি গড়িয়ে নিয়ে, হঠাৎ আর একটি গুবরে—যার আবর্জনা কুড়াবার কাজ তখনও আরম্ভ হয়নি,—সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসে সাহায্য দান করতে ঐ আগের গুবরেটিকে। গুবরেটি এই অনাহূত অতিথির সাহায্যে বাধা দেয় না; কিন্তু শেষের সাহায্যকারী এই গুবরেটির আসলে কিন্তু মতলব ভালো নয়। সে এসেছে দস্যুবৃত্তি করতে!

নিজের থেকে খাদ্য-ভাণ্ডারের বল তৈরি করাটা তত সহজ নয়; সে জন্য ধৈর্যেরও দরকার। কিন্তু তার চাইতে পরের তৈরি খাদ্য-ভাণ্ডার চুরি করে বা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসা ঢের সহজ। ওদের সবাই অবশ্য চোর-ডাকাত নয়। কেউ সৎ উপায়ে জীবন নির্বাহ করে, আবার কেউ বা পরের তৈরি খাদ্য-ভাণ্ডার চুরি করে।

অনেক সময় দেখা যায়, গুবরে পোকাটি তার খাদ্য-ভাণ্ডারের বলটি নিয়ে যাচ্ছে; এমন সময় আর একটি পোকা উড়ে এসে তার বলের উপর ব'সে সম্মুখের পা দুটি বাড়িয়ে নানারকম কসরৎ আরম্ভ করে দিল! ভাবটা বলটি নিয়ে যেও না, তা হ'লে খুন করব!

বলের ঐ মালিকও তখন তার সম্মুখের পা দুটি বাড়িয়ে লেগে যায় যুদ্ধে—ভাবটা মগের মুলুক পেয়েছ নাকি? এস না একবার!

যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। ডাকাত যদি হেরে যায় তা হ'লে সে অমনি সুড়সুড় করে গিয়ে পাশের ঘাস জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে! আবার মালিক যদি হেরে যায় তা হ'লে মন-মরা হয়ে সে আবার ফিরে যায় আর একটা খাদ্য-ভাণ্ডার যোগাড় করতে। অবশ্য ওদের ঐ যুদ্ধকালে কখনও কখনও তৃতীয় আর একটি গুবরেকেও ফাঁকতালে বলটি নিয়ে সরে পড়তে দেখা গেছে।

মধ্যে মধ্যে আর একটা মজার ব্যাপারও ঘটে থাকে। ওদের মধ্যেই একরকম ঠগ গুবরে পোকা আছে। তারা থাকে ঠিক ভিজে বেড়ালের মত, কিন্তু শয়তানের ঝানু এরা। কোনও গুবরে পোকা যখন তার বলটি নিয়ে যাচ্ছে, তখন এদের কেউ এসে ওকে সাহায্য করবার ভান দেখায়। বালি কি ঘাসের ভিতর দিয়ে যখন বলটি গড়িয়ে নেওয়া হয়, তখন ঐ শয়তান এমন ভাব দেখায়—যেন সেও ঐ বলটিকে ঠেলছে; কিন্তু আসলে সে বিশেষ কিছুই করে না—বলটির উপর বসে থাকে মাত্র।

যখন ঐ খাদ্য-ভাণ্ডারকে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখবার উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায়, তখন ভাণ্ডারের আসল মালিক লেগে যায় গর্ত করতে। গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে মাঝে মাঝে সে উপরে উঠে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বলটি আছে কিনা দেখে যায়। তার ঐ ধূর্ত সঙ্গীটি তখন যেন কতই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে এই ভাব দেখিয়ে, বলটির উপর আধ-মরা হ'য়ে পড়ে থাকে। গর্তটি ক্রমেই গভীর হয়। মালিক গুবরে পোকার উপরে উঠে আসতে বেশ সময় লাগে তখন। এই অবসরে ঐ শয়তান গুবরেটি—চোর যে ভাবে পরের জিনিস নিয়ে পালায়, ঠিক সেইভাবে খুব তাড়াতাড়ি বলটিকে ঠেলে নিয়ে পালাতে যায়। এই সময়ে যদি ঐ খাদ্য-ভাণ্ডারের মালিক গর্ত থেকে উপরে উঠে এই ব্যাপার ধরে ফেলে, তা'হলে ঐ চোর এমন ভাব দেখায় যেন সে একেবারেই নির্দোষ—বলটি এমনিতেই গড়িয়ে যাচ্ছিল, সে ঠেকাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে!

তার কথা বিশ্বাস করে এবং যেন কিছুই হয়নি এইভাবে পরে আবার দু'জনে ঠেলতে আরম্ভ করে গর্তের দিকে।

কিন্তু ঐ চোরটি যদি খাদ্য-ভাণ্ডারটি নিয়ে সরে পড়তে পারে, তা'হলে মালিক গর্তের ভিতর থেকে উঠে তার বলটিকে দেখতে না পেয়ে বোকার মত চারিদিকে তাকাতে থাকে! তারপর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, হাত পা ঝেড়ে ঝুড়ে আবার নতুন করে খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ে।

চোর, জোচ্চোর বা ডাকাতের হাতে না পড়লে গুবরে পোকা তার খাদ্য-ভাণ্ডারটিকে এনে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে আবর্জনা দিয়ে গর্তটির মুখ বন্ধ করে দেয়। তারপর সে দশ-পনের দিনের মধ্যে আর গর্তের বাইরে আসে না, ব'সে ব'সে তার খাদ্য-ভাণ্ডার শেষ করে।

সন্ধ্যাবেলায় তোমরা আলো জ্বেলে হয়ত পড়াশুনা কি গল্পগুজব কচ্ছ, এমন সময় তোমাদের মাথার উপর ভোঁ ভোঁ শব্দ ক'রে আসবে এই গুবরে পোকা। তোমাদের মধ্যে যে চালাক, সে হয়ত বলবে,—সবাই হাত মুঠি কর গুবরেটা তা'হলে এক্ষুনি পড়ে যাবে। তোমরা হাত মুঠি করলে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পোকাটি বেশ জোরের সঙ্গে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল।

না, হাত মুঠি করবার জন্য ওটা পড়েনি—গুবরের স্বভাবই ওই। ভোঁ ভোঁ শব্দ করে বলে ওকে ভোমরা মনে ক'রো না কিন্তু। ভোমরার রং কুচকুচে কালো, গুবরের তা নয়। তা ছাড়া ভোমরা কেবল দিনের বেলায় উড়ে বেড়ায় এবং তাদের চারটি পাতলা ডানা বেশ দেখা যায়।

গুবরে পোকা আবর্জনা দিয়ে ছোট একটা ফলের মত তৈরি ক'রে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। আবর্জনার মধ্যে থাকে তার নরম খাদ্য-ভাণ্ডার। ডিম পাড়বার আট-দশ দিন পরে ওর ভিতর থেকে স্বচ্ছ চকচকে হলদে রংয়ের বাচ্চা বেরিয়ে ঐ নরম খাদ্যটা খেতে আরম্ভ করে। প্রায় মাসখানেক বসে বসে তার খাদ্য খেয়ে নিয়ে সে বেশ মোটা হয় এবং খোলস ছাড়ে।

এরপর তার রং হয় লাল ও সাদায় মিশানো। এই ভাবে তার আসল কালচে রংয়ে এসে পৌছালে তার পাগুলি বেশ শক্ত হয় এবং বর্ষায় মাটিটা নরম হ'লেই সে তার বাসা ভেঙ্গে মাটি ভেদ করে আলোর দিকে ছুটে আসে। উপরে এসেই সে লেগে যায় আবর্জনা ও গোবর ঘাঁটতে—খাদ্য-ভাণ্ডার সঞ্চয়ের জন্য।

"মনে রাখিও, ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসে। তাহাকে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইতে হয় না। অতএব যখন তোমার হৃৎপদ্মটি বিকশিত হইবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিবে। সর্ববিধ শিক্ষারই মূল কথা—আদান-প্রদান লেন-দেন। আচার্য দান করিবেন, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি চাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

চুহুলিকা আর লুচির মানুষ

শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

চুহুলিকার একবার জ্বর হ'ল আর তার ক'দিন পরেই তার গা মুখময় ছোট ছোট লাল ঘামাচির মতন কি সব দেখা দিল। ডাক্তার দেখে বললেন, 'ও হাম, জ্বর ছাড়লেও দু' সপ্তাহ স্কুল যাওয়া চলবে না বা অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা চলবে না। চৈতালিকে যতদূর সম্ভব আলাদা রাখতে হবে, বড় ছোঁয়াচে রোগ।'

বেচারি চুহুলিকার মহা মুস্কিল, কত আর একা একা বসে থাকবে সে? তার উপর স্কুল কামাই হচ্ছে দেখে জ্বর ছাড়বার ক'দিন পরেই তার মা আরম্ভ করলেন লেখাপড়া। দাদু রোজই খবর পান আর তার মনটা কেমন করে, মনে হয় যেন বনের পাখিকে খাঁচায় বন্ধ করা হয়েছে।

ক'দিন এই রকম কাটলো। রবিবার দিন যখন দিদিভাই, মঞ্জরী আর দাদু গাড়ি থেকে নামলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে নামলো একটা মস্তবড় বাক্স।' চুহুলিকা সেটা দেখেই জিগেস করল, 'এতে কি আছে দাদুভাই?' দাদু বললেন, 'খুলেই দেখ না।' চুহুলিকা বাক্স বাঁধা সুতোটার সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তির পর যখন সেটা খুললো, তখন তার মুখে আর আনন্দ ধরে না। রান্না করবার ছোট বাসনকোসন তার আগেও ছিল এক সেট, কিন্তু এটার বাসনগুলো এত বড় যে তাতে বেশ রান্না করা চলে। বাসনের সঙ্গে আরও একটা জিনিস ছিল যেটা চুহুলিকা চিনতে না পারায় দাদু বললেন, 'ওটা ষ্টোভ, ওতে স্পিরিট ঢেলে দেশলাই ধরিয়ে দিলে সত্যিই রান্না করা যায়। তা শুনে তো চুহুলিকার মুখের অবস্থাটি যা হ'ল বুঝতেই পারছো! দু'জনে ঠিক হ'ল যে এখনই রান্না করে দেখতে হবে। চুহুলিকার মা বললেন, 'কিন্তু স্পিরিট তো নেই।' চুহুলিকার মুখ শুকোতে দেখে দাদু বললেন, 'দেখি গাড়িতে আছে নাকি এক-আধ ফোঁটা।' এই বলে তিনি গাড়ি থেকে মস্ত এক বোতল স্পিরিট বার করে নিয়ে এলেন। আগে থেকেই এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন, ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াবে জেনে!

এখন প্রশ্ন উঠলো, কি রান্না হবে? কেউ বলল এক রকম, কেউ বলল আর এক রকম, শেষে দিদিমা বললেন, 'লুচি আর আলুভাজা কর, সেটাই সুবিধা, আর খেতেও

ভাল।' চুহুলিকা বলল, 'আমি আর দাদুভাই রাঁধব, আর কেউ রাঁধতে পাবে না।' মঞ্জরী বলল, 'ভাগ্যিস্ কি রান্না হবে ঠিক হবার পর বলল চুহু এই কথাটা, তা না হলে মা হয়ত বলতেন, মোচার ঘণ্ট রাঁধতে!' দাদু বললেন, 'কেন, আমি কি রাঁধতে জানি না? সেই বরোদায় থাকতে রবিবার সন্ধ্যাবেলা তুমি, নন্দা আর আমি মিলে রান্না করতুম না?' কথাটা সত্যি। রাঁধবার লোক ছিল না, কাজেই সপ্তাহে অন্ততঃ একবেলা দিদিমাকে রান্নার কাজ থেকে ছুটি দেবার জন্য ঐ ব্যবস্থাই করেছিলেন দাদু। নন্দা কিন্তু দাদুর প্রশ্নের জবাবে বলল, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু কি রান্না করতুম আমরা বলত?' বুঝিয়ে বলবার বোধহয় দরকার নেই যে, লুচি আর আলুভাজাই রান্না হ'ত!

দাদু কিন্তু দমবার পাত্র নন্, বললেন, 'আর গুরুদেবকে কে রেঁধে খাইয়েছিল?' দাদুরা তখন লিলুয়ায়। মীরতোলার উত্তর বৃন্দাবন আশ্রম থেকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আর তাঁর শিষ্য মাধবআশীষ এক বেলার জন্য তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন চুহুলিকার দিদিমার খুবই অসুখ, কাজেই দাদুই রেঁধেছিলেন তাঁদের জন্য খিচুড়ি আর টমাটোর চাটনী—প্রশংসাও পেয়েছিলেন খুব। কেনই বা হবে না, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাদুকে জানতেন খুবই অল্প বয়স থেকে। তখন তিনি লখনউ কলেজে পড়াতেন আর দাদুর সেজকাকার ছিলেন বিশেষ বন্ধু। তখনও সন্ন্যাস নেন নি, নাম ছিল 'রোনাল্ড নিক্সন'। চমৎকার ছবি আঁকতেন, দাদুর ছবি আঁকার হাতেখড়ি তাঁরই হাতে। দাদুর তখন বারো বছর বয়স, প্রতি শনিবারে সাইকিলে চড়ে যেতেন তাঁর বাড়ি ছবি আঁকা শিখতে। সেই থেকে দাদু গর্ব করে বলতেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রথম শিষ্য তিনিই, আর বাড়ির অন্য সকলের মতন তাঁকে সাধারণতঃ 'গোপাল কাকা' বললেও, কারুর উপর টেক্কা দিতে হলেই দাদু বলতেন, 'গুরুদেব'!

রান্নার বিষয় দাদুর কথা বলাটা দিদিমা বরাবরই অনধিকার চর্চা মনে করে এসেছেন, কিন্তু সেবারে দাদুর খিচুড়ি রান্নার গল্প সকলকেই শোনাতেন আর একটু গর্ব করেই বলতেন, 'ওঁর বেশ নুনের আন্দাজ আছে, জানো? নুনটা নিজেই দিয়েছিলেন!'

আটা মাখা হলে দাদু চুহুলিকাকে বললেন, 'ভাই, মঞ্জরীকে বল লুচিগুলো বেলতে, তা না হলে ও বেচারা মনে বড় কষ্ট পাবে।' আসল কথা, দাদু বেলতে গেলে লুচিগুলো গোল হয় না কিছুতেই। মঞ্জরী জানতো ব্যাপারটা, সে তাই চুহুলিকাকে বলল, 'না চুহু, দাদুভাই খুব সুন্দর লুচি বেলতে পারেন, ওকেই বল বেলতে।'

দাদু দেখলেন মুস্কিল। কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় চট্ করে তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। মনে পড়ে গেল, তিনি বরোদাতে কেমন নন্দা আর মঞ্জরীর জন্য লুচির মানুষ আর জীবজন্তু ভেজে দিয়েছিলেন, আর তাই নিয়ে তারা কি রকম আনন্দ

করেছিল। তিনি বললেন, 'গোল লুচি তো সবাই বেলতে পারে, কি বল ভাই? তার থেকে আমি তোমায় লুচির মানুষ ভেজে দি।' চুহুলিকা তো লুচির মানুষ হবে শুনে খুব খুসী, সে বলল, 'হ্যাঁ দাদুভাই, লক্ষ্মীটি লুচির মানুষ ভেজে দাও না।' দাদু বললেন, 'তা হলে মঞ্জরীকে রাজী কর যে সে লুচি বেলবে, আর আমি তাই থেকে কেটে কেটে মানুষ, হাঁস, মোরগ এই সব বানাবো।' চুহুলিকা তক্ষুনি, 'হ্যাঁ মঞ্জি, লক্ষ্মীটি মঞ্জি, বলে এমন মঞ্জরীকে চেপে ধরল যে, তার আর না করবার জো রইলো না।

সে প্রথম লুচিটা বেলতেই দাদু তা থেকে ছুরি দিয়ে কেটে একটা মানুষ বানিয়ে ফেললেন, আর তার পরেরগুলো থেকে হ'ল হাঁস, মোরগ, শেয়াল, আরও কত কি! গরম ঘীতে পড়তেই তো মানুষটা ঠিক লুচির মতন ফুলে উঠলো; তাই দেখে চুহুলিকার কি ফুর্তি! তারপর এক এক করে মোরগ, হাঁস প্রভৃতি আরও কত রকম জন্তু ভাজা হ'ল— সব শেষে ঘিয়ে পড়ল শেয়াল।

ভাজা শেষ হলে মানুষ আর জন্তুগুলো একটা থালায় সাজিয়ে চুহুলিকার সামনে ধরে মঞ্জরী জিগেস করল, 'কোনটা সব থেকে আগে খাবে—মানুষটা?' চুহুলিকা বলল, 'না, ওটা আমি খাব না, ওটা বড় সুন্দর হয়েছে।' মঞ্জরী বলল, 'তা'হলে শেয়ালটাও খেও না। ঐ মানুষের আর শেয়ালের খুব ভাল একটা গল্প আছে, দাদুকে বল সেটা বলতে।' চুহুলিকা বলল, 'হ্যাঁ দাদুভাই, বল না সেই গল্পটা। দাদু বুঝলেন যে, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে মঞ্জরী যেন আবার শিশু হয়ে গেছে আর গল্পটা শোনবার ইচ্ছে তার চুহুলিকার থেকে কম নয়! তিনি বললেন, 'তবে শোন বলি:

'এক ছিল কাঠুরে আর তার বৌ। তাদের কোনও ছেলেপুলে ছিল না বলে তাদের মনে বড় দুঃখ। এক মনে তারা ভগবানকে ডাকে, বলে, 'ঠাকুর, কত লোকে তোমার কাছে কত কি চায়, আমরা কিন্তু টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর কিছু চাই না তুমি আমাদের দয়া করে যা দিয়েছ তাই আমরা অনেক মনে করি। কেবল, ঠাকুর, আমাদের কোল-ভরা একটা ছেলে দাওনি, তাই বুকের ভিতরটা খালি খালি ঠেকে। পায়ে পড়ি ঠাকুর, আমাদের ছোট্ট একটা ছেলে দাও।'

এমনি করেই তাদের দিন যায়, এমনি করেই বছর ফুরোয়। দেখতে দেখতে কাঠুরে আর তার বৌ বুড়ো হয়ে গেল, তাদের ছেলে হবার আর কোনও আশা রইলো না। বুড়ি তখন কি আর করে? সে রোজ ক্ষীর দিয়ে ছোট একটা পুতুল গড়ে মন্দিরে দিয়ে আসে আর বলে, 'ঠাকুর তোমার দয়া হলে এই পুতুলই সত্যি ছেলে হয়ে উঠবে একদিন।'

অনেক দিন এই ভাবে কেটে গেছে; শীতকাল পার হয়ে বসন্তকাল এসেছে,

চারিদিকে পাতা-ঝরা শুকনো ডালে কচি কচি পাতা বেরিয়েছে আর গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাসন্তী রঙের কাপড় পরে চারিদিকে খেলে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে বুড়ীর মন বড়ই উতলা হয়ে উঠলো ; সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে একমনে ঠাকুরকে ডাকতো লাগলো আর ক্ষীর দিয়ে একটা পুতুল গড়তে লাগলো। মস্ত বড় পুতুল যেন একট সত্যিকারের চার বছরের ছেলে।

পুতুলটা সে এত মন দিয়ে বানিয়েছিল যে, তার মুখের হাসিটা দেখে সত্যিই ছোট শিশুর হাসির মতন মনে হচ্ছিল। বুড়ী আনন্দে বিভোর হয়ে তাই দেখছে আর দেখছে, এমন সময় সত্যিই পুতুলের চোখ দুটি নড়ে উঠলো। এ স্বপ্ন না সত্যি বুঝতে না পেরে বুড়ী চোখ ঘষে আবার তাকাতেই দেখে যে পুতুলটা উঠে বসেছে আর তার পর-মুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালালো !

'ধর, ধর', বলে বুড়ী ছুটলো তার পিছনে, কিন্তু সে তাকে ধরতে পারবে কেন ? বুড়ো ছিল বাগানে, সেও বুড়ীর চিৎকার শুনে ছুটলো ছেলেটার পিছনে, কিন্তু ছেলেটা জোরে হেসে বলে উঠলো :

'আমার সাথে ছুট লাগাতে
　　পারবে নাকো তুমি,
আমি হলুম ক্ষীরের ছেলে
ছুটবো তোমায় পিছে ফেলে
একি যাকে তাকে পেলে ?
　　ক্ষীরের ছেলে আমি !'

'ধর, ধর, ধর।' বুড়োবুড়ীর চিৎকারে গ্রামের লোকরাই শুধু নয়, তাদের গরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী সকলে ছুটলো ছেলেটার পিছনে, কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারলো না।

সবাইকে পিছনে ফেলে ছেলেটা দৌড়ল বনের ভিতর। সকলে ভাবল, এইবার ছেলেটা নিশ্চয়ই যাবে বাঘের পেটে। বুড়ী বেচারা তো হতাশ হয়ে বনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর মনে মনে বলতে লাগলো, 'ঠাকুর, এতদিন পরে সত্যিই যদি একটা ছেলে দিলে তবে তাকে এত দুষ্টু করে গড়লে কেন ? তাকে যে একবার কোলে নেবারও সৌভাগ্য হ'ল না আমার।'

এদিকে ছেলেটা হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে বনের ভিতর দিয়ে, এমন সময় এক হরিণের সঙ্গে তার দেখা। হরিণ বলল, 'বা রে, বেশ দৌড়োতে পার তো তুমি ! এসো দেখি কে জেতে ?' এই বলে সে ছেলেটার সঙ্গে দৌড়োতে লাগল। সমান তালে পাল্লা

দিয়ে ছুটছে দু'জনে, খানিক পরে হরিণ বলল, 'খুব বাহাদুর ছেলে তো তুমি! আমি কিন্তু আজ এইখান থেকেই ফিরলাম, আবার একদিন তোমার সঙ্গে 'রেস' হবে। এই বলে হরিণ ফিরে গেল।

এত দুর দৌড়ে ছেলেটা হাঁপিয়ে পড়েছে, এমন সময় এক শেয়ালের সঙ্গে তার দেখা। এইখানে চুহুলিকা লুচির শেয়ালটা দেখিয়ে জিগেস করল, 'এই শেয়াল?' দাদু ঘাড় নেড়ে বলে যেতে লাগলেন:

'আসলে শেয়াল তাকে আগে থেকেই দেখেছে আর বুঝেছে যে ছেলেটাকে দৌড়ে ধরা তার কর্ম নয়, তাকে একটু ফন্দি করে ধরতে হবে, সে তাই বলল, 'তুমি তো খুব দৌড়োতে পারো! কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি একটু হাঁপিয়ে পড়েছ, এসো আমার পিঠে বস, আমি তোমায় খুব সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।' ছেলেটা তো আর শেয়াল কি জিনিস জানে না? সে বেশ খুসী হয়েই শেয়ালের পিঠে এক লাফে উঠে বসল!
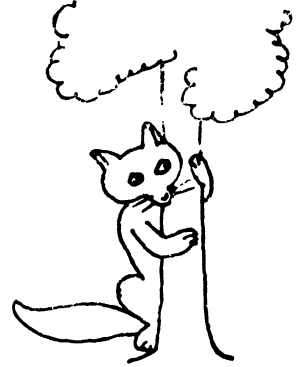
একটু দুর গিয়ে শেয়াল বলল, 'তুমি আমার লেজের বড় কাছে বসেছ, একটু ঘাড়ের দিকে সরে এসো তো!' ছেলেটা শেয়ালের কথা শুনে সরে বসল আর বলল:

'আমার বোঝা বইতে পারো সাধ্য তোমার কি!
তোমার কথা মতন তোমার ঘাড়ে বসেছি।'

শেয়াল বলল, 'এই ঠিক হয়েছে।'

খানিক দুর গিয়ে শেয়াল বলল, 'নাঃ, এ ঠিক হচ্ছে না। আমার মাথায় উঠে বসো তো, তাহলে ওজনটা ঠিক হবে।' ছেলেটা শেয়ালের কথা শুনে তার মাথায় সরে বসল আর গাইল:

'আমার বোঝা সইতে পার সাধ্য তোমার কি?
তোমার কথা মতন তোমার মাথায় বসেছি।'

শেয়াল বলল, 'এইবার ঠিক হয়েছে।'

আরও খানিক দুর গিয়ে দুষ্টু শেয়াল বলল, 'নাঃ, এও ঠিক হচ্ছে না, আরও একটু এগুতে হবে। তুমি আমার নাকের উপর এসে বসো তো দেখি!'

এই শুনে ছেলেটা আবার সরে শেয়ালের নাকের উপর বসতে যাচ্ছে এমন সময় একটা ছোট্ট নীল পাখী তার কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল আর বলল:

'নাকের উপর বসলে পরেই শেয়াল তোমায় খাবে,
ঘরের ছেলে ঘরে পালাও, সেথায় আদর পাবে।'

যেই এ কথা শোনা, ছেলেটা তো তড়াক্ করে শেয়ালের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়ে পিছন ফিরে দে ছুট! শেয়ালও ঘুরে তার পিছু নিল, ভাবল ছেলেটা হরিণের সঙ্গে দৌড়ে বেশ হাঁপিয়ে গেছে, তাকে সে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে। ছেলেটা কিন্তু এতক্ষণে শেয়ালের উপর বসে বেশ জিরিয়ে নিয়েছিল, সে হেসে বলল :

'আমার সাথে ছুট লাগাতে
পারবে নাকো তুমি,
ছুটছি আমি বাড়ির পানে
শুনতে যে পাই কানে কানে
কেমন করে মায়ে টানে
লক্ষ্মী ছেলে আমি!'

এই বলে সে এক দৌড়ে শেয়ালকে কোথায় পিছনে ফেলে গ্রামে পৌছে এক লাফে বুড়ীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর বুড়ীও তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো।

চুহুলিকা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল গল্পটা। সে জিগেস করল, 'তারপর?' দাদু বললেন, 'তারপর আর কি? ছেলেটা বুড়োবুড়ীর কাছে থাকতো আর কক্ষনো দুষ্টুমি করত না। বুড়োবুড়ীও ছেলে পেয়ে মনের সুখে থাকতে লাগলো!'

চুহুলিকা একটা খুসীর নিঃশ্বাস ফেলে লুচির শেয়ালটা তুলে বলল, 'এই শেয়ালটা ভীষণ দুষ্টু।' এ বলে সে দাঁত দিয়ে কট্ করে তার মাথাটা কেটে নিল আর তারপর সবটাই খেয়ে ফেলল। তারপর সে বলল, 'মা, মানুষটাকে আমি পুতুলের বাক্সতে রেখে দেবো, যদি ওটা সত্যি ছেলে হয়ে যায়!' চুহুলিকার মা এতে ভীষণ আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন দেখে দাদু তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বললেন, 'ওকে পুতুলের বাক্সয় রাখা ঠিক হবে না ভাই, তাতে কী লেগে-টেগে যাবে, তার চেয়ে বরং ওকে তুমি একটা থালায় রেখে, একটা বাটি চাপা দিয়ে দাও। আমার বোধহয় বাটিটার উপর একটা ওজনও চাপিয়ে দেওয়া ভাল হবে, যাতে ও বাটি উল্টে না পালাতে পারে।' বেশ মনের মতন ব্যবস্থা হ'ল দেখে চুহুলিকা খুব খুসী আর দাদুরাও খুসী হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা বেশ ভোরেই ঝনঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠলো। দাদু কানে তুলেই শুনতে

দাদু বললেন, 'ঐ ভয়ই আমি পেয়েছিলুম। যাক্‌, কি আর করা যাবে?'
বলল, 'আজ আমি আর স্কুলে যাবো না, মানুষটা যখন সত্যিকারের ছেলে হয়ে ফিরে আসবে তখন আমি এখানে থাকতে চাই। শেয়ালটা তো আমি খেয়েই ফেলেছি, কাজেই দুষ্টু শেয়াল আর ওকে ধরতে পারবে না।'

দাদু দেখলেন বিপদ! তাড়াতাড়ি বললেন, 'ও তো ভাই আর ফিরে আসবে না!' চুহুলিকা জিগেস করল, 'কেন?' দাদু বললেন, 'তোমার মা বাবার তো তোমার আর চৈতালির মতন দুটি সুন্দর বাচ্চা আছে, কাজেই সে আর তোমাদের বাড়ি এসে কি করবে? তার চেয়ে বরং সে যাবে এমন লোকের বাড়ি, যাদের ছেলেপুলে নেই বলে মনে বড় কষ্ট।'

টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়েও যেন চুহুলিকার খুসী-ভরা চোখ দুটি দাদু দেখতে পেলেন। সে বলল, 'হ্যাঁ দাদুভাই, সেই ভাল। আমি যাচ্ছি, মা ডাকছেন স্কুল যেতে।'
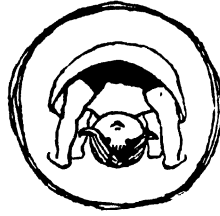
কুঁড়ে ঘর

ডাঃ ননীলাল দে

ভোট-কর্তা এসেছেন ঐ গাঁয়ের ভোট নিতে,
অট্টালিকায় বিরাট অফিস খোলেন হরষ-চিতে।
ভোটদাতারা ভোটও দিতে এলেন দলে দলে,
ব্যালট-পাতে গোপন ভাবে ভোটের কার্য চলে।
এসেছেন এক গাঁয়ের মোড়ল ভোটটা দেবার তরে
হাজির হলেন ভোট-কর্তার অফিস দালান ঘরে.
ব্যালট পেপার দিলেই তিনি, নিয়েই কোন মতে,
চিহ্ন দিবেন বলেই দ্রুত বাহির হলেন পথে।
ভোটের কর্তা শুধান ত্রাসে, বাইরে করেন কি?
ভোটার বলেন—এ দিকে যে সবই দালান দেখি,
ভোট দেব যে 'কুঁড়ে-ঘরেই' ছাপ দেব যে তাই,
দেখছি খুঁজে 'কুঁড়ে ঘর' একটা যদি পাই।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তারপর একদিন সত্যসত্যই ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে। গুনে গুনে ক'মাস পর পর। প্রথমে মন্ত্রীর বাড়ীতে,—তারপর সেনাপতির—তারপর কোটালের বাড়ীতে। কবার করে বাজবে মহারাজা বলে দিয়েছিল। ছেলে হলে পাঁচবার, আর মেয়ে হলে তিনবার। ক'বার বাজে তা বোঝার জন্য খড়্‌কে দিয়ে কান সাফ করে মহারাজা চোঙা লাগাল।

ঢোলের ডেডাং শব্দ শুনে মহারাজা মহারাণীকে বলে, "শুনেছ ?"

মহারাণী কানে খাটো। বলে, "হা। শুনেছি—তিনটে পাকাচুল।"

মহারাজা বলে, "হে হে পাকাচুল নয়,—ছেলে।"

মহারাণী বলে, "ভুল নয়। আমি এক এক করে তুলে গুনেছি।"

মহারাজা গলা তুলে মহারাণীকে বোঝায়। তখন মহারাণী কল্ কল্ শব্দ করে উলু দেয়। বলে, "খুব ভাল হ'ল। রাজার মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল চাই তো!"

মহারাণী অনেক খাজা-গজা তৈরী করিয়ে ওদের বাড়ী পাঠায়।

কিছুদিন পর রাজসভায় মন্ত্রী দাড়ি চুলকায়। মহারাজা বলে, "ছেলে হ'ল, তবে দাড়ি চুলকোয় কেন মন্ত্রী ?"

মন্ত্রী মুখ কালো করে বলে, "পেকেছে মহারাজ।"

মহারাজা বলে, "অ্যা! ভাল কথা নয়। দেখ তো আমার চুল।"

মন্ত্রী দেখে ভয়ে ভয়ে বলে, "তিনটে পাকা—"

মহারাজা বলে, "মহারাণী কাল তিনটে তুলেছে, ফের আজ তিনটে। এই মরেচে, তিন গোনা ভাল নয়!"

সেনাপতি গোঁফ নাবিয়ে বলে, "আমারও মহারাজ।"

কোটাল গালপাট্টায় হাত দিয়ে বলে, "মহারাজ আমারও।"

মহারাজা চিন্তা করে বলে, "এ কেমন হ'ল মন্ত্রী? এত বড় রাজপাট চালাতে হবে.— আর সবাই পেকে গেলাম। হয়ত ক'দিন পর পচে যাব। তখন—"

তখন কি হবে তা নিয়ে পরামর্শ হয়। পাখাবরদার জোর বাতাস করে, হুঁকোবরদার ছিলেম সেজে দেয়। অবশেষে তারা সবাই হেসে ওঠে। বলে, "আম পাকে, জাম পাকে, মামাবাড়ীর বেথুন পাকে। আমরা পাকব না? কাঁচার চেয়ে পাকার মিঠে স্বাদ।"

মহারাজা তারিফ করে বলে, "সাবাস!"

মন্ত্রী বলে, "কিন্তু মহারাজ।"

মহারাজা বলে, "আহা হা, আমি কিন্তু মহারাজ নই। কিন্তু জুড়লে কেন?"

মন্ত্রী হাত জুড়ে বলে, "আপনার নামে নয়। আমাদের নামে জুড়তে হবে, চন্দ্রবিন্দুর মত।"

মহারাজা বলে, "কেন?"

মন্ত্রী বলে, "আপনার ছেলের নাম রাজা। সে নাম মিলিয়ে আমাদের ছেলের নাম হবে মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল। এখন আমাদের হাল কি হবে?" মন্ত্রী প্রশ্নচিহ্নের মত ঘাড় বাঁকায়।

সেনাপতি বলে, "এখন নাম নিয়ে মারামারি না হয়!"

কোটাল চাপদাড়ি চট্‌কে বলে, "বাপবেটায় ঝটাঝটি! লেঠার কথা।"

মহারাজা বলে, "আঁটসাট মন্ত্রণা কর।"

জোর যুক্তিতর্ক হয়। নামের আগে পাকা, ঝুনো, বুড়ো, কি জোড়া যায় তা নিয়ে বিষম তর্ক!

কোটাল বলে, "বড় ছোট হিসেবে 'রাম' ভাল শব্দ। রামদা, রাম পাঠা, রাম ছাগল।"

মন্ত্রী খুঁৎ খুঁৎ করে। তার গালে রামছাগলের দাড়ি। তখন মহারাজা পকেট থেকে একটা মোহর বার করে। বলে, "লটারি করি। বল মুণ্ডু না লেজ (হেড্ না টেইল)?"

মন্ত্রী বলে, "মুণ্ডু, "আর সবাই বলে," লেজ!"

মহারাজা ডান হাতে মোহর ধ'রে, বুড়ো আঙুলের টোকায় তা ওপরে ছোড়ে।

মহারাজার ছোড়া! তা সাতিরে আটকে থাকে। সবাই হা করে থাকে; কিন্তু মোহর আর পড়ে না। ফল বোঝা যায় না, মাঝ থেকে মোহরও মারা যায়! কিন্তু বাঁচাল সেই হুতুম পেঁচা। সোরগোল শুনে, সে খোড়ল থেকে বেরিয়ে উঁকি দেয়। তারপর ডানার সাপট মেরে ওড়ে। সেই ধাক্কায় সাতিরে আটক মোহর ঝনাৎ করে মেঝেয় পড়ে।

মন্ত্রী হাততালি দিয়ে বলে, "হেড্! আমি ভেবেছি মহারাজার সঙ্গে মিলিয়ে সব নামে মহাশব্দ জোড়া।"

মহারাজা মাথা নেড়ে বলে, "আমিও মনে মনে তাই ভেবে হেড ধরেছিলেম।"

সবাই সায় দেয়। মহারাজা হুকুম দেয়, "সবার নামের আগে 'মহা' শব্দ জুড়ে দিলেম। এখন হতে তোমরা হলে গিয়ে মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি, মহাকোটাল। আর হুতুমের নাম হ'ল মহাহুতুম। সে ভালোমানুষ। মোহর ফিরিয়ে দিল।"

মহারাজা হুতুমের দিকে একমুখ ধোয়া ছুড়ে দিল। তারপর হাঁকল, "মহাফেজ—"

মহাফেজ মোটা খাতায় রাজ্যপাটের টুকিটাকি কথা টুকে রাখে। অনেক খুঁটিনাটি কথা লিখে লিখে নিজের শরীরে খুঁৎ ধরেছে। চোখে কম দেখে, কানে কম শোনে। পা গুনে গুনে চলে। তার চোখে পুরু কাচের সুতো-বাঁধা চশমা, আর দু'কানের ছেঁদায় কাগজের চোঙা। কানে কলম, হাতে দোয়াত, বগলে মোটা খাতা। সে এসে মহারাজাকে দণ্ডবৎ করে দাঁড়ায়। গলায় ঢেউ খেলিয়ে বলে, "মহারাজ!"

মহারাজ বলে, "মহাফেজ, লেখ।"

মহাফেজ শুন্‌ল, দেখ। ভাবল, মহারাজা কাছে যেয়ে কি দেখতে বলছে। সে চোখ উঁচু করে এগোয়।

এখন মস্তবড় বেদীর উপর মহারাজার সিংহাসন। ক'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। মহাফেজ সিঁড়িতে হোঁচট খায়—আর উল্টে পড়ে মহারাজার কোলে! হাতের দোয়াত কাত হয়, কালিতে মহারাজার গাল মাখামাখি!

সবাই হা হা করে ছুটে আসে। পাগড়ীর লেজ দিয়ে মহারাজার গাল মোছে। পান্থাবরদার খৈনী খায়। সে চুনের ডিবা হাতে এগোয়। মহারাজার গালে কালি, তা তুলতে চুন মেখে খোলতাই করে!

মহারাজা বিবেচক—বলে, "থাক, থাক। বুড়ো লোক, চোখে দেখে না। মহাফেজ, লেখ—"

এবার মহাফেজ শুন্‌তে পায়। সে হাটুভেঙ্গে খাতা খুলে বসে। মন্ত্রী বলে, "মহারাজ, আর একটি কথা আছে। ভয়ে বল্‌ব, না নির্ভয়ে বল্‌ব?"

মহারাজ বলে, "নির্ভয়ে বলো।"

মন্ত্রী বলে, "মহারাজ, শকুন দেখেছেন তো? অনেক উঁচু থেকে ওরা ভাগাড় দেখে। তেমি আমাদের দেখতে হবে ভবিষ্যৎ,—অর্থাৎ কাল কি হবে তাই। আমাদের নামের আগে মহানাম জুড়ে মহাশয় করলেন। সদরমহল ঝক্‌ঝকে হ'ল। এবার অন্দরমহলের পালা। মহারাণীর সঙ্গে মিলিয়ে ওদের নাম রাখা হ'ক—মহামন্ত্রিনী, মহাসেনাপত্নী, মহাকোটালনী।"

মহারাজা সায় দিয়ে বলে, "ঠিক।"

মন্ত্রী বলে, "আর ছেলেরা বড় হয়ে বৌ আন্‌বে তো! তাদের নাম রাখা হ'ক—মন্ত্রিনী, সেনাপত্নী, আর কোটালনী।"

মহারাজা বলে, "বাঃ! এত বুদ্ধি বলেই তো মহামন্ত্রী। মহাফেজ, বুঝ্‌লে?"

মহাফেজ বলে, "দোয়াতের কালি?"

মহারাজা বলে, "উহু। মন্ত্রী যা পেশ করল আমি পাশ করেছি। টুকে নাও।"

মহাফেজ বলে, "দোয়াতের গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে এনেছিলেম মহারাজ। তবু উল্টে সর্ব্বনাশ। কালি নেই। কি দিয়ে লিখি?"

মহারাজা হাঁক দেয়, "পানিপাঁড়ে—"

পানিপাঁড়ে জল নিয়ে আসে। মহারাজা গাল কুঁচকায়। অর্থাৎ—

মহাফেজের দোয়াতে জল দাও। কিন্তু পানিপাঁড়ে ইঙ্গিত বোঝে না। জল দিয়ে মহারাজার গালের চুন-কালি ধুয়ে দেয়। তারপর ছোট্ট আয়না তার মুখের কাছে ধরে। সত্যই মহারাজার গালে চুন-কালি নেই। তখন সবাই জয়ধ্বনি করে। আর মহাফেজ জলো-কালিতে লিখে নেয়।···

(ক্রমশঃ)

"যখনই আমোদ-প্রমোদে লোকের চিত্ত প্রধাবিত হয়, তখনই মনের বলবীর্য ও শান্তির অপচয় হইতে আরম্ভ হয়, তখনই জাতীয় অবনতি ও অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। দেশের মধ্যে রঙ্গরসের যত আধিক্য হইবে, ততই দেশের হৃদয় দুর্বল হইয়া যাইবে।"

—কৃষ্ণানন্দ স্বামী

হাতে খড়ি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

শীতের সকাল। কুয়াশা কেটে গেছে, গা ভরে মিঠে রোদ পোহাতে কী আরাম। নদীর পারে বালুর চড়া থেকেও একটু তাতের আমেজ আসছে। ওপারে বনজঙ্গল আর পাহাড়ের সারি। রাতভোর সেখানে চলে পশুরাজ্যের ব্যস্ততা। কেউ ছোটে শিকারের সন্ধানে, কেউ পালায় প্রাণ বাঁচাতে। এখন তাদের ঘুম ও বিশ্রামের সময়। বনজঙ্গল এখন নীরব। এপারটা অনেক ফাঁকা। অনেক দূর পর্যন্ত ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের ছড়াছড়ি। মানুষের আনাগোনা নেই এই দুর্গম অঞ্চলে।

মা-সিংহিনী শুয়েছিল বালুর চড়ায়, তন্দ্রার আলস্যে তার চোখ আধ-বোজা। বাচ্চা দুটো দৌড়ঝাঁপ ও ছুটোছুটি করে, কখনো বা তার গায়ের উপরে গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করে। ওদের বয়স হলো প্রায় তিন বছর। এবার ওরা সাবালক হয়ে উঠল বলে। নিজে নিজে শিকার করাটা যদি ওরা রপ্ত করে নিতে পারে, তবে আর মায়ের চিন্তা কি? ইদানীং মা ওদের সঙ্গে নিয়েই শিকারে বেরোয়, শিকারে ওরা যোগও দেয়: শিখে নিচ্ছে একটু একটু করে, শিকারে তারা কিছুটা সাহায্যও করে। সেদিন বড়কা সঙ্গে না থাকলে মোষটা আর একটু হলে পালিয়ে যাচ্ছিল। মা ঝোপের আড়াল থেকে ওত পেতে দৌড়ে গিয়ে যখন ঝাঁপিয়ে পড়বে মোষের উপরে, তখন আচমকা একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে তার নিশানা প্রায় ফস্কে যাচ্ছিল, শিকারও হাতছাড়া হয়ে যেত। কিন্তু বাহাদুর ছেলে বড়কা, সেও ওত পেতে ঠিক তাক্-মাফিক লাফ মেরে মোষের ঘাড় কামড়ে ধরেছিল। ততক্ষণে মা টাল সামলে ছুটে এসে বাছাধনকে সাবাড় করল। সেদিন বড়কা না থাকলে শিকার জুটত না, উপোস করে থাকতে হ'ত তিনজনকে। হাজার হোক, ব্যাটা ছেলে তো! তার সাহস আর তেজবীর্যই আলাদা রকমের। ছুটকীটা কিন্তু এখনো খুকীই রয়ে গেল। পাকা শিকারী হতে তার আরো সময় লাগবে। কী কষ্টে যে ওদের খাওয়া জোটাচ্ছে আর মানুষ করছে, তা একমাত্র মা-ই জানে। যতদিন ওরা বুকের দুধ খেত, ততদিন অত চিন্তা ছিল না। অবশ্য তখনো নিজের পোড়া পেটের ধান্ধায় তাকে ঘুরতে হ'ত। তখন আবার ওদের একলা ছেড়ে যাওয়াও ছিল বিপদ। পাহাড়ে জঙ্গলে দুশমনের অভাব নেই। হায়েনা, চিতাবাঘ, নেকড়ে, গণ্ডার, হাতী—এদের কারো পাল্লায় বাছারা পড়লে কি আর রক্ষা থাকত? একটা বাঁচোয়া যে, সিংহের আস্তানার আশেপাশে তাদের গায়ের গন্ধ ভুরভুর করে, বাতাস রটিয়ে বেড়ায় সেই গন্ধের খবর, আর পশুরা সতর্ক হয়ে শতহস্ত দূর দিয়ে চলাফেরা করে। তারা কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়—হাজার হোক, কোন্ পশুর ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে, পশুরাজের বংশকে সমীহ না করে চলবে? কিন্তু

শয়তানী বুদ্ধিতে ওরা কম যায় না। বাচ্চাদের যদি একলা ঘুরে বেড়াতে দেখে আর টের পায় যে, মা-বাবা কেউ কাছে নেই, তবে সিংহের বাচ্চা বলেই কি তারা আর রেহাই পায়? বিশেষ করে হায়েনা, চিতা আর নেকড়েগুলো হচ্ছে বজ্জাতের ধাড়ী। কত দিক সামলে কতকিছু ভেবেচিন্তে চলতে হয় মা-সিংহিনীকে। তাই বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে তবে সে বেরোতে পারত শিকারে। তাও বেশি দূর বা বেশিক্ষণের জন্য কি যাওয়া চলত? অত বাঁধাবাঁধির মধ্যে কি আর সব সময় শিকার জোটানো যেত? কতদিন উপোস থাকতে হয়েছে তাকে। সেইসব পুরানো দিনের কথা মনে আসছিল সিংহিনীর। আয়েস করে সে রোদ পোহাচ্ছিল।

হঠাৎ ছুট্‌কীর ডাক শুনেই সিংহনীর ঘুমের চট্‌কা ভেঙে গেল। ব্যাপার কি, বুঝে ওঠার আগেই সিংহিনী একটু মাথা তুলে ঘোঁৎ করে একটা ধমক দিয়ে উঠল। যদি দুশমন কেউ এসে থাকে, তাকে সতর্ক করে দেওয়া হবে, আর যদি বড়কা'র কোন দুষ্টুমি হয়ে থাকে, তবে তাতে তাকে শাসন করার কাজ হবে। সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল বড়কার কীর্তি দেখে নালিশ জানিয়েছিল ছুট্‌কী। বড়কা ছুট লাগিয়েছে পাড়ের ঝোপ-ঝাড়ের দিকে। হয়ত কোন খরগোশ দৌড়চ্ছে আর পিছনে তাড়া করেছে বড়কা। বড় দুরন্ত ছেলেটা। শাসন না মেনেই ছুটছে ঝোপের আনাচে-কানাচে। সিংহিনী এবার দাঁড়িয়ে উঠে বড়কার দিকে মুখ করে জোরে একটা গর্জন ছাড়ল। কিন্তু কোথায় কে? বড়কা কেয়ারও করল না। ব্যাটা ঠিক সিংহেরই বাচ্চা হয়েছে, একটু ভয়ডর নেই। এই ঝোপঝাড়ের দিকে অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। ছুটুক ব্যাটা যতক্ষণ পারে খরগোশের পিছনে। ওদের টিকিটিরও নাগাল কি আর সে পাবে? সেও তা বিলক্ষণ জানে, তবু ছুটোছুটি খেলার একটা অছিলা তো জুটেছে। দামাল ছেলে তাতেই খুশি। দেখতে দেখতে দিব্যি জোয়ান হয়ে উঠেছে বড়কা। মাথায় কি সুন্দর রেশমী কেশর গজিয়েছে, ঠিক রাজপুত্রের মত দেখায়। কিন্তু দস্যি ছেলেটাকে ভিতর থেকে কিসে যেন কেবলই তাড়া লাগায়, স্থির হয়ে থাকতে পারে না সে, দৌড়ঝাঁপ করতে না পারলে যেন তার পায়ের সিরসিরিনি থামে না—এত চঞ্চল! কখন কিসের খপ্পরে পড়ে, কে জানে? এই জন্যই বড়কা'কে নিয়ে সিংহিনীর এত দুর্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে একটু মুচ্‌কি হেসে সে ভাবল, আবার এই বেপরোয়া দুর্দান্ত ছেলেটার উপরেই তার কত ভরসা। বড় হলে বড়কা যে একটা সিংহযূথের সর্দার হয়ে উঠবে, এতে তার কোন সন্দেহ নেই।

সিংহিনী গর্জন ছেড়ে ছুট্‌কীকে নিয়ে বালুর চড়াতেই দাঁড়িয়েছিল, বড়কা'র পিছনে ধাওয়া করার কোন দরকার মনে করেনি। খানিক পরেই ছুটতে ছুটতে ফিরে এল বড়কা। এসে মার গায়ে মাথা ঘষ্‌তে লাগল। যেন বলতে চাইল—পারলাম না, মা। ক্ষুদে

শয়তানগুলো সুড়ুৎ করে পালিয়ে কোন্ ফাঁকে যে গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়ে, তার হদিস্ পাওয়া ভার। একটাকেও ধরতে পারলাম না। যাক, খানিকটা কসরৎ করে আসা গেল, কি বল মা? মা আদর করে বড়কা'র গায়ে মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে জিব্ দিয়ে চেটে দিতে লাগল। অমি ছুট্‌কী আদর কাড়বার জন্য গর-র্ গর-র্ করতে করতে ছুটে এল মার কাছে। সিংহিনী পর পর দু'জনকেই ভালো করে চেটে দিল। দু'জনেই খুশি হয়ে দৌড়ে চলে গেল ছুটোছুটি করতে। বড়কা একবার চুক্ চুক্ করে কিছু নদীর জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিল। সিংহিনী আবার গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঝিমুতে ঝিমুতে তার মনের কোণে আনাগোনা করে কত কথা। গাছের ঝরা-পাতার মত টুপ টুপ করে ঝরে পড়তে লাগল কত টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি। বড়কা ছুট্‌কীকে কোলে নিয়েই সে প্রথম মা হয়েছে। এই সময় সে সিংহযূথের সঙ্গে থাকতে পারলে কত সুবিধা হ'ত, সবাই তাই থাকে। তা হলে আর এত ভোগান্তি হ'ত না, দলের সবাই মিলে বাচ্চাদের দেখাশোনা করত, নিজের খাওয়ার জন্য নিজেকে তার এত ভেবে মরতে হ'ত না। সেও যূথ ছাড়া ছিল না, তারও যূথ ছিল, কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পর তাদের সঙ্গে আর সে থাকতে পারল কোথায়? সতীন-কাঁটা রয়েছে যে! ভাবতেই গায়ে জ্বালা ধরে। দুটো বাচ্চাকে নিয়ে নাজেহাল হতে হতে রেগেমেগে কতদিন সে ভেবেছে, এই বহুবিবাহের আপদ প্রথাটা সিংহসমাজ থেকে দূর হবে কবে? তিন চারজন সিংহিনী না থাকলে সিংহমহারাজদের চলে না! এত নবাবী কেন? মাথা ঠাণ্ডা করে কিন্তু সে আবার ভাবল, সিংহ বেচারাদের দোষ দিয়েই বা কি হবে? বাচ্চা হলে তাদের নিয়েই তো সিংহিনীকে ব্যস্ত থাকতে হয়। সিংহকে তখন অন্য সিংহিনী খুঁজতে হয়। কথায় বলে, পুরুষসিংহ। অন্য সমাজের কথা তার জানা নেই, কিন্তু সিংহসমাজে পুরুষরা মরদ বটে, তারা তিন চারজন বৌকে সন্তুষ্ট রেখে সকলকে নিয়ে সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারে। সেই ক্ষমতা তাদের আছে। সতীনরাও মিলেমিশেই থাকে। তার কপালেই শুধু সতীন-কাঁটা জুটল। এমন হিংসুটে সতীন আর সে দেখেনি! নিজের বাচ্চা হয়নি বলে সে হিংসায় মরে। বড়কা ছুট্‌কী ছিল যেন তার দু'চোখের বিষ। তাই বাচ্চাদের নিয়ে সিংহিনী সেই ডাইনীর আওতা থেকে সরে এসেছে। বাচ্চা হওয়ার আগে থেকেই অবশ্য সতীনের ভীষণ রাগ তার উপরে। তিনি পশুরাজের পাটেশ্বরী পাটরাণী হয়ে থাকতে চান। তাতে কে আপত্তি করতে গিয়েছিল? তুমি সিংহের জীবনে আগে এসেছ, থাক না তুমিই পাটরাণী হয়ে। আসল কথা তা নয়। সিংহিনী এবার একটু হাসল মনে মনে। সতীন তো পাটরাণী, কিন্তু সে নাকি সিংহের সুয়োরাণী হয়ে উঠেছিল। হিংসে সেই জন্যে। তা সিংহ যদি তাকেই বেশি পছন্দ করে, তবে সে কী করতে পারে?

সিংহিনীর চিন্তায় বাধা পড়ল। ভাইবোন দু'জনে হঠাৎ ছুটে এল তার কাছে। ছুট্‌কী এসেই দুই থাবা দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে জিব দিয়ে তার মুখ চাটতে লাগল। মাও তার সারা গা চেটে দিল। ছুট্‌কীটা বড় ন্যাওটা হয়েছে। বড়কা মা'র গায়ের উপরে দু'বার লুটোপুটি খেয়েই ছুট লাগাল একদিকে। খানিকটা গিয়ে দুই থাবা দিয়ে এক জায়গায় বালি খুঁড়তে আরম্ভ করল। ছুট্‌কীও তখন একদৌড়ে গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল। বেশ আছে দুটিতে মিলে, ভাবল সিংহিনী। শুধু যদি বাপের সঙ্গে ওরা থাকতে পারত, তবে সব দিক দিয়েই কত ভালো হ'ত। ছেলেমেয়ের দিকে সিংহের বেশ টান আছে, কিন্তু সিংহ যে সতীনকে একটু ভয় করে। তবু ফাঁক বুঝে মাঝে মাঝে আসে সে খোঁজখবর নিতে। এসে ছেলেমেয়েদের আদর করে, তাদের সঙ্গে একটু খেলাধূলোও করে। বড় শিকার জোটাতে পারলে মাঝে মাঝে মুখে করে নিয়ে এসে তার ভাগও দেয় তাদের। মোটের উপর, সিংহ লোক খারাপ নয়।

খেলতে খেলতে ভাই বোন দু'জনে আবার এসে পড়ল সিংহিনীর কাছে। হঠাৎ বড়কা চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল ওত পাতার ভঙ্গীতে, তার দৃষ্টি সোজাসুজি নদীর ওপারের দিকে। সিংহিনী তাকিয়ে দেখল, জঙ্গলের ছোট ছোট গাছপালা নড়ছে হেলে-দুলে। নিশ্চয়ই কোন পশু কচি ঘাসপাতা খাচ্ছে। হরিণই হবে খুব সম্ভব। এদিকে সিংহিনী কিছু বলার আগেই বড়কা ছুট লাগিয়েছে নদীর পাড় ধরে উজান দিকে। সিংহিনী উঠে বসে তাকিয়ে রইল সেইদিকে, দেখা যাক কী মতলব শ্রীমানের। ছুট্‌কী মার লেজ নিয়ে খেলা করতে লাগল। ওমা! দেখছ কাণ্ড ছেলেটার! নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়কা নদীর ওপারে সাঁতরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। জঙ্গলের পশুটাকে শিকার করার ফন্দী এঁটেছে নিশ্চয়ই। এ পর্যন্ত সে নিজে নিজে একলা শিকার করেনি কোনদিন। আজ যদি শিকারে তার হাতে খড়ি হয়, তো হয়ে যাক না। সিংহিনী কোন বাধা দেবার চেষ্টা করল না। কী হবে জোয়ান ব্যাটাছেলের পিছনে টিক্‌টিক্ করে? দাঁড়াক সে নিজের পায়ে। সিংহিনী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বড়কার গতির দিকে। ঐ সে ওপারে পৌছল। ঐ সে ধাওয়া করেছে জঙ্গলের দিকে। করুক, আজ তেমন ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আর একদিন যা কাণ্ড করেছিল বড়কা, ভাবলে এখনো বুক দুরুদুরু করে সিংহিনীর। চলতে চলতে পথে হাতীর নাদ পেয়ে কী ফুর্তি বড়কার আর ছুট্‌কীর। সদ্য ফেলে-যাওয়া বড় বড় সব নাদের পিণ্ড, তখনো ধোঁয়া ছাড়ছে আর কী টাট্‌কা সুবাস ছড়াচ্ছিল। বড়কা তো একেবারে পাগলের মত পিণ্ডগুলোকে নিয়ে ফুটবল খেলা শুরু করে দিল। তারপর সেগুলোকে চট্‌কে তার উপরে গড়াগড়ি দিয়ে সারাগায়ে মাখতে লাগল। ছুট্‌কীও দাদার সঙ্গে কম মাতামাতি করছিল না। করুক, তাতে দোষের কিছু নেই। হাতীর নাদ

যে সিংহের গায়ে মাখবার সেরা সুগন্ধি পাউডার, তা কে না জানে? সিংহিনী নিজেও সেই নাদ মেখেছিল গায়ে। কিন্তু মুস্কিল বাধল যখন সামনের জঙ্গলে হাতীদের ডালপালা ভাঙার মড়্ মড়্ আওয়াজ ও কলরব শোনা গেল। তাদের গন্ধও ভেসে আসছিল বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গেই ওত পেতে বসল বড়কা। তখন সে আরো কত বাচ্চা! সিংহিনী তাকে
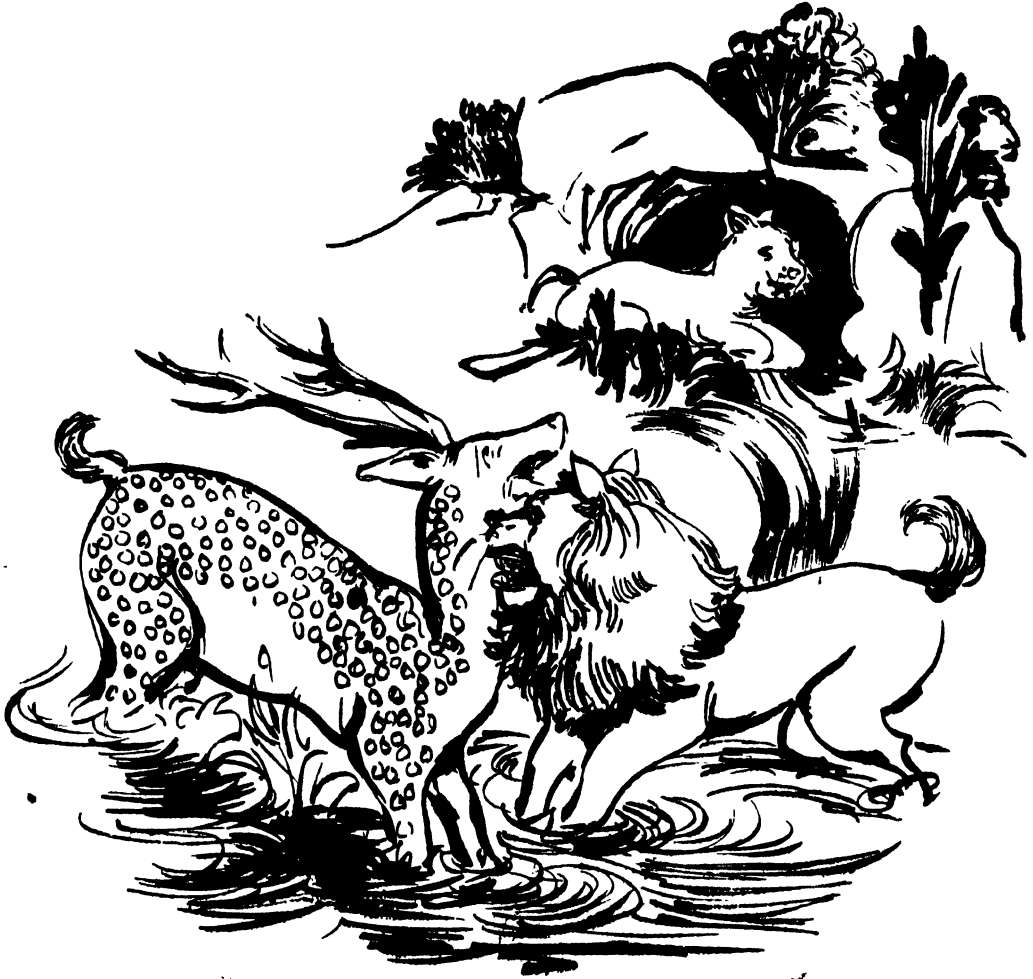
'সাবাস ছেলে! এবার জব্দ হবে হরিণ'—পৃঃ ১৩২

থামাবার জন্য একটা ধমক দিল। ঐ দৈত্যগুলোর সঙ্গে খেলতে যাওয়া যে কী সাংঘাতিক বিপদের মুখে পা বাড়ানো, তা সে বুঝবে কী করে? সিংহের উপরে হাতীদের কেমন এক জাতক্রোধ! বাগে পেলে তারা পশুরাজদেরও ঘায়েল করে ছাড়ে! বড়কা তো বলতে গেলে দুধের বাচ্চা, দানবগুলো তাদের দশমণী পায়ের তলায় পিষে ওকে থেঁতলে দেবে

না? বড়কা তো বুঝবে না—এমন গোঁয়ারগোবিন্দ! ধমক না শুনে হাতীর পিছনে ছুটবার জন্য তবু সে জেদ ধরল। সিংহিনী তখন তাকে মারল এক চাটি। তাতে তো দমল না সে। একরোখা অবুঝ ছেলেটাকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ল সিংহিনী। শেষটা সে বড়কা'কে চিৎ করে ফেলে দুই থাবা দিয়ে তাকে আটকে রাখলে আর নিজের শরীরের চাপে তার নড়াচড়া বন্ধ করল। খানিক বাদে হাতীগুলো দল বেঁধে চলে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিল সিংহিনী। ইস্! কী অনর্থই সেদিন ঘটাতে বসেছিল দস্যি ছেলেটা, ভাবলে আজও তার বুক কাঁপে!

ওপারের জঙ্গলের দিকে নজর সিংহিনীর। বড়কা ঢুকে পড়েছে সেখানে। তারপরেই জঙ্গলে লাগল তোলপাড়। আজ ভয়ের কিছু নেই, ভাবল সিংহিনী, তবু উৎকর্ণ হয়ে সে তাকিয়ে রইল। এমন সময় ঝুপ করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা হরিণ। তার অনুমানই তা' হলে ঠিক ছিল। কিন্তু বড়কা'র শিকার যে ফস্কে গেল। ছাখো, ছাখো, হরিণটা সাঁতরে নদী পার হবার জন্যে এদিকেই ছুটে আসছে। তার পিছনে ধাওয়া করে বড়কা'ও লাফিয়ে পড়ল জলে। এপারের কাছাকাছি এসে হঠাৎ হরিণটার চোখ পড়ল সিংহিনীর দিকে। তখুনি থতমত খেয়ে ঘুরে আবার সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটল উল্টো দিকে। সিংহিনী একবার ভাবলো, লাফিয়ে পড়বে নাকি সে হরিণের ঘাড় মট্কাতে। তারপর ভাবল না, থাক বড়কা নিজেই তার শিকার সামলাক, হাতে খড়ি হয়ে যাক আজ তার। হরিণের তখন আর পালাবার পথ নেই। দেখতে দেখতে বড়কা সিংহবিক্রমে এসে চড়ে বসল হরিণের পিঠে। তারপর তাকে চুবুনি দিতে লাগল জলের নীচে। তুমুল ঝটাপটি চলল নদীতে। হরিণটা বড়কা'র অন্ততঃ দেড়গুণ বড়। কখনো দু'জনেই ডুবে যায় জলের নীচে, কখনো দেখা যায় শুধু হরিণের ঠ্যাং বা লেজ, কখনো বা বড়কা'র মাথা। আবার হয়ত ভেসে ওঠে দু'জনে। সিংহিনী আগ্রহে, উত্তেজনায় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেদিকে। ছুট্কীও দেখছিল ব্যাপার, সেও চাপা উত্তেজনায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। এদিকে বড়কা শিকারকে একটু কাবু করেই ঘাড় ছেড়ে দিয়ে কামড়ে ধরল তার গলায়। সাবাস ছেলে! এবার জব্দ হবে হরিণ। গলার নলী ছিঁড়ে গেলে আর কতক্ষণ টিঁকবে সে? ও মা! তারপর একী কাণ্ড! হরিণের গলার কামড় যে ছেড়ে দিল বড়কা! সঙ্গে সঙ্গেই হরিণের মুখটাকে আবার নিজের মুখের ভিতরে পুরে কামড়ে ধরল সে। বলিহারী যাই! এ যে পাকা শিকারী হয়ে উঠেছে। হরিণের শ্বাস বন্ধ করিয়ে, দম আট্কিয়ে মারবে তাকে। এবার লড়াই ফতে। আর কতক্ষণ যুঝতে পারে বেচারা? বাহাদুর ব্যাটা! পুত্র-গর্বে ভরে উঠল সিংহিনীর বুক। বিশাল শিকারটাকে টেনে টেনে বড়কা পাড়ের কাছে আসতেই এগিয়ে গেল সিংহিনী। দু'জনে মিলে শিকারকে টেনে তুলল উপরে। হাঁপিয়ে গিয়েছিল বড়কা, জল ঝরছিল তার সারা গা থেকে। সিংহিনী আদর করে তাকে জিব দিয়ে চেটে দিতে লাগল। ছুট্কী শিকারের উপরে গড়াগড়ি খেয়ে নাচানাচি শুরু করে দিল।

শিকারে আজ হাতে খড়ি হয়ে গেল বড়কা'র। সিংহিনীর আর চিন্তা কি? এবার সে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফিরে যাবে নিজেদের যূথে। সতীনকে আর সে পরোয়া করে না, ছেলে তার লায়েক হয়ে উঠেছে।

উড়ন্ত বাক্স

শ্রীশান্তা দেবী

একছিল সওদাগর; তার ধন-দৌলতের সীমা ছিল না। ইচ্ছে করলে সে তার বাড়ী ঘরের মেঝে রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু সে রকম করে টাকা নষ্ট করবার খেয়াল তার ছিল না। সে বাণিজ্যের উপর বাণিজ্য করে টাকা ক্রমেই বাড়াতে লাগল। তারপর যখন তার জীবন শেষ হয়ে গেল, তখন তার ছেলে ঐ সব ধনদৌলত পেল।

ছেলেটা কিন্তু অন্যরকম। সে জীবনটা ফুর্তি করেই কাটাবে ঠিক করলে। রোজ সন্ধ্যায় নাচগান যাত্রা নিয়ে মেতে থাকত। টাকাপয়সা এমন করে ছড়াত যেন খোলামকুচি।

কাজেই দেখতে দেখতে সব টাকাকড়িই উড়ে শেষ হয়ে গেল। বাকি রইল কিছু খুচরো পয়সা। কাপড়-চোপড় বলতে একটা আলখাল্লা আর একজোড়া চটি মাত্র তার সম্বল তখন। বন্ধুবান্ধব সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল, কারণ তার কাছ থেকে কিছু তো আর পাবার আশা ছিল না। তারি মধ্যে একটা লোক ছিল একটু ভাল। সে সওদাগর পুত্রকে একটা বাক্স পাঠিয়ে দিলে আর বললে, "তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাও।" উপদেশটা ভালই; কিন্তু বাক্সে ভরবার মত কোনো জিনিসই তার ছিল না, তাই সে নিজেই বাক্সের মধ্যে ঢুকে বসল।

বাক্সটা ভারী অদ্ভুত। চাবিটা বন্ধ করে দিলেই ওটা উড়তে পারত। বণিকপুত্র চাবি এঁটে দিল আর বাক্সটা অমনি ওকে নিয়ে শূন্যে উঠে গেল। তলার দিকটা ফেটে গেল, কিন্তু একেবারে দু'টুকরো হ'ল না। কাজেই বণিকপুত্র শূন্য থেকে নীচে পড়ে গেল না।

নিরাপদেই বাক্স এসে নামল তুরস্ক দেশে। ছেলেটি একটা জঙ্গলের মধ্যে শুকনো ডালপালা চাপা দিয়ে বাক্সটা রেখে দিলে। তারপর পাশের শহরে হেঁটে চলে গেল। ওদেশে সবাই আলখাল্লা আর চটি পরেই বেড়ায়, কাজেই বণিকপুত্রের কোনো অসুবিধা হ'ল না। পথে দেখলে একটি মেয়ে ছেলে কোলে করে চলেছে। সে বললে, "হ্যাঁ মা, ঐ যে বড় বড় দরজা জানালাওয়ালা প্রাসাদ, ওটি কার?"

মেয়েটি বললে, "ও বাড়ীতে এখানের রাজার মেয়ে থাকেন। রাজকন্যার ভাগ্য গণনা করে শোনা গিয়েছিল যে, তাঁকে কেউ একজন বিবাহ করতে এসে দুঃখ দিয়ে যাবে। তাই যখন রাজারাণী সামনে না থাকেন তখন কাউকে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না।"

বণিকপুত্র বললে, "আচ্ছা আসি, নমস্কার।" এই বলে সে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে বাক্সটি বার করে তার মধ্যে বসে রাজকন্যার প্রাসাদের ছাদে উড়ে গিয়ে নাম্‌ল, তারপর জানালা দিয়ে গুড়ি মেরে রাজকন্যার মহলে গিয়ে ঢুকল।

রাজকন্যা পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। বণিকপুত্র পালঙ্কের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অমন সুন্দরী মেয়েকে দেখে তার হাতখানিতে একটু আদর না করে পারলে না। কন্যার ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু হঠাৎ একজন অজানা মানুষকে নিজের ঘরের ভিতর দেখে একটু ভীত হলেন। বণিকপুত্র বল্‌লে, "আমি তুরস্কের ভাগ্যনিয়ন্তা, ভগবানের অবতার, রাজকন্যাকে বিবাহ করবার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। শুনে কন্যা মহাখুসী; তখন তারা দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্প করতে লাগল।

বণিকপুত্র রাজকন্যার সৌন্দর্যের অনেক ব্যাখ্যা করতে লাগল: তার নীল সমুদ্রের মত চোখ, তুষারশুভ্র কপাল ইত্যাদি ইত্যাদি। অত স্তুতিবাদ শুনে রাজকন্যা খুসী হয়ে বিবাহে সম্মতি দিলেন।

কিন্তু পরে বললেন, "আপনাকে শনিবারে এখানে আসতে হবে। সেদিন সন্ধ্যায় রাজা ও রাণী আমার এখানে এসে খাবেন। যখন তাঁরা শুনবেন যে আমি ভগবানের অবতারকে বিবাহ করব, তাঁদের আনন্দের আর গর্বের সীমা থাকবে না। কিন্তু তাঁরা গল্প শুনতে ভারী ভালবাসেন। আপনাকে তাঁদের একটা গল্প বলতে হবে। আমার মা গল্পের মধ্যে উপদেশ ভালবাসেন, বাবা কিন্তু মজার গল্প ভালবাসেন। এমন গল্প চান, যা শুনলেই তাঁর হাসি আসে।"

বণিকপুত্র বললে, "আচ্ছা বেশ। আমি বিবাহের উপহারে গল্পই দেব।" এই বলে সে বিদায় নিল। রাজকন্যা তাকে সোনার হাতল দেওয়া একটা তরবারি উপহার দিলেন। এই উপহার দিয়ে যে কি করতে হবে তা তার বেশ জানা ছিল।

তারপর সে বাক্সে করে উড়ে গিয়ে একটা নূতন আলখাল্লা কিনলে, আর জঙ্গলে বসে বসে শনিবারের জন্য গল্প তৈরী করতে লাগল। গল্প তৈরী করা খুব সহজ কাজ নয়, তবু যাহোক করে শনিবারের মধ্যে গল্প একটা খাড়া হ'ল।

রাজকুমারীর প্রাসাদে রাজা রাণী আর সমস্ত সভাসদেরা তার অপেক্ষায় বসেছিলেন। বণিকপুত্রকে ঘটা করে অভ্যর্থনা করা হ'ল।

রাণী বললেন, "আমাদের একটা গল্প বলুন শুনি, এমন গল্প হবে যার গভীর অর্থ একটা থাকবে এবং যার থেকে কিছু শিক্ষা পাব।

রাজা বললেন, "কিন্তু গল্প বলে আমাদের হাসাতে হবে।"

বণিকপুত্র বল্‌লে, "তথাস্তু।" তারপর গল্প সুরু হ'ল :

"এককালে এক গোছা দেশলাইয়ের কাঠি ছিল, তারা তাদের উচ্চবংশের জন্য খুব গর্বিত ছিল। ঝাউ গাছের কাঠি, ঝাউ গাছ বনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু গাছ। দেশলাইগুলি একটা দুধের কড়াই আর একটা চকমকির বাক্সের মাঝখানে রাখা থাকত। এদের সঙ্গে দেশলাইরা অনেক সময় আগেকার গল্প করত।

একদিন বললে, "আমরা যখন সবুজ গাজের ডালে ছিলাম, তখন ভারী সুখের সময় ছিল। সকাল-বিকেল আমরা শিশিরকণার সরবৎ খেতাম, সারাদিন সূর্যের আলো ঝলমল করত আর ছোট ছোট পাখীরা আমাদের কত গল্প শোনাত।

আর আমরা ধনীও ছিলাম খুব। অন্ত সব গাছেরা শুধু গ্রীষ্মকালে সবুজ পাতায় সাজত, কিন্তু আমরা দারুণ শীতেও গ্রীষ্মের মতই সবুজ পোষাক পরে থাকতাম।

"শেষে একদিন কাঠুরেরা এল, তখন এক মহা প্রলয় হ'ল। আমাদের পরিবার ছন্ন-ভন্ন হয়ে ছড়িয়ে গেল। বড় গুড়িটি কেটে মস্ত একটা জাহাজের মাস্তুল করতে নিয়ে গেল। সারা পৃথিবীই সে জাহাজ ঘুরতে পারে। অন্ত ডালপালারা অন্যান্য কাজে নানা জায়গায় চলে গেল। আর আমরা দীন-দুঃখী আর সাধারণ লোকের জন্যে আলো জ্বালাতে রইলাম। দেখ কেমন করে অত উচ্চ বংশে জন্মে আমাদের শেষকালে রান্নাঘরে স্থান হ'ল।"

লোহার কড়াই বললে, "আমার কথা যদি শোন, সে আর এক ইতিহাস। যবে থেকে আমি এ দুনিয়ায় এসেছি, তবে থেকে আমাকে কেবল ঘসা আর মাজা হয়, আর তারপর উহুনে চড়ে দুধ ফোটাই আর রান্না চড়াই। সে যে কতবার তার আর ঠিক নেই! ভাল কাজ করতে আমি খুবই ভালবাসি। এ বাড়ীতে আমার মত কাজের জিনিস কমই আছে।

"খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে ঘসামাজা হয়ে তাকে বসে থাকাই আমার একমাত্র আনন্দ; তখন বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্পগাছা করি। আমাদের মধ্যে এক জলের বালতি মাঝে মাঝে বাইরে যায়, আর সবাই আমরা ঘরোয়া লোক, ·চুপচাপ বাড়ীর মধ্যে থাকি কাজ করি। বাইরের খবর আনে ঐ ঘাস-তোলা ঝুড়িটা; সে 'সরকার', 'জনসভা' কত কিছুর কথাই বলে। এখানে এক সময় একটা পুরানো কলসী ছিল, সে ওর কথা শুনে এমনি আঁৎকে উঠল যে তাক থেকে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।"

চকমকির বাক্স বললে, "তুমি বড় বেশী কথা বল। বিকেল ·বেলাটা আরামে আনন্দে কাটানো যাক্ না!" দেশলাইরা বললে, "আচ্ছা, কে কত উচ্চ বংশে জন্মেছে ঠিক করা যাক্ না!"

মাটির কলসী বললে, "না, না, আমি নিজের কথা বলতে চাই না। এস, অন্যরকম মানসিক আনন্দচর্চা করা যাক্। প্রতিদিন আমরা কত কি দেখি শুনি। তারই কথা বলে শুরু করব। বাল্টিক সমুদ্রের ধারে ছায়া-ঘন বনে···।

থালা-বাটিরা সমস্বরে বলে উঠল, বাঃ কি সুন্দর! এই রকম গল্পই চাই।

সেখানে একটি শান্তশিষ্ট গৃহস্থ ঘরে আমার যৌবন কেটেছিল। প্রতিদিন আসবাব ঝাড়া হ'ত, মেঝে ধোওয়া হ'ত, মাসে দু'বার পরদা চাদর সব বদল হ'ত।

চিরুনি বললে, কি সুন্দর! তুমি কি চমৎকার করে বর্ণনা কর। তোমার কথা শুনেই বোঝা যায় যে একজন মহিলা কথা বলছেন। কি পরিচ্ছন্ন গল্প!"

জলের বালতি বললে, ঠিক বলেছ। এই বলে সে একটি লাফ দিলে। তাতে খানিকটা জল মেঝেয় পড়ে গেল।

কলসী গল্প বলেই চলল, আরম্ভের মত শেষটাও সুন্দর হ'ল। থালারা সবাই হাত-তালি দিয়ে উঠল। চিরুনি কলসীকে শাকের জয়মাল্য পরিয়ে দিলে। অন্যরা খুসী হবে না বুঝেও ভাবলে আজ আমি ওকে জয়মাল্য দিলে, ও আমাকে কাল জয়মাল্য দেবে।

চিমটে বললে, "আমি এবার নাচ সুরু করব।" সে যা নাচ! এক পা শূন্যে ছুঁড়ে নেচেই চলল। তার নাচ দেখে চেয়ার-ঢাকা কাপড়টা ভয়ে ছিঁড়েই গেল। চিমটে বললে, "এবার আমাকে জয়মাল্য দেবে না?" তাকেও জয় মাল্য দেওয়া হ'ল।

দেশলাইরা ভাবলে, "যত সব অসভ্য ছোটলোক!"

এবার চায়ের কেটলিকে গান করতে বলা হ'ল, কিন্তু তার ঠাণ্ডা লেগেছিল। সে বললে, "উনুনে না চাপালে আমার গান আসে না। আসলে ও সব তার অহঙ্কারের কথা। সত্যি কথা বলতে চায়ের আসরে না বসলে সে গান করে না।

জানালার তাকে একটা পুরানো কলম পড়েছিল, রাঁধুনী তা দিয়ে হিসেব লিখত। তার গা-ময় কালি ছাড়া আর কিছু বিশেষত্ব ছিল না; তাতেই তার অহঙ্কার। সে বললে, "কেটলি যদি গান না করে না করুক। বাইরে খাঁচায় একটা দোয়েল পাখী আছে, সে গান করতে পারে। অবিশ্যি সে গান কোনও দিন শেখেনি। যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় কারুর নিন্দে করব না।"

চায়ের কেট্‌লির বড় ভাই গরম জলের কেট্‌লি বললে, "এ বড় বাজে প্রস্তাব। একটা বিদেশী পাখীর গান কেন শুনচ? এই কি দেশপ্রেম হ'ল? আমি ঘাসের ঝুড়ির কাছে নালিশ করছি।"

ঘাসের ঝুড়ি বললে, "আমার বড়ই বিরক্ত লাগছে। এ রকম কথা যে ভাবাও যেতে

পারে মনে করে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। এমনি করে কি সান্ধ্য-মজলিস কাটাতে হয়? এ সভার একটা পরিপূর্ণ সংস্কার হওয়া দরকার, এবং নূতন ভাবে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে

"শূন্য থেকে আতসবাজি বর্ষণ হতে লাগল"—পৃঃ ১৩৮

আবার সবাইকে স্থান দেওয়া হোক। তা'হলে সকলে নিজ নিজ যথাযথ স্থান পাবে; আর আমি এই বিপ্লবের দলপতি হব। তোমরা কি বল? এটা একটা কাজের মত কাজ হবে।"

সবাই চেঁচিয়ে বললে, "আমরা খুব হৈ চৈ বাধিয়ে দেব।"

ঠিক তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে গেল আর ঝি ঘরে ঢুকে পড়ল। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, একজনও নড়তে সাহস করল না; কিন্তু মনে মনে প্রত্যেক বাসনই ভাবছিল কি মহা কাণ্ড সে করতে পারে, এবং অন্যদের চাইতে সে কত উচ্চস্তরের।

সবাই ভাবছিল, "যদি এটা করতাম, সন্ধ্যেটা কি চমৎকারই কাটত।"

ঝি হঠাৎ একটা দেশলাই তুলে জ্বালল আর আলো ঝলমল করে উঠল।

দেশলাইরা ভাবলে, "এখন সবাই দেখে বুঝবে যে আমরা সব চেয়ে উচ্চবংশের। কি চমৎকার উজ্জ্বল আমাদের আলো। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই তারা নিভে গেল।"

রাণী শুনে বললেন, "চমৎকার গল্প। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সেই রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তোমার হাতেই আমরা কন্যা সম্প্রদান করব। রাজা বললেন, "আমিও সাদরে তোমায় বরণ করছি। সোমবার তোমার সঙ্গে আমাদের কন্যার বিবাহ হবে।"

বিবাহ ঠিক হয়ে গেল, তার আগের রাত্রে সারা শহর আলোয় সাজানো হ'ল। প্রজাদের দু'হাতে মিঠাই-মণ্ডা বিলি করা হ'ল। ছোট ছেলেরা 'জয় হোক' বলে চীৎকার জুড়ে দিল।

বণিকপুত্র ভাবলে, আমারও তো কিছু করা উচিত। এই ভেবে, সে অনেক বাজি, পটকা, তুবড়ী কিনে নিয়ে এল। সবগুলি বাক্সে ভরে নিজে সেই সঙ্গে আকাশে উড়ে চলল। শূন্য থেকে আতসবাজি বর্ষণ হতে লাগল।

সে কি আলোর খেলা!

তুর্কিরা বাজি দেখবার জন্যে এমন লাফ দিতে লাগল যে তাদের পায়ের চটি মাথার দিকে উড়ে যেতে আরম্ভ করল। আগে তারা এমন আতসবাজি কখনও দেখেনি। এবার তারা বুঝল যে, সত্যিই দেবতার অবতার রাজকন্যাকে বিবাহ করতে এসেছেন।

বণিকপুত্র বাক্স করে আবার সেই জঙ্গলে ফিরে এল। ভাবলে, এবার নগরের লোকেরা কি বলছে একটু শুনতে হবে। নিজের বিষয়ে জানতে কার না ইচ্ছা হয়?

নানা লোকে নানা রকম বলতে লাগল। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই এক মত। এত আশ্চর্য উজ্জ্বল সুন্দর আতসবাজি তারা কখনও দেখেনি।

একজন বললে, "অবতারকে স্বচক্ষে দেখলাম। তারার মত তাঁর চোখ দুটি। সাগরের সফেন ঢেউ-এর মত তাঁর দাড়ি।"

আর একজন বললে, "তিনি তো আগুনের পোষাক পরেছিলেন। ছোট ছোট দেব-

শিশুরা পোষাকের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল।"

আরও অনেক প্রশংসা সে শুনল। কাল তার বিবাহ; এখন সে একবার বাক্সে গিয়ে ঢুকবে।

কিন্তু বাক্স কই?

হায় হায়! বাক্সটা পুড়ে গিয়েছে। আতসবাজি থেকে একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাক্সের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তাইতেই বাক্সে আগুন ধরে যায়। এখন সমস্ত বাক্সটাই ছাই হয়ে গিয়েছে। বণিকপুত্র আর আকাশে উড়তে পারবে না। বেচারী তার ভাবী বধূর কাছেও আর যেতে পারবে না।

রাজকন্যা সারাদিন ছাদের উপর ভাবী বরের অপেক্ষায় বসেছিলেন; এখনও তাঁর আশা যায়নি। এদিকে বণিকপুত্র সর্বত্র গল্প বলে বলে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাজকন্যার প্রাসাদে দেশলাই-এর কাঠিদের বিষয় যে গল্পটা সে বলেছিল, তেমন সুন্দর গল্প আর একটাও বলতে পারে না।*

* বিদেশী গল্পের ছায়ায়।

দাদুর লাঠি

শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঠুকঠুকে বুড়োটির ঠকঠকে লাঠি
ভেঙে গেলে একদিন কি বিপদ হয়—
চেঁচামিচি হৈ হৈ কথা-কাটাকাটি
এটা ভাঙে, ওটা ভাঙে, সব নয়ছয়!
লাল মাথা পুলিশেরা জোরে ছুটে আসে,
ভাবলো কী চুরি হ'ল, সব শুনে হাসে,
হাসি শুনে দাদু জ্বলে তেলবেগুনে
বলে, 'যত পাজি সব বাটপাড় খুনে।
লাঠি গেলে লাঠি হয় একথা কে বলে
লাঠি গেলে আমি জানি সব যায় চ'লে—
আমি, হারু, শিবু, হীরা ঠিক তখনই
বলি, 'দাদু পাওয়া গেছে লাঠি এখনই,
চারজন চার লাঠি তোমারই তো দূত,
যখন যেমন বলো তখনই প্রস্তুত'—
'বেশ বলেছিস'—দাদু বলে সব শুনে,
এক লাঠি চার হ'ল, ভাল রূপে-গুণে।

(উপন্যাস)

ধূ ধূ করছে পথ·· কাঠফাটা রোদ্দুর—খুড়ো আর খুড়ী চলেছে তীর্থ-ভ্রমণে সে কত দূর! এ তীর্থ, ও তীর্থ। এ ঘাট, ও মন্দির। পুরাতন বট, ভাঙা দেউল। এদেশ ওদেশ—এ মুল্লুক, ও মুল্লুক···

এত ঘোরাঘুরি কেন রে বাপু? এত কী ধর্ম্মের নেশা? না, না, না, ধর্মের নেশা নয়। তারা পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াচ্ছে তিনটি মেয়ে।

মেয়ে? মেয়ের এত বা অভাব কী? তার জন্যে এত ঘোরাঘুরি কেন রে বাপু! এই তো আমাদের বাড়ীতে রয়েছে পুতুল, মমম্—হেনা, ঝুমা, মুকুল। ওদের বাড়ীর কুলি—ফুলি, কুসমী- সুষমা; ও পাড়ায় লছমি, যমুণী; কৃষ্ণা, তৃষ্ণা; রেবা, সেবা; মহনা মোহানা···তবে কেন এই বিদেশে ঘোরাঘুরি?

আরে বাপু, খুড়ো-খুড়ীর পছন্দ আছে—পছন্দমত মেয়ে খুঁজছে তারা। যে মেয়ে দেখে তাই যে তাদের অপছন্দ—তাইত খুঁজে খুঁজে হয়রান, লবেজান!

খুড়া চলেছে মোটা লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে—পিঠে ঝোল্লা, পরনে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ী, পায়ে শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতো···

খুড়ী চলেছে পিছনে পিছনে—লালপেড়ে শাড়ী গাছ-কোমর বাঁধা—নাকে নথ, কোমরে চন্দ্রহার, কানে মাকৃড়ি—খোঁপায় সোনার চিরুনি!

খুড়ী বলে আর কতদূর?

খুড়ো বলে প্রবোধ দিতে—ঐ যে দেখা যায় খেজুর বাগান, তার কোলে পাহাড়,

নীল-নীল, ছায়া-ছায়া—মাথার উপর মেঘের মায়া, মেঠোপথ আঁকা-বাঁকা—পাশে ক্ষেত চৌকো চাকা—

খুড়ী ভেংচে ওঠে—আর, এদিকে মোর কাঁকাল বাঁকা!

খুড়ো এগোয়—এই এসে পড়ল—এক পা, দু' পা যায় আর থামে। থামে আবার যায়—দুপুরের সুয্যি পশ্চিমে গড়ায়···

হঠাৎ দেখে ছায়া-ছায়া বিরাট এক পাহাড়ের কোলে মস্ত সিংদরজা—দুয়ার আঁটা, বন্ধ-সন্ধ,···দেখে মনে হয় অনেক কাল অনেক যুগ যেন এ দরজা খোলা হয়নি—অনেক কাল কেউ আসেনি এ পথে। মাকড়সা জাল বুনেছে চারদিকে।

খুড়ো দরজায় লাঠি ঠোকে—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠকাস্ ঠক্ দোর খোলো গো, দোর খোলো···

খুড়ী বসে পড়ে দোর ঠেসান দিয়ে—শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঝুম! সাড়া নেই, শব্দ নেই, কাকপক্ষী ডাকে না, বাতাস বায়ু বহে না, জীবজন্তু হাঁকে না, গাছপালা নড়ে না—বেলাও তো কৈ পড়ে না! এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা···কত সময় চলে যায়—খুড়ো আবার দেয় ধাক্কা—খুড়ী চেঁচায়—ও বাছা, দরজাটা একবার খেলো না গো—

পড়ন্ত রোদ্দুর তেমনি থাকে—সুয্যি ঠাকুর পশ্চিম আকাশে গড়াতে গড়াতে যেন গেছে আকাশের গায়ে আটকে, আটকে আছে পড়ন্ত বেলা, বেলা আর পড়ে না—ছায়াও আর নামে না···

খুড়ো অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ায়—লাগায় ঠেলা—হঁইও—হেঁইও!

দরজা হেলে না, দোলে না, টলে না, কাঁপে না—

খুড়ী মারে কপাটে কিল—দুম্ দুম্ দুম্ ··গুম্ গুম্ গুম্···

উহু হু হো হো—খুড়ীর হাতে লেগে গেছে, হাতটা খুড়ী মুখে ভরে দেয়।

একী! একী! খুড়ী আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে—মিষ্টি-মিষ্টি, পাটালী-পাটালী—

খুড়ো লাঠির মাথা দিয়ে ঘা মারছিল—ঠক্ ঠকাস্, ধাঁই ধপাস্, চটাস্ ঠাস্ ··

খুড়ীর কথা শুনে খুড়ো লাঠির আগায় জিভ ঠেকায়—চেঁচিয়ে ওঠে, আরে আরে যষ্ঠিমধু রে, উঁহুঁ—কেমন যেন চকোলেট্ চকোলেট্।

খুড়ো চেঁচিয়ে ওঠে, দরজাটা চকোলেট্ দিয়ে তৈরী—আমি হুড়কো আর কড়া দুটো খেয়ে ফেলি!

খুড়ী বলে, আমিও কব্জাগুলো খুলে খাই।

যে কথা সেই কাজ। দু'জনে খিদের জ্বালায় কচ্‌মচিয়ে চিবোয় আর চিবোয়—মিষ্টি

মিষ্টি—ক্রমশঃ কেমন ঝাল ঝাল লাগে—জিভ দিয়ে লালা গড়ায়—একি একি তাদের সারা গা দিয়েও ঘামের মত লালা গড়ায় যে! সেই সঙ্গে তাদের পা দুটো কেমন নাচের তালে নেচে উঠতে থাকে—ধেই ধেই! ধিন্‌তা ধিনা···দু'জনে সামনা-সামনি ভাল্লুক আর ভাল্লুকীর মত নাচতে থাকে—ধানের বনের চিংড়ির মত নাচতে থাকে—কোমরে দড়ি বাঁধা বাঁদরের মত নাচতে থাকে···

খুড়ো খুড়ীকে ধমকায়—নাচছ কেন? হুতুম থুমোর মত নাচতে লজ্জা করে না?

খুড়ী ভেংচি কাটে, আহা! ঢং! নিজে কি করছ? আহা ঠিক যেন হাতী নাচছে।

কিন্তু ওরা কেউই ইচ্ছে-সুখে নাচছে না, কে যেন ওদের নাচচ্ছে অসম্ভব একটা নাচের তাগিদে ওরা নাচছে.—আর সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কা, মরীচ, গরমমশলার ঝাল ওদের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়ে লালা ঝরাচ্ছে! এ সব ঐ চকোলেটের দরজা খাবার ফল তা'হলে।

ও সর্বনাশ! এ তারা কোন্ দেশে এল!

খুড়ো খুড়ী নাচতে নাচতে পালাবার পথ খোঁজে—নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়—এ-গলি—ও-গলি, এ-বাঁক—ও-বাঁক; ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে, উত্তরে-দক্ষিণে, পূবে-পশ্চিমে! কিন্তু ও হরি! কিছুক্ষণ বাদে দেখে তারা এসে পড়েছে সেই বদ্ধ সিংদরজার সামনে—একী গোলক-ধাঁধা নাকি!

খুড়ী ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে, ছোট মেয়ের মত ফুঁকিয়ে ফুঁকিয়ে—ব্যাস! আরেক বিপদ শুরু হয়—কান্না আর থামে না, নাচও থামে না, জল ঝরাও থামে না।

ওদিকে আরেক বিপদ! আরেক কাণ্ড! আশেপাশে সামনে-পিছনে যে সব ঝোপ ছিল তারা সব বলা নেই, কহা নেই, ক্রমশঃ হু হু করে বেড়ে উঠতে লাগল, লকলকিয়ে বেড়ে চলল—উঁচু হতে লাগল—চোখের সামনেই তারা বড় হয়ে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা তালগাছের মত হ'ল। তারপরও বাড়তে লাগল—মেঘ ছুঁলো, আকাশ ছুঁলো। সব অন্ধকার হয়ে গেল—আলো হয়ে গেল আড়াল। খুড়ো আর খুড়ী যেন একটা কৌটোর মধ্যে বন্দী হয়ে গেল।

উপায়? এখন উপায় কি? ভয়ে-ভাবনায় দু'জনে অস্থির। দু'জনের কান্নায় দু'জনের প্রাণ গলে যায়।

খুড়ো খুড়ীর মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না থামাতে গিয়ে দেখে—একী! খুড়ীর মুখে যে বকের মত লম্বা একজোড়া ঠোঁট্। খুড়ো চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, ওগো তোমার একি হ'লো গো!

নিরুপায় খুড়ো দরজাটা খুঁজতে লাগল, অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে।

হঁ্যা, এই তো দরজা। কিন্তু তারা তো হুড়কো আর কব্জাগুলো খেয়ে ফেলেছিল, তবে?—সেগুলো যেমন ছিল আবার তেমনি লাগানো রয়েছে যে! কে আবার সেগুলো ঠিক করে দিল?

খুড়ী বললে, চাবি খোঁজো তো—নিশ্চয়ই কোথাও চাবি আছে।

দু'জনে ঘাসের মধ্যে চাবি খুঁজতে লাগল। ওদিকে সুযোগ বুঝে ঘাসগুলোও বাড়তে লাগল—বেড়ে বেড়ে তারা নলখাগড়ার মত হ'ল—আখ গাছের মত হ'ল—তারপর আরো বেড়ে বাঁশের মত হ'ল···আরো বাড়বার আগেই খুড়ো খুড়ী চাবি খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ দরজার ঠিক মাঝখান থেকে একটা ঝরকা খুলে গেল। ও-পাশ থেকে টানা টানা ঘুমন্ত স্বরে কে যেন বলতে লাগল—

"মধু আর চিনির রাজ্য এপারে—এপারে;
লঙ্কামরীচ, গরম মশলার রাজ্য ওপারে—ওপারে।"

খুড়ো সেই সুরে সুর মিলিয়ে টেনে টেনে বলতে লাগল—

"এ পারেতে পাখার ঠোঁট,
এপারে হাত-পা-গা দিয়ে জল ঝরে
কান্না থামে না, গাছপালা হু হু করে বাড়ে,
তার ওপরে নাচের নেশা"—

ওপার থেকে হাসির হররা উঠল—খিল্ খিল্—হি হি হি—হো হো হো···

সে শব্দ এপারে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল—রুপোর ঘণ্টার মত ভরাট সে শব্দ··· ডিং ডং ডিং আডং···

হাসির শব্দে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। গাছপালা আবার ছোট হয়ে আসতে লাগল—ঘাস ক্রমশঃ বেঁটে হয়ে আসতে লাগল, খুড়ো খুড়ীর তুর্কী নাচ ক্রমশঃ কমে এল। হাত-পা-গা দিয়ে জল ঝরাও থেমে গেল।

কিন্তু পাখীর মত ছুঁচলো ঠোঁট যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল!

হায় হায় হায়। খুড়ো খুড়ী পাখীর ঠোঁটওলা দুটি আজব মানুষ হয়ে গেল।

ঝরকার ছোট ফাঁক দিয়ে ওরা ওপারটা দেখতে গেল উঁকি মেরে।

হঁ্যা হঁ্যা ঐ যে! ঐ যে! পেঙ্গুার মত সবুজ সবুজ একটা জানোয়ার। চোখ দুটো লাল গোলাপের মত—চুলগুলো যেন সিগারেটের ছাই ছাই রঙের, মাথাটা যেন এক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক গুগলীর খোল। কিন্তু জন্তুটা আগাগোড়া আইসক্রীম দিয়ে তৈরী। ঠিক যেন একটা লজেন্স চকোলেটওলা—তার কোমর থেকে পা পর্যন্ত ক্যাঙ্গারুর মত; গায়ে সবুজ

আলখাল্লা তাতে অগণতি পকেট। কোমরে একটা তোয়ালে ঝোলানো। পরনে একটা দাবাবড়ের ছকের মত পাজামা। কোমর থেকে সেপটিপিন দিয়ে ঝোলানো রয়েছে—চায়ের কাপ, চামচে, হাতা, ছুরি, কাঁটা, খন্তি, ঝাঁঝরি—পকেট থেকে উঁকি মারছে নানা রংয়ের নানা সাইজের বোতল আর শিশি—তাতে জ্যাম, জেলা, সিরাপ আর এসেন্স···

খুড়ো দেখলে জীবটা তেমন রাগী বা তেজী নয়। কেমন ঠাকুদ্দা ঠাকুদ্দা মত। তাই জিজ্ঞাসা করে বসল, তুমি কে হে?

জীবটা বললে, গুগলী ঝিনুক ঝাঁ—এদেশের আমি এঞ্জিনীয়ার। ব'লে মুখে হাত চাপা দিয়ে শব্দের ঢেউ আটকে দিল।

খুড়ো বললে, উঁহু! তুমি কক্ষনো ইঞ্জিনীয়ার নও। আমার মনে হচ্ছে, সরবতওলা, লজেন্সওলা বা পান্তুয়াবরোফওলা—

খুড়ী বললে, "ঠিক, ঠিক, পান্তুয়াবরোফওলা!"

জীবটা যেন কেমন ঘাবড়ে গেল। ভড়কে গিয়ে আমতা-আমতা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করল। তারপর একটু সুর ভেঁজে, দু'বার গলা খাঁকারি দিয়ে গান ধরলো:—

[গান]

আমি, লজেঞ্চুসের ইট সাজিয়ে
জ্যাম মাখিয়ে কর্ণিকে
চকোলেটের পেলেস্তারায়
ওলন ঝোলাই চারদিকে;
কেকের ফালি—ছাদের টালি
তিলে-খাজার দ্বার বানাই
ইক্ষু দিয়ে গরাদ গড়ি
ঝোলা গুড়ের রং মাখাই;
ক্ষোয়া ক্ষীরের ক্ষোয়া দিয়ে
রাস্তা বানাই শক্ত তাই
চিনিপাতা দই দিয়ে ঘর
চুনকামে হয় পোক্ত, ভাই;
গুগলী ঝিনুক ঝাঁ হ'ল নাম
মস্তবড় কারুকৃৎ
গড়বো যে সব ঘরবাড়ী—সব
নড়বে নাকো কারো ভিৎ।

(একটু থেমে আবার বিলম্বিত তালে সুর ধরলো)—

মধু, চা আর মাখন-রুটি
জ্যাম, জেলী চাও কামড়াতে
কামড়ে দেখ আমার দেহ
আমসত্ত্বের চামড়াতে—
এখন, তোমরা আছো ঝালের দেশে
লঙ্কামরীচ মশলাতে
কড়া এবং হুড়কো খেয়ে
অশ্রুজলের পশলাতে—"

গুগলী ঝিনুক ঝাঁ গানের এক এক কলি গাইছিল আর মুখে হাত চাপা দিয়ে শব্দের ঢেউ থামাচ্ছিল। শেষটায় গানের নেশায় মেতে যাওয়ায় মুখে হাত চাপা দিতে ভুলে গেল। আর কী যে মজা!

চতুর্দিক থেকে শব্দের প্রতিধ্বনি হতে লাগল—পশলাতে, পশলাতে, পশলাতে···

(ক্রমশঃ)

সংবাদ বিচিত্রা

ওদেসার স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাণী

সোভিয়েত ইউনিয়নের ওদেসা নগরীর ১১৮ নং বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সম্প্রতি একটি "আন্তর্জাতিক মৈত্রীসংঘ" গড়ে তুলেছেন। এই মৈত্রীসংঘকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিম্নলিখিত অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছেন।

"আমি তোমাদের অভিনন্দন ও স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। ১৯৬৭ এই বৎসরটি তোমাদের ও আমাদের দুই দেশের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। এ বৎসর তোমাদের প্রজাতন্ত্রের ৫০তম বার্ষিকী এবং আমাদের উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির ২০শ বার্ষিকী। তোমাদের সঙ্গে দেখা করার এবং তোমাদের সুন্দর নগরীতে যাবার সুযোগ করে উঠতে পারলে আমি খুব খুসী হব।" ইতি—তোমাদের **ইন্দিরা গান্ধী**

মোটা লোকদের বিপদ

উচ্চতা অনুযায়ী যাদের দেহের ওজন শতকরা ৩০ ভাগ বেশি, একটি পরীক্ষায় প্রকাশ, তারা সাধারণতঃ বহুমূত্র, পাথুরি, বাত ও হাঁপানিতে বেশি ভোগে। এদের সন্ন্যাস রোগ হতে পারে এবং উচ্চ রক্তের চাপের দরুণ হার্টের গোলমাল হয় ও রক্ত-সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে। "জার্মান পুষ্টি প্রতিষ্ঠান" পরিচালিত এই পরীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, যাদের ওজন শতকরা দশভাগ কম তারা বেশিদিন বাঁচে।

কোলোনের কাফেতে বিস্ময়কর অতিথি

কোলোন-এর এক কফি-হাউসের মালিকের একটি ছোটখাটো পশুশালা আছে। সেখানে এক গিবনের বাচ্চা হওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবরে প্রকাশ, মা-গিবন যখন ১৫ সেন্টিমিটার বাচ্চা কোলে নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে লাফালাফি করছিল, তখন অপর গিবনগুলিও সেই আনন্দোৎসবে যোগ দিয়েছিল।

'কবিতার ধাঁধা'র উত্তর

১। তারা, ২। আসামী, ৩। তা, ৪। ডাক, ৫। তাক, ৬। ঠাট, ৭। তাড়া, ৮। জেলে, ৯। বেড়ালে, ১০। তামাশা, ১১। টং, ১২। তার।

বারো হাজার পাউণ্ড ওজনের বুট

নিজের বিজ্ঞাপন হিসেবে মিউনিখ শহরে ৮০ বছরের বৃদ্ধ মুচি যোসেফ শ্রার্ট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাহাড়ে চড়ার উপযোগী এক বুট জুতো বানিয়েছে। ন'টি ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে তৈরী ৩১।২ মিটার লম্বা এই বুটের ওজন ১২০০ পাউণ্ড। বুটের তলা সেলাই করতে ৪৫ মিটার পাহাড়ী দড়ি লেগেছে এবং এর লাইনিং দিতে লেগেছে ২০ বর্গ-মিটার ভেড়ার লোমদার চামড়া। এই বুট জুতো তৈরী কোরে এই মুচি তার আগের তৈরী ৮০০ পাউণ্ড ওজনের বুটের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

শিকারী-পাখীর পালকদের বিরুদ্ধে মামলা

জার্মানির কোম্বলেনটজ-এর এক ঘটনায় প্রকাশ যে, স্থানীয় এক শিকারী দু'জন জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে এক অদ্ভুত নালিশ দায়ের করেছে। তার নালিশ হচ্ছে, এই দু'জন জমিদারের পোষা নানারকম শিকারী-পাখীদের জ্বালায় কাছের জঙ্গলে তাঁদের পাখী শিকার করা বন্ধ হওয়ায়, জীবিকার্জনের পথও বন্ধ হয়েছে। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই এই মামলার রায় বেরুবে।

রশিদুল হোসেন

FOUR (চার) সংখ্যা ইংরেজীতে বানান করে বলতে গেলে বা লিখতে গেলে চারটে অক্ষরই লাগে। অক্ষর-সংখ্যার সঙ্গে শব্দবর্ণিত সংখ্যার এমন মিলের দৃষ্টান্ত আর নেই।

*   *

জীব-জন্তু জগতের ৪।৫ ভাগই হচ্ছে পোকামাকড়।

*   *

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ক্যাকিউট ইণ্ডিয়ানরা (Kwakiut Indians) নিজের নাম বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করে। যতদিন গ্রহীতা দেনা শোধ না করবে ততদিন সে নামহীন হয়ে থাকবে।

*   *

জাভা দ্বীপের একটা হ্রদে আপনা-আপনি বুদ্বুদ হয় আর নিজে থেকেই শব্দ করে ফেটে যায়। এগুলো বেলুনের মত ফুলে ওঠে যখন-তখন এবং এর এক-একটির ব্যাস হয় প্রায় ৬ ফুট। জলের উপরের বাষ্পের ও গ্যাসের ক্রিয়ায় এই সব বুদ্বুদের সৃষ্টি হচ্ছে।

*   *

রোমান সম্রাট নীরোর আমলে এক একটি সাধারণ কাঁচের গ্লাসের দাম ছিলো ৬০০০ ডলার। একে ৭টা ৫০ পঃ দিয়ে গুণ করলে আমাদের দেশের এখনকার দাম জানতে পারবে।

*   *

মানুষ তার জাবনের ১।৩ ভাগ কাল বিছানাতেই কাটায়।

*   *

২৫শে নভেম্বর ১৯১১ সালে লণ্ডনের 'গ্রীণবেরীহিলে' তিনজন খুনীর ফাঁসী হয়। ঐ তিনজন হত্যাকারীর মধ্যে প্রথমে ফাঁসী হয় গ্রীণের, তারপর হয় বেরীর ও সবশেষে হয় হিলের।
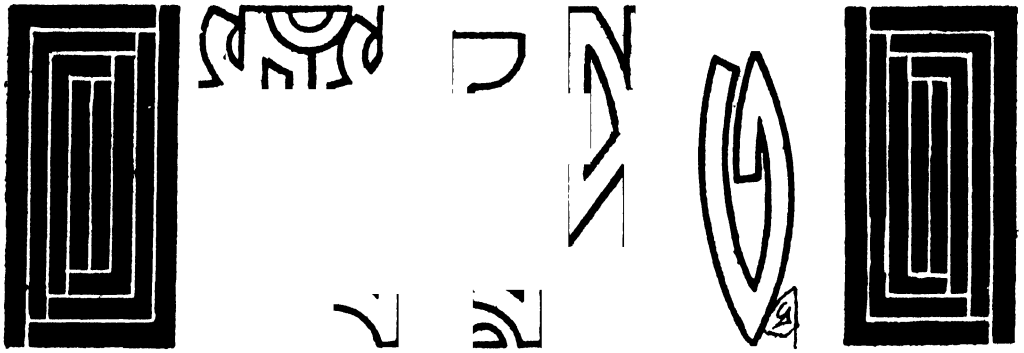
কবিতার ধাঁধা

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

নীচে যে বারোটি দুই লাইনের কবিতা দেওয়া হয়েছে তার মিলের জায়গাগুলি ফাঁক রাখা হয়েছে। এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা এক জোড়া করে ভিন্ন অর্থের একই শব্দ বসাতে হবে।

যেমন:—ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান যেই দিক্ না গোল,
ছাতা-লাটি-টুপী ছুঁড়ে সবাই করে গোল।

১। রাত্রিতে আকাশ জুড়ে ফোটে যে সব—,
বলতে পারো দিনের বেলা কোথায় থাকে—?

২। আজিকার মামলায় যে লোকটা—,
চেহারাতে মনে হয় নিশ্চয় সে—।

৩। এখন দেখি গোঁফজোড়াতে বেশ দিচ্ছ—,
কালকে তুমি যা করেছ জানি আমি—।

৪। এলো না এখনও কেন সকালের—!
ওই যাচ্ছে পিওন ওকে একবারটি—।

৫। বন্দুক ও রাইফেলেতে এমনি আমার—,
বলছি আমি দেখলে পরে লাগবে তোদের—।

৬। ভেঙে গেছে সংসারের ভেতরের—,
বজায় রেখেছে তবু আগেকার—।

৭। এতোক্ষণ মিছামিছি দিচ্ছিস্ আমায়—,
যে মেরেছে তার পেছনে কর না গিয়ে—।

৮। জেলে পাড়ার সেই যে সেই কালাচাঁদ—,
কি জানি কি করে সে তো আছে এখন—।

৯। ঘর দোর সব খুলে রেখে পাড়ায় ঘুরে—,
সব কিছুই তো খেয়ে যাবে কুকুরে বা—।

১০। কষ্ট করে এতোক্ষণ দেখালাম যা—,
তোমরা বুঝি ধরে নিলে সেগুলো সব—?

১১। ইস্কুলের ঘণ্টাটাতে যেই না বাজে—,
ছাড়তে খেলা ছেলেগুলো রেগে যে হয়—।

১২। তোর কথায় আজকে আমি ঘুগ্‌নি কিনে—,
দেখলুম খেয়ে যাচ্ছেতাই, নেইকো কোনো—।

(উত্তর অন্যত্র দেখ)
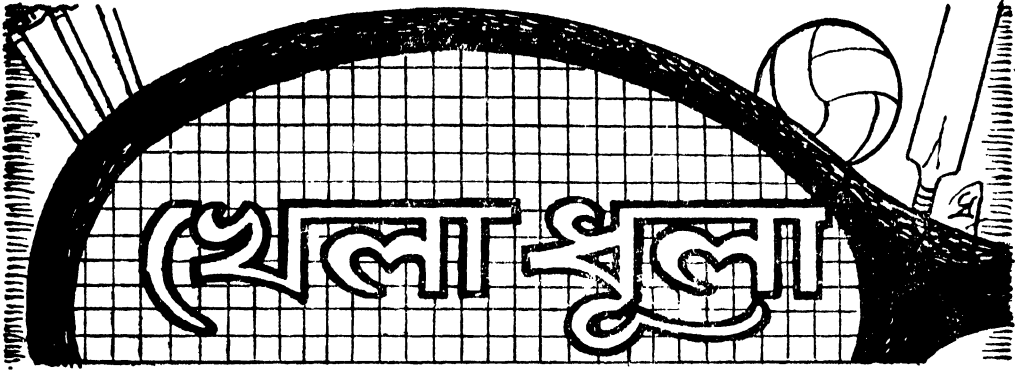
মেঠুড়ে

ফুটবল

কলকাতার মাঠে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়েছে। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আনন্দ যতখানি, উদ্বেগও ততোটা। শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা বিশ্বেই ফুটবল খেলা নিয়ে যতো হইচই হয়, তেমন বোধ হয় অন্য কোনো খেলাকে নিয়ে আর হয় না।

ভারতীয় জুনিয়র ফুটবল দল ব্যাংককে এশীয় যুব ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে ৬—২ গোলের ব্যবধানে হেরেছে। ভারতীয় দলের এই ফলাফলে ফুটবল ক্রীড়ারসিক মাত্রই আশ্চর্যবোধ করেছেন। ভারত শক্তিশালী দল নিয়েই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। গতবারের যুগ্ম বিজয়ী ইজরাইলের সঙ্গে সমান তালে লড়ে গ্রুপের প্রথম খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত রেখে দ্বিতীয় খেলায় মালয়েশিয়াকে ৪—১ গোলে হারিয়ে মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। তারপরেই ঘটে তার শোচনীয় পরাজয়।

হকি

এবার নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব চারবার বেটন কাপ জয়ী হ'ল। ১৯৫৭ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে প্রথমবার, ১৯৬২ সালে সেণ্ট্রাল রেলকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ও ১৯৬৪ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী হিসেবে তৃতীয়বার ইষ্টবেঙ্গল বেটন কাপ বিজয়ী হয়।

এবারের ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ভিলাই ষ্টীল প্লাণ্ট দলের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে জয়ী হয়ে বেটন কাপ পাবার সম্মান অর্জন করেছে। দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে খেলার সুযোগ পেয়ে ভিলাই ষ্টীল দল প্রথমে পোর্ট কমিশনার্সকে ২—১ গোলে, তৃতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান ক্লাবকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। নর্থ ইষ্টার্ণ দল বেটনে খেলতে না আসায় ভিলাই দল ওয়াক

ওভার পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের রানার্স কোর অব সিগন্যালকে দ্বিতীয় দিনের খেলায় ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনালে নেভি দলকে দ্বিতীয় দিনে ১—০ গোলে হারিয়ে সর্বপ্রথম বেটন ফাইনালে খেলার গৌরব অর্জন করে। অপর দিকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে ইষ্টার্ণ রেলের সঙ্গে চারদিন অমীমাংসিত খেলা শেষ করার পর পঞ্চম দিনের খেলায় ১—০ গোলে বিজয়ী হয়। ভূপাল একাদশ বেটনে অনুপস্থিত থাকায় 'ওয়াক-ওভার' পেয়ে ইষ্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইনালে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সকে ২—০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনালে গতবারের বেটন বিজয়ী শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিসকে ২—১ গোলে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়।

ভিলাই ষ্টীল প্লাণ্ট দল এবং ইষ্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলাতে আশানুরূপ হকি নৈপুণ্যের পরিচয় মেলেনি, যদিও ভিলাই দলের ক্রীড়া-পদ্ধতির প্রশংসা করা চলে, কিন্তু তাদের আক্রমণের ধার তেমন ছিল না। ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে জয়সূচক গোলটা করেন ইনামুর রহমান।

ক্রিকেট

বিলেতের মাঠে ক্রিকেট খেলতে ভারতের ষোলজন তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়কে নিয়ে গড়া একটা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল আগামী ১৫ জুলাই ভারত থেকে বিলেত অভিমুখে যাত্রা করবে। ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে এত অল্পবয়েসী দল আর কখনো বিদেশ যায়নি। তেমনি ইংলণ্ডে এ দলই হবে সর্বকনিষ্ঠ প্রথম আগন্তুক ক্রিকেট দল। এদের গড়ে বয়েস সাড়ে ষোল। প্রখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের ছেলে সুরিন্দরই দলের বয়সী খেলোয়াড়। সুরিন্দরের বয়েস আঠারো এবং দলের সবচেয়ে ছোট প্রতিনিধিটির নাম ট্যাণ্ডন, বয়েস চোদ্দ।

এই সফরে তরুণ ক্রিকেট দলটি মোট তিনটে টেস্ট সমেত আঠারোটা খেলা খেলবে। টেস্টের প্রথম খেলাটা হবে এজবাসটনে, দ্বিতীয়টা কার্ডিফে এবং শেষ টেস্ট এডিনবরার স্কটিশ স্কুলের মাঠে।

এই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ব্যাটসম্যান। দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে বোম্বাইয়ের তরুণ অলরাউণ্ডার অজিত নায়েক। বাংলা থেকে দু'জন খেলোয়াড় এই দলে স্থান পেয়েছে। একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে—নাম রাজা মুখার্জি আর একজন বোলার হিসেবে—নাম দীপংকর সরকার।

* * *

বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ইংলণ্ড সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে খুব চিন্তায় পড়েছেন। ভারতীয় দলের সফর শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট আটটা ইনিংসের গড় ১৮১'৩। বিপক্ষ দলগুলোর গড় ১৫১'৩। চলতি সফরে বিপক্ষে দুটো আর ভারত অক্সফোর্ডের বিপক্ষে একটা সেঞ্চুরি করেছে। সেঞ্চুরিটা করেছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদি। প্রথম টেষ্ট আরম্ভ হয়েছে। আগামীবার আমরা তার খবর দেব।

ছোটদের বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)— অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে শ্রীদীনেশ চন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১২'০০

এবার তোমাদের কাছে এমন একটি বইয়ের কথা বলছি, যার মধ্যে তোমরা সব জিনিসের সবকিছুর সন্ধান পাবে। এমন একটি জিনিস তোমাদের সকলেরই ঘরে ঘরে হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন।

কিছুকাল পূর্বে 'শিশু ভারতী' নামে এমনই একখানি কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ গুপ্তর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীতে বর্তমান যুগে শিল্প-বিজ্ঞানে যে সকল যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বিভিন্ন রাজত্বের যে সকল রূপান্তর ঘটেছে, বহুবিধ নূতন যে সব আবিষ্কারে পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হয়েছে, সে সকল ঘটনা বা কাহিনী নূতন রচিত হালের কোষগ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। এই বিশ্বকোষ গ্রন্থখানিতে এমন অনেক জিনিস আছে, যাকে এক কথায় বর্তমান যুগের জ্ঞানের খনি বলা চলে।

ক্রাউন আট পেজী সাইজের এই বিরাট মূল্যবান গ্রন্থের রচনাগুলির সঙ্গে পাতায় পাতায় আছে নানা ধরনের ছবি। এই ছবিগুলির অধিকাংশই আবার দু'রঙে ছাপা। তাছাড়া সম্পূর্ণ পাতা-ভরা ফটো চিত্রও আছে কয়েকখানি। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব না হলেও, আমরা একথা বলবো যে, এর মধ্যে বিবিধ বিচিত্র জ্ঞানের খোরাক এমনভাবে ছড়ানো আছে, যা পড়লে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই উপকৃত হবে।

বর্তমান খণ্ডটিতে প্রধানতঃ এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন : মহাকাশের কথা, পৃথিবীর কথা, দেশ-বিদেশের সেরা বই, গাছপালার কথা, জীবজন্তুর কথা, মানুষের কথা, ইতিহাসের কথা, ভাষা ও লিপির কথা, দেশ-বিদেশের ছড়া, বিশ্ব-সাহিত্যের ছড়া, ধর্মের কথা, অঙ্কশাস্ত্রের কথা, এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা, সাধারণ বিজ্ঞানের কথা, আমাদের শরীরের কথা, খেলাধূলার কথা, চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রভৃতি।

এরূপ একখানি ছোটবড় সকলের নিত্য প্রয়োজনীয় কোষগ্রন্থ প্রকাশের জন্য সম্পাদকদ্বয় আমাদের ধন্যবাদভাজন।

তোমাদের সঙ্গে যখন কথা বলতে বসেছি তখন প্রখর তপন তাপে পৃথিবী পুড়ে যাচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে খবর আসছে নিদারুণ খরার জন্য দুর্ভিক্ষ মহামারীর—ফসলের অভাবে খাদ্যে অনাটন—তার ফলে নিদারুণ দুর্গতি। তাছাড়া প্রতিদিনই সংবাদপত্র খুলে দেখবে কিছু না কিছু বিপদ বিপত্তি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

এসব শুনতে যেন অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের পারস্পারিক হৃদ্যতা, ভালবাসা সব কি বিনষ্ট হতে যাচ্ছে না? প্রতিবেশীর জন্য পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন অথবা দুর্গতদের জন্য আমাদের কল্যাণহস্ত প্রসারিত যদি না হয়, এর চেয়ে বড় দুঃখ ও অকল্যাণের আর কি হতে পারে। 'সকলের জন্য সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। এই বাণীটি মনে রাখতেই হবে, ভুললে চলবে না। দুর্গতদের জন্য তোমাদের দান সামান্য হলেও তা অসামান্য হয়ে থাকবে। এই কথাটি তোমরা ভুলো না।

দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন ছুটীতে তোমরা কে কি করলে, কেউ বেরিয়ে আসতে পারলে কিনা লিখে জানিও। যদি কেউ বাইরে বেড়াতে গিয়ে থাকো সেখানকার অধিবাসী, জীবনযাত্রা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে গুছিয়ে লিখলে আমাদের খুব ভালো লাগবে।

একটা গল্প বলি :

কথায় বলে ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। মেয়েরা বলেন, শিবের অসাধ্য।

আত্মীয়স্বজন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, হাল ছাড়েন নি শুধু রোগী নিজে—ডাক্তারী ওষুধ, ইনজেকশান, কবিরাজী মালিশ, হাকিমী দাওয়াই কোন কিছুই উপশম ঘটাতে পারলো না। দিন দিন গতিহীন, আয়ুহীন তবুও আশাভাণ্ড অফুরন্ত।

এমনি রোগীর সংখ্যা দু'টি একটি নয় অনেক। শহরে শহরে দেবালয়ে তাদের ভিড়। ডাক্তার কবিরাজ যা করতে পারেন না, ঠাকুর দেবতা প্রসন্ন হলে ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে কতক্ষণ? তাই আধিব্যাধিগ্রস্ত মানুষ দল বেঁধে আসে দেবতার মন্দিরে, ধর্ণা দেয়। প্রত্যাদেশের জন্য অপেক্ষা করে, গভীর শ্রদ্ধায় তার বিশ্বাসের প্রসাদী ফুল পাতা নিয়ে ফিরে যায় বাড়ী।

শুধু আমাদের দেশেই যে এরকম দেখতে পাওয়া যায় তা নয়। পাশ্চাত্য দেশেও এমন দেবতার প্রাসাদাকাঙ্ক্ষী, আরোগ্যকামী মানুষের অভাব নেই কিছুমাত্র।

ফ্রান্স এর ল্যুভার। আধা-শহর বিশ্বাসবাহুল্যের সঙ্গে তার যোগাযোগের সূত্রটিও নেহাৎ ক্ষীণ। তবু এই আধা-শহরের উপকণ্ঠে দেখা যেতে লাগলো মানুষের ভিড়। সুস্থ সবল মানুষের দল নয়, ব্যাধিপীড়িত ভগ্নস্বাস্থ্য মেয়ে-পুরুষ দুশ্চিকিস্য বলে ধার্য হয়েছে, ডাক্তার কিংবা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কেউ তাদের শোনাতে পারেনি আশার ললিত-বাণী।

লোকালয় ছেড়ে খানিকটা দূরে নির্জন পটভূমিতে একটি মন্দির; তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মেরীমাতার সুন্দর একটি মর্মরমূর্তি। অনুচ্চ একটি বেদী তার উপর অভয় মুদ্রার ভঙ্গীতে মা মেরী—মন্দিরের সামনেই একটি জলকুণ্ড। পাথরে গড়া সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে জলের ধার পর্যন্ত। ব্যাধিগ্রস্তদের দল কুণ্ডে নেমে স্নান করে, যারা অশক্ত তাদের মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হয় কুণ্ডের জল। তারপর তারা মর্মরমূর্তির সামনে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে জানায় তাদের আরোগ্যলাভের কামনা। কেউ দেবীর বেদীতে রেখে দেয় পুষ্পের অর্ঘ্য, কেউ জ্বালায় মোমবাতি, ধূপ—বাতাসে মৃদু কাঁপতে থাকে তাদের শিখা।

আরোগ্যকামীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, স্থানমাহাত্ম্যের কথা ছড়িয়ে যায় দেশের সর্বত্র—বিদেশেও। আরোগ্যকামীদের সংখ্যা বেড়ে চলে। তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য গড়ে ওঠে রাত্রির আবাস—প্রতীক্ষালয়। ইঁট কাঠ দিয়ে ঘর বাড়ীই শুধু নয়, কর্মীদের প্রয়োজন হলো, ব্যাধিগ্রস্তদের সাময়িক সেবা-শুশ্রূষার জন্য দলে দলে এলো কর্মীর দল।

পুরোদমে কাজ চলছে। রোগার্তদের ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়া সংখ্যার অনুপাতে কর্মীসংখ্যা কম। একদিন সকালবেলা দু'জন বিদেশী এসে হাজির। তাদের পরিচ্ছদের মধ্যে দৈন্যের প্রকাশ, চোখ-ভর্তি বিনয়। তাদের বক্তব্য অনেক দূর থেকে এসেছি আমরা, বিদেশী মানুষ—ভাগ্যের বিপর্যয়ে আমরা আজ আপনাদের সাহায্য চাইছি, যদি কিছুদিন এই সেবাশ্রমে কাজ করার সুযোগ পাই তাহলে অন্ততঃ দু'টি বেলা খাবার যোগানোর হাত থেকে বেঁচে যাবো। পোষাকে দৈন্যের ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু তবু চেহারার মধ্যে কোথায় যেন আভিজাত্যের ছাপ আত্মগোপন করেছিল। কাজের ভার দেওয়া হলো তাদের উপর। গভীর নিষ্ঠা আর দরদ নিয়ে চললো তাদের রোজকার কাজ—রোগাক্রান্তদের স্ট্রেচারে করে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া, তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া, দৈহিক কষ্টের যাতে লাঘব হয় সেদিকে নজর রাখা—এইসব হলো তাদের কাজ।

তাদের সেবাধর্মের নিষ্ঠা সকলের কাছে থেকে অর্জন করলো অকুণ্ঠ প্রশংসা।

সপ্তাহ দুই এমনি কেটে যাবার পর একদিন কিন্তু সেই দু'টি কর্মীকে আর দেখা গেল না। সবাই তাদের জন্য দুঃখবোধ করলেন। ওরকম দরদী কর্মী সত্যিই দুর্লভ।

একদিন বিকেলবেলা একটি ঝকঝকে প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়ালো মন্দিরের চত্বরে—বেরিয়ে এলেন দামী পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা দু'টি ভদ্রলোক, তাদের চেহারা আর পোষাক দেখে বোঝা গেল এঁরা ভারতীয়।

কর্তৃপক্ষ তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন—কিন্তু তাঁদের মনে অশ্বস্তি—কী আশ্চর্য, এঁরা কারা ?

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললেন : আপনারা যা ভাবছেন বুঝতে পারছি, আমরা, ছদ্মবেশে এখানে কাটিয়ে গেছি, খুব ইচ্ছে ছিল এখানকার সেবার কাজে সাহায্য করবো, কিন্তু সত্যিকারের পরিচয় দিলে সে সুযোগ পেতাম না। তাই প্রতারণার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলাম—আমরা ভারতবর্ষের লোক—ব্যবসা উপলক্ষে এ দেশে এসেছিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষে জন্ম হলেও আমরা বিশ্বের মানুষকে ভাই বলে ভাবতে শিখেছি—সেই-জন্যই এসেছিলাম এখানকার রোগার্ত মানুষের সেবার কাজে অংশগ্রহণ করতে—আপনারা আমাদের সে সুযোগ দিয়েছেন তাই আমরা ঋণী, জানেন তো আমাদের দেশের কবির কথা—গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করছ আমায়।

কর্তৃপক্ষ তাঁদের নামধাম পরিচয় জানতে চাইলেন—কিন্তু তাঁরা অজ্ঞাত পরিচয় থেকে যাওয়াই পছন্দ করলেন। ধনী অভিজাত দু'টি ভারতসন্তান সেদিন বিদেশে যে মহানুভবতার পরিচয় রেখে এলেন—মহাকালের ইতিহাসে তা সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা খুঁজলে কোথাও তাঁদের নাম পাওয়া যাবে না।

চিঠি পেলাম—

নন্দিতা পুরকায়স্থ, পাটনা; মিনতি ও সুমতি বসু, কোলকাতা; অনির্বাণ চক্রবর্তী, কোলকাতা; বিশাখা দে, শান্তিনিকেতন—তোমার মত অনেকেই জিজ্ঞাসা করে আলেয়া জিনিসটা কি ? কথায় কথায় সবাই বলে আলেয়া হলো ভূত। তা ঠিক নয়। তবে হঠাৎ এরকম দেখলে কিন্তু অলৌকিক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, আর এইজন্যেই ভূত আখ্যা পেয়েছে বোধ হয়। আসলে এটা হলো জলাভূমিতে উৎপন্ন একরকম গ্যাস। এই গ্যাস হাওয়া পেলেই জ্বলে ওঠে। কৌশিক ও নূপুর, কোলকাতা; অম্বরীস ও আম্রপালি বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্শিয়ং; অরিন্দম ও অর্পিতা, যাদবপুর; রণেন্দ্রমোহন লাহিড়ী ও শ্রীরূপা, তেজপুর; মালা চক্রবর্তী ও অনীতা, কোলকাতা; বনি চক্রবর্তী, কোলকাতা।

শুভকামনা ও ভালবাসায়— তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : ০·৫০ পয়সা
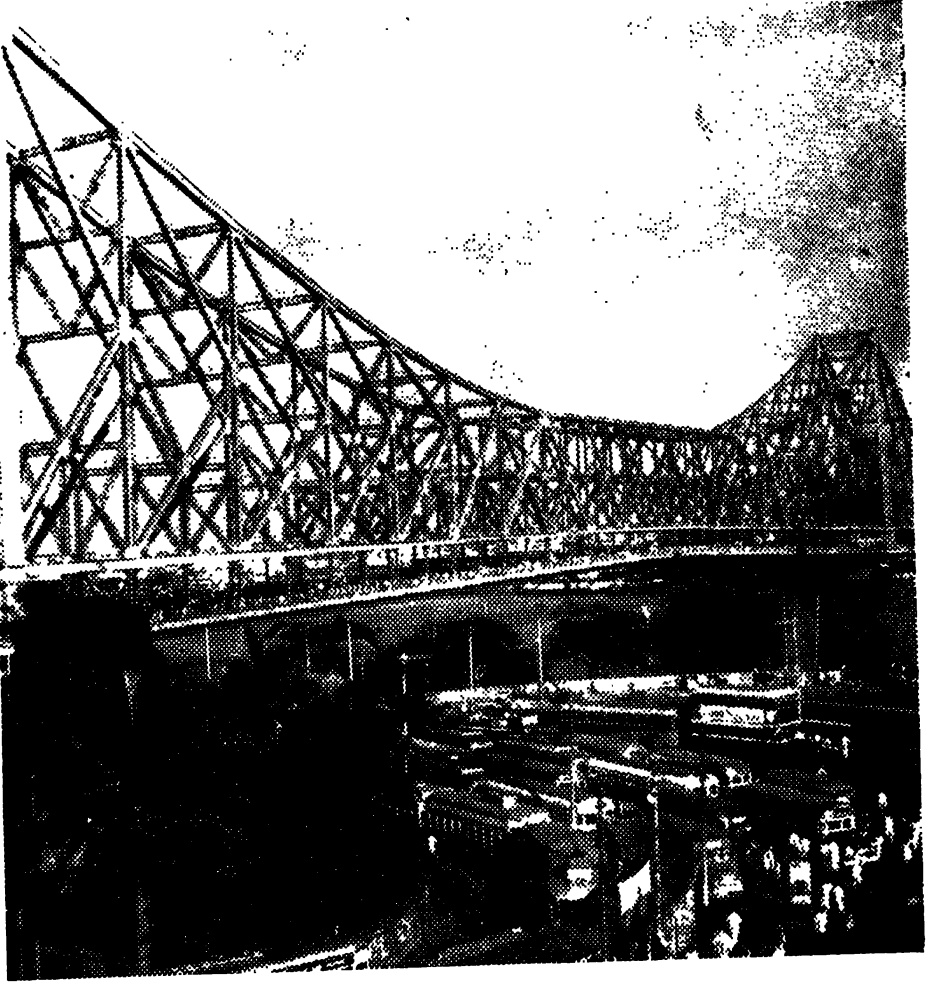
হাওড়ার পুল

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋

৪৮শ বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৭৪ [৪র্থ সংখ্যা

KRISHNA PUBLIC LIB.

আয় ঘুম

শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দন রঙা চাঁদ চায়।
সবুজ ঘুমের পরী,
সবুজ ঘুমের পরী,
শিগ্‌গির উড়ে উড়ে আয়।
ঐ দূর মাঠ বন
খুশি ক'রে অকারণ
রং দিয়ে শিশু-মনটায়।
খুকীর চোখের পাতা
খুকীর গানের খাতা
খুকীর প্রাণের পাতাটায়
যত সব আজগুবি
এঁকে যা ঘুমের ছবি
চিরকেলে মায়া-তুলিকায়।

ওর দু'গালের টোল
চুম্বনে উতরোল
চোখে চুম্বন চমকায়।

চুম্বন উড়ে যায়
চুম্বন নভ ছায়
চুম্বন ঝরে ঝরোকায়।

বব্-করা ওর চুল
নেই তার কোনো তুল
লাল রিবনের ফুল তায়।

সবুজ ঘুমের পরী,
পান্নার সাতনরী
গলে দিয়ে উড়ে উড়ে আয়।

চন্দন চাঁদ চোর
চন্দন চাঁদ চোর
চুম্বন চুপি চুপি চায়।

তার চোখে দিয়ে চুম
নন্দন-বন-ঘুম
সুর্মাদানায় নিয়ে আয়।

আসার সময় যেন
টফি চকোলেট্ হেন
রূপকথা ভ'রে থলিটায়

আনিস্ সবুজ পরী ;
আর নয়, নয় দেরি
সাড়া জাগে নিদ-মহলায় !

ঐ শোনো, ঐ শোনো,
করাঘাত ঘন ঘন
মেঘ-মহলের দরোজায়।

আয় ঘুম, আয় রাত
ঢেকে ফ্যাল্ আঁখি পাত
রেশমী নরম হাতটায়
দুই চার নিমেষেই
ওর চক্ষের এই
আধ-বোজা দু'টি জানলায়।

আয় ঘুম ; ডাকে খুকী
চেতনার উঁকি-ঝুঁকি
ঐ বুঝি ঐ থেমে যায়।

গল্প বলার খেলা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

যতীন ও রতীন দুই বন্ধু। তারা এক ক্লাসেই পড়ে। তাদের একটা খেলা আছে: গল্প বলার খেলা। নদীর পাড়ে ঘাসের ওপর বসে একজন একটা গল্প শুরু ক'রে, একটুখানি বলেই তার সূত্র অন্যের হাতে ছেড়ে দেয়। এইভাবে পালা করে একটা গল্প তারা বানায়। সেদিনও তাই হচ্ছিল।

শুরু করলে রতীন। খেয়াঘাটের উপরে তারা দু'জনে বসেছিল। বসেছিল আর খেয়া পারাপার দেখছিল। তাই থেকে গল্পের সূত্রটা রতীনের মাথায় এল। রতীন শুরু করলে:

বৈশাখের বিকাল বেলা। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়েছে। আর একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে। দু'টি ছেলেমেয়ে ব্যস্তভাবে এসে মাঝিকে বললে নদী পার করবার জন্য।

একটুকরো কালো মেঘ অত্যন্ত দ্রুতবেগে আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল। গাছপালাগুলো স্তব্ধ। চারিদিকে থমথমে ভাব।

সেইদিকে তাকিয়ে মাঝি বললে, দেখছ না ঝড় আসছে। এখন আর পার করা চলবে না। ফিরে যাও।

ছেলেটি বললে, খুব চলবে। ঝড় আসতে এখনও অনেক দেরি। আমি বাড়ী ফিরতে চাই। নইলে মা-বাবা খুব ভাববে।

মাঝির সাহস নেই। সে ক্রমাগত আপত্তি জানাতে লাগল। চেনা মাঝি, চেনা দুটি ছেলেমেয়ে। মাঝি ছেলেমেয়ে দুটিকে মাসীর বাড়ী ফিরে যাবার জন্য বোঝাতে লাগল। কিন্তু ওদের মন মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সেই সকালে দু'টি ভাই-বোন ওপারে মাসীর বাড়ী গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল সন্ধ্যেয় ফিরবে। এমন তারা মাঝে-মাঝেই যায় আসে। মাঝিও জানে সে কথা। ঝড় আসবে বলেই তারা ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছে। ঝড় আসবে বলেই মাঝিরও আপত্তি। কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটির কান্নাকাটি ও কাতর অনুরোধে সে আপত্তি টিকল না।

মাঝি বললে, চল দিদিমণি। পাড়ি তো দিই। তারপর ঠাকুর যা করেন তাই হবে।

নৌকোর রশি মাঝি খুলে দিল।

এখানে রতীন চুপ করে থেমে গিয়ে, যতীনের মুখের দিকে চাইলে।

যতীন শুরু করলে:

নদীর মাঝ-বরাবরও নৌকা তখনও আসেনি। এমন সময় ঝড় উঠল। কালো

আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

মাঝি চিৎকার করে উঠল। অন্ধকার আকাশ। তেমনি ঝড় আর মেঘের গর্জন। তার মধ্যে ছেলেমেয়ে দুটিও চিৎকার করে উঠল। ঝড়ের বেগে তীরের মত নৌকা ছুটল উজানে। মাঝি খুব ওস্তাদ। বলতে গেলে, ছেলেবেলা থেকে নৌকা চালিয়ে আসছে। কিন্তু এই ঝড়ের মুখে নৌকা সামলাবার ক্ষমতা কারো নেই। নৌকা ছুটেছে তীরের বেগে। নদীর ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। কালো, কালো, আকাশ কালো, নদীর জল কালো, চারিদিক কালো যেন আলকাতরার মত। প্রাণের ভয়ে মাঝি ছেলেমেয়ে দুটোকে তিরস্কার করতে লাগল। নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল। ছোট ছেলেমেয়ের কথা শুনে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মুখে কেন বেকুবের মত নৌকা ছেড়েছিল সেজন্য নিজেকেও ধিক্কার দিতে লাগল। সে চিৎকার ঝড়ের গর্জনে ছেলেমেয়েদের কানে হয়ত পৌঁছচ্ছিল না। তারা দু'জনেই মূর্চ্ছা গিয়েছিল।

যতীন থেমে রতীনের দিকে চাইলে।

রতীন বলতে লাগল :

পরদিন সকাল।

তখন আর ঝড় নেই। কিন্তু ওপড়ানো গাছে, চারিদিকে ছড়ানো খড়কুটোয়, ভাঙা মাটির ঘরে তার চিহ্ন রয়েছে।

কোতলপুরের জমিদারদের জমিদারী যত না বড়, তার চেয়ে বড় তাদের দাপট। এ অঞ্চলের যত লাঠিয়াল সমস্ত তাদের হাতে। জমিদারদের বড় আয় হচ্ছে ডাকাতি।

পাঁচশো বছর আগের কথা বলছি। তখন এখনকার মত গভরমেণ্ট ছিল না। জমিদারই ছিল গভরমেণ্ট, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুতরাং নামে জমিদার হলেও কোতলপুরের মোহনবাবুকে সবাই রাজাবাবু বলে ডাকত।

রাজাবাবু তার লোকজনদের হুকুম দিলেন সমস্ত রাজ্য ঘুরে ঘুরে দেখতে কোথায় কার কি ক্ষতি হয়েছে। তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে বললেন।

হুকুম পেয়ে লোকজন হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল চারিদিকে। রাজাবাবুর বড় ছেলে কুমার, বছর ষোল তার বয়স, সেও বন্ধুদের নিয়ে বেরুল।

কুমার বেরিয়ে পড়ল নদীর দিকে, যেদিকটায় মাঝ-নদীতে একটা চর পড়েছে, সেই দিকে।

ঘুরতে ঘুরতে কুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দেখ দেখ চরের উপর কি যেন একটা শুয়ে না?

সবাই সবিস্ময়ে দেখলে, তাই বটে। মনে হচ্ছে যেন একটা ছোট মেয়ে।

রতীন থামল।

যতীন বলতে লাগল :

চরের নাম 'একশো বিঘার চর'। বছর কয়েক থেকে চাষবাসও চলছে।

চরের মেয়েটিকে দেখে ওরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কে জানে, মেয়েটি বেঁচে আছে না মারা গেছে! তাড়াতাড়ি একখানি নৌকা ডেকে ওরা চরে গিয়ে উঠল।

উঠেই থমকে গেল।

লাল শাড়ি পরা একটা মেয়েই বটে। জীবন্ত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ওরা থমকে গেল একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখে। বেলা বেশি না হলেও এরি মধ্যে সূর্যের
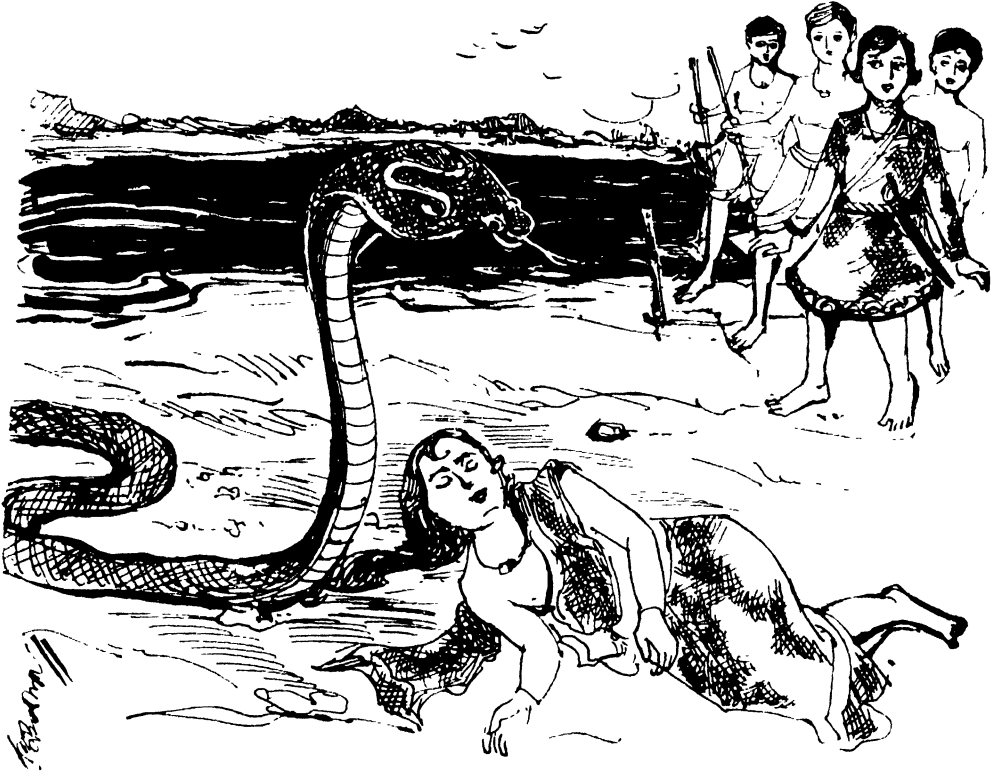
'একটা প্রকাণ্ড বড় গোখরো সাপ মেয়েটির মুখের উপর ফণা ধরে আছে।'

তেজ হয়েছে। বোধ করি সেই রোদ থেকে রক্ষা করবার জন্য একটা প্রকাণ্ড বড় গোখরো সাপ মেয়েটির মুখের উপর ফণা ধরে আছে। এতবড় সাপ সহজে দেখা যায় না। ওরা ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাপটা তেড়ে এলে সেখান থেকেই নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

সাপটা কিন্তু তেড়ে এল না। ওদের দিকে চিক্‌মিক্ করে চাইলে। চেরা জিভটা লিকলিক্ করে বার কয়েক বার করলে। তারপর সুড়সুড় করে চলে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

যতীন থামল।

রতীন বলতে লাগল :

সাপটা চলে যেতে কুমার এবং তার দলবল সাহস পেল। ধীরে ধীরে মেয়েটির কাছে এগিয়ে এল তারা। কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করার পর মনে হ'ল মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসছে। আরো কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি চোখ খুললো। সামনে অনেকগুলি অপরিচিত ছেলেকে দেখে একটু সঙ্কুচিত হ'ল। তারপর অশ্রুতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, আমি কোথায় ?

কুমার বললে, তুমি কোতলপুরের চরে।

মেয়েটি কোতলপুরের চরের নাম শুনেছিল বলে মনে হ'ল না। একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলে পারলে না।

কুমার তার একজনকে হুকুম দিলে, তুমি আমাদের বাড়ী চলে যাও। মাকে সব কথা বলে একটা পাল্কী নিয়ে এস। খুব জল্‌দি।

খুব তাড়াতাড়ি পাল্কী এল। মেয়েটিকে পাল্কীতে উঠিয়ে রাজাবাবুর বাড়ী নিয়ে আসা হ'ল।

অনেক শুশ্রূষার পর বিকেলের দিকে মেয়েটি খানিকটা সুস্থ হ'ল। কিন্তু বাপ-মার জন্য খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর রাণীমা শুধু এইটুকু বুঝতে পারলেন যে, ঝড়ে নৌকাডুবির ফলে এই কাণ্ড হয়েছে। মেয়েটির বাড়ী রসুলপুর। এইদিকের লোক সে গ্রামের নামও শোনেনি। তখন রেল ছিল না, স্টিমার ছিল না, ডাকঘর টেলিগ্রাফ কিছুই ছিল না। তখন বিশ ক্রোশ দূরত্ব এখনকার দুশো ক্রোশের থেকে বেশি ছিল।

ন'দশ বছরের ছোট মেয়ে নিজের গ্রাম এবং মাসীর গ্রামের নামটাই শুধু জানে, তার বেশি আর কিছু জানে না।

রাণীমা তার নাম জিগ্যেস করলেন।

মেয়েটি বললে রাধা। বাপের নাম বললে রামকৃষ্ণ মুখুয্যে।

রাজাবাবু মনে মনে ভাবলেন, তাঁদেরই স্ব-ঘর। মেয়েটি পরমাসুন্দরী না হলেও কুৎসিত নয়। যে মেয়ের মাথায় সাপে ফণা ধরে, সে মেয়ে কুৎসিত হলেও তাকে তিনি

পুত্রবধূ করতে আপত্তি করবেন না। লোকে তাঁকে রাজা বলে, কিন্তু তিনি জানেন সত্যি সত্যি তিনি রাজা নন। শক্তিশালী জমিদার মাত্র। শক্তিটা গোলা-বারুদের নয়, লাঠি এবং তলোয়ারের। তাঁর মাথার ওপর আছে বীরগঞ্জের রাজা। তার ওপর খাস নবাব বাহাদুর। অথচ তাঁর বহুদিনের সাধ তিনি রাজা হবেন। একেবারে স্বাধীন না হলেও কার্যতঃ স্বাধীন। রাধাকে পুত্রবধূ করতে পারলে সে সাধ পূর্ণ হতে পারে।

রতীন থামল।

যতীন বলতে লাগল :

রাজাবাবু চারিদিকে লোক পাঠালেন। খোঁজ কোথায় রসুলপুর। খুঁজে বের কর সেই গ্রামের রামকৃষ্ণ মুখুয্যেকে। নিয়ে এস তাকে এখানে। বিবাহ-উৎসবটা তিনি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চান। দৈবের কথা বলা তো যায় না। লোক ছুটল নৌকোয়। নৌকোডুবির থেকে মনে হয় রসুলপুর নদীর ধারেই কোন গ্রাম হবে। কিন্তু নৌকো আসতে আসতে চলে, সুতরাং নদীর ধারে ধারে ঘোড়সওয়ারও ছুটে চলল।

রাধা অন্দরে বসে এই খবর শুনে মনে মনে খুশি হয়। তার বাবা-মাকে আবার দেখতে পাবে। কিন্তু একের পর এক লোক ফিরে আসে, বলে, রসুলপুরের নাম কেউ শোনেনি।

রাজাবাবু রাধাকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ মা, গ্রামের নামটা রসুলপুর ঠিক তো?

রাধা ভড়কে যায়। তারও মনে সন্দেহ হয়। আমতা আমতা করে বলে, তাই বলেই তো সবাই ডাকে।

রাজাবাবু আরো দূরে ঘোড়সওয়ার ছোটালেন রসুলপুরের সন্ধানে। তাঁর যেন আর তর সইছে না। রাধার সঙ্গে কুমারের বিয়ে দিতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব। রাধাকে তাঁর পুত্রবধূ হিসাবে চাই-ই। তার রাজলক্ষণ আছে। সেই হবে কতুলপুরের ভবিষ্যৎ মহারাণী।

কিন্তু মনের ইচ্ছা তিনি কাউকে মুখ ফুটে বললেন না। এমনকি রাণীকে পর্যন্ত নয়। অঘটন কখন কি ঘটে বলা তো যায় না।

রাধার বাপ-মায়ের খোঁজ নেওয়া চলতে লাগল। কিন্তু এই ব্যবস্থা করেই তিনি চুপ করে বসে রইলেন না। কুমারের জন্য যেমন ঘোড়ায় চড়া শেখানো, লাঠি এবং তলোয়ার খেলা শেখানোর ওস্তাদ রেখেছেন, রাধার জন্যও সেই ব্যবস্থা করলেন। সকালে গুরুমশাই এসে তাকে লেখাপড়া শেখান, কিছু বাংলা ও কিছু ফার্সি। বিকালে ওস্তাদ এসে তাকে ঘোড়ায় চড়া এবং লাঠি ও তলোয়ার খেলা শেখান।

প্রথম প্রথম রাধা মহা বিব্রত হয়ে পড়ল। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, এ সবে তার কি দরকার। বড় হয়ে সে রাঁধবে-বাড়বে, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-পুত্রের পাতে ভাত দেবে, এই তো তার কাজ। ঘোড়ায় চড়ে সে কি করবে?

কিন্তু রাজাবাবুর হুকুম। এ অঞ্চলে তাঁর কথায় প্রশ্ন করার রেওয়াজ নেই। তিনি যা বলেন সকলেই নিঃশব্দে নতশিরে মেনে নেয়।

রাধাকেও মেনে নিতে হ'ল। (আগামীবার সমাপ্য)

কি কঠিন কাজ! কে যাবে এমন কাজ করতে? প্রাণ থাকবে তার হাতের মুঠোর মধ্যে। কেননা বুনো হাতী বুঝতে পারলে তাকে যে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

জঙ্গলের মধ্যে মানুষ কখনও একলা বা দল বেঁধে হাতী ধরতে যায় না। কারণ হাতীরাই দলের মধ্যে থাকে ষাট-সত্তর জন, আশী জন। একশ, দেড়শ, দু'শ হাতীও একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ কাছে আছে জানতে পারলে তাকে তারা আছড়ে মেরে ফেলবে। মানুষ যখন হাতী ধরতে যায় তখন সে আর একটা হাতীকে সঙ্গে নিয়ে যায়—এই হাতীর নাম 'কুটনী হাতী'। সে কুটনীপনা করে বলেই বোধ হয় তার নাম কুটনী রাখা হয়েছে। সে স্বজাতিকে স্বজনকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে খপ্পরে ফেলে দেয়। হাতীর যারা ব্যবসা করে—হাতী যারা জঙ্গল থেকে ধরে আনে, তারা প্রথমে হাতী পুষে তাকে কুটনীপনা বিদ্যেটা শিখিয়ে দেয়। হাতী সহজেই শিক্ষা নেয় এবং কথা শুনে ভালোভাবেই কাজ করতে পারে।

হাতীর মালিক সকালবেলা কুটনী হাতী ছেড়ে দেয় জঙ্গলের মধ্যে। হাতী তো একলা যায় না, সঙ্গে তার মাহুত থাকে। কিন্তু মাহুত থাকবে কোথায়? পিঠের ওপর বসে থাকলে বুনো হাতীরা তাকে তো মেরে ফেলবেই, আর তার হাতীটিকে পর্যন্ত শেষ করে দেবে। মাহুত এখানে তাই লুকিয়ে থাকে তার পেটের তলায়। পিঠের ওপর দিয়ে একটা জাল জড়ান থাকে, সে থাকে সেই জালের মধ্যে—কখন শোয়া, কখনও বসা অবস্থায়। সেই পেটের তলা থেকেই সে লাঠির খোঁচা দিয়ে হাতীকে চালাতে থাকে। সে সেই সংকেত বুঝে সারাদিন বুনো হাতীর দলে ঘুরে তাদের ভোলাবার চেষ্টা করে।

হাতীদের কি ভাষা, কিই বা তাদের কথা, কি কথা বলেই বা তাদের ভোলান হবে? এ বিষয়ে অন্যান্য পশুপাখীদের যেমন, এদেরও তেমনি। এদের কথা খালি খাবার কথা। খাবার সংগ্রহের কাজই তাদের কাজ। সারাদিন তারা দল বেঁধে ঐ এক কর্মে ঘুরে বেড়ায়। কুটনী হাতী তাদের কানে সেই মন্ত্রই দিয়ে চলে। সে তাদের বলতে থাকে, একটা ভাল বাগান তার জানা কোথায় আছে, কেমন করে সেইখানে যাওয়া যায়; একবার সেখানে যেতে পারলে বেশ কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত হতে পারে।

এই সব ধরণের কথা নিয়ে সে সারাদিন কাটিয়ে দেয় বুনো হাতীর দলের মধ্যে। সন্ধ্যে হলে সে আর সেখানে থাকে না, মাহুতকে নিয়ে চলে যায় তার নিজের ডেরায়। সারাদিন বাদে মাহুত তখন বেরিয়ে আসে তার গোপন জায়গা থেকে। সে তখন খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নেয়। হাতীও তখন শুয়ে পড়ে তার সারা দিনের অবসন্ন দেহ

নিয়ে। যাত্রা আবার শুরু হয় পরের দিন ভোরের বেলা। মাহুত তখনকার মত তৈরী হয়ে নিয়ে হাতীর পেটের তলায় জালের মধ্যে তার সেই গোপন জায়গাটায় আবার আস্তানা নেয়। এইভাবে দিনের পর দিন তাদের কাজ চলতে থাকে। কুটনী হাতী আবার এমন—সে আগের দিন যে দলটির সঙ্গে মিশেছিল, ঠিক সেই দলটিকে খুঁজে নেয় বনের মধ্যে। এদিকে আগন্তুক হাতীদের অভ্যর্থনার জন্য বাগান তৈরী হতে থাকে। জঙ্গল ছাড়িয়ে একটু তফাতে অনেকখানি জমি ঘেরাও করে একটা বাগান তৈরী হয় এবং সেখানে কলাগাছই লাগান হয় খুব বেশী করে। অবশ্য আরও অনেক রকমের গাছও থাকে। একটা নকল জঙ্গলের মত হয় তার চেহারা। তার ফটক থাকে প্রকাণ্ড, বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। কুটনী হাতী যখন কায়দা করে তার কয়েকজন বুনো বন্ধুকে এনে তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে তখন তো তারা আহ্লাদে আটখানা! এত খাদ্য—এত কলাগাছ তারা একযোগে আর দেখেনি কখনও। যে তাদের নিয়ে এলো সেখানে, তাকে শেষকালে ভুলে যায়। একেবারে মত্ত হয়ে সবাই খেতে লেগে যায়। কুটনীও সুযোগ বুঝে তাদের নিমন্ত্রণে বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

মাহুত সেই সময় ফটকের দরজা বন্ধ করে দেয়। হাতী মশাইরা কয়েক দিন খুব নাচানাচি করে নেয়। তারপর যখন খাদ্য ফুরিয়ে আসে, তখনই চলে যাবার কথা মনে পড়ে। কিন্তু কোথায় যাবে তখন? চারিদিক আটকান, কঠিন বেড়া, তারপর আরম্ভ হয় চীৎকার, গর্জন, লাফালাফি, বাগান ফাটিয়ে! সব তখন বুঝে ফেলে তারা। কুটনী হাতীকে পেলে বোধ হয় সে সময় গিলেই ফেলে! যতখানি শক্তি থাকে দাপট দেখায়. তারপর অনাহারে দুর্বল হয়ে শেষে শুয়ে পড়ে। এইবার মাহুত এসে তাকে খাবার দিয়ে বাঁচায়, অর্থাৎ তাকে বশ করে ফেলে—তার পায়ে দেয় শিকল পরিয়ে।

কুটনী হাতী আর সেই হাতীর দলে কখনও যায় না। তারা এইবার সব বুঝে ফেলেছে। পেলে তাকে মেরে ফেলবে। কারণ সে তাদের দলের কয়েকজনকে ভাঙিয়ে নিয়েছে!

একটুখানি হাসো

শিক্ষক—বলো তো কারক কয় প্রকার?

ছাত্র—স্যার, কারক দু'ই প্রকার—বলকারক ও পুষ্টিকারক।

*

শিক্ষক—আচ্ছা, বলো দেখি কেস্ কয় প্রকার?

ছাত্র—আজ্ঞে, কেস্ দু' প্রকার—সুটকেস ও লেদারকেস।

শ্রীসন্তোষকুমার গুপ্ত

মিঠুনের পরীক্ষা

শ্রীবিকাশ বসু

মিঠুনদের স্কুলটা খুব কড়া। সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা। সেবারের সাপ্তাহিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিল—পাঁচজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম লিখ। মিঠুন লিখল—নিউটন, লুই পাস্তর, আইনষ্টাইন, সত্যেন বসু ও অবনীশচন্দ্র মজুমদার। অবনীশচন্দ্র মজুমদার মিঠুনের বাবার নাম।

শনিবারে শনিবারে পরীক্ষা, সোমবারে সোমবারে খাতা ফেরত। খাতা ফেরত দেবার সময় বাংলার স্যার উচ্চকণ্ঠে মিঠুনের খাতা পড়ে ক্লাসের সবাইকে শোনালেন। সবাই হাসতে লাগল। সবাইকে হাসতে দেখে মিঠুন লজ্জা পেল, কিন্তু ভেবে পেল না তার ভুলটা কোথায়। তার বাবা কি বৈজ্ঞানিক নন।

আসলে অবনীশবাবু স্থানীয় কলেজের একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক মাত্র।

সকালে বাজার করার সময় বাংলার স্যারের সঙ্গে অবনীশবাবুর রোজই দেখা হয়ে যায়। পরের দিনই সকালে মেছোহাটায় বাংলার স্যার মিঠুনের বাবাকে ধরে বললেন, শুনেছেন আপনার ছেলের কাণ্ড।

অবনীশবাবু ভাবতে লাগলেন, এখন তো কামরাঙার সময় নয়। তাহলে মিঠুন আবার কোন অপকর্ম করল। গত বছর মিঠুন ও তার সম্প্রদায় মিলে কুড়ুনে চাষীর কামরাঙার গাছটি একেবারে শেষ করে দিয়েছিল। হেডমাষ্টারমশাই এজন্য মিঠুন ও তার সম্প্রদায়কে জরিমানা করেছিলেন। জরিমানার সমস্ত টাকা অবনীশবাবুর পকেট থেকেই গিয়েছিল।

অবনীশবাবু হয়তো মিঠুনের দ্বারা সম্ভব সব অপকীর্তির কথা একে একে ভেবেই চলতেন, কিন্তু তার আগেই বাংলার স্যার সব কথা খুলে বললেন। সব কথা শুনে মিঠুনের বাবা খুব লজ্জা পেলেন। কিন্তু একটু গর্বও হ'ল তাঁর। ছেলেবয়েস থেকে একজন মস্তবড় বৈজ্ঞানিক হবার বাসনা ছিল তাঁর। মিঠুন বোধহয় কেমন করে তা জানতে পেরে পরীক্ষার খাতায় তাঁকে বৈজ্ঞানিক বানিয়ে দিয়েছে।

বাড়িতে এসে অবনীশবাবু হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন, শুনেছ তোমার ছেলের কাণ্ড।

মিঠুনের কাণ্ডর শেষ নেই। তখন মিঠুন আরো ছোট। কী একটা প্রয়োজনে বাড়িতে লেডি ডাক্তার আনার কথা হচ্ছিল। সেই সূত্রে 'লেডি ডাক্তার' শব্দটি বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল। মিঠুনের খুব ভাল লাগছিল শুনতে, শব্দটা বিদেশী বলেই বোধ হয়। তা ছাড়া বুড়ো নরেন ডাক্তারের জায়গায় আর একজন নতুন ডাক্তারকে দেখতে

পাবে এজন্যেও তার ভালো লাগছিল। লেডি ডাক্তারকে দেখবার আগ্রহে সকাল থেকে মিঠুন দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। লেডি ডাক্তারকে আগের দিনই খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারদের যেমন হয়ে থাকে, বেলা বারোটা বেজে গেলেও তাঁর দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। বাবা বার বার ব্যগ্রতা প্রকাশ করছিলেন, লেডি ডাক্তার এসেছে ?

মিঠুন তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে ছুটে গিয়ে খবর দিল, লেডি ডাক্তারের বউ এসেছে।

ছোটকা একবার ডিস্‌পেনসারী ঘুরে এল। না, তিনি সেখানে নেই, 'কলে' বেরিয়ে গেছেন।

প্রায় বেলা একটার সময় মিঠুন দেখল একজন ভদ্রমহিলা ব্যাগ ও বুক-দেখা-নল (ষ্টেথেসস্কোপ) হাতে তাদের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেন।

মিঠুন তৎক্ষণাৎ বাড়ির মধ্যে ছুটে গিয়ে খবর দিল, লেডি ডাক্তারের বউ এসেছে।

বাড়িসুদ্ধ সবাই তার কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ছোটকা মিঠুনকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, চল দেখি তোর লেডি ডাক্তারের বউকে ডেকে আনি।

তারপর অনেকদিন ধরে বাড়িতে সকলে সেই গল্প করেছে।

মিঠুনের দৃঢ়মূল ধারণা হয়েছিল লেডি ডাক্তার আগে আগে ব্যাগ ও ষ্টেথেসস্কোপ হাতে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়েছেন, পরে তিনি আসবেন। মিঠুন যখন দেখল লেডি ডাক্তার নিজে এলেন না, তাঁর বউ-ই ডাক্তারি করলেন, তখন মিঠুনের ভুল ভেঙে গেল। পরে যখনই এই ঘটনা মনে পড়েছে মিঠুন মনে মনে খুব লজ্জা পেয়েছে।

আর একটা ঘটনার কথা মিঠুনের খুব মনে পড়ে। তখন ওরা এখানে সবে এসেছে। এদিকটায় এতো বাড়ি ওঠেনি। পোষ্ট অফিসের পিছনে ছিল ধান ক্ষেত। ধান ক্ষেতটা তাকে খুব টানত, আর টানত দূরের রেল-লাইন। দূর থেকে সে দেখত মেঠো রাস্তা মিশেছে রেল-লাইনের গায়ে। তার খুব ইচ্ছে করত রেল-লাইনটা ছুঁয়ে আসতে।

তখন মিঠুনের কতই বা বয়েস। ভর্তি হয়েছে স্থানীয় বাংলা স্কুলের 'ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে'। 'ইনফ্যাণ্ট' শব্দটা সহজে মুখে আসে না। কেউ কোন্ ক্লাসে পড় জিজ্ঞাসা করলে মিঠুন উত্তর দেয়, 'ফিন্ ফিন্' ক্লাসে। ছাত্রদের চেহারাও ক্লাস অনুযায়ী ফিন্ ফিন্ করছে। কী রোগা ছিল তখন মিঠুন। একদিন সদ্য-সংগৃহীত বন্ধু অঞ্জুকে ডেকে মিঠুন বলল, রেল-লাইনে যাবি?

অঞ্জু বলল, চ।

ধান ক্ষেতের সবুজ শাড়িটা শেষ হয়েছে রেল-লাইনের কালো-পাড়ে। বুড়ির কুল গাছটা পার হয়েই অবাক কাণ্ড—রেল-লাইনটা এসে গেছে। পাথরকুচি, কাঠের স্লিপার স্পষ্ট দেখা যায়। দূর থেকে গুমটি ঘরটাকে দেখাচ্ছিল যেন একটা ছোট্ট টুল। এখন সেটা ঘর বলেই বোধ হচ্ছে।

অঞ্জু মিঠুনকে বলল, আচ্ছা ওটা কি বল তো?

মিঠুন এতক্ষণ দেখতে পায়নি। রেল-লাইনের গা ঘেঁষে ধান ক্ষেতের মধ্যে মানুষ-প্রমাণ একটা লোহার খুঁটির মাথায় চারচৌকো টিনের প্লেট গাঁথা।

মিঠুন অঞ্জুকে বলল, চল, কী লেখা আছে পড়ে আসি।

জল-কাদা ভেঙে দু'জনে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। এবার বেশ পড়া যায়। ছাড়ো-ছাড়ো করে লেখা—সাব ধান।

মিঠুন অঞ্জুকে বলল,—মানে কী বলতো?

অঞ্জু বলল, তুই একটা আস্ত গাধা। নামের আবার মানে কি। এই ধানগাছগুলোর নাম 'সাব ধান'।

মিঠুন অনেক রকম ধানগাছের নাম শুনেছিল। কিন্তু 'সাব ধান' বলে কোন ধান আছে বলে শোনেনি।

মিঠুনের মনে সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয়ে সে বলল, তাই বোধহয় হবে রে।

অঞ্জু বলল, বোধহয় কি রে, তাই।

মিঠুন ভাবল, অঞ্জুর দাদা চাষবাষ সম্পর্কে পড়াশুনো করতে আমেরিকায় গিয়েছে,

অঞ্জুর কথা মেনে নেওয়াই ভালো। সে মনে মনে বলল, যাক একটা নতুন ধানগাছের কথা শেখা গেল।

মিঠুনের এমনি স্বভাব নতুন কিছু শিখলে তা জাহির করবেই। হাফইয়ার্লি পরীক্ষাতেই প্রশ্ন এল, যে কোন একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লিখ: গরু অথবা ধানগাছ। সে চোখ বুজে ধানগাছের কথা লিখতে আরম্ভ করে দিল। আমন, আউষ, পৌষ, সালি ধান, বিন্নি ধান, উড়কি ধান ইত্যাদির কথা একে একে লেখার পর সে লিখল, "আরও একপ্রকার ধানগাছ আছে। তাহার নাম সাব ধান।"

মিঠুন ভেবেছিল সে রচনায় সকলের চেয়ে বেশি নম্বর তুলবে। বইয়ে যা লেখা আছে, তা তো সে লিখেছেই, তা ছাড়া নতুন কথা লিখেছে। খাতা ফেরত দিতে দেখা গেল, লাল কালির দাগ দিয়ে বাংলার স্যার লিখে দিয়েছেন, "সাবধান! বইয়ের কথা লিখবে, নিজের কথা লিখবে না।" রচনায় মিঠুন অনেক কম পেয়েছে। তার কান্না পেল। সে অঞ্জুকে বলল, দেখি তোর খাতা দেখি।

অঞ্জু বলল, আমি তো ধানগাছের রচনা লিখিনি—গরুর রচনা লিখেছি।

মিঠুনের ভীষণ রাগ হয়েছিল অঞ্জুর ওপর।

টুনটুনিকে

শ্রীসলিল মিত্র

ও টুনটুনি টুনুরাণী টুন্ টুনাটুন্ টুন্,
বেগুন গাছে উঠে তুমি খাবে কি বেগুন ?
বেগুনকাঁটা নাকে যদি পুট্‌স্ করে লাগে
নাপ্‌তে ব্যাটার নরুন দিয়ে বাদ দেবে নাকটাকে ?
তাই কি পারো ? নাকটাকে বাদ ? যায় না পারা ভাই
তবে তুমি বেগুন খেতে যাচ্ছ কেন ছাই ?
নাকটি যাবে—নরুন পাবে তার বদলে ঠিক—
'খ্যাঁদানাকি' বলে সবাই হাসবে যে ফিক্ ফিক্ !

গঙ্গাফড়িং

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একে জায়গাটা আদিগঙ্গার পশ্চিমকূলে, তার উপরে রামতুলসীতলাও পাওয়া গেল। গঙ্গাফড়িং মহা আনন্দে সেইখেনে আখড়া বসিয়ে দেশের ফড়িংদের নিয়ে অষ্টপ্রহর সংকীর্তন জুড়ে দিলেন। তুলসীপাতা খেয়ে খেয়ে গঙ্গাফড়িং ক্রমে নবদূর্বাদলশ্যাম বর্ণটি হয়ে উঠুন; ফড়িংগুলো কাদাগোলা গঙ্গাজল খেয়ে গঙ্গামৃত্তিকার অলকাতিলকার ছাপমারা হয়ে থাকুন, এদিকে গঙ্গার ওপারে খুদে পিঁপড়ে, ডেঁয়ে পিঁপড়ে তারা মাঠের মধ্যে গড়শেষ্ট হাঠ-বাজার ঘর-কন্না পেতে বসবার জোগাড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে খুদকুঁড়ো সংগ্রহ কোরে কেবলি খাটছে; বাসরে কি খাটুনি! রোদে পুড়ে ডেঁয়েগুলো কালো হয়ে গেল, রাঙ্গামাটি খুঁড়তে খুঁড়তে খুদে পিঁপড়েগুলোর গায়ের বর্ণ পোড়ামাটির মত রং ধরলে।

এই ভাবে দিন যায়, গঙ্গাফড়িংয়ের 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে হুল্লোড় করে দিন যায় আর পিঁপড়ের দিন যায়, কাজ কাজ কেবলি কাজ করে; ক্রমে বর্ষা গেল, শরৎ গেল, শীত কাটলে বসন্তকালটাও ফুরালো, খরার দিনে আদিগঙ্গার জল ম'রে তলার মাটি পর্যন্ত ফেটে চটে শুকিয়ে উঠলো—মাঠগুলোয় আর ঘাসও গজায় না গাছও বাঁচে, না কেবলি ধুলো ওড়ে আর আকাশের শেষ পর্যন্ত আদিগঙ্গার দুই পার ধূ ধূ করতে থাকে। পিঁপড়েরা মাটির তলায় ঢুকেছে, সেখানে তাত একটুও নেই, জমা করা খাবারও যথেষ্ট, পিঁপড়েরা আরামেই রইলো! আর গঙ্গাফড়িং শুকনো রামতুলসীর তলায় না পান হাওয়া, না পান খাওয়া; তাই একদিন ওপার থেকে এপার পিঁপড়ে শহরে ভিখ্ মাঙ্গতে চল্লেন। পিঁপড়েদের খুদে শহরে খুদকুঁড়োর গুলজার বাজার বসেছে, পিঁপড়েরা আসছে-যাচ্ছে নিচ্ছে-থুচ্ছে গঙ্গাফড়িংকে দেখেও তারা দেখে না। বেলা বাড়লো, খিদেয় তার পেট জল্লো, তেষ্টায় গলা কাট হলো, এক মুদির দোকানের সামনে ভিক্ষে দাও বাবা বলে ফড়িং গিয়ে হাত পাতলেন। মুদির দোকানের খুদে পিঁপড়ে কট্‌কট্ করে শুনিয়ে দিলে—ভিখ্ পাওয়া যাবে না! গঙ্গাফড়িং ধারে খাবার চাইলেন—এখন কর্জ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও—ফসল ফল্লে কুঁড়োর বদলে কাঁড়ি দিয়ে ধার শুধবো। পিঁপড়ে শুধোলো, খুদ কুঁড়ো কাঁড়িনা করে এক মাস করছো কি শুনি? গঙ্গাফড়িং খঞ্জনী বাজিয়ে গঙ্গা-মাহাত্ম্য সুরু করে দিলেন—রাত্রি হয়ে এল, মুদি বল্লে যদি গেয়ে গেয়েই দিনটা গেল, তবে না খেয়ে রাতও পোহাক্, বলে সে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করলে।*

---

* এই রচনাটি 'পার্বণী' (১৩২৭) নামক বার্ষিকী থেকে গৃহীত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(৬)

আবার দিন যায়,—আসে।

তিল বড় হয়ে তাল না হোক, কুম্‌ড়োর ফালির মত চাঁদ সোনার থালার মত হয়। তেম্নি হয় মহারাজা, মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি, আর মহাকোটালের ছেলেরা। চাঁদের মত ছুরত তাদের নয়, তবু খোসামুদেরা খোশ মেজাজে বলে, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

তারাই এত বড় রাজ্যের হবু হর্তাকর্তা। কিছুকাল পর তাদের হাতে রাজ্যপাট দিয়ে বুড়োদের বনে যেতে হবে। সেদিন রাজসভায় এ কথা উঠল।

মহামন্ত্রী বল্‌ল, "আমরা বুড়িয়ে যাচ্ছি মহারাজ। একদিন তো বনে যেতে হবে। ছেলেদের রাজকাজ না শেখালে যদি বুনো বনে যায়।"

মহারাজ সায় দিয়ে বলে, "বুনো ওল সাংঘাতিক।"

মহামন্ত্রী বলে, "কিন্তু রাজদরবার ঘর একটা।"

মহাকোটাল বলে, "শ্যাওড়া, গাব আর তেঁতুলতলায় বসে হাতেখড়ি হতে পারে। সেখানে অনেক পশুপাখী,—তারা পাত্র-মিত্র। গাছের গুঁড়ি বাঁধিয়ে দিলে সিংহাসন!"

মহাসেনাপতি সায় দেয় না। সে বাইরের শত্রুর আর মহাকোটাল ভেতরের শত্রুর খবরদারি করে। কে বড় আর কে ছোট তা নিয়ে তাদের মধ্যে আখছা-আখছি। তা আখছার লেগে আছে। মহাসেনাপতি বলে, "পশুপাখীর মধ্যে থেকে তারা যদি সে ধাঁচের হয়ে যায়?"

মহাকোটাল বলে, "উঁহু। যেখানে থাক, ছুঁচোর ছেলে ইঁদুরের চেয়ে, গাধার ছেলে পাঁঠার চেয়ে বড় হয়।"

মহারাজা বলে, "ঠিক। বাঁদরের ছেলে ভোঁদড়ের চেয়ে বড় হয়।"

সবাই হাততালি দেয়; কিন্তু ছুঁচো আর গাধার তুলনায় মহাসেনাপতি মনে মনে ক্ষেপে ওঠে। আত্মসম্মানের দোরে তা যে জোরদার ধাক্কা! মহামন্ত্রী তা টের পায়। মহাসেনাপতিকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, "মহারাজা যখন ভোঁদড় বাঁদরের তুলনা করেছেন, তা ভাদর মাসের রোদের মত আর পোষ মাসের পিঠের মত মিঠে।"

তবু মহাসেনাপতির রাগ কাটে না। সে তলোয়ার খোলে না, কিন্তু বাঁ হাতে আড়াল করে, ডান হাতে মহাকোটালের নাকের কাছে একটা তুড়ি দেয়। আর কেউ না দেখলেও মহাকোটাল তা দেখে। বলে, "মহারাজাকে যদি বলে দি।"

ঘোরাল ব্যাপার সরল করার জন্য মহামন্ত্রী বলে, "আহা যেতে দাও। একটা তুড়ি তো। ভুঁড়ি বাগিয়ে লোকে তুড়ি দেয়, হাই পেলে তুড়ি দেয়, তাল দিতে তুড়ি দেয়। তাতে বেসামাল হতে নেই। এ হ'ল গিয়ে আপোষে ঘুড়ির লড়াই। আপসোসের কিছু নেই। থুড়ি বলে উড়িয়ে দাও।

কি আর করা? মহারাজার পরে মহামন্ত্রী! সে যেভাবে যন্ত্র বাজায় মান্‌তে হয়। তারা জুড়ি বেঁধে থুড়ি দেয়। তুড়ির জারিজুরি ভাঙে।

মহারাজার নজর এড়ায় না। ক'দিন পর বলে, "যখন মিটে গেছে, মিঠে কথা বলি। যদি টিকটিকি বড় হয়ে গিরগিটি হয়, আর বেড়াল হয় বাঘ, তাতে রাগের কারণ কিস্‌সু নেই। রাজাও দস্যি হচ্ছে।"

শুনে মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি আর মহাকোটাল ভড়্‌কে যায়। মহারাজা হেসে চোখ মটকায়। বলে, "সত্যি কি আর দস্যি হচ্ছে? জোর হাস্য করে। ওঙা ওঙা ছেড়ে মাম্মা, বাঃ বাঃ ছেড়ে বাব্বা বলে।" শুনে সবাই বাহবা দেয়।...

অমন আজব ঘরের বাহারে ছেলে! আদর-আবদারের অবধি নেই। নাই পেয়ে তার বায়না ও খাই খাই বেড়ে চলে। এক গা গয়না পরে সে টলেটলে ঘরময় আনাগোনা করে। আর ভোজনের ওজন না থাকায়, পোকামাকড় চাপড়ে মেরে মুখে দিয়ে চাখে। মহারাজা আর মহারাণী অবাক চোখে দেখে বলে, "এ ছেলে দিগ্বিজয়ী হবে। শত্রু ধরে খাবে।"

সে নানা ঢঙ দেখিয়ে হাসায়; কিন্তু কিছুদিন পর কাঁদাবার উপক্রম করল। পেটে শক্ত ব্যামোর আক্রমণ হ'ল। হোঁৎকা রাজা টিঙটিঙে রোগা হতে লাগল।

একদিন তা টের পেয়ে মহারাজা বলল, "মহারাণী, ভাল কথা নয়।"

মহারাণী ভয় পেয়ে বলে, "ভূত এল নাকি ?"

"মহারাজা বলল, ভূত না হলেও ভয়ের কথা। এমন বংশের ছেলে রাজা। সে হবে সিংহ-বাঘের মত। কিন্তু সে টিঙটিঙে রোগা হচ্ছে কেন ?" এতক্ষণে মহারাণীর নজরে এল, সে মাথা চুলকে বলল, "তাই তো। তাই-তাই দেয় না,—চাঁদ ডেকে টিপ দিলে ফিক্ ফিক্ হাসে না! অথচ বাটি-ভরা দুধ-ভাত, পাত-ভরা পিঠে-পায়েস, মোণ্ডা-মেঠাই খায়।"

মহারাজা টিপ্পনী কেটে বলে, "তাই তো মোটেই মোটা হয় না। মাংসে মাংস বৃদ্ধি, হাড়ে হয় বাড়।" শ্লোক শুনিয়ে দেয়।

মহারাণী জানায়, "কিন্তু দাঁত বার হয়নি যে।"

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "কি বারে জন্মেছিল ?"

মহারাণীর তা মনে নেই। মাথা চুলকে বলে, "রাঙা শুক্রবার—"

মহারাজা নিজের দাঁত বার করে বলে, "ঐ বারে আমারও জন্ম হয়েছিল। তার অনেক বাহার। আমার দাঁতের ধার দেখ।"

মহারাণী তার দাঁত ধরে দেখে। মহারাজা প্রশ্ন করে, "কেমন ধার দেখলে তো ?" তলোয়ারের আর দরকার হয় না। দাঁত বার করতে শত্রু দৌড়ে পগার পার হয়।"

ভাল কথা! কিন্তু কোন্ শুঁট্কী বুড়ী ঝাঁটা পেটা করে রাজাকে রোগা-পট্কা বানাচ্ছিল। তাকে আটকানো দরকার। তার জন্য চাই আঁটসাট দাঁত। অথচ কাছে-টাছে দাঁতের দোকানই নেই।

অগত্যা মহারাজ রাজসভায় গিয়ে বলে, "মহামন্ত্রী!"

মহামন্ত্রী হাত জুড়ে বলে, "মহারাজ!"

"তোমার ছেলে রোগা না মোটা ?"

কি বল্লে মহারাজ চটে যাবে, তা ভেবে মহামন্ত্রী দাড়ি চুল্কায়। সরু গলায় বলে, "ভয়ে বল্‌ব, না নির্ভয়ে বলব মহারাজ ?"

"নির্ভয়ে বল।"

"আপনার রাজ্যে বাস। আশ মিটিয়ে দুধ-ভাত খায়, রোগা হবে কোন্ দুঃখে ? মোটাসোটা।"

"মুড়ো, মাংস, হাড় খায় ?

"বড় হয়ে খাবে মহারাজ। এখনো দাঁত ওঠেনি।"

"তোমার ছেলে মোটা হয়, আমার ছেলে হয় না কেন ?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে মহামন্ত্রী লোটাপুটি খায়। ওটা রাজপাটের পুঁথিপত্রে লেখা নেই। বহু মাথা খাটিয়ে বলে, "মহারাজার পুত্র রাজার খাবার বায়না বেশী। অনেক খাজাগজা মোণ্ডামেঠাই খায় তো। তা পেটে সয়না। এক কাজ করলে হয় না ?"

মহারাজা প্রশ্ন করে, "কি কাজ ? গা-সাজান গয়না ?"

মহামন্ত্রী তা-না-না-করে জবাব দেয়, "চেনা-জানা কবিরাজ আনা।"

মহারাজ খুসী হয়ে বলে, "কাজের কথা মনে করেছ মহামন্ত্রী। নানা কাজের ঝামেলায় এ কথা স্মরণ হয়নি!" বাড়ী ফিরে মহারাজা কবিরাজকে ডেকে বলে, "তুমি আছ কেন?"

কবিরাজের মাথার সামনে টাক, পেছনে টিকি। সব দাঁত পড়ে ফোক্‌লা মুখে কথা বলে, আর বয়সের চাপে কুঁজো হয়ে চলে। তার সকল কথা জড়িয়ে যায়। সে টিকি নেড়ে বলে, "আসিক্কেণ? আপনি ঢাকেন ব্লে। (আছি কেন? আপনি ডাকেন বলে)।"

মহারাজা বলে, "রাজা চিচিঙের মত টিঙ্‌টিঙে রোগা হয়ে যাচ্ছে। পুঁথিপত্র ঘেঁটে তাকে হাতি বানিয়ে দাও। রাজাকে বাজিয়ে দেখ।"

কবিরাজ নিচের দিকে চেয়ে বলে, "নিচ্চো, নিচ্চো। (নিশ্চয়, নিশ্চয়)।"

কিন্তু সত্যি সে আর রাজাকে ঢোলের মত দু'হাতে বাজায় না। তার জিভ দেখে, চোখ উল্টে দেখে, বুকে কান দিয়ে ধুকধুক আওয়াজ শোনে, নাড়ি টেপে, পেটে টিপি দেয়। আর রাজা চোখ পিটপিট করে ঘোঁত ঘোঁত শব্দে হাসে।

কবিরাজ খেক্ খেক্ করে শেয়ালের ডাক শোনায়, "হুয়া, ঠিক হুয়া। ঐ টো রোগ!"

মহারাজ বোঝে না। জিজ্ঞেস করে, "কি রোগ?"

কবিরাজ বলে, "ঘোট্ ঘোট্ রোগ। বডহজম হোয়ে ঢ্যাবঢ্যাব; টারফর ঘোট্ ঘোট্ (বদহজম হয়ে ঢেবঢেব, তারপর ঘোঁত ঘোঁত।) আওয়াজ ডিচ্ছে (দিচ্ছে)। ডেখুন (দেখুন)।" সে রাজার পেট টিপে তার অট্টহাসি শোনায়।

মহারাজা মাথা নেড়ে বলে, "পেটে রাক্কোস ঢুকেছে?"

কবিরাজ বলে, "উঁহু, ঘোট্ ঘোট্। ছেলেকে কে ফালে (পালে)?"

অনেক দুধ ঘি ছানা ননী খেয়ে মহারাণীর নড়াচড়ার কষ্ট। ছেলেকে পালে তার খাস ঝি আহ্লাদী আর জল্লাদী। তাদের ডাকা হয়। কবিরাজ তাদের জিজ্ঞেস করে, "রাজা কি ক্কায় (কি খায়)?"

কঠিন প্রশ্ন। বরং কি না খায় এ প্রশ্ন সোজা। ওরা মাথা চুলকে বলে, "পোলাউ, মাছের মুড়ো, মাংসের হাড়—"

কবিরাজ হে হে করে বলে, "ডাট নেই, আর এ সোব ক্কায় (দাঁত নেই, আর এ সব খায়)?"

কি খায় রাজা তা দেখিয়ে দিল। কবিরাজের ঝোলায় ছিল এক ডিবা চ্যবনপ্রাশ সুযোগ খুঁজে রাজা তা সাবাড় করেছে।. কবিরাজ বুঝল, রাজাকে যারা পালে তারা তার এ হাল করেছে। সে ওষুধের মোড়ক পাকিয়ে বলল, "শুটু রাজা খেলে চলবে না। যারা ফালে টাডেরও ডুবেলা ডুগোণ্ডা নিম ঘোটা ডিয়ে ক্কেটে হোবে। (শুধু রাজা খেলে চলবে না। যারা পালে তাদেরও দু'বেলা দু'গণ্ডা নিম গোটা দিয়ে খেতে হবে)।"

কবিরাজ গুটিগুটি চলে যায়, আর আহ্লাদী জল্লাদী ভয়ে গুটিগুটি মারে। নিম-গোটার নামে ওরা হিমসিম খায়। আড়ালে বলে, "কোবরেজ না কানা কুমীরের ল্যাজ! নেড়েচেড়ে তেজ দেখিয়ে গেল!" (ক্রমশঃ)

নজরুল-কথা

—শ্রীকৌশিক চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম

নাম কাজী নজরুল ইসলাম, গাঁয়ের লোকেরা ডাকে দুখুমিয়া বলে। গরীব-দুঃখীদের জন্য সর্বদাই তার প্রাণ কাঁদে। সেইজন্যই বোধহয় তারা ওই নাম দিয়েছে।

একবার ঈদের উৎসবে গ্রামের এক মৌলবীর বাড়িতে খুব খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অতিথিরা আসছে-যাচ্ছে। এক ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরে দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। অতিথিরা সব চলে গেলে সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে ঈদের জাকাত (ভিক্ষা) চাইল। মৌলবী তো তাকে দেখা মাত্রই ঘৃণায় নাক কুঁচকে ঝাঁঝিয়ে উঠল—দূর হ, দূর হ ব্যাটা!

বেচারী ভিক্ষুক নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। দূর থেকে এ দৃশ্যটা দেখতে পেল বালক নজরুল। তার দরদী হৃদয় কেঁদে উঠল। সে তাকে হাত ধরে তার বাড়িতে নিয়ে এসে পেট ভরে খাইয়ে দিল। ভিক্ষুক আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল।

পরবর্তীকালে হয়ত একথা স্মরণ করেই কবি লিখেছিলেন—

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর,
মোল্লারা কন হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনে,
সবে দাও পাজীটার জাত মেরে।

নজরুলের পরদুঃখকাতরতার সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা বলছি।

নজরুল তখন যুবক। গাড়ী করে কোলকাতার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক বাড়ির সামনে দেখতে পেলেন, কিছু লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, কী ব্যাপার? নজরুল গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, বাড়ীতে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু টাকার অভাবে সৎকারের ব্যবস্থা হয়নি।

সেদিন নজরুলের পকেটে কিছু টাকা ছিল। পঞ্চাশ টাকা বের করে ক্রন্দনরতা মাতার হাতে দিয়ে ফিরে এলেন। গাড়ীতে উঠে সহযাত্রী বন্ধুকে বললেন, আজ যদি আমি মুসলমান না হয়ে হিন্দু হতাম, তা হলে শিশুটির সৎকার কার্যে নিজেই এগিয়ে যেতাম। কিন্তু হায়! মৃত্যুর পরেও মানুষের জাত বিচার।

জাত-টাতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ কবির নানা গানে ও কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'জাতের বজ্জাতি' নামক কবিতায় তিনি লেখেন—

"বলতে পারিস বিশ্বপিতা,
ভগবানের কোন সে জাত?
কোন ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া,
অশুচি হন জগন্নাথ!"

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি'র কবিতা বাংলার তরুণদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকাও বাংলার বিপ্লবী মনকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। বৃটিশ সরকার ভয় পেয়ে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। সেইখানে দাঁড়িয়ে কবি যে অপূর্ব ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই জবানবন্দী থেকে এখানে কয়েক লাইন উদ্‌ধৃত করছি—

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজ-বিদ্রোহী; তাই আমি রাজ-কারাগারে অভিযুক্ত। একধারে রাজার মুকুট, আর এক ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর একজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড।"

জেলে থাকতে নজরুল গানে, কবিতার আবৃত্তিতে, হাস্যরসে, রাজবন্দীদের মাতিয়ে রাখতেন। নজরুল সঙ্গে থাকলে, জেলের শত দুঃখ-কষ্টও তাদের গায়ে লাগত না।

হুগলীতে জেল সুপার ছিল আর্স্টন বলে এক সাহেব। তার মেজাজটাও ছিল যেমন বিশ্রী, চেহারাটাও ছিল তেমনি বিদকুটে। কবি তাকে ডাকতেন হর্সটোন বলে। তাকে চটাবার জন্য তিনি 'সুইপার বন্দনা' বলে একটি গান লিখলেন। তার প্রথম অংশটি এই রকম—

"তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে,
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার গান, তোমারি ধ্যান,
তুমি ধন্য ধন্য হে।"

জেলের কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টি পড়ল নজরুলের ওপর। তারা বুঝল, রাজবন্দীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখেছে এই কবি মানুষটি। বাইরে থেকে দৈনিক কাগজ আসা বন্ধ হোল, দৈনিক কাগজ পড়া বন্ধ হোল। সকালে-বিকেলে জেলের মাঠে যেটুকু পায়চারী করবার ব্যবস্থা ছিল, সরকারী হুকুমে তাও বন্ধ হোল। কিন্তু কিছুতেই কবির অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে খর্ব করা গেল না। কবি উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরতেন—

"কারার এই লৌহ কপাট,
ভেঙে ফেল্ কররে লোপাট।"

জেলে থাকতেই কবি আর একটি গান রচনা করেছিলেন—

"এই শিকল পরা ছল্ মোদের,
এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের,
করব রে বিকল।
তোমার বন্দী কারায় আসা,
মোদের বন্দী হতে নয়।
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের,
সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন পরেই, বাঁধন ভয়কে,
করব মোরা জয়।
এই শিকল বাঁধা পা, নয় এ
শিকল ভাঙা কল।"

মানব-দরদী বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে নমস্কার।

ভূতোর সঙ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

ঢং ঢং ঢং···
সেজেছে কি সঙ!
কাঁধে লাঠি মাথায় হাঁড়ি
যাচ্ছে ভূতো শ্বশুরবাড়ী।
পায়ে জুতো, মোচার খোলা
লাঠির ডগায় ছেড়া ঝোলা
মনের সুখে ছাতু ছোলা
খেতে খেতে যায়।
ডাইনে-বাঁয়ে থুথু ফেলে
জুটলো যতো পাড়ার ছেলে
মুচকি হেসে ভূতো শুধু
এদিক-ওদিক চায়।

সেদিন নজরুলের পকেটে কিছু টাকা ছিল।
মাতার হাতে দিয়ে ফিরে এলেন। গাড়ী
আমি মুসলমান না হয়ে হিন্দু
কিন্ত হায়! মা

নগর

শ্রীবিমল দত্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

খুড়ো অনেকক্ষণ ধরে তাক কষছিল—সুযোগ বুঝে ঝরকা দিয়ে সুড়ুৎ করে গ'লে ওপারে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ-এর লম্বা লম্বা ক্যাঙ্গারুর থাবার মত পায়ের উপরে গ্যাঁট্ হয়ে বসে পড়ল। খুড়ীও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গাছকোমর বেঁধে ওপারে লাফিয়ে পড়ে আরেকটা থাবার উপর আঁচল পেতে বসল।

অমনি কোথা থেকে—মাটি ফুঁড়ে, না কি করে কে জানে—ভোজবাজির খেলার মত কতকগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে অদ্ভুত আকৃতির জীব তাদের চারিদিকে ভিড় জমিয়ে ফেলল। সকলেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে খুড়ো-খুড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে লাগল।

বেশ বোঝা গেল ওরা এই আশ্চর্য নগরের বাসিন্দা। এদের সকলের মাথায় পেল্লায় পেল্লায় ঢাউস ঢাউস পরচুলা—আর সেগুলোর পিছনের চুটকি এত লম্বা যে একজন করে বাচ্চা চাকর সেগুলো ধরে না থাকলে মাটিতে লুটিয়ে পড়তো।

এদের হালচাল দেখে খুড়ী তো প্রায় হেসে গড়িয়ে পড়ে আরকি! হাসবে না? এ যেন'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি!

এদের কতকগুলো চিনি-জমানো ছাঁচ, কতক বা কেকের ফালি জুড়ে জুড়ে তৈরী, কেউ বা নানারকম ফলের টুকরো দিয়ে তৈরী—পরে খুড়ো-খুড়ী জানতে পারে এদের নাম। যারা চিনি দিয়ে তৈরী তাদের নাম চিন্‌চিনিয়া, যারা কেক দিয়ে তৈরী তাদের নাম

যারা ফল দিয়ে তৈরী তাদের নাম ফল্‌সা আর যারা সবজি দিয়ে তৈরী তাদের ...। কিন্তু সবাই জ্যান্ত—নাচছে, চলছে, হাসছে, খেলছে, কথা কইছে।

খাবার সামনে দিয়ে ঘুরছে-ফিরছে তবু খুড়ো-খুড়ীর পেট চুঁই চুঁই করছে সেই ...। কিন্তু এই আশ্চর্য নগরে একটু সামলে না চললে রক্ষে আছে? একবার আর কলা খেয়ে যা বিপদ হয়েছিল তা কি তারা ভুলতে পারে? তা ছাড়া কে কিসে কি হয়! মুখের সামনে পাখীর ঠোঁট নিয়ে তারা একেই তো জ্বলে মরছে।

জীবগুলো কিন্তু খুব কর্মিষ্ঠি—চট্‌পটে, ব্যস্তবাগীশ। কেউ কেউ পকেট থেকে স্পঞ্জ বার করে ঘাসের এবং গাছপালার পাতার উপরকার ধুলো মুছতে লাগল—কেউ কেউ পকেট থেকে ভাঁজ করা ব্লটিংকাগজ বার করে গাছের পাতার উপরকার শিশির শুষে নিতে লাগল—কেউ বা পকেট থেকে রং-এর বাক্স আর তুলি বার করে ফুলগুলোকে রং করতে লাগল আর প্রজাপতিদের পাখায় রং-এর ছিটে দিয়ে দিতে লাগলো।

খুড়ো গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, ঠোঁট হঠাৎ পাখীদের ঠোঁটের মত লম্বা হয়ে গেল কেন?"

গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ কাঁটা-চামচ দিয়ে মাথা চুল্‌কে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, ওর কি ডানা আছে?"

খুড়ো বললে, "না তো!"

তখন গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ জোর গলায় ঘোষণা করলে, "তবে ওর কখনো পাখীর মত ঠোঁট থাকতে পারে না।" বলেই হোঃ হোঃ করে ঢেকুর তোলার মত থেকে থেকে হাসতে লাগল।

খুড়ো চটে গিয়ে বললে, "তোমার কি চোখ নেই? লম্বা লম্বা এ দু'টো তবে কি?"

গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ ঝাঁ-করে পকেট থেকে একটা লম্বা চোঙের মত টেলিস্কোপ বার করে চোখে লাগিয়ে খুড়ো-খুড়ীকে লক্ষ্য করে—টেলিস্কোপটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে বললে, "যাদের ডানা নেই, তাদের ঠোঁট কখনো পাখীর মত হতে পারে না। কাজেই খুড়ীর মুখে পাখীর ঠোঁট থাকতে পারে না।"

ওদিকে কথা বলেই মুখে হাত চাপা দিতে ভুল হওয়ায় শব্দের প্রতিধ্বনি হতে লাগল:

পাখীর ঠোঁট থাকতে পারে না। পাখীর ঠোঁট থাকতে পারে না। পাখীর ঠোঁট থাকতে পারে না।

খুড়ীর রাগ ধরে গেল—খুড়ী বললে, "তুমি গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ—না হাতী—হিপ্পো—ক্যাঙারু! তোমার নাম হওয়া উচিত—হজগজ ভজ রাম।

গুগলী ঝিনুক ঝাঁ দারুণ ভড়কে গেল, তারপর আমতা-আমতা করে বললে, "উঁহু! আমি হজ গজ ভজ রাম নই—আমি গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ—এঞ্জিনীয়ার বা কারুকৃৎ—আমার পাশ করা সার্টিফিকেট্‌ আছে—" এই বলে সে পকেট হাতড়াতে লাগল—সব পকেট ভর্তি জ্যাম, জেলি, সিরাপ, এসেন্স, চাট্‌নী, চিটে গুড়, মোরব্বা—সে রেগে পকেট থেকে দুমদাম করে শিশি বোতল বয়াম মাটিতে আছড়ে ফেলতে লাগল—শিশি ভেঙে জ্যাম, জেলী, পড়ে রাস্তাটা জ্যাবজেবে হয়ে গেল। তাই না দেখে পরচুলওলা তাজ্জব জীবরা সেই দিকে ছুটলো আর হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে কুকুরের মত রাস্তা থেকে সেই সব ম্যাক্‌ ম্যাক্‌ করে চেটে খেতে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল কিছু দূরে একটা রাস্তা দিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে। তারা এদিকে আসতে লাগল, এদের আকৃতি আরো অদ্ভুত—দূর থেকে মনে হচ্ছিল ঘোড়শোয়ার, কিন্তু কাছে এলে দেখা গেল এরাও সব চিনি আর কেকের পুতুল বটে, তবে চিনচিনিয়া বা কেকরালিদের মত নয়। এদের কোমর পর্যন্ত শরীরের ঊর্ধ্বাংশ হুবহু মানুষের মত, কিন্তু তারপর থেকে ঘোড়ার পিঠ জোড়া। দুই জীবে মিলে এক জীব—ঠিক যেন ঘোড়ার পিঠে কোমর কাটা মানুষ জোড়া। খুড়ী ওদের নামকরণ করলে "ঘোড়ামুষ।"

ওদিকে গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ পকেট থেকে সব ফেলে একতাড়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন বা ব্যবস্থাপত্র বার করে ফেলল—সেগুলো এমনি—

"একজ্বরে গুড়-চালতা"

"ডেঙ্গুতে আড়ুটি মাছের ঝোল"

"আমাশাতে ভাবা দই"

"হাড়মড়মড়ানিতে কামরাঙ্গার মোরব্বা"

সার্টিফিকেট্‌ পাওয়া গেল না। তখন পরচুলওলা জীব আর ঘোড়ামুষরা মার্চ করে পিট্‌টান দিতে লাগল—তাদের মুখ থেকে রাইট্‌ লেফ্‌ট্‌-এর বদলে বেরুতে লাগল—

হজ গজ ভজ রাম

হজ গজ ভজ রাম

হজ গজ ভজ রাম

হজ গজ ভজ রাম

গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ প্রতিবাদ করে বললে, "আমি হজ গজ ভজ রাম নয়—" খুড়ী বললে, "সে তবে কে?"

গুগ্‌লী ঝিনুক বললে, "সে আমাদের দারোয়ান।"

খুড়ী তো চটে আগুন—ভারী তো দেশ! তাতে যদি দরজা থাকে তো তা অষ্টপহর বন্ধ। আর দরজা যখন খোলা হয় না, তখন আবার দারোয়ানেরই বা কি দরকার?"

গুগলী ঝিনুক বললে, "তাও জানো না? আগে আমাদের দারোয়ান ছিল, কিন্তু দরজা ছিল না। একবার এক বিদেশী এসে বহু কষ্টে আমাদের চোরামাণিক্য বাহাদুরকে বোঝায়। তখন চোরামাণিক্য চকোলেটের দরজা করে।"

খুড়ো বললে, "চোরামাণিক্য বাহাদুর আবার কে?"

গুগ্‌লী ঝিনুক বললে, "আশ্চর্য নগরের সব চেয়ে বুদ্ধিমতী হচ্ছে 'কাকিনী মাসী,' তারপরেই 'চোরামাণিক্য' বাহাদুর।"

গুগ্‌লী ঝিনুক বললে, "দারোয়ান বহুকষ্টে যোগাড় করা গেছে কিন্তু তার ধারণা সে গুটিপোকা—দারোয়ান বললে ক্ষেপে যায়, বলে, একী আলু পটল—দারোয়ান মানে একদর—আমার তা' হলে মাইনে বাড়বে না তো! চিরকাল এক মাইনেতে কেউ কাজ করে? তুমি তবে দ্বাররক্ষী তো! এ কথা বললে সে বড় খুশী, বলে, "বোসো ভাই, দুটো প্রাণের কথা কই"—এই বলে পেল্লায় চাবি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—

"—ঐ দেখ সে—"

খুড়ো-খুড়ী দেখলে কোমর থেকে তরোয়ালের মত বিরাট চাবি মাটিতে ঠেস দিয়ে গুটিপোকা দ্বাররক্ষী ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে দ্বার রক্ষা করছে।

এই সময়ে একটা দাঁড়কাক এসে দরজার কাছে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পায়চারি শুরু করে দিলে—যেন সেই দারোয়ান।

আসল দারোয়ান ঘুমুচ্ছে আর দাঁড়কাক তার হয়ে কাজ করে দিচ্ছে।

দাঁড়কাকের চোখে রঙ্গীন কাচের চশমা—একটা কাচে লেখা রয়েছে, "আমার দিকে তাকিও না," আরেকটাতে লেখা রয়েছে, "চোখ দিয়ে কেউ শোনে না"—তার গলা থেকে একটা মেডেল ঝুলছে, তার মধ্যিখানে একটা চোখ বসানো—সেটাও জ্যান্ত চোখ—এদিক ওদিক চোখ টেরিয়ে দেখছে সেই চোখটা।

খুড়ী বড় অস্বস্তি অনুভব করলে—বললে, "আমার দিকে অমন কুৎকুৎ করে তাকাচ্ছ যে বড়!"

কাক অত্যন্ত ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠল, "না৽না, কখ্‌খনো না, এক্কেবারে না, কস্মিনকালেও না—"

খুড়ী রেগে উঠে বললে, "চুপ! বেয়াদব তেচোখো কাক! বুকে ঝোলানো চোখটা দিয়ে দিব্যি প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে আমার দিকে তাকাচ্ছো আবার মিথ্যে কথা!"

কাক ফ্যাস্‌ ফ্যাস্‌ করে হেসে বল্লে:

"তাকুড় গাছে পাকুড় ফলে
আঁকশী হাতে দফাদার,
কামিখ্যেতে কাক মরেছে
কাশীধামে হাহাকার।"

অর্থাৎ কিনা মেডেলে বসানো চোখটা আমার নয়—ওটা আমার মায়ের চোখ—"

খুড়ী বললে, "মারা গেছেন তিনি ?"

কাক বললে, "উঁহু—তবে বড্ড বয়স হয়েছে তাঁর। নড়তে-চড়তে, বেড়াতে-টেড়াতে পারে না—কিন্তু দুনিয়ার সবকিছু দেখতে চান মা—তাই আমি মায়ের একটা চোখ মেডেলে বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি—মা ঐ চোখ দিয়ে ঘরে বসে সব কিছু দেখে।"

খুড়ো বললে, "তার আরেকটা চোখ ?"

কাক বললে, "অন্ধ হয়ে গেছে। তবে ঐ একটা চোখে মা সব জিনিসের অর্ধেক দেখে—কিন্তু কারো কথা শুনতে পায় না—নির্বাক ছবির মত দেখে শুধু। আহা! বেচারা মা—এখন যা অবস্থা—পা নেই, ডানা নেই—লেজ নেই—"

"কেন ? কেন ?" খুড়ো-খুড়ী জিজ্ঞাসা করলে।

কাক বললে, "বয়স। মার যে বেজায় বয়স হয়েছে তবু শুধু এই আশ্চর্য নগরের মঙ্গলের জন্যে মা বেঁচে আছেন। মাকে সবাই চেনে, নাম রেখেছে কাকিনী মাসী—"

খুড়ী বললে, "শুনেছি, তিনি এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী।"

কাক পরম তুষ্ট হয়ে বললে, "শুনেছ তা'হলে! বেশ বেশ! কিন্তু এখানে, এই আশ্চর্য দেশে তোমরা কেন এলে ?"

খুড়ী বললে, "তিনটে মেয়ের সন্ধানে এসেছি—"

কাক বললে, "কি রকম মেয়ে ?

"দিদিমণির কোলে,
খুকুমণি দোলে।
খুকু দোলে নড়ে চুল,
খুকুর মাথায় চাঁপা ফুল।
খুকুর গাল ভরা হাসি,
মাণিক ঝরে রাশি রাশি।"

খুড়ী বললে, "ওরকম মেয়ে নয়, ওরকম মেয়ে নয়।"

কাক হেসে বললে, "তবে ?"

"মেয়ে মেয়ে মেয়ে
ধুস্ করলে খেয়ে,
হরি ভক্তি উড়ে গেল
মেয়ের পানে চেয়ে।"

খুড়ো-খুড়ী এক সঙ্গে বলে উঠলো :

"নীল নীল আকাশ-রঙের চোখ
বাদামী চোখের স্নিগ্ধ চাওয়া
সবুজ সবুজ চোখ অবুজ অবুজ বায়না"

কাক হেঁড়ে গলায় বলে উঠলো :

"আছে, আছে, আছে"—

বলেই হুস্ হুস্ হুস্ করে কোথায় উড়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

বারবেলা

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

বিকেল বেলায় দেবেশ্বরের সঙ্গে দেখা হলো।

দেবেশ্বর বললো, 'তোমাকে খুঁজছিলাম।'

আমি বললাম, 'আমি তোমার ওখানেই যাবো ভাবছিলাম গতকাল দু'দুবার তোমাদের বাড়ীতে গিয়েও দেখা পাইনি।'

'কালকে তুমি যে দু'বার আমাদের ওখানে গেছো, আমি সে দু'বারই তোমাকে এখানে খুঁজতে এসেছিলাম।'

'আমিও তোমাকে পাইনি, তুমিও আমাকে পাওনি। ব্যাপারটা তাহলে কাটাকাটি হয়ে গেল।

দেবেশ্বর মাথা নাড়লো। পকেট থেকে চকোলেট বের করে আমার হাতে দিলো কয়েকটা, বললো, 'চলো আজকে বেড়িয়ে আসি একটু। তোমার এখন নিশ্চয় কোনো কাজ নেই'

'আজকে থাক। কাল রোববার, আমার ইস্কুল ছুটি। কালই বরং বেড়িয়ে আসবো।' আমি দেবেশ্বরকে নিরস্ত করতে চাইলাম। মনে মনে জানি দেবেশ্বরের মত বদলানো যাবে না। কারণ হঠাৎ যদি কোনোদিন দেবেশ্বরের বেড়াবার ইচ্ছে হয়, তাহলে দেবেশ্বরকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল নয়। দেবেশ্বরকে নিয়ে এ অভিজ্ঞতা আমার আছে।

'আজ তোমার কাজ আছে নাকি কিছু?' দেবেশ্বর শুধালো।

আমি বললাম, 'না, কাজ নেই। শনিবারের বারবেলা হঠাৎ বেড়াতে বেরোনা কি ঠিক?'

দেবেশ্বর কিছুটা সময় ভাবলো। কথাটা বোধহয় দেবেশ্বরের মনে লাগলো। বোধ হয় নয়, সত্যিই কথাটা মনে লাগলো দেবেশ্বরের। বললো, 'তা'হলে থাক। আপাততঃ এসো কাছাকাছি এই পার্কটায় আমরা কিছুক্ষণ বসি।'

ট্রামলাইন পেরিয়ে আমরা পার্কের মধ্যে এলাম।

পার্কের একদিকের একটা বেঞ্চে বসলাম আমরা। দেবেশ্বর চকোলেট চিবুতে চিবুতে বললো, 'বারবেলায় তুমি বিশ্বাস করো!'

আমি বললাম, 'না ক'রে উপায় আছে? বারবেলা অত্যন্ত দারুণ জিনিস। একবারের জন্ম তার আওতায় পড়ে যাও, তা'হলে বুঝতে পারবে।'

'বারবেলার আওতায় পড়েছিলে নাকি কোনোদিন?' দেবেশ্বর কৌতুহলী হয়ে শুধায়।

কি বলবো ভেবে নিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই। তোমারও মনে থাকা দরকার। সেই যে তুমি আর আমি সেই সম্পাদকের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তোমার দাদার বন্ধু সম্পাদক। সেই কুকুরের তাড়া তোমার মনে আছে? অবশ্য ওই জন্যেই আমার কবিতা ছাপা হয়েছিলো। ওর স্মৃতিতেই একটা কুকুরের মূর্তি আমার টেবিলে সাজিয়ে রেখেছি। এসব ঘটনা তো শনিবারের বারবেলাতেই ঘটেছিলো।'

দেবেশ্বর ফের বললো, 'মনে আছে আমার।'

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'তাহলেই গ্যাখো, শনিবারের বারবেলা মানেই অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার।'

দেবেশ্বর বললো, 'নিশ্চয়ই।'

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেই ঘটনাটা যেদিন ঘটেছিলো, সেদিন শনিবার ছিলো কিনা আমার মনে নেই। আর 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা' হলেও, নির্ঘাৎ সে ঘটনা ঘটতো। কারণ বাড়ীতে কেউ না থাকলে বাড়ীর কুকুর অনধিকার প্রবেশকারীকে নিশ্চয়ই তাড়া দেবে। আর কুকুর হলেই তা করে থাকে।

আমি কথাগুলো ভেবে মনে মনে হেসে বললাম, 'আজ বেড়াতে না বেরিয়ে ভালোই করলাম তা'হলে।'

দেবেশ্বর আমাকে সমর্থন করে বললো, 'তা আর বলতে! তবে কাল ছুটির দিন, কাল কিন্তু খুব ঘুরে বেড়াবো। ভয় নেই খিদে-টিদে পেলে তোমাকে খাইয়ে দোবো রেষ্টুরেণ্টে।'

'না, না। খাওয়াবার কথা বলে আমায় লজ্জা দিয়ো না দেবেশ্বর। খাওয়ার ব্যাপারে তোমার উদারতার কথা তোমার শত্রুরও ক্ষমতা নেই চেপে যায়।' আমি মৃদু প্রতিবাদ করি।

দেবেশ্বর হাসতে থাকলো। কোনো কথা বললো না। আমি মোড়ক খসিয়ে কয়েকটা চকোলেট একসঙ্গে মুখে পুরলাম।

পরদিন সকাল বেলাতেই মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। দেবেশ্বরের তখনও দেখা নেই। অবশ্য দেবেশ্বর যখন আসবে বলেছে তখন নিশ্চয়ই আসবে। একটু দেরি হয়তো হবে। আমি ভাবলাম।

দেবেশ্বর চকোলেট খাইয়ে খাইয়ে আমায় চকোলেটের নেশা করিয়েছে। দেবেশ্বর সঙ্গে না থাকলেও আমি নিয়মিত চকোলেট কিনে খাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভালো লাগলো না বলে আমি একঠোঙা চকোলেট কিনে চিবুতে শুরু করলাম।

'ব্রজহরি বললো, কথাটা সত্যি হ'ল কিনা বলো ?'

রবিবারের একটা কাগজও কিনে ফেললাম।

কাগজ পড়লাম অনেকক্ষণ। দু'চারজন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চেয়ে নিয়ে পড়ে ফিরিয়েও দিলো কাগজখানা। কিন্তু তবু দেবেশ্বরের দেখা নেই।

এবার দেবেশ্বরের বাড়ীতে যাবো। হয়তো ভুলে গেছে। অথবা আমার আগেই এসে আমাকে না পেয়ে একাই রেগে চলে গিয়েছে। একবার ডাকেওনি হয়তো রেগে গিয়ে। দেবেশ্বর রেগে গেলে আমার খুব মুশকিল হবে। কারণ আমার কবিতা সম্পর্কে দেবেশ্বর তবু মাঝে মাঝে চেষ্টা-চরিত্র করে যাতে ক'রে ছাপা হয়। কথাটা ভেবে দাঁড়ালাম না। একটা বাস আসতে উঠে পড়লাম।

দেবেশ্বরের বাড়ীতে পৌছে দেখি দেবেশ্বর বাইরের ঘরে বসে ব্রজহরির সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে। দেখে দারুণ রাগ হলো আমার। আমি কড়া করে বললাম, 'আমি প্রায় দেড়ঘণ্টা হলো মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার নিশ্চয়ই এর মধ্যে একবার যাওয়া উচিত ছিলো মোড়ে। ব্রজহরিকে নিয়ে গেলেও পারতে। কি বলো ব্রজহরি ?'

ব্রজহরি বললো, 'নিশ্চয়ই।'

দেবেশ্বর বিষণ্ণভাবে হাসলো। বললো, 'ভাখো, বলেছিলাম ব্রজহরিকে। ও বললো আমি না গেলে তুমি ঠিকই চলে আসবে—কাজেই—'

ব্রজহরি বললো, 'কথাটা সত্যি হলো কিনা বলো! তুমি তো এখানে এসে গেলেই, মিছিমিছি আমরা যেতাম।'

আমার রাগ হলো খুব। কিন্তু আমি কিছু বললাম না ব্রজহরিকে। ব্রজহরি কেমন বিশ্রী ভাবে হাসতে থাকলো।

ব্রজহরি একসময় দেবেশ্বরের কাছাকাছি একটা বাড়ীতে থাকতো। কিছুদিন আগে, তা প্রায় বছরখানেক হলো অন্য জায়গায় উঠে চলে গেছে। বোধহয় বেহালাতে। নিয়মিত এসে কিছুক্ষণ গল্প করতো আমাদের সঙ্গে। বেশীক্ষণ থাকতো না। দেবেশ্বরের দেয়া চকোলেট আরাম করে চিবুতে চিবুতে চলে যেতো।

সেই থেকে আমার সঙ্গেও ওর পরিচয় হয়েছে। আমি ওকে তুমি বলি। কারণ দেবেশ্বর বলেছে যাকে সে তুমি বলবে তাকে যেনো আমি কখনোই আপনি না বলি। কেনো বলেছে তা অবশ্য আমি জিজ্ঞেস করিনি কোনোদিন। জিজ্ঞেস করলে দেবেশ্বরের কাছ থেকে ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না।

ব্রজহরির সঙ্গে প্রায় এক বছর পরেই আমাদের দেখা হলো।

পকেটে আমার চকোলেটের প্যাকেটটা ছিলো। কিন্তু আমি সেটা বের করলাম না ওর সামনে। কারণ ওর জন্যেই আমাকে ঠায় দেড়ঘণ্টা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। কাজেই আমার চকোলেট চিবিয়ে ও আমার সঙ্গে গল্প করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

দেবেশ্বর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'বোসো।'

'বেরোবেনা নাকি ?' আমি রাগ করে শুধালাম।

দেবেশ্বর কিছু বলবার আগেই ব্রজহরি উত্তর দিলো, 'রোববার দিন সকাল বেলায় আবার কেউ বেরোয় নাকি ?'

'খুব বেরোয়। এই তুমিই তো বেরিয়েছো।' আমি ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দি।

'আমি বেরোইনি, এসেছি। দেবেশ্বরের কাছে এসেছি।'

চট্ করে আমি ওর আসা আর আমাদের বেরোনোর মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই তা ধরতে পারি না। ধরতে পেরেই প্রতিবাদ করি প্রবলভাবে, 'আমাদের বেরোনো আর তোমার আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

ব্রজহরি হেসে বললো, 'আছে। বেরোনো আর আসা দুটো বিপরীত কথা। তুমি স্কুলে কাজ করো, তোমাকে আর বলা উচিত নয় আমার।'

ব্যাপারটা ব্রজহরিকে ভালো করে বুঝিয়ে শুধরে দেবার আগেই দেবেশ্বর কথা বললো, 'থাক্‌গে, আসা-যাওয়া নিয়ে বেশী এগুনো ঠিক নয়। শেষকালে আসা-যাওয়া করতে

করতে এমন হবে আর থামার সুযোগ পাওয়া যাবে না। বুঝলে ব্রজহরি, ও আজকাল খুব ভালো কবিতা লিখছে।'

নাকটা উঁচু করে ব্রজহরি শুধালো, 'ছাপা-টাপা হয় কোথাও?'

'তা হয় বৈকি! অনেকে খুব প্রশংসা করে থাকে ওর! বলে কি জানো, ও খুব নাম করবে একদিন। লোকের মুখে মুখে ওর নাম ফিরবে।'

একটু যেনো দমে গেলো ব্রজহরি, 'হলে তো ভালোই। আমাদের বন্ধু কবি হবে, এ আমাদের সৌভাগ্য। বেহালার অনেককেই আমি ওর নাম বলেছি। কিন্তু কেউ কস্মিনকালেও ওর নাম শোনেনি। কবিতা লেখে শুনলেই কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে। কবিতা লেখা আজকাল অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার।'

ব্রজহরিকে এর উত্তরে খুব কড়া একটা কথা শুনিয়ে দেবো মনে মনে ভাবলাম। কারণ আমি স্পষ্টই বুঝতে পারি ব্রজহরি আমাকে ইচ্ছে করে ছোটো বানিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। দেবেশ্বর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বললো, 'তুমি এখন উঠবে নাকি ব্রজহরি?'

ব্রজহরি চোখ কপালে তুললো, 'পাগল হয়েছো তুমি? ঠিক মতো বসতেই পারলাম না, ওঠবার কথা ভাববো কি করে!'

ব্রজহরির ভাব দেখে দেবেশ্বর তাড়াতাড়ি বললো, 'না না, তোমাকে উঠতে বলছি না। বলছিলাম কি, বসলে আরো ভালো করে বোসো।'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।' ব্রজহরি হাসতে হাসতে বললো আবার।

তা'হলে কি যাওয়া হবে না নাকি? ব্রজহরির ওপর আমার দারুণ রাগ হতে লাগলো আমি দেবেশ্বরের দিকে তাকালাম। দেবেশ্বর ব্রজহরির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'বুঝলে দেবেশ্বর, একটা বছরে অনেক কথা মনের মধ্যে জমে গেছে, তোমাকে সব জানাতে হবে আস্তে আস্তে। কি করি বলো, সময় করে উঠতেই পারি না যে আসবো।' বলে শুরু করলো ব্রজহরি।

কোন্‌দিন ব্রজহরির ট্রামে একটা কুকুর চাপা পড়েছিলো। বাস থেকে নামবার সময় বাসে কবার এবং কেনো ঘন্টি দিতে হয়, এমন কি রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল হলুদ সবুজ আলো জ্বালা হয় কেনো, এ সমস্ত ব্যাপারের টীকা সহ ব্যাখ্যা করতে থাকলো ব্রজহরি। মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ঘটনাও উল্লেখ করতে থাকলো। দেবেশ্বরের বা আমার উৎসাহ বা নিরুৎসাহের দিকে তার কোনোরকম লক্ষ্য নেই।

ব্রজহরির দম নেবার ফাঁকে দেবেশ্বর হঠাৎ বললো, 'তোমার কথা বলতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে। থাক তাহলে। আর গল্প করবার দরকার নেই।'

'না না বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না আমার। তারপর শোনো—'

ফের শুরু করলো ব্রজহরি।

ও যে আমাদের আজকে বেরুতে দেবে না, তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারি। ব্রজহরির নাকটাও যেন শয়তানীতে কেমন বেঁকে আছে। একটা ঘুষি দিয়ে ওর নাকটাকে সোজা করে দিতে ইচ্ছে হলো আমার।

আমি আবার দেবেশ্বরের দিকে তাকাই। অসহায় বোধ করি। কিন্তু দেবেশ্বর ভরসা দিতে পারে না। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করে না দেবেশ্বর, ফের একটা ফাঁক খুঁজে বলে, 'নিশ্চয়ই কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে ব্রজহরি?'

'না না, মিথ্যে তুমি ভাবছো। ভাববার কিছু নেই তোমার। তা ছাড়া দীর্ঘ এক বছর পর দেখা, কষ্ট হলেও কথা বলতেই হবে।' ব্রজহরি দেবেশ্বরকে ভাবনা মুক্ত করলো। আমাকেও। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দেড়ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

মনে মনে আমি হিসেব করলাম কতোটা সময় নষ্ট হলো। মোড়ে দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলাম আর এখানে বসে আছি দেড়ঘণ্টা। তিন তিনটে ঘণ্টা ব্রজহরির জন্য নষ্ট হলো। এ তিনটে ঘণ্টা কবিতার জন্য খরচ করলে অনেকখানি উপকার হতো আমার।

আর নিশ্চয়ই এখানে বসবো না, প্রতিজ্ঞা করে ফেলি আমি।

উঠে দাঁড়িয়ে বলি, 'আমি চললাম দেবেশ্বর। আমার অন্য কাজ আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে দেবেশ্বর আমার মুখোমুখি হলো। কাতর গলায় বললো, 'তুমি যদি আমার দুর্দশার ভাগ না নাও ভাই—'

আমি কোনো কথা না বলে ফের বললাম, 'দেবেশ্বর আমার কবিতা প্রকাশের জন্য অনেক কষ্ট করে মাঝে মাঝে। সুতরাং একদিন না হয় দেবেশ্বরের জন্য কষ্টই করলাম।'

আমার দিকে ব্রজহরি একবার বিরক্তভাবে তাকিয়ে ফের বলতে শুরু করলো। ও যে কোনোদিন থামবে আমি তা ভাবতে পারলাম না।

ভাবতে না পারলেও কিন্তু থামলো এক সময়। ঠিক আড়াই ঘণ্টা বাদে। আমার মাথার মধ্যে তখন ভোঁ ভোঁ করছে।

দেবেশ্বর আড়মোড়া ভেঙে বললো, 'ঠিক চার ঘণ্টা বকলে তুমি।

ব্রজহরি তৃপ্তির হাসি হাসলো, বললো, 'ছ্যাখো দৈনিক গড়ে দু'মিনিট করে আলাপ করলেও এক বছরে মোট আলাপের সময় দাঁড়াতো—'মনে মনে হিসেব করে ফের বললো, 'বারো ঘণ্টা দশ মিনিট। তার মধ্যে মাত্র চার ঘণ্টা মেকাপ করলাম। বাকীটুকু ধীরে ধীরে মেকাপ করে নেবো।'

হাসতে থাকলো ব্রজহরি। মর্মান্তিক হাসি।

দেবেশ্বর অসহায় ভাবে বললো, 'তুমি দৈনিক আসতে পারো না ব্রজহরি?'

'চেষ্টা কি করি না। করি, কিন্তু পারি না। তাছাড়া রোজ আসা বড়ো খরচের ব্যাপার, ট্রামে বাসে বড়ো পয়সা যায়। তার চেয়ে একবার খরচ করে চার মাসের আলাপ করে যাওয়াটা কি বুদ্ধির কাজ নয়? আচ্ছা চলি আজকে।'

ব্রজহরি ফের সেই মর্মান্তিক হাসি হেসে চলে গেলো।

আমি বললাম, 'শনিবারের বারবেলা কি ভয়ানক দেখলে? বেড়াবার কথাটা শনিবারের বারবেলায় বলেছিলাম তাতেই এই দুর্গতি। আর বেরিয়ে পড়লে?'

দেবেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'হুঁ!'

শ্যাডোগ্রাফি

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

খেলা দেখানো অবস্থায় এড্‌ওয়ার্ড ভিক্টর

আঙুল দিয়ে ছায়া ফেলে অনেক রকমের মজার মজার জিনিস করা যায়। ইংরেজীতে একে 'শ্যাডোগ্রাফি' বলে। বিলেতের একজন সাহেব এই 'শ্যাডোগ্রাফী'তে একেবারে পৃথিবী জুড়ে নাম করেছেন। এর নাম এড্‌ওয়ার্ড ভিক্টর। ভিক্টরের বয়স এখন পঁয়ষট্টি। পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে দু'হাতের দশটি আঙুলের কারসাজিতে ছায়া ফেলে, তিনি এমন-এমন মানুষ, জীবজন্তু ও জিনিস তৈরি করেছেন যা দেখলে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না এবং মনেই হয় না যে আঙুলের ছায়া ফেলে এমন সব জিনিস তৈরি করা যায়।

এখানে আমরা এড্‌ওয়ার্ড ভিক্টরের ছবির সঙ্গে তাঁর হাতের কারসাজির কতকগুলি

নমুনা তুলে দিলুম। এগুলি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে, আলোর ছায়া ফেলে, তিনি তাঁর এই ক'টি আঙুলের সাহায্যে কি অসাধ্যসাধন করেছেন। এই ব্যাপারে তাঁর আঙুলগুলি এমনই তৈরি হয়ে গেছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একটি জিনিস থেকে আর একটি জিনিস করে দর্শকদের তাক্ লাগিয়ে দিয়ে থাকেন।
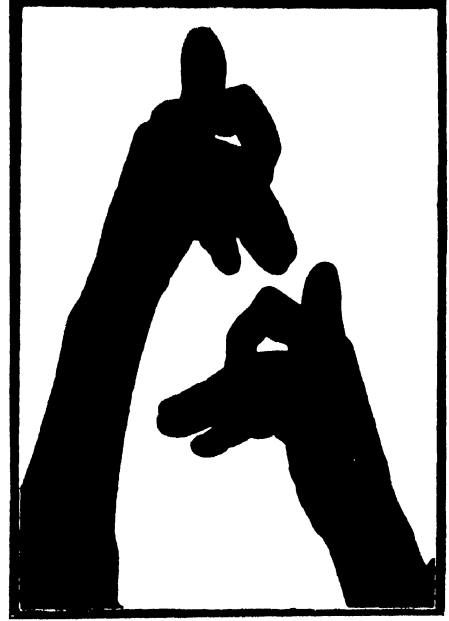
কোন কোন সময় নিজের আঙুলগুলি ছাড়া সামান্য দু'চারটি জিনিস, যেমন— পেনসিল, চামচ, পাইপ, সিগার এক টুকরো দড়ি বা কাগজ এই কাজে তিনি ব্যবহার করে থাকেন বটে, কিন্তু সেগুলি শুধু চেহারাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যেই। তাঁর এই ছায়াবাজির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ'ল যখন পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকজনের মুখ তিনি নিমেষের মধ্যে তৈরি করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। এই মুখগুলির মধ্যে চার্চিল, মরিস সিভেলিয়র, গোয়েরিং প্রভৃতি বিখ্যাত।

মাত্র একটি পনরো স্কোয়ার ফিট পরদার উপর ছায়া ফেলে ভিক্টর তাঁর আঙুলের এই বিচিত্র খেলা দেখিয়ে থাকেন বিভিন্ন ষ্টেজে, ক্লাবে ও পার্টিতে। এ থেকে তাঁর প্রচুর পয়সা রোজগার হয়। সম্প্রতি তাঁর একমাত্র ছেলে প্যাট্রিকও তৈরি হয়ে উঠেছে এই কাজে। উত্তরাধিকার সূত্রে সেও তার বাবার মত একদিন এই 'শ্যাডোগ্রাফি' থেকে প্রচুর পয়সা রোজগার করবে।

১৯৩৭ সালে এডওয়ার্ড ভিক্টর লণ্ডনের উইণ্ডসর ক্যাসেলে রাজা-রাণীর কাছে আঙুলের এই খেলা দেখিয়ে প্রচুর প্রশংসা পান। সম্প্রতি বিলেতের টেলিভিসনেও তাঁর আঙুলের এই কৌশল দেখান হচ্ছে এবং এর জন্য বেশ পয়সা পাচ্ছেন তিনি।

মেঠুড়ে

ক্রিকেট

টেস্ট ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে তোমরা অনেক কথাই জানো, কিন্তু তা' হলেও জেনে রাখো, যে সব দেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সভ্য তারাই এই টেস্ট ম্যাচে খেলতে পায়। যেমন, স্বাধীন হয়েও ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ভারতবর্ষ, নিউজিল্যাণ্ড—এই সব দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সভ্য বলে এর টেস্ট ক্রিকেটে খেলতে পায়। এতদিন সাউথ আফ্রিকা কমনওয়েলথ-এর সভ্য ছিল ব'লে এই টেস্ট ক্রিকেটে যোগদান করতে পারতো, কিন্তু এরা এখন একেবারে স্বাধীন বলে যারা শ্বেতকায় টেস্ট ক্রিকেটের সভ্য, যেমন ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এরাই এই খেলায় খেলে থাকে।
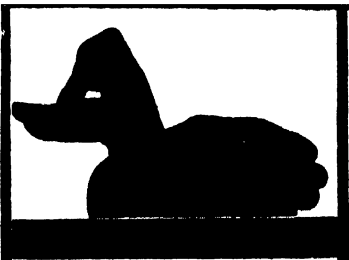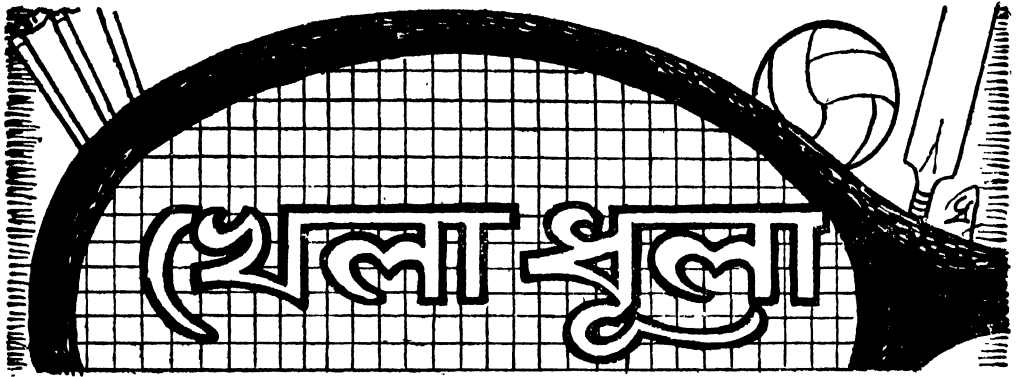
লণ্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনের অফিসে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা-সভায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন পাতৌদির নবাব, চান্দু বোরদে ও তাঁদের মধ্যে বিবিসি'র হিন্দী শাখার শ্রীরত্নাকর ভারতীয়া প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

তোমরা বোধহয় সকলেই জানো এই টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সম্প্রতি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই সর্বশক্তিমান। এদের কয়েকটি খেলোয়াড়ের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। যেমন—কানাই, সোবার্স ইত্যাদি।

এই সমস্ত ক্রিকেট খেলা কখন কার সঙ্গে কোন বছরে হবে তা ঠিক করে এমপায়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েসন যাদের অফিস ইংলণ্ডে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের খেলা বিলেতে শেষ হয়ে গেল। ১৯৩৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত যত টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল এইখানে দেওয়া হ'ল।

	খেলা	জয়লাভ	হার	সমান-সমান	টাই
ইংল্যাণ্ড	৪২৮	১৬৮	১১৬	১৪৪	
অস্ট্রেলিয়া	২৮৫	১৩২	৭৬	৭৬	
সাউথ আফ্রিকা	১৪২	২৭	৭২	৪৩	
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১১২	৪১	৩৫	৩৫	
ইণ্ডিয়া	১০০	১০	৪০	৫০	
নিউজিল্যাণ্ড	৭১	১	৩৬	৩৪	
পাকিস্তান	৫০	১০	১৪	২৬	

এবারে এই দু'মাসে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের তিনটি টেস্ট খেলা ইংল্যাণ্ডে হয়। প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ডের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১ ইনিংসে ১২৪ রানে হেরেছে।

এবারে ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল যে তিনটি টেস্ট খেলতে গিয়েছে তার দু'টি খবর উপরে দেওয়া হয়েছে। এবারে তৃতীয় টেস্ট-এর খবরটি এখানে দিচ্ছি। এই তৃতীয় টেস্টেও ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন পাতৌদির নবাব। পাতৌদির নবাব আর দুটি টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন, অর্থাৎ তিনটি টেস্ট খেলাতেই। এই তৃতীয় টেস্টেও ইংল্যাণ্ডের টিম সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করেছে ভারতের বিরুদ্ধে।

ইংল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ
প্রথম ইনিংস—২৯৮	প্রথম ইনিংস— ৯২
দ্বিতীয় ইনিংস—২০৩	দ্বিতীয় ইনিংস—২৭৭

লীডসের হেডিংলে মাঠে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেষ্টে যদিও ভারত ৬ উইকেটে হেরে গেছে তবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন বিদেশী সাংবাদিকরা তাঁদের ওপর। হেডিংলে মাঠের এই টেস্ট ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বিপর্যয়, বিক্রম ও সংগ্রামী শক্তির পরিচয় হিসেবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৫২ সালে এই মাঠে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারত যে প্রথম টেষ্ট খেলেছিল, এই খেলায় যেন তার মিল দেখা যায়। সে-খেলায় হয়েছিল ব্যাটিং ব্যর্থতার এক নতুন রেকর্ড। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো রান হবার আগেই একে একে চারটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল। শূন্য রানে চার উইকেট পড়ার সে লজ্জা ঢেকে দিয়েছিলেন অধিনায়ক বিজয় হাজারে ও দাতু ফাদকার তাঁদের অসাধারণ ব্যাটের মারে। এবার ইংল্যাণ্ডের বড় রানের ইনিংসের বিরুদ্ধে ভারতের সূচনার শোচনীয় ব্যর্থতার গ্লানি ঢেকে দিয়েছেন অধিনায়ক পাতৌদি, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার, হনুমন্ত সিং এবং অজিত ওয়াদেকার ইংল্যাণ্ডের ধারালো বোলিংকে ধূলিসাৎ করে। কে ভেবেছিল ইংল্যাণ্ডের ৫৫০ রানের (৪ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের শেষে যে-ভারত ছ-টা উইকেট হারিয়ে

মাত্র ৮৬ রান তুলেছিল, সেই ভারত ১৬৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করবে? কিংবা দু' উইকেটে ১৯৮ রান তুলে তৃতীয় দিনের শেষে বিশ্রাম নেবে?

প্রথম দিনই দু'জন খেলোয়াড়ের চোট লাগে। ব্যারিংটনের ব্যাট থেকে বল এসে হাঁটুতে লেগে সুর্তির পা জখম হয়। লং লেগে একটা বলের পেছনে ছুটবার সময় বেদীর উরুর মাংসপেশীতে টান ধরে। সুর্তি ও বেদীর মতন দু'জন নির্ভরযোগ্য বোলার দলে না থাকার অর্থ ভারতের দুর্বল বোলিং শক্তি আরো দুর্বল হওয়া। উইকেটকিপার ইঞ্জিনীয়ার, আর আগে থেকে পায়ে চোট খাওয়া বোরদে বাদে ভারতের সবাইকেই বল করতে হয়। ফলে, জিওফ বয়কট ২৪৬ রান করেও নট আউট, বেসিল ডি ওলিভেরার ১০৯, ব্যারিংটনের ৯৩, গ্রেভনীর ৫৯—চার উইকেটে ৫৫০ রান করে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড হয়।

এই বড় রানের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে ভারতের ব্যাটসম্যানরা যে সাহস দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ইংরেজ সাংবাদিকরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন পাতৌদি, ইঞ্জিনীয়ার ও ওয়াদেকারের অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্যের কথা। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের তৃতীয় দিনের খেলা দুর্যোগের ঘন অন্ধকারের মধ্যে চোখ-ধাঁধানো কৃতিত্ব। চতুর্থ দিনের খেলা আশা-জাগানো ব্যাটিং নৈপুণ্য। অনেকেই আশা করেছিলেন, তৃতীয় দিনের নট আউট ব্যাটসম্যান ওয়াদেকার সেঞ্চুরী করতে পারবেন—কিন্তু পারেন নি। মাত্র ৯ রান বাকি থাকতে আউট হয়ে যান। কিন্তু ভারতের রঙীন আশায় রূপ দিয়েছেন দলের অধিনায়ক পাতৌদি একটা সুন্দর সেঞ্চুরী উপহার দিয়ে। পাতৌদি ও হনুমন্ত সিংয়ের প্রাণবন্ত ব্যাটিং নৈপুণ্যে ভারত শুধু ইনিংসে হারার হাত থেকে রক্ষা পায়নি, প্রথম ইনিংসের গ্লানি ধুয়ে মুছে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সৌন্দর্যকে নতুনভাবে উদ্ঘাটিত করেছে ইংল্যাণ্ড তথা বিশ্বের সকল ক্রিকেট অনুরাগীদের চোখে

এই খেলার ফলাফল সত্যিই চাঞ্চল্যকর হতে পারত, যদি ভারতের ফিল্ডিং ও ক্যাচিং ভালো হতো। জয়ের জন্যে ১২৫ রানের প্রয়োজন নিয়ে ব্যাট করতে আরম্ভ করে ইংলণ্ড চারটে মূল্যবান উইকেট হারায়। আরো হারাবার সম্ভাবনা ছিল এবং ক্যাচের সদ্ব্যবহার হলে ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিত।

॥ ২ ॥

প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ড ৬ উইকেটে ভারতকে হারাবার পর লর্ডসের টেস্টেও এক ইনিংস ও ১২৪ রানে ভারতের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে রাবার পেয়েছে। ১৯৬১-৬২ থেকে ভারত-ইংলণ্ড টেস্টের রাবার ভারতেরই হাতে ছিল। এবার হাতছাড়া হ'ল।

এবার ইংল্যাণ্ড সফরের শুরু থেকেই ভারতের প্রতি ভাগ্যদেবী তেমন প্রসন্না নন। টসে জিতে এবং শুকনো মাঠে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও ভারত প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫২ রান

তোলে। ইংল্যাণ্ডের ৩৮৬ রানের উত্তরে দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ১১০ রানে ইনিংস শেষ করে। পুরো একদিন এবং তিন ঘণ্টা সময় হাতে থাকতে খেলার ওপর যবনিকা পড়ে। তৃতীয় দিন বৃষ্টির জন্মে দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট না হলে হয়তো আরো আগে খেলা শেষ হয়ে যেতো।

প্রথম ইনিংসে ওয়াদেকার এবং দ্বিতীয় ইনিংসে কুন্দরন ছাড়া ভারতের কোনো ব্যাটসম্যানই আস্থার সঙ্গে খেলতে পারেন নি। ইংল্যাণ্ডের টম গ্রেভনির ১৫১ রান, মাত্র ৩ রানের জন্মে কেন ব্যারিংটনের সেঞ্চুরি না করতে পারার দুঃখ, উইকেটকিপার জন মারের ছ-টা ক্যাচ ধরে বিশ্ব রেকর্ডের সম কৃতিত্ব করার যোগ্যতা, ইলিংওয়ার্থের মাত্র ২৯ রানে ছ-টা উইকেট এবং ভারতের চন্দ্রশেখরের ১২৭ রানে ৫টা উইকেট লাভ লর্ডস টেস্টের উল্লেখ করার মতন ঘটনা।

ফুটবল

ক্রিকেট মাঠ হিসেবে ইডেন উদ্যানের আন্তর্জাতিক খ্যাতি বহুকালের ঐতিহ্য ভেঙে ইডেনে ফুটবল খেলার ব্যবস্থায় অনেকেরই আপত্তি ছিল। তবে ইডেনে ফুটবল খেলার বর্তমান ব্যবস্থা সাময়িক। যে হেতু তিন বছরের ভেতর বিদেশী দলের ক্রিকেট সফর নেই এবং চাহিদা অনুযায়ী দর্শক আসনযুক্ত ফুটবল মাঠ নেই, সেই কারণে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ইডেনে ফুটবলের আয়োজন। ইডেনে ষাট হাজারের বেশি দর্শক খেলা দেখার সুযোগ পাবে।

ইডেনে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলার জন্মে পঞ্চাশ হাজারের মতন টিকিট ছাপা হয়েছিল। সামান্য কিছু এর বিক্রি হয়নি। তবে মাঠে পঞ্চাশ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইডেনের মসৃণ মাঠে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটা দর্শকদের তেমন আনন্দ দিতে পারেনি। এ খেলায় গোল তো হইনি, গোলে ভালো শটও দেখা যায়নি। মসৃণ মাঠে খেলায় যেমন গতিবেগ থাকার কথা, সে গতিবেগও এদিনের খেলায় দেখা যায়নি। তবে দু-দলের খেলোয়াড়দের ভেতর দৃঢ়তার পণ ছিল, আত্মরক্ষার প্রতিজ্ঞা ছিল। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় ছিল শেষ সময় পর্যন্ত।

ইডেনে ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লীগ খেলাকে কেন্দ্র করে ক'দিন ফুটবল ক্রীড়া রসিকদের ভেতর যে হইচই চলেছিল তা খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেছে। দর্শক পরিপূর্ণ ইডেনেই এবারের প্রথম ডিভিসন লীগের এই দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলাটা হয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গল এ খেলায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং চ্যাম্পিয়নশিপের পথের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়। প্রথমে গোল করে বিরতির সময় পর্যন্ত মোহনবাগানই ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে পর পর দুটো গোল করে ইষ্টবেঙ্গল লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় জয়ী হয়।

এই খেলায় আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের চেয়ে দু' দলেরই রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা ভালো খেলেন। মোহনবাগানের পক্ষে গোল দেন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বি. দেবনাথ। ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে দুটো গোল করেন যথাক্রমে পি. সিংহ ও অসীম মৌলিক॥

ভুবনেশ্বর ও পুরীর পথে

২৩শে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা। আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌছলাম, তখন রাত সাড়ে সাতটা। ন'টায় আমাদের ট্রেন ছাড়ল। আমরা ভুবনেশ্বরের পথে যাত্রা করলাম।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত। পথে দূরে দূরে দেখা যাচ্ছিল খড়ে-ছাওয়া কুঁড়ে ঘর, আর পুকুর-ভরা জল; সেই জলে শাপলা ফুটে আছে। যেন ঝাঁকে ঝাঁকে বকের ছানা উড়বার আগে ডানা মেলে ভোরের আলোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে—এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

ভোরের দিকে যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন এসে বসলাম জানালার কাছে প্রকৃতির রূপ দেখবার জন্য। এই প্রকৃতি কিন্তু আমাদের সারা পথের সঙ্গী হলো। সে দেখালো তার নানান রূপ। কোথাও বা রাণীর বেশে মৃদু হেসে জানাচ্ছে তার সমাদর, আবার কোথাও বা রূঢ় কঠিন ভাবে জানাচ্ছে তার শাসন-বার্তা! কিন্তু আমরা প্রকৃতির সব রূপ উপভোগ করতে করতে এসে পৌছালাম আমাদের গন্তব্যস্থানে।

এর আগে আমি ভুবনেশ্বরে আসিনি। এই প্রথম এলাম। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই মনোরম। চারপাশে বড় বড় ঝোপ-ঝাড়, ধানক্ষেত, আর তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী বাজোয়া। আবার পাহাড়ের আড়ালে মেঘের লুকোচুরি, পাখির গান, ফুলের শোভা, এদের মধ্যে এসে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এমন ঘাসের আসনে, গাছের ছায়ায়, আকাশের নীলাভ চাঁদোয়ার তলে বসে দেখতাম রাখালদের গরু চরানো, আর দূর থেকে ভেসে আসতো তাদের বাঁশির মিষ্টি সুর।

ফুলের গন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুকুহু, পাপিয়ার পিউপিউ আরও কত নাম-না-জানা পাখির ডাকে আমার মন-প্রাণ কোন্ সুদূরে যেন চলে যেত! এই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম—বড়মার ডাকে আমার তন্ময়তা ভাঙলো। বড়মা

সবাইকে বাসুদেবের প্রসাদ দিলেন। বাসুদেবও ওখানকার লিঙ্গরাজের প্রতিমার দেবতা। দুপুরটা আমাদের হই-হইতে কেটে গেল। আমাদের বাড়ীটা বিরাট বড়। বাড়ীর ভেতরে রাস্তার দু'ধারে কামিনী ফুলের গাছ। ফুল পড়ে সারাটা রাস্তা ভরে আছে। প্রথম দিন দেখে মনে হ'ল, গাছেরা যেন আমাদের আগমনবার্তা পেয়ে সাদর অভ্যর্থনা করার জন্য ফুলের বিছানা বিছিয়ে রেখেছে!

বিকাল বেলা ছোটকাকু আমাদের গৌরীকুণ্ড, কেদারকুণ্ড ও রাজ-রাণীর মন্দির দেখিয়ে নিয়ে এলেন। এই মন্দিরগুলি কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। তার পরের দিন লিঙ্গরাজকে দেখে ও পূজা করে বাড়ী ফিরলাম আমরা। আর একদিন আমরা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দেখতে গেলাম। কি নির্জন সেই স্থান! মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল।

তার কিছুদিন পরে আমরা পুরীতে এলাম। সেখানকার সমুদ্র দেখে আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত ক্ষমতা আমার নেই। সেখানে আনন্দময়ী মা'র আশ্রম। সেখান থেকে প্রায়ই ভেসে আসতো সুমধুর ও সমবেত কণ্ঠের গীতা ও চণ্ডী পাঠের আওয়াজ। ভোর বেলায় যখন সূর্যদেব পূর্ব দিকে উদয় হ'ত, তখন তার সোনালী আভায় সমুদ্র আর এক রূপ ধারণ করতো।

বেলা হলে আমরা সমুদ্রে স্নান করতে যেতাম তখন দেখতাম একটির পর একটি ঢেউ ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে তীরের উপর। আমরা যেদিন পুরীতে পৌছলাম তার পরের দিন স্নানযাত্রা ছিল। আমরা স্নানযাত্রা দেখতে গেলাম। পাণ্ডারা ১০৮ কলসী জল দিয়ে জগন্নাথ দেবকে স্নান করিয়ে দিল। রাত্রে রাজবেশ হয়ে মন্দির বন্ধ হয়ে গেল। বেশি জল দিয়ে স্নান করানোর জন্য জগন্নাথদেবের জ্বর এসে গেল। এর জন্য ১৫ দিন মন্দির বন্ধ রইল।

এই ক'দিন আমরা ওখানকার যে সব দর্শনীয় জিনিস ছিল তা দেখলাম। ১৫ দিন পরে মন্দির খুললো। সেদিন জগন্নাথদেবের নবযৌবন। তার পরের দিন রথযাত্রা। আমরা রথ দেখতে গেলাম। ৪টার সময় রথ টানা আরম্ভ হ'ল। রথ মাসীর বাড়ী পর্যন্ত গেল না, আমরা ফিরে এলাম। দু'তিন দিন বাদে আমরা কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। বাড়ীতে আসবার পর সর্বদা মনে হ'ত কবে আবার ওদেশে যাব, কবে আবার ফিরে পাবো সেই হারিয়েযাওয়া দিনগুলি।

শ্রীশুক্লা সরকার

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

কথামালার ছবি-ছড়া—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা। ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১'২৫।

সতীন্দ্রনাথ শিল্পী ও সাহিত্যিক। ছোটদের জন্যে তিনি অনেক লেখা লিখেছেন। ছড়া ও কবিতা লেখায় তাঁর হাত খুব মিষ্টি। সেই মিষ্টি হাতের পরিচয় কবিতায় লেখা কথামালার গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ছবির সঙ্গে নানা ছন্দে লেখা এই কবিতাগুলি পড়ে তোমরা সকলেই খুশি হবে। প্রচ্ছদ-পটটিও আকর্ষণীয়।

উড়ন্তুদের গল্প—শ্রীকাজল বল। শ্রীসমীর চ্যাটার্জী কর্তৃক নিওরিট, ৬১বি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৩১ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১'০০

উড়ন্ত প্রাণীদের বিচিত্র কাহিনী গল্পের মাধ্যমে ভারী সুন্দর করে বলেছেন লেখক। কাহিনীগুলি কিন্তু আজগুবী নয়, সবই বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং লেখকের বলার ধরনটি এত সুন্দর যে, প্রত্যেকটি কাহিনীই মনের উপর ছাপ রেখে যাবে। শিল্পী রবীন নাথের ছবিগুলি বইখানিকে ছোটদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলবে।

রাজ্য জুড়ে রূপকথা—শ্রীসুজিতকুমার নাগ। পম্পা পাবলিসিটি, ৯৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১'৫০

রূপকথার অনেক বই লিখেছেন সুজিত-কুমার। তাঁর এই বইখানিও ছোট ছোট ছ'টি রূপকথার গল্প নিয়ে লেখা। গল্পগুলি আকারে ছোট হলেও, পড়ে খুবই আনন্দ পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'মায়াকাননের পথে', 'রূপনগরে রাজা নেই', 'সোনার পুতুল' আমাদের খুবই ভাল লাগল। কভারের উপরের ছবিটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

বৈশাখী—শ্রীমতী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। মডার্ণ নার্সারি অ্যাণ্ড কে. জি. স্কুল, পি ৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-১০। মূল্য ২'৫০

ছোটদের বার্ষিক নাট্যপত্রিকা হিসাবে 'বৈশাখী'র প্রকাশ। এই সংখ্যায় আছে সম্পাদিকার লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের নাট্যরূপ এবং বিদেশী রূপকথা অব-লম্বনে রচিত 'লালটুপি মেয়েটি' নামক নাটিকা। বর্তমানে বাংলা দেশে বড়দের জন্য অনেক নাটক রচিত আছে এবং নতুন হচ্ছে, কিন্তু ছোটদের জন্য সেরকম কোন ভাল ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সে দিক থেকে ছোটদের অভিনয়ের উপযোগী এই দু'টি নাটি-কাই বিশেষ উপভোগ্য! মাত্র এক ঘণ্টা করে সময়ের মধ্যে এই দুটি অভিনীত হতে পারবে। দুটির মধ্যেই নানা ধরনের চরিত্র ও ছড়া-গান আছে। তোমরা এ দুটি নাটিকা পড়ে ও অভিনয় করে প্রচুর আনন্দ পাবে।

এবারের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। স্কুল-ফাইনালে যে মেয়েটি প্রথমস্থান অধিকার করেছে, তার নাম শ্যামলী ঘোষ। হাটথুবার একটি স্কুল থেকে পাশ করেছে সে। সমগ্র পরীক্ষার্থীদের মত একটি ছোট স্কুল থেকে ছোট মেয়েটির এই সাফল্যের সংবাদে সকলের সঙ্গে আমরা কত আনন্দিত হয়েছি সে কথা বলতে পারছি না যেন। অচেনা সেই মেয়েটি, সমস্ত মেয়েদের পক্ষ থেকে সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে—তাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর অপেক্ষা করে রইলাম উত্তরোত্তর তার সম্ভবনাময় ভবিষ্যৎ-এর শুভ-সংবাদের জন্য।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার খবরগুলিও আশাপ্রদ—তাদের মধ্যেও যারা শীর্ষস্থান অধিকরী করেছে, তারাও আমাদের গর্বের পাত্র-পাত্রী। সকলের জন্যই আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

একটি চিত্র

মহাশ্মশান!

সবাই যখন ঘুমোয় তখন জেগে থাকে জীবনলাল—কখনও কখনও ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কিন্তু তাকে আমল দেয় না—এ এক বিচিত্র অনুভূতি। রাতের পৃথিবীর যে একটি সম্পূর্ণ আলাদা নিজস্ব রূপ আছে, সে কথাটি এত গভীরভাবে এর আগে কোনোদিন অনুভব করেনি জীবনলাল। তবু কেউ তাকে সারারাত জেগে থাকতে বলেনি—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সারা রাত জেগে থাকে সে, বলে : এ আমার ব্রত।

সেদিনও তার চোখের পাতার সামনে রাতের পৃথিবী নিজেকে উন্মোচিত করে দিচ্ছিল। দিনের কোলাহলে পৃথিবীর আসল চেহারা অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে যেন তেমন গভীরতা থাকে না। তাই জীবনলাল সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে রাতের পৃথিবীর জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে। কখন নিজের অজান্তে মনের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল আর সেই অবসরে যে ঘুমকে সে এতদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল,

সেই ঘুম এসে তার চোখের পাতা কেড়ে নিল। কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই জেগে উঠলো জীবনলাল। অন্ধকারে অভ্যস্ত দু'টি চোখের দৃষ্টি চালনা করলো ঘরের মধ্যে, ছোট্ট শয্যাখানির দিকে। ছোট ঘর, বাড়ীর একান্তে খড়-ছাওয়া চাল, বাঁশের খুঁটির দেওয়াল—বারান্দায় জীবনলালের আস্তানা। ঘরের মাঝখানে শয্যাটি যার জন্য নির্দিষ্ট তাকে কেন্দ্র করে জীবনলালের এই অতন্দ্র পাহারা। দিনের এবং রাতের কাজের শেষে সেই মানুষটি যখন বিশ্রামের জন্য দু'দণ্ড সময় বেছে নেন, তখন জীবনলাল তার সতর্ক সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে তাকে ঘিরে রাখে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর যখন দেখলো শয্যা শূন্য—এক মুহূর্তে জীবনলাল বিদ্যুৎগতিতে মাথায় প্রচণ্ড ভাবনা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। নিষ্প্রদীপ ঘর। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় শয্যার অধিকারী মানুষটি ঘরে কোথাও নেই। ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে জীবনলাল ছুটে এলো বারান্দা থেকে উঠোনে। পরিষ্কার ঝকঝকে মাটি-লেপা আঙ্গিনা—চারিদিক ঘিরে সুপুরি আর নারকোল গাছের সারি। রাতের সেই নিস্তব্ধতার তারা যেন মৌন সাক্ষী। জীবনলালের মনে হলো সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যেন রিক্ততার হাহাকার। গাছের পাতার ছায়া আঙ্গিনার অনেকখানি আড়াআড়ি ভাবে ঢেকে দিয়েছিল, তাই তার দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে আসছিল বার বার। তবু খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে দেখতে পাওয়া গেল। আঙ্গিনার প্রায় বাইরে একটি নিমগাছ, তারই নীচে সেই মানুষটি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জীবনলাল তাঁর সামনে। পাথরে গড়া ধ্যানস্থ মূর্তি—নিথর, নিস্তব্ধ চারিদিক। জগতের সব কোলাহল থেমে গিয়েছে। বাতাসের গতিবেগেও যেন মন্থরতা। জীবনলাল ধ্যান-নিবিষ্ট সেই মূর্তির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—তার মনে হচ্ছিল মহাশ্মশানের বুকে যেন জেগে আছেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি। দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি আরো প্রসারিত হয়ে ফিরে গেল সাম্প্রতিক অতীতে। ভেসে উঠলো প্রেতপুরীর দৃশ্য। মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তের নেশায় মত্ত মানুষের প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি। সেই ধ্বংসের যজ্ঞে আহুতি দিল কত তাজা প্রাণ—তারপর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জেগে উঠলো মহাজীবনের আহ্বান। নিজের নিরাপত্তার কথা একটি মুহূর্ত ভাবলেন না। কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় তুলে নিলেন অবহেলায় সে ভাবনাও তাঁর নয়—তাঁর একমাত্র সংকল্প এই মৃত্যুপুরীতে আবার শোনাবেন জীবনের জয়গান। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে আবার ভগীরথের মত বয়ে নিয়ে আসবেন প্রেম-প্রীতির মন্দাকিনী—দুর্গম পথের একক যাত্রী। জীবনলাল স্বেচ্ছায় তাঁর দেহরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। তাঁর নিজের দিক থেকে এ সতর্কতার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

জীবনলাল একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সর্বত্যাগী মানুষের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ এই মহাপুরুষটির দিকে। একটু পরে মনে হলো যেন মহাকালের ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। ইশারায় কাছে বসতে বললেন। তারপর জীবনলালের কানে ভেসে এলো মুখ থেকে নয়,—অন্তর

থেকে উচ্চারিত ক'টি কথা "বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি, আজ মনে হচ্ছে কেউ গ্রহণ করতে চাইল না আমার কথা। আমি বলেছিলাম, আত্মনির্ভর হবার জন্য চরকার কথা, কিন্তু ক'জন সাড়া দিল? আমি বলেছিলাম, হিংসা-দ্বেষ ভুলে গিয়ে সকলকে মিলে-মিশে থাকতে, সে কথাও কেউ শুনলো না। সাম্প্রদায়িকতার নামে কি প্রলয়ঙ্কর নেশায় আজ মেতে উঠেছে দেশের লোক!" জীবনলাল প্রত্যুত্তরে কোনো কথা না বলে শুধু শুনে যাচ্ছিল সেই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কথা।

মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "চলো ঘরে।"

রাতের আকাশ থেকে অন্ধকারের ঘোর তখন কাটতে শুরু করেছে। আঙিনা পার হয়ে ঘরের কাছে এসে মহাপুরুষ জীবনলালকে ইঙ্গিতে দেখালেন আকাশ, সেখানে চলছিল মেঘের আনাগোনা। সব কটি তারাই ছিল মেঘের অন্তরালে—শুধু দু'টি-একটি তখনও মিট মিট করছিল আর আকাশে তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে জলজল করছিল শুকতারা।

জীবনলালের মনে হলো অনেকখানি অর্থবহ এই ইঙ্গিত। মহাত্মাজী এর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন—আশার আলো কোনোদিন নিভবে না। শুকতারার মতই চিরকাল দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে। জীবনলালের মনে হলো মৃত্যুর এই মহাশ্মশানের বুক থেকেই একদিন দেখা দেবে জীবনের আলোক-শিখা।

চিঠি পেলাম

কোলকাতা থেকে—অনির্বাণ ও অনুষ্টুপ, মালবিকা, নূপুর, দীপান্বিতা, মহেশ্বেতা ও সমর্পিতা, জয়া চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মিণ্টু ঘটক, রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ও রত্না রায়।

শান্তিনিকেতন থেকে —কৌশিক, কুনাল, কুহেলী। যাদবপুর থেকে— দেবজ্যোতি ও বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম, অর্পিতা দত্ত, জ্যোৎস্না দাস। তেজপুর থেকে—রীতা, রমেন। আসানসোল থেকে—সিঞ্চিতা ও বাপ্পা। বর্ধমান থেকে—সুরজিৎ ও সুরশ্রী দাস।

দিল্লী থেকে—দেবযানী বসু, লক্ষহীরা সেন।

সকলের জন্য রইল আমার শুভকামনা ও ভালবাসা।

তোমাদের—'মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৫০ পয়সা

নতুন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছবিতে শ্রীমতী গান্ধীকে সেই উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের মধ্যে খাবার বিতরণ করতে দেখা যাচ্ছে।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র
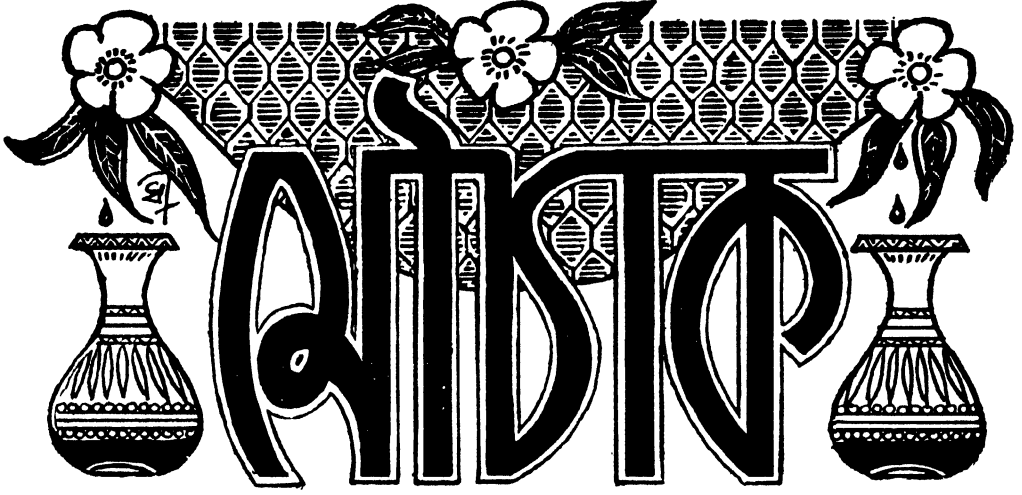
৪৮শ বর্ষ] ভাদ্র : ১৩৭৪ [৫ম সংখ্যা

যে যেমন, তাকে তেমন

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

চক বাজারের দর্জিপটীর
পাঞ্জাবী এক দর্জি,
জামার কাপড় কাটছিল সে
যখন যেমন মর্জি।

এবং ছুঁচে সেলাই করে
জুড়ছিল কৌশলে,
রাখছিল ছুঁচ পাগড়ীটাতে
কাঁচিটা পা'র তলে।

পাশেই বসে পুত্র সেটা
বেশ কিছুক্ষণ ধরে,
তলিয়ে যেন গভীর ভাবে
দেখছিল ঠিক করে।

শেষে বাপের কাণ্ড দেখে
বিস্ময়ে কয় ছেলে,
ছুঁচ রেখেছ মাথায় কেন,
এমন কাঁচিফেলে ?

দর্জি বলে, লক্ষ্মীছাড়া
কাঁচির স্বভাব বড়ো,
কেটেকুটে ছন্নছাড়া
করতে সে খুব দড়ো !

অখণ্ডকেই টুকরো করে
সে রেখে দেয় দূরে ;
ছুঁচ সেখানে ঐক্য আনে
টুকরো ছেঁড়ায় জুড়ে।

সুসংহতির মূর্ত্ত প্রতীক—
কে বলে ছুঁচ তুচ্ছ ?
সংগঠনের আদর্শ এর
ঢের মানবিক, উচ্চ।

ছুঁচের চেয়ে যদিও কাঁচির
অনেক বেশী মূল্য,
তবুও স্বভাব বিচার গুণে
নয় কাঁচি এর তুল্য।

ছুঁচটাকে তাই সসম্মানে
মাথায় করে আছি,
কর্ম দোষেই পায়ের নীচেয়
ঠাঁই পেয়েছে কাঁচি।

রেলপথের ইতিকথা

শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ

রেলগাড়িতে চড়তে কে আর না ভালবাসে? রেলগাড়িতে চড়ে যাওয়ার একটা মজা আছে, পৌঁছবার পর সেখানের মজা তো আছেই। স্থলপথে দূরে অল্প খরচের মধ্যে রেলগাড়িতে যাওয়া আজও প্রশস্ত। তবে বেশী পয়সা খরচ করতে পারলে, অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছনর দরকার থাকলে বা অন্য কোন ভাবে যোগাযোগ না থাকলে এরোপ্লেন করে যাওয়া হয়। জলপথ অল্প সময়ে অতিক্রম করতে হলেও জাহাজের বদলে এরোপ্লেনে যাওয়া যায়। স্থলপথে রেলগাড়ির ইদানীং প্রতিযোগী হয়েছে ভ্রমণের জন্য মোটর গাড়ি, আর মাল বহনের জন্যে মোটর লরি। কিন্তু তবুও বলতে হবে স্থলপথের রাজা রেলগাড়ি, যদিও সে আজ আর একচ্ছত্র অধিপতি নয়। এখন রেলগাড়ির আধিপত্য খর্ব করতে চাইছে মোটর লরি আর এরোপ্লেন।

একশ' বছরেরও বেশি রাজত্ব করে আসছে রেলগাড়ি, তার পথকে বলি রেলপথ। রেলপথ বলতে বুঝি দুটো লাইন পাতা, তার ওপর দিয়ে গাড়ি যায়। এই ব্যাখ্যায় ট্রামপথও তাহলে রেলপথ। সত্যিই কিন্তু তাই, বাষ্পীয় ইঞ্জিনে গাড়ি টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই যে রেললাইনের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা নয়, ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ও ইয়োরোপের দেশগুলিতে রেললাইনের প্রচলন ছিল। খনি থেকে নদীর গঞ্জ বা সমুদ্রের বন্দরের মুখ পর্যন্ত রেললাইন পাতা থাকত, তার ওপর দিয়ে মালবোঝাই গাড়ি ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেত। ইংলণ্ডে তো লাইনপাতা পথকে ট্রামওয়ে বা ট্রামপথ বলা হ'ত। এ রকম জানা যায় যে, মিঃ আউটরাম বলে একজন গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে অনেক লাইনপাতার কাজ করেছিলেন, তাঁর নাম থেকে ট্রামওয়ে কথাটার চলন হয়েছিল।

প্রথম দিকের লাইন ছিল কাঠের তৈরি। তারপর কাঠের ওপর লোহার পাত মোড়া হতে লাগল যাতে ঘর্ষণ কম হয় এবং গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। সর্বপ্রথম লোহার রেললাইন তৈরি করে কোলব্রুকডেল আয়রণ ওয়ার্কস, ইংলণ্ডে ১৭৬৭ সনে। এগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল তিন ফিট করে এবং চাকা যাতে হড়কে পড়ে না যায়, সেজন্যে লাইনের কানা থাকত বা লাইনে খাঁজ কাটা থাকত। পরে লাইনের বদলে চাকাতে কানা তৈরি করার ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু ট্রামলাইনে এখনও খাঁজকাটা থাকে।

মানুষের মন তো আর বসে থাকে না, নতুন কিছু করার চেষ্টার ফলেই মানুষের অগ্রগতি। তাই ঘোড়ায় টানা রেলগাড়িতেই মানুষ আটকে থাকেনি।

জলকে তাপ দিয়ে ফোটালে বাষ্প হয়, সেই বাষ্পের শক্তি সাঙ্ঘাতিক। এই সাঙ্ঘাতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাতে হবে—এই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়

দিকে টমাস নিউকোমেন একটা অবড়জঙ বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেন খনির জমা-জল পাম্প করে টেনে তোলার জন্যে। ইঞ্জিনটা তেমন কাজের হয়নি, কাজ করত খুব ধীরে। ঝামেলা ছিল অনেক, কিন্তু ইঞ্জিনটির প্রচলন হয়েছিল। এই রকম একটি ইঞ্জিন মেরামতের কাজে নিযুক্ত হন কারিগর জেমস ওয়াট ১৭৬৪ সনে। এই ইঞ্জিন মেরামত করতে এসে এর অনেকগুলি গলদ দূর করে এবং নতুন ব্যবস্থা সংযুক্ত করে তিনি প্রায় একটি নতুন ইঞ্জিন তৈরি করেন; কাজেই বলা যায় জেমস ওয়াটই কাজের উপযোগী প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেন এবং সেটার পেটেণ্ট করান ১৭৬৯ সনে। ওয়াটস-এর ইঞ্জিন খনি থেকে জল পাম্প করার কাজে ব্যবহার হতে লাগল। ওয়াটস অবশ্য পথ অতিক্রম করার কাজে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ১৭৮৪ সনে উইলিয়ম মুরডক বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করে প্রথম তা চাকার ওপর বসান। কিন্তু তা পাতা-লাইনের ওপর দিয়ে চালান হয়নি। সাধারণ রাস্তার ওপর দিয়ে চলত। ক্রমেই ইঞ্জিনের উন্নতি করার চেষ্টা হতে লাগল। ১৭৯৭ সনে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়র রিচার্ড ট্রিভিথিক একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেন, সাত বছর পরে ১৮০৪ সনে ওয়েলস্-এর পেন-ই-ডারেন কয়লার খনিতে পাতা-লাইনের ওপর দিয়ে তা চালান হয়। ঘোড়ায় টানার জন্যে এ লাইন পাতা ছিল। এই প্রথম রেললাইনে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালান হ'ল। যাত্রী বহন করার জন্যে গাড়িসমেত ট্রিভিথিক-এর একটি ইঞ্জিন লণ্ডনে ১৮০৮ সনে প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তা বিশেষ কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

এই কাজটিতে সাফল্য অর্জন করেন ইঞ্জিনিয়র জর্জ স্টিফেনসন। ইনিও ইংরেজ। স্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ শুরু করেন ১৮২০ সনে। তারপর ১৮২৫ সনের ২৭ সেপ্টেম্বর সেই রেলপথের উপর দিয়ে ৩৪টি ছোট কামরাযুক্ত যাত্রীসহ রেল-গাড়ি বাষ্পীয় ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলল। ইঞ্জিনের আগে আগে চলল পতাকাসহ একজন ঘোড়সওয়ার লোকজনদের সাবধান করে দেবার জন্যে। তারিখটা মনে রাখার মত। পৃথিবীতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন পরিবহন-যুগের সূচনা হ'ল।

১৮২৯ সনে তাঁর ইঞ্জিন 'রকেট' বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বারমিংহাম থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ঘণ্টায় পনর মাইল বেগে অতিক্রম করে পাঁচশ পাউণ্ড পুরস্কার অর্জন করেছিল। লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেস্টার রেলপথে নিয়মিত যাত্রীবহন শুরু হ'ল। ইংলণ্ডের অন্যত্র এবং ইউরোপের দেশগুলিতেও এর পরে রেলপথ খোলা হতে লাগল। আমেরিকায় প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিনে মাল পরিবহন করে ডেলাওয়্যার এণ্ড হাডসন ক্যানাল কোং পেনি-সিলভিনিয়াতে। ইংলণ্ড থেকে ইঞ্জিনটি কেনা হয় এবং ১৮২৯ সনের ৮ই আগষ্ট চালান হয়

লোহার পাত-লাগান কাঠের তৈরি রেললাইনের পক্ষে এই ভারি ইঞ্জিনটা ঠিক খাপ খায়নি —পরে ইঞ্জিনটাকে আর পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

১৮৩০ সনে আমেরিকায় একটি বড় মজার ঘটনা ঘটে। বাল্টিমোর থেকে বার মাইল দূরে এলি-কট্‌স মিলস্ পর্যন্ত রেললাইন পাতা ছিল, ঘোড়ায় টানা গাড়ি এই লাইনের ওপর দিয়ে চলত। লাইনের মালিকেরা নিউ ইয়র্কের পিটার কুপারকে একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করে দিতে বললে তিনি একটি ইঞ্জিন তৈরি করে দেন। মাপে ছোট ও ওজনে মাত্র দেড় টন বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'টম থাম্ব'। আমরা জানি রূপকথার 'টম থাম্ব' বুড়ো আঙুলের মাপের একজন মানুষ। যাই হোক ইঞ্জিন টম থাম্ব বেশ ভালই কাজ করছিল। একদিন ঘোড়ার গাড়ির মালিকেরা পিটার কুপারকে তাদের একটা গাড়ির সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিতে চ্যালেঞ্জ করল। পিটার রাজী হয়ে গেল। প্রথম প্রথম টম থাম্ব ও ঘোড়ার গাড়ি সমান সমান চলছিল: তারপর পিটার ইঞ্জিনে আরো বাষ্প উস্কে দিতে টম থাম্ব এগিয়ে চলল। ঘোড়াগাড়ির চালক প্রাণপণ চেষ্টা করেও টম থাম্বের আর নাগাল পাচ্ছিল না—নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছতে আর সামান্যই বাকি এমন সময়ে টম থাম্বের একটা বেল্ট খুলে গেল, কুপারের বেল্টটাকে পরিয়ে পৌছতে সময় লাগল; ততক্ষণে ঘোড়ার গাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌছে বাজি জিতে নিয়েছে। ঘোড়ার গাড়ির মালিকদের আনন্দ ধরে না, যেন তারা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শক্তি ও সম্ভাবনা বরাবরের মত নাকচ করে দিয়েছে। তারা তখনও বোঝেনি যে তা হবার নয়। বিজ্ঞানের শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না, একবার হেরে যাওয়াই পরাজয় নয়।

আমাদের দেশে প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলে ১৮৫৩ সনের ১৬ই এপ্রিল। বম্বাই থেকে তের মাইল দূরে কল্যাণ পর্যন্ত রেলপথ চালু হয় সেদিন। তারপর ১৮৫৪ সনের আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত এবং ১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে মাদ্রাজ থেকে আরকোনাম পর্যন্ত রেলপথ চালু করা হয়। প্রথম ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চলে ১৯২৫ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই থেকে কুরলা পর্যন্ত।

একটি হিসাবে জানা যায় যে, ১৮৬৩ সনে ভারতে রেলপথ ছিল ২৫০৭ মাইল (অর্থাৎ প্রায় ৪০৩৬ কিলোমিটার) মাত্র, আর সর্বশেষ ১৮৬৬ সনের হিসাবে জানা যায়, ভারতে বর্তমান রেলপথ হ'ল ৫৮,২৭২,৯৯ কিলোমিটার। ভারতে দিনে আধ কোটিরও বেশি —৫৮ লক্ষ যাত্রী রোজ ট্রেনে ভ্রমণ করে; দিনে সাত হাজারের বেশি ট্রেন ছাড়ে, এর মধ্যে চার হাজারের বেশি যাত্রীবাহী ট্রেন। ভারতে যতগুলো যাত্রীবাহী কামরা আছে, প্রায় ত্রিশ হাজার, তা সারি করে রাখলে ১২৫ মাইল লম্বা হবে। মালগাড়ি আছে প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার। ভারতে ষ্টেশনের সংখ্যা ৬৮৫৪। সবচেয়ে লম্বা প্ল্যাটফর্ম—সোনপুর ২৪১৫ ফিট, সবচেয়ে লম্বা রেল ব্রিজ—সোন-ব্রিজ ১০,০৫২ ফিট। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সংখ্যা ১১ হাজারের বেশি, ইলেকট্রিক ইঞ্জিন প্রায় তিনশ'। ভারতের রেল ব্যবস্থা আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় —সর্ববৃহৎ রেলব্যবস্থা!

এত খবর জানা গেল, চল এবার কোথাও রেলে চড়ে বেড়িয়ে আসি: রেলে চড়ে এসব কথা কিছু মনে এন না যেন, তাহলে রেলে চড়ার আনন্দটাই মাটি হবে।

এখানেই থামি, আমার ষ্টেশন এসে গেছে।

গল্প বলার গল্প

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রতীন বলতে লাগল :

তখনকার সময়ে গুপ্তচরের প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশী। নবাবের চর ঘুরত রাজা-মহারাজাদের পিছনে। আর রাজামহারাজাদের চর ঘুরত তাঁদের অধিনস্ত জমিদারদের পিছনে। কে কখন কি করে, উপরওয়ালাকে অমান্য করে হঠাৎ স্বাধীন হয়ে বসে, কার মনের পিছনে কি মতলব ঘুরছে বলা তো যায় না।

রাজাবাবু একটা অপরিচিত মেয়েকে চর থেকে তুলে এনে যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছেন। কেন? কে এই মেয়েটি? হঠাৎ তার ওপর রাজাবাবুর এই খেয়াল চাপল কেন? চরেরা এবার মাথা ঘামাতে বসল। এরা বাইরের লোক নয়। আজকাল রেল ষ্টেশনে বিজ্ঞাপন দেখা যায় : পকেট মার হইতে সাবধান! এরাও তেমনি সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছেই থাকে। হয়ত তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি।

রাজাবাবু এসব জানতেন। এবং এদের সম্বন্ধে সতর্কও ছিলেন। যদিচ কোথায় কার সম্বন্ধে সতর্ক হ'তে হবে তার কোনো স্থিরতা ছিল না। কারণ অন্দর থেকে সদর পর্যন্ত সর্বত্রই এরা ছড়িয়ে ছিল।

তাই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেও কিছু কিছু প্রকাশ হতে বাকী থাকে না। যেমন, স্বাধীন রাজা হতে গেলে গড় চাই। গোপনে গড় বাঁধা যায় না। সুতরাং রাজাবাবু যখন তাঁর রাজবাড়ীতে চারপাশে গড় খুঁড়তে আরম্ভ করলেন তখন সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, হঠাৎ গড়খাই কেন।

রাধাকে যখন পাওয়া গেল তখন কুমারের সঙ্গে তার বন্ধুরাও ছিল। সুতরাং রাধার মাথায় সাপের ফণা তোলার গল্পটা সহজেই ছড়িয়ে পড়েছিল। চরেদেরও তা জানতে বাকী ছিল না। তারা গড় তৈরি, সাপের ফণা ধরা এবং রাধার যুদ্ধবিদ্যা শেখার ব্যাপারকে একসঙ্গে জুড়ে একটা অর্থ করলে। সে অর্থটা খুব মূল্যবান অর্থ। খবরটা বীরগঞ্জের রাজার কাছে দিতে পারলে মোটা বকশিশ পাওয়া যেতে পারে। গোপনে তারা বীরগঞ্জের রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

বীরগঞ্জ থেকে বিশেষ চর এল এই খবরের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য।

কিন্তু বীরগঞ্জের রাজার শক্তি খুব বেশী ছিল না। অন্য দিকে রাজাবাবু পুরোদমে লোক-লস্কর ও হাতিয়ার সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর হাতে কয়েকটা ডাকাতের দল তো ছিলই। এখন নৌকর সংখ্যা বাড়াবার জন্য প্রচুর নৌক তৈরি হচ্ছে। বীরগঞ্জের রাজা

দ্বিধা করতে লাগলেন যে, তাঁর যে শক্তি আছে তাই দিয়ে কোতলপুরের রাজাবাবুকে আক্রমণ করা ঠিক হবে কিনা।

যতীন বলতে লাগল :

স্বাধীন হওয়ার লোভ বীরগঞ্জের রাজারও মনে মনে ছিল। কিন্তু স্বাধীন হওয়া তো মুখের কথা নয়। কেল্লা চাই, গোলা বারুদ চাই, অস্ত্রশস্ত্র চাই, জলে যুদ্ধ করবার জন্য নৌ-বাহিনী চাই, সৈন্য-সামন্ত অনেক কিছুই চাই। আর তার জন্য বহু অর্থেরও প্রয়োজন। তত অর্থ কোথায় পাওয়া যায়?

তবে রাধাকে যদি পুত্রবধূরূপে পাওয়া যায়, তাহলে বীরগঞ্জের রাজার স্বপ্নও ফাঁকতালে সফল হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তিনি এক কাজ করলেন : কিছু লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে একখানা জমকালো পাল্কী পাঠিয়ে দিলেন কোতলপুরে। আর তার সঙ্গে রাজাবাবুর কাছে একখানা চিঠি। তাতে তিনি এই লিখলেন যে, কয়েক মাস হ'ল চরে যে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে সেই মেয়েটিকে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবেন। সে জন্য পাল্কী এবং লোকজন পাঠান হ'ল। আশা করি আমার এই আদেশের অন্যথা হবে না।

চিঠি পড়ে রাজাবাবু অবাক। এই আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল যে, খবরটা বীরগঞ্জের রাজা, এমন কি নবাববাহাদুরের কাছেও পৌছুতে পারে। বুঝলেন, বীরগঞ্জের রাজা সহজে ছাড়বেন না। লড়াই অনিবার্য। বীরগঞ্জের রাজার সঙ্গে তো বটেই, হয়ত বা নবাবী ফৌজের সঙ্গেও। কারণ অধীনস্থ জমিদারকে সায়েস্তা করবার জন্য বীরগঞ্জের রাজা নবাবের সাহায্য চাইতে পারেন। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু চিঠিখানা বিনীতভাবেই লিখলেন : আপনার আদেশ কখনও অমান্য করিনি। এই আদেশও অমান্য করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু একটা মুস্কিলে পড়েছি। কন্যাটি আমার পুত্রের জন্য বাগদত্তা। বাগদত্তা কন্যাকে গ্রহণ করতে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবে। আপনার আদেশের অপেক্ষায় রইলাম।

পাল্কী ফিরে গেল। রাজাবাবু জানতেন পাল্কী আবার ফিরে আসবে। এবং শেষ পর্যন্ত বীরগঞ্জের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। তিনি যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

রতীন বলতে লাগল :

গোপন কিছুই রইল না। ওদিকে বীরগঞ্জের রাজাও তৈরি হতে লাগলেন।

রাধা হ'ল তুরুপের তাস।

রাজাবাবু তার বাপ-মায়ের সন্ধানে অনেক সময় নষ্ট করলেন। আর নষ্ট করতে রাজি হলেন না। সামনের শুভদিনেই বিবাহের দিন ধার্য করলেন। এ খবরটাও বীরগঞ্জে গিয়ে পৌছুল।

আগেই বলা হয়েছে তখন রেল ছিল না, স্টীমার ছিল না; ডাক ও তার বিভাগও ছিল না। সুতরাং খবরটা পৌছুতে সময় নিল। অন্য দিকে বিয়েও যে-সে দিনে দেওয়া যায় না। তারও দিনক্ষণ আছে। এবং সেটাও ফরমাস মত করা যায় না।

রাজাবাবু তখন নিঃশ্বাস নেবার ফুরসুত নেই! এদিকে বিয়ের আয়োজন, অন্য দিকে যুদ্ধের আয়োজন। হাতে সময় অল্প।

তিনি আরও একটা কাজ করলেন: বীরগঞ্জের রাজা নবাববাহাদুরের সাহায্য চাইবার আগেই তিনিই নবাবের শরণাপন্ন হলেন। জানালেন, বীরগঞ্জের রাজা তাঁর বাগদত্তা পুত্রবধূকে জোর করে কেড়ে নিতে চান।

নবাবটি খুব ভালো লোক ছিলেন। একজনের বাগদত্তা পুত্রবধূকে গায়ের জোরে অন্য লোক কেড়ে নেবে, এটা তিনি সমর্থন করবেন না এই বিশ্বাস রাজাবাবুর ছিল।

কিন্তু তাঁর ঘোড়সোয়ার তখন হয়ত রাজধানীর উদ্দেশ্যে বড় জোর মাইল দশেক গেছে, এমন সময় খবর এল বীরগঞ্জের রাজা আসছেন লাঠি সোটা লোক-লস্কর নিয়ে।

যুদ্ধ অনিবার্য।

কিন্তু এরি মধ্যে রাজাবাহাদুর একটা কাজ করে ফেললেন। একটা মাঝারি গোছের বিবাহের দিন ছিল, সেই দিনে কুমারের সঙ্গে রাধার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

ধূমধাম বিশেষ করলেন না। শুধু লোক মারফৎ বীরগঞ্জের রাজার কাছে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। ভরসা খবরটা পেয়ে বীরগঞ্জের রাজা যদি থেমে যায়! কেন না, অন্যের বিবাহিত পুত্রবধূকে কেউ নিজের পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে পারবে না।

কিন্তু বীরগঞ্জের লোক-লস্কর তখন অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। নিমন্ত্রণ পত্র মাঝপথেই বীরগঞ্জের রাজার হস্তগত হ'ল।

রাজা তো আগুন।

তিনি রাজাবাবুর ঘোড়সোয়ারকে হুকুম দিলেন, তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে এখনই বীরগঞ্জে ফিরে গিয়ে রাজাবাবুকে বিয়ে বন্ধ করতে বল। এ বিয়ে হলে আমি কোতলপুরের একখানা ইট আস্ত রাখব না। বলবে, আমি নিজে আসছি লোকজন নিয়ে। আমার ছেলেও যাচ্ছে সঙ্গে। ওই লগ্নেই আমার ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হবে। রাজাবাবু হবেন কন্যাকর্তা। যাও।

যতীন বলতে লাগল :

রাজাবাবুর ঘোড়সোয়ার তখনই ছুটল কোতলপুরের দিকে। নিজের লোক-লস্করকেও বীরগঞ্জের রাজা হুকুম দিলেন তখনই কোতলপুরের দিকে রওনা হতে। হাতে সময় বেশী নেই।

বীরগঞ্জের রাজা এবং রাজপুত্র দুজনেই বন্দী হলেন।

রাজাবাবুও এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। মেয়েটিকে কখনই তিনি অন্যের হাতে দিবেন না এই তাঁর পণ। কোতলপুর থেকে মাইল দশেক দূরে যেখানে বীরগঞ্জের সৈন্যদের নদী পার হওয়ার কথা, সেখানে উপযুক্ত সেনাপতির অধীনে তিনি একদল সেপাহী পাঠিয়ে দিলেন। ইচ্ছা বিবাহটা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যায়।

তাই হ'ল।

ওপারের বীরগঞ্জের সেপাই, এপারে রাজাবাবুরা। মাঝখানে নদী। দুটো দিন পরস্পরের তাল ঠোকাঠুকিতেই কেটে গেল।

ইতিমধ্যে বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল।

রাজাবাবুর সাহস বেড়ে গেল। সাপে যে মেয়ের মাথায় ফণা ধরেছিল এতদিনে ধর্মতঃ সে কোতলপুরের রাজলক্ষ্মী হ'ল।

রাজাবাবু নিশ্চেষ্ট বসে রইলেন না। কোতলপুরের ঘাটে নদী পার হয়ে, নিজে যাত্রা করলেন একজন সেপাহী নিয়ে। বন-বাদাড়, খানা-ডোবার আড়াল দিয়ে তাদের নিয়ে নিজে তিনি যাত্রা করলেন।

ওদিকে তখনও তাল ঠোকাঠুকি চলছিল। বীরগঞ্জের সিপাইরা শত্রুর সামনে নদী পার হতে সাহস করছিল না।

এমন সময় অতর্কিতে রে রে করে গিয়ে পড়ল বীরগঞ্জের সেপাইদের ওপর। অতর্কিত আক্রমণে অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা যে যেদিকে পারল পালাল।

বীরগঞ্জের রাজা এবং রাজপুত্র দুজনেই বন্দী হলেন।

এটা রাত্রের ঘটনা।

পরদিন ভোরেই নবাবের হুকুমনামা নিয়ে নবাবী ঘোড়সোয়ার এসে পৌছুল।

নবাব বীরগঞ্জের রাজাকে অবিলম্বে রাজধানী যাবার জন্য তলব করেছেন।

অগত্যা বীরগঞ্জের রাজাকে ছেড়ে দিতে হ'ল। তিনি গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নবাবের সামনে দাঁড়ালেন।

নবাবের ঘোড়সোয়ার বীরগঞ্জের রাজার যুদ্ধযাত্রা এবং পরাজয়ের কাহিনী নবাব বাহাদুরকে নিবেদন করল।

শুনে নবাব বললেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল। তোমার উচিত সাজা হয়েছে। তোমার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হ'ল এবং তা রাজাবাবুকে দেওয়া হ'ল।

বীরগঞ্জের রাজা অনেক কান্নাকাটি করল। কিন্তু নবাব বাহাদুর শুনলেন না! বললেন, যে অন্যের বাগদত্তা পুত্রবধূকে ছিনিয়ে নিতে চায়, সে রাজা হবার যোগ্য নয়। তার হাতে রাজ্য থাকা নিরাপদ নয়।

রাজাবাবুর স্বপ্ন সফল হ'ল। এতদিনে তিনি রাজা হলেন। কিন্তু রাজধানী কোতলপুরেই রইল।

এইখানেই গল্পটি শেষ করে রতীন ও যতীন বাড়ী ফিরল।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কাকের সঙ্গে খুড়ো খুড়ী গল্পে মশ্‌গুল, এমন সময়ে গুগলী ঝিনুক ঝাঁ-মশাই সরে পড়েছেন। গুটিপোকা তেমনি কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় বেহুঁস। কোথাও কেউ নেই···শুধু সেই দরজা আর দারোয়ান।

এমন সময় খাটো পা-ওলা বামনাকৃতি একজন এসে হাজির হ'ল। মাথায় পাগড়ী হাতে লম্বা 'সমন'—সেটা বার করে সামনে মেলে ধরে সে পড়তে লাগ্‌ল :

"এতদ্বারা আপনাদের জানান যাইতেছে যে," বলেই বামনটি পকেট থেকে শিশি বার করে একটু সিরাপ খেয়ে নিল—তারপর আবার পড়তে লাগ্‌ল :

"আপনারা যদি ভাতখেকো হন এবং"—আবার সিরাপ খেল লোকটা—

"যদি আপনাদের পাখীর মত ঠোঁট থাকে

আর ডানা না থাকে

আর পালক না থাকে"

সিরাপের শিশি থেকে আবার সিরাপ খেয়ে লোকটা বলতে লাগ্‌ল :

"আর যদি মেয়ে খোঁজার জন্য

আপনারা এসে থাকেন তো'

আপনারা গুরুতর অপরাধে এই দেশের আইনানুসারে দণ্ডনীয়—অতএব আপনাদের

এতদ্বারা শ্রীল শ্রীযুক্ত চোরামাণিক্য বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ দেওয়া যাইতেছে।"

খুড়ো চাইলে খুড়ীর দিকে
খুড়ী চাইলে খুড়োর দিকে

"উপায় এখন উপায় ?" এই হ'ল ওদের চাউনির অর্থ।

লোকটার পাগড়ীতে গোলাপ ফুল—আর আগেই বলেছি পকেটে সিরাপের শিশি—গলাটা বেজায় খ্যাঁসখেঁসে। দু'পায়ে পেল্লায় শুঁড়ওলা নাগ্‌রা জুতো। তার দু'পাটিতে লেখা রয়েছে—"প্যাপীলিক"—

খুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে ?"

সে বললে, "রাজার দূত—কর্মচারী বা পেয়দা।"

খুড়ী বললে, "নামটি কি তোমার ?"

সে বললে, "প্যাপীলিক।" কিন্তু মুখে হাত চাপা না দেওয়ায় শব্দ তরঙ্গ উঠল :

প্যাপীলিক প্যাপীলিক প্যাপীলিক প্যাপীলিক

প্যাপীলিক পকেট থেকে দুটো আখরোটের খোলা বার করলে—বললে, "এই খোলার মধ্যে করে তোমাদের রাজবাড়ীতে নিয়ে যাবো।"

খুড়ী ভয়ে ভড়কে গেল। "ওমা সেকি—ওর মধ্যে ধরবে কি করে ?"

খুড়ো পালাবার ফাঁক খুঁজছিল। এমন সময়ে প্যাপীলিক খোলা দুটো তাদের কাছে মেলে দিল।

ম্যাজিকের মন্ত্রে যেন মনে হ'ল আখরোটের খোলা দুটো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মত বড়। তার মধ্যে সারা আশ্চর্য নগরের নক্সা আঁকা—সব কিছুই রয়েছে।

খুড়ো-খুড়ীর আজ্ঞাতে প্যাপীলিক তাদের আখরোটের খোলে ভরে পকেটে ফেলে দিল।

খুড়ো-খুড়ী বুঝতেও পারলো না যে তারা আখরোটের খোলে বন্দী।

পথে যেতে যেতে প্যাপীলিক গল্প জুড়ে দিল : প্যাপীলিকের গল্প।

আমাদের এই দেশের নাম আশ্চর্য নগর।

এই দেশ শাসন করে চোরামাণিক্য বাহাদুর।

এ দেশের কথা কেউ কেউ স্বপ্নে দেখেছে—কিন্তু এখানে কেউ বড় একটা আসতে পারে না। পথ ঘাট এত জটিল গোলক ধাঁধার মত যে, কেউ একবার এলে আর ফিরে যেতে পারে না।··

গল্প বলা হঠাৎ থেমে গেল।

খুড়ো-খুড়ী শুনলে গীর্জার ঘণ্টার মত হাজার হাজার ঘণ্টা বাজছে সারা দেশ জুড়ে

খুড়ী আঁৎকে উঠে বললে, "ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি ?"

খুড়ো চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, "এত ঘণ্টা বাজছে কেন, মশাই ?"

প্যাপীলিক বললে, "ও হচ্ছে মধ্যাহ্ন ভোজের ঘণ্টা—আমরা রাজবাড়ীর কাছে এসে গেছি—এবার ঢুকবো ভোজনালয়ে—আমরা সবাই একই ভোজনালয়ে খাই দেশসুদ্ধ সবাই এক সঙ্গে।

আখরোটের খোলা খুলে প্যাপীলিক খুড়ো-খুড়ীকে বার করে দিলে।

একটা বিরাট হলঘর—সারি সারি সব টেবিল-চেয়ার পাতা—প্রত্যেক চেয়ারে পরচুলওলা জীবগুলো গ্যাট হয়ে বসে আছে খ্যাঁটের আশায়। চেয়ারগুলো মোমের তৈরী কিন্তু ইস্পাতের মত শক্ত। প্যাপীলিক খুড়ো-খুড়ীকে দুটো চেয়ারে বসিয়ে দিলে। এক দিকে দেখা গেল গম্ভীর মুখে কাকটা বসে আছে। গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ বসেছে খানিক দূরে চকোলেট্ খেকো গুটিপোকা একটা চেয়ারে বসে জোর ঢুলছে।

একটু উঁচু চেয়ারে চোরামাণিক্য বাহাদুর বসে আছেন। ইনি আগাগোড়া জুতোর বাক্সের পিজবোর্ড জুড়ে তৈরী। প্যাপীলিক তাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলার পর তিনি দুটো দূরবীন দু'চোখে দিয়ে খুড়োখুড়ীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। গুগ্‌লী ঝিনুক ঝাঁ তাঁকে হড়বড় করে কি সব বলতে লাগল।

এরি মধ্যেই খাবার আসতে শুরু করেছে। কাণ্ড দেখে খুড়ো-খুড়ী তাজ্জব, যাকে চলতি কথায় বলে থ' !

টেবিলে একটা করে শ্লেট দেওয়া আছে—তা পাটালী দিয়ে তৈরী, তাতে লেখা হয় লাঠি বিস্কুট দিয়ে—এদের ছাপানো খাদ্যতালিকা বলে কিছু নেই। যার যা খাবার ইচ্ছে তা এই পাটালীর শ্লেটে লাঠি বিস্কুট দিয়ে লিখতে হয়।

কেউ খাবার পরিবেশন করে না—খাবারের নাম পাটালীর শ্লেটে লাঠি বিস্কুট দিয়ে লেখা মাত্র খাবার আপনি এসে হাজির হয়।

খুড়ো-খুড়ী দেখে তো' অবাক্—একি স্বপ্ন না সত্যি ? তারা বারবার চোখ কচলায় আর দেখে। নাঃ স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যি। খাবাররা সব সচল, জীবন্ত প্রাণীর মত হেঁটে চলে আসছে, কিন্তু কোন শব্দ নেই। ঘর ময় শুধু খাবারের ছুটোছুটি—কিলবিল্ করছে সব খাবার। কেউ উড়ে আসছে, কেউ হেঁটে আসছে, কেউ গড়িয়ে আসছে, কেউ বাতাসে ভেসে আসছে – আর ঠিক ঠিক হিসাব মত যে যার টেবিলে উঠে শ্লেটের উপর শুয়ে পড়ছে প্লেটগুলো চিনির তৈরী—এগুলোও খাবার।

খুড়ী দেখলে ডিম আসছে ছোট ছোট পা ফেলে তার এক বগলে নুন-মরীচের শিশি, ার এক বগলে চামচ। চপ আসছে হেলতে দুলতে—গোলগাল তার শরীর—তার এক াতে ছুরি-কাঁটা অন্য হাতে রাইয়ের শিশি। বিস্কুট, কেকের ফালি, টোষ্ট, শ্রেফ গড়িয়ে াসছে চাকার মত। মুরগীর রোষ্ট জ্যান্ত মুরগীর মত হেঁটে আসছে। মাছ আসছে বাতাসে াসে, পাখনা নাড়তে নাড়তে।

প্যাপীলিক খুড়ো-খুড়ীকে চুপি চুপি বললে, "খাবারের নাম লেখো তাড়াতাড়ি। াজ শেষের ঘণ্টা বাজলে সব ভোজবাজীর মত মিলিয়ে যাবে কিচ্ছুটি দাঁতে কাটতে ারবে না।"

খুড়ো লিখলে, "ফাউল কাট্‌লেট্;" সঙ্গে সঙ্গে এক ঠ্যাং-এ ন্যাঙ ন্যাঙ করে কাট্‌লেট্ াসে টেবিলে প্লেটের ওপর শুয়ে পড়লো।

খুড়ী সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের ঠ্যাং? মুরগীর? রামো!" াল প্রায় উঠে পড়ছিল—খুড়ো তাড়াতাড়ি খুড়ীর শ্লেটে খুড়ীর পেনসিল দিয়ে লিখে দিলে, াঙ্গাজল।"

ব্যাস! ঘরময় এক বিশৃঙ্খল কাণ্ড বেধে গেল—তোড়ে গঙ্গাজল এসে টেবিল চেয়ার াসিয়ে দেয় আর কি!

চোরামাণিক্য বাহাদুরের জুতো জলে ভিজে যেতেই তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে াড়লো। চোরামাণিক্য মশাই আসলে জুতোর বাক্সের পিজবোর্ড দিয়ে তৈরী—জলে াপসে উঠে এলিয়ে পড়েন আর কি!

একদল পাখী আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। এরা এদেশের য়্যামবুলেন্স বাহিনী। া সবাই বুট পরা উট পাখী। পিঠে এক বোঝা মাছের সরু সরু কাঁটা রয়েছে আর ামরে জড়ানো নানা রঙের সুতো। তারা চোরামাণিক্য বাহাদুরের বিপদ দেখে শো শো ারে নেমে এল। এই দলের দলনেত্রীর নাম তীরন্দাজিনী। তিনি মাছের কাঁটা দিয়ে াটো করে পিজবোর্ডগুলো লাল নীল সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে চোরামাণিক্য বাহাদুর রক্ষা ালেন।

এদিকে গঙ্গাজলে অনেকের জুতো ভিজে গেছিল। তারা উঠে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ ারছিল। এটা দারুণ অভদ্রতা বেয়াদপি—ভোজ সভার নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই সুস্থ হয়েই াোরামাণিক্য বাহাদুর একটা পেল্লায় মুখোস মুখে এটে বসলে—মুখোসের তলায় লেখা াবর্দার!" ওরা দেখলে চোরামাণিক্য বাহাদুরের পাশ থেকে দেদার সব মুখোস ঝুলছে— দুখদ, অমায়িক, হাসিখুসি, আহ্লাদে আটখানা—গোমড়া মুখো, ভেংচিকাটা সব ভঙ্গীর

মুখোস—কোনটায় লেখা "সর্বনাশ!" কোনটায় লেখা "ভারী খুশী", কোনটায় লেখা "অত্যন্ত দুঃখিত।" যখনকার যা ভাব, সেই ভাবের মুখোস পরে ইনি ভাবের অভিব্যক্তি করেন।

মুহূর্তে সবাই বসে পড়ল। সব চুপ কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়াদাওয়া শেষ হতে চোরামণিক্য বাহাদুর বললেন, "এবার আমরা কুচকাওয়াজ দেখতে যাবো।" তারপর মুখোস পরলো "সর্ব্বনাশ!" সে হাঁক দিল, "সেনাপতি!"

সবাই ভয়ে কেঁপে উঠলো।

একটা স্যুট-পরা উটপাখী লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর সামনে এসে ডানা তুলে ঝপাট করে বন্ধ করে দুই বুট একত্র ঠুকে দাঁড়াল। এই হচ্ছে এদের স্যালুট্ দেওয়া। উটপাখীর এক ডানার তলায় একটা ছোট হাড়ের "ব্যাটন" আর অন্য ডানার তলায় একটা ছোট সাঁড়াশি ঝোলানো।"

প্যাপীলিক বললে, "ভাত-খেকো দুটোর বিচার করা হোক্।"

চোরামাণিক্য বললেন, "ঠিক! কিন্তু এখন সূর্য মাঝ আকাশে—বেআইনি প্রবেশের শাস্তি নির্বাসন। এখন এদের ছেড়ে দিলে রোদের তাতে ওরা গলে যাবে। তার ফলে মতরাজ্যের চর্বি আর পচা মাংসের দুর্গন্ধে আজব নগরের সোনার রাজ্যে মড়ক মহামারী দেখা দেবে। ওদের শাস্তি চাই—কিন্তু আমার রাজ্যের মঙ্গল আগে। কাজেই ওদের ব্যবস্থা হবে সন্ধ্যার পর।"

চোরামাণিক্য বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এদেশে কি করে ঢুকলে? কে তোমাদের দরজা খুলে দিলে?"

খুড়ো বললে, "পথ ভুলে এসে পড়েছি হুজুর। ঝরকা দিয়ে লাফিয়ে ঢুকেছি—আপনার দারোয়ান ঘুমোচ্ছিল।"

চোরামাণিক্য হাঁক দিলেন, "দারোয়ান, খুড়ি দ্বাররক্ষী—"

গুটিপোকা গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়ে ঢুলতে লাগল—

খুড়ো বললে, "দেখুন, মহারাজ"—

চোরামাণিক হাঁকলেন, "জহ্লাদ!"

একটা শকুন কোথা থেকে উড়ে ঝপ্ করে নেমে এল—বললে, "হজোর!"

"একে জাগিয়ে দাও—" চোরামাণিক্য হুকুম দিলেন। দ্বাররক্ষী তখনো ঘুমুচ্ছে।

শকুন জহ্লাদ ট্যাঁক থেকে একটা নস্যের ডিবে বার করে, সেটা দুই পায়ে খুলে ঠোঁটে করে একটু নস্য নিয়ে দ্বাররক্ষীর নাকে দিতেই সে ভীষণ শব্দে হেঁচে উঠে জেগে চোখ মেলে দাঁড়ালো।

"দ্বাররক্ষী!" চোরামাণিক্য হাঁকলেন, "তুমি ঘুমোচ্ছিলে?"

"আজ্ঞে না, হ্যাঁচ্চো; হ্যাঁচ্চো! আমি দ্বার রক্ষা করছিলাম। মানুষ দ্বাররক্ষীরা এই রকম ঘুমের ভান করে ঢোলে। আর যেই কেউ দরজা দিয়ে ঢুকতে যায়, অমনি তাকে ক্যাঁক্ করে ধরে ফেলে।"

চোরামাণিক্য খুশী হয়ে বললেন, "সাবাস্! কিন্তু এরা ঢুকলো কি করে তবে?"

গুটিপোকা বললে, "ওরা হুজুর পাখী—তাই মিথ্যে কথা বলে। একরকম পাখী শুনেছি চোখ গেলো, চোখ গেলো বলে ডাকে। কিন্তু হাজার দু'হাজার বছর ধরে শুনেছি তাদের চোখ ঠিক আছে। ওরা ডাহা মিথ্যুক।" এ দুটো গুপ্তচর—গুপ্ত ভাবে চয়ে বেড়ায়—ওরা অন্য কোন পথে ঢুকে থাকবে।"

চোরামাণিক্য বললেন, "যাও!" তারপর খুড়ো-খুড়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেসা করলেন, "তোমরা এদেশে এসেছ কেন সত্যি করে বলোত!"

খুড়ী বললে, "তিনটি মিষ্টি মেয়ের সন্ধানে এসেছি—।"

খুড়ো বললে, "আমরা কাককে একথা বলেছি—কাক বলেছে, 'আছে, আছে, আছে।'

গুগলি ঝিনুক ঝাঁ বললে, "হুজুর, কয়েদীর মেয়ে তিনটে তো' রয়েছে—"

চোরামাণিক্য বললেন, "পরামর্শ করতে হবে—কাকিনী মাসীকে হাজির কর।"

(ক্রমশঃ)

ছোটদের প্রতি

শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালকে যারা উঠবে বেড়ে
তাদের নমস্কার।
জানি খনির সেই লোহাতে
জাগবে কত ধার॥

হোক এ কুঁড়ি যতই ছোটো
ক'রছে যে এ ফোটো ফোটো
মাতবে শেষে ফুল হ'য়ে রে
গন্ধে চমৎকার

বটের বীজে দেখে কি তার
বিভর ধরা যায়।
সেই অনুতে মহৎ রাখে
লুকিয়ে আপনার

আদর করি তাই কণারে
এম্নি সেতো থাকবে না রে
সময় হ'লে পাবে সে তার
যোগ্য অধিকার॥

গল্পের গল্প

শ্রীঅতীন মজুমদার

এক যে ছিল রাজা—

সে ছিল ভারী চতুর আর লোভী। দিনরাত্তির কেবল টাকার চিন্তাতেই মশগুল হয়ে থাকত। টাকা পেলেই খুশী। তাই সব সময়েই টাকার জন্যে প্রজাদের ওপর জুলুম চালাত। নিত্য-নতুন ফন্দী আঁটত, বার-মাসে-তেরো-আইন তৈরী করত আর সেই আইনের প্যাচে পেঁচিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। যারা টাকা দিতে পারত না, রাজাকে তার ন্যায্য-প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এই অজুহাতে তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হ'ত।

কিন্তু এমনি আর কদ্দিন চলতে পারে? রাজার জুলুমবাজিতে প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল। তারা নিজেরাই দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না, পরনে কাপড় নেই তো রাজাকে টাকা যোগাবে কোত্থেকে। শেষে যখন হাজার জুলুম ক'রে, নতুন নতুন আইন করেও প্রজাদের কাছ থেকে কাণাকড়িও মেলে না, তখন রাজা এক নতুন মতলব আঁটল: যে তাকে গল্প শোনাতে পারবে, সে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। তবে সর্ত এই—গল্প নতুন হওয়া চাই। রাজার যদি সে গল্প জানা থাকে, তবে যে গল্প শোনাতে আসবে, তাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।

রাজার লোকেরা দেশ-বিদেশে গিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একথা ঘোষণা করে এল।

টাকার লোভ বড় লোভ। দেশ-বিদেশ থেকে তাই লোভে পড়ে কত যে লোক এল রাজাকে গল্প শোনাতে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু আগেই বলেছি, রাজা ছিল ভারী চতুর। প্রথমে গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে নিত। তারপর চালাকি ক'রে বলত আরে এই গল্প! এ তো আমি অমুক দিনে অমুক লোকের কাছে শুনেছি। এ আর নতুন কি?

যারা গল্প শোনাতে আসত, তারা রাজার একথা শুনে কি আর করে! রাজ্যে বসে তো আর রাজার সঙ্গে ঝগড়া বা তর্ক করা চলে না! তাছাড়া রাজার মতলবটাও তারা ধরতে পারত না। ফলে দশ হাজার টাকা দণ্ড দিয়ে তাদের ফিরে যেতে হ'ত।

শেষে একদিন অনেক, অ-নে-ক দূরের এক রাজ্য আজবপুর থেকে সেখানকার রাজা এল গল্প শোনাতে। তার সঙ্গে এল আরো দু'জন লোক। ইয়া মোটা আর ইয়া লম্বা একটা খাতা তাদের হাতে। খাতাটা বহু পুরানো। সাতপুরু ময়লা জমে জমে সে খাতাটা হয়ে গেছে কালো কুচকুচে। তাতে কি সব হিজিবিজি হিসেব লেখা।

আজবপুরের রাজা যখন তার দু'জন সঙ্গী সমেত রাজসভায় ঢুকল, তখন রাজা বসে বসে পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে নতুন মতলব আঁটছে। আজবপুরের রাজা প্রথমে তার পরিচয়

দিল, তারপর তার উদ্দেশ্য জানাল। রাজা শুনে তো খুব খুশী। একটু পরেই তো গল্প শেষ হলে দশ হাজার টাকা লাভ হবে। তাই সে আজবপুরের রাজাকে খাতির করে বসতে দিল আর তার দু'জন সঙ্গীকেও বসতে বলল।

এবার সুরু হ'ল গল্প। আজবপুরের রাজা বললেন: আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমি সৎ, তেমি প্রজাপরায়ণ। এ ছাড়া তার আরো গুণ ছিল। তিনি ছিলেন মস্ত বড় বীর এবং শিকারী।

একবার তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন। সেই অবসরে তাঁর রাজ্য থেকে সাড়ে চুয়াত্তর লক্ষ যোজন দূরে উদ্ভটপুর নামে এক রাজ্য থেকে প্রায় ছ'-শ' অশ্বারোহী এক গভীর রাত্রে এসে তার রাজ্য আক্রমণ করল। তারপর রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের ধন-দৌলত সম্পত্তি লুঠ করে, চার-শ' প্রজাকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় রাজার কোষাগারও লুঠ করতে ভুলল না তারা।

দিন পনের পর রাজা শিকার থেকে ফিরলেন। ফিরেই রাজ্যের অবস্থা দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির! একি! একটিও সৈন্য বেঁচে নেই! নিরীহ প্রজারা পথের ভিখিরী হয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। যে চার-শ' প্রজাকে তারা ধরে নিয়ে গেছে, তাদের বাপ-মা ছেলেমেয়েদের বুক-ফাটা কান্নায় রাজ্যের পশু-পাখিও কাঁদছে। কোষাগার শূন্য—একটি কপর্দকও নেই।

রাগে-দুঃখে-অপমানে রাজা বিরাট এক চিঠি লিখলেন উদ্ভটপুরের রাজার কাছে: আপনার রাজ্যের যে ছ-শ' জন অশ্বারোহী আমার রাজ্যে এসে হামলা করেছে, তাদের অবিলম্বে বন্দী করে আমার কাছে পাঠান। আমার যে চারশ' প্রজাকে তারা বন্দী করে নিয়ে গেছে, তাদের মুক্তি দিন। আমার কোষাগার লুঠ করার জন্যে নব্বই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা এবং প্রজাদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করার জন্যে চল্লিশ কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিন। এ ছাড়া গভীর রাতে অতর্কিত আক্রমণ ক'রে অন্যায় যুদ্ধে আমার এক হাজার ন'শ তিপ্পান্ন জন সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছে। এদের জন প্রতি প্রাণের মূল্য স্বরূপ দশ হাজার টাকা পত্রপাঠ পনের দিনের মধ্যে আমার কাছে পাঠান। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

দেখতে দেখতে পনের দিন কেটে গেল। কিন্তু উদ্ভটপুরের রাজার কোনো সাড়া-শব্দই নেই। আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। শেষে তেইশ দিনের মাথায় উদ্ভটপুরের রাজার এক চিঠি এল। সেই চিঠিতে কোনো কিছু লেখা নেই, শুধু কাঁচকলার ছবি আঁকা। চিঠি দেখে তো রাজা চটে লাল!—বটে! এত বড় আস্পদ্দা! সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেল্লেন।

'এই হ'ল আমার গল্প—এ আপনি শুনেছেন কি ?'

কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করলেই তো আর হ'ল না। উদ্ভটপুর বিরাট রাজ্য, তার সৈন্য-সামন্ত কত। তার সঙ্গে যুদ্ধ করা কি চাট্টিখানি কথা! প্রচুর সৈন্য-সামন্ত চাই —চাই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, চাই টাকা। আর্ধেক সৈন্য তো মারাই গেছে অশ্বারোহীদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে!—আর টাকা—? রাজ্যের কোষাগার তো শূন্য!

আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। তাই তিনি এসে তাকে ধরলেন। তিনি রাজাকে তিন-শ' বিরানব্বই কোটি টাকা, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য এবং পঞ্চাশ কোটি দশ লক্ষ টাকার অস্ত্র ধার দিলেন। এ ছাড়া এক হাজার হাতীও দিলেন। সর্ত রইল: রাজা যদি যুদ্ধে জেতেন তবে বাৎসরিক শতকরা দু'টাকা হারে সুদ দিয়ে সব শোধ করে দেবেন। যত পদাতিক সৈন্য দিলেন, তাদের কেউ যদি যুদ্ধে মারা যায়, তবে জন প্রতি দশ হাজার টাকা, অশ্বারোহীদের মধ্যে কেউ মারা গেলে জন প্রতি বার হাজার টাকা, প্রতিটি অশ্বের জন্যে এক হাজার টাকা এবং হাতীর জন্যে পনের হাজার দেবেন। আরো সর্ত রইল: রাজা যদি যুদ্ধে জেতেন এবং ধার শোধ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়, তবে তার বংশধররা সুদ সমেত এই ধার শোধ করবেন।

যথারীতি খাতাপত্তরে এই সব লেখা হ'ল এবং রাজা সই করলেন।

তারপর রাজা তো যুদ্ধে গেলেন। প্রায় এগার মাস উনিশ দিন সাড়ে ছ' ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল। সে কি ভীষণ যুদ্ধ! শেষে রাজারই জয় হ'ল। তবে তিনি যুদ্ধে জিতলেও তাঁর প্রচুর ক্ষতি হ'ল। যত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে গিছলেন, তার মধ্যে মাত্র একশ' দু'জন পদাতিক সৈন্য, বাহান্ন জন অশ্বারোহী ও তেরটা হাতী ছাড়া সকলেই মারা পড়ল।

ঐ যুদ্ধের পর রাজাও আর মাত্র দু'মাস বেঁচেছিলেন। কারণ যুদ্ধে অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। এদিকে আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ঐ যুদ্ধ চলাকালীনই মারা যান। তাই ঐ ধার আর শোধ হয় না, রাজার বংশধরেরাও কেউ আজ পর্যন্ত শোধ করেন নি। খাতাতেই ঐ ধারের কথা লেখা রইল এবং চক্রবৃদ্ধি হারে তার সুদও বাড়তে থাকল। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বংশধরেরাও রাজকাজের নানা ঝামেলায় ব্যস্ত থাকায়, এতদিন ঐ খাতাখানা খুলে দেখার সময় পাননি।

এই বলে আজবপুরের রাজা থামল। তারপর প্রশ্ন করল,—মহারাজা, এই হ'ল আমার গল্প—এ আপনি শুনেছেন কি?

চতুর রাজা তক্ষুনি জবাব দিল,—আরে, এ গল্প তো ছোটবেলায় আমার ঠাকুমার মুখে শুনেছি।

শুনেছেন?—আজবপুরের রাজা বলল—তা'হলে এতদিন ঐ ধার শোধ করেন নি কেন?

তার মানে?—ভুরু কুঁচকে চতুর রাজা প্রশ্ন করল।

আজবপুরের রাজা হেসে বলল: আজ্ঞে তার মানে অতি সোজা। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার কাছে যিনি ধার নিয়েছিলেন তিনি আপনারই ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা।

চতুর রাজার তো চক্ষুস্থির! হাঁ-করে আজবপুরের রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কোনো জবাব না পেয়ে আজবপুরের রাজা আবার বলল: তা'হলে মহারাজ, দয়া করে আজ্ঞা করুন, খাতাখানা সঙ্গে এনেছি, আমার দু'জন হিসাবনবিসও এসেছে, তারা এই সাড়ে তিনশ' বছর ধরে ঐ ধার সুদে-আসলে কত হ'ল তা' ক'ষে আপনাকে জানিয়ে দিক।

এ কথা শুনেই চতুর রাজার মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা হ'ল। কোন রকমে বুদ্ধি খরচ করে আমৃতা আমৃতা করে সে বলল: এখন তো রাজসভা ভঙ্গ হওয়ার সময় হয়ে এল। এ হিসেব করতে তো সময় লাগবে। আপনি বরং এদের হিসেব করতে বলে দিন—কাল না হয় শুনব। এই বলে চতুর রাজা রাজসভা ত্যাগ করে কোন রকমে অন্তঃপুরে পালিয়ে বাঁচলেন। আজবপুরের রাজাও তখন হাসতে হাসতে তার দু'জন সঙ্গী ও খাতাসমেত রাজসভা ত্যাগ করে নিজের রাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন।

আসলে আজবপুরের রাজা ঐ চতুর রাজার কথা, তার প্রজাদের ওপর টাকার জন্যে জুলুমের কথা অনেক আগেই শুনেছিলেন। তাই তাকে জব্দ করার জন্যেই এই গল্পটা ফেঁদেছিলেন।

পরদিন দেখা গেল, ঐ চতুর রাজা ধার শোধ করার ভয়ে রাজ্য ছেড়ে কোথায় যে পালিয়েছে তার পাত্তাই নেই!

ফলে ঐ রাজার ছেলে রাজা হ'ল। সে ছিল খুবই সৎ। প্রজাদের ওপর জুলুম করা সঞ্চিত টাকার সমস্তই সে সমান ভাগে ভাগ করে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিল। প্রজারাও মন-প্রাণ দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করল। রাজ্যে সুখ-শান্তি ফিরে এল। *

বাংলার একটি প্রাচীন উপকথা অনুসরণে

ছোট পীসির ভাগনে

শ্রীরুণু চট্টোপাধ্যায়

ছোট পীসিকে আমরা সবাই ভালবাসতাম। ছোট পীসি আমাদের চেয়ে বড় ছিলো না বেশী। বিয়ের পর কমই আসতো আমাদের বাড়িতে। যখনই আসতো কাঁদতো ঠাকুমার কাছে বসে বসে।

ওর এক ভাগনে ছিলো, শাশুড়ীর খুব আদরের নাতি। তার জন্যে সব সময়ে ওকে কথা শুনতে হতো। ছোট পীসি মাটির এ্যাসট্রে, রেকর্ড ভাঙা দিয়ে ফুলদানী, মাটির থালায় ছবি আঁকা, এই সব করতো। আর যখন শেষ হতো ওর শাশুড়ী তখন সবাইকে দেখিয়ে বলতেন, 'টুবলু তৈরি করেছে।' টুবলু শাশুড়ীর সেই আদুরে নাতির নাম। পীসির এই সব কথা শুনে খুব দুঃখ হতো।

একদিন সন্ধেবেলা এসে ছোট পীসি ঠাকুমার কাছে খুব দুঃখ করছিলো, কাঁদছিলো। আমি আর কাজল মাঝে মাঝে এসে শুনছিলাম আর ভীষণ রাগ হচ্ছিল আমরা কিছু করতে পারি না বলে। ছোট পীসি যাবার সময় বলে গেল, 'আমায় আর আসতে বোলো না তোমরা, ওরা বাপের বাড়ি আসাও পছন্দ করে না।'

রাত্তিরে আমি আর কাজল শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ প্ল্যান করলাম। কিছুই মাথায় আসে না। ভোরে কাজল ঘুম থেকে উঠে বললো, 'আমার একটা বুদ্ধি এসেছে, তোকে শোনাই।' তারপর কাজল ওর প্ল্যানটা বললো। প্ল্যানটা আমার খুব পছন্দ হলো।

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই ঠাকুমার কাছে গেলাম। বললাম, 'ভয়ানক মাথা ব্যথা করছে। একটা কোডোপাইরিন আছে?'

কোডোপাইরিন নিয়ে আবার শুতে চলে গেলাম।

একটু পরেই কাজল ঠাকুমার কাছে গিয়ে বললো, 'ভয়ানক পেট ব্যথা করছে আর গা বমি-বমি করছে। জোয়ানের আরক দিতে।' একটু বেলা হতে বাড়িসুদ্ধ সবাই জানলো আমাদের দু'জনের শরীর খারাপ হয়েছে। মা অবিশ্যি বলছিলেন শুনলাম, 'নিশ্চয়ই ওদের ক্লাসওয়ার্ক আছে, তাই এইসব শরীর খারাপের ছুতো। আজ ওদের ঝোল-ভাত ছাড়া আর কিছু দেওয়া হবে না।'

দুপুরে বাড়িটা যখন নিঝুম হয়েছে, তখন আমরা দুই ভাই-বোন নীচে টেলিফোনের ঘরে গেলাম। টেলিফোনে তালা লাগানো। আমরা ভাই-বোনেরা হরদম টেলিফোন করি বলেই এই তালা। কিন্তু ট্যাপ করেও যে ফোন করা জায় তা আমাদের গুরুজনরা জানতেন না। ট্যাপ করেই ছোট পীসির বাড়ি ফোন করলাম।

কয়েকবার ফোনটা বাজার পর খুব বিরক্ত গলায় পীসির শাশুড়ী ফোন ধরলেন। বললেন, 'হ্যালো! কাকে চাই?'

'এটা কি ব্যারিষ্টার সেনের বাড়ি? জগবন্ধু স্কুলের কাছ থেকে বলছি, টুবলু কি আপনার নাতি'···কাজল গলা মোটা করে বললো আর আমি পাশ থেকে সমানে বলতে লাগলাম, 'এ্যাক্সিডেন্ট, এ্যাক্সিডেন্ট!' টেলিফোনে শুনলাম পীসির শাশুড়ী চেঁচাচ্ছেন, 'ওরে আমার কী সব্বোনাশ হলো রে···!' আমরা টেলিফোন কেটে দিয়ে পীসির বাড়িতে যাবার জন্যে বেরুলাম।

ওদের বাড়িতে পৌছে দেখি সারা বাড়ি লোকে ভরে গেছে।

আমরা যেন কিছু জানি না এমনি ভাব করে বললাম, 'কী ব্যাপার? এতো ভিড় কেন?'

দেখলাম বারান্দায় কপাল ফুলে-ওঠা, কালশিটে পড়া ছোট পীসির শাশুড়ীকে। এলো-মেলো অবস্থায় বসে আছেন। ছোট পীসি মাথায় হাওয়া করছে, অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছেন। 'কী হয়েছে?' আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

আমাদের দেখে ছোট পীসির শাশুড়ী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'ওরে আমার কী সব্বোনাশ হয়েছে রে, টুবলুর এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাস্তা থেকে লোকে খবর দিয়েছে। ইস্কুলে গাড়ি করে গিয়েছিলাম। হেড মাষ্টার বললেন, ১টার সময় সে শরীর খারাপ করছে বলে চলে গেছে। তারপরই এ্যাক্সিডেন্ট!'

আমরাও হকচকিয়ে গেলাম। কি রে বাবা, সত্যিই এ্যাক্সিডেন্ট হলো নাকি?

হাসপাতালে, থানায় ফোন করা হয়েছে। ব্যারিষ্টার সেন নিজেই গেছেন হাসপাতালগুলো দেখতে। আমরা ঐ অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ঠাকুমাদের ফোন করে দিলাম। আমাদের বাড়ির সকলেও এসে গেলেন।

আমরা ব্যস্ত হয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছি। এমন সময় প্রায় পৌনে ছ'টা নাগাদ টুবলুকে রাস্তার মোড়ে দেখা গেলো। আমরা দৌড়ে গেলাম।

'কী ব্যাপার? কোথায় ছিলে?' উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগগেস করলাম আমরা।

চোখ টিপে টুবলু বললো, 'সিনেমায়, বড়দের বই বুঝলে? বাড়িতে বোলো না যেন। আমি বলবো স্পেসাল ক্লাস ছিলো।'

আমরা বললাম, 'এসব কথা কেউ বলে নাকি? আমরাও তো হরদম এরকম করি।'

গেটের ভেতর ঢুকে টুবলু বললো, 'এত লোক কেন রে?' সঙ্গে সঙ্গে ছোট পীসির শাশুড়ী দেখে ফেললেন টুবলুকে।

'ওরে এলি ? কোথায় লেগেছে বাবা, আয় দেখি।'

'আঃ! চেঁচাচ্ছ কেন দিদা! স্পেশাল ক্লাস ছিলো যে, কী করবো তাই দেরি হলো।' টুবলু বিরক্ত হয়ে বললো। আর সেই গলা শুনে যা কখনো হয় না, টুবলুর মামা মানে আমাদের পীসেমশাই টুবলুর কানটি ধরে কসকসে করে মুলে দিয়ে বললেন, 'বাঁদর, বাড়ি-সুদ্ধু সবাই এ্যাক্সিডেন্ট ভেবে অস্থির, আর তোমার এই বাঁদরামো। কোথায় ছিলি বল ?'

'টুবলুর কানটি ধরে কসকসে করে মুলে দিয়ে বললেন—কোথায় ছিলি বল ?'

আমরা এগিয়ে গেলাম টুবলুর অবস্থা দেখে। কারণ টুবলু ছেলেটা খারাপ ছিলো না। বললাম, আমরা ওর অঙ্কের স্যারের বাড়ি থেকে ওকে ডেকে এনেছি, ওখানে ছিলো ও'। পীসেমশাই গর্জন করে বললেন, 'তবে স্কুলে কেন শরীর খারাপ বলে বেরিয়েছিলো ?'

'ঐ অঙ্কের ক্লাসে যাবে বলেই।' কাজল বললো।

সন্ধ্যেবেলা আমাদের অনেক খাওয়ালেন ছোট পীসির শাশুড়ী। বাইরের ঘরে একটা মাটির ফুলদানীর ওপরে নক্সা আঁকা দেখে আমরা বললাম, 'চমৎকার হয়েছে, কে এঁকেছে ? টুবলু নাকি ?'

ছোট পীসির শাশুড়ী বললেন, না, ওটা আমার বৌমা এঁকেছে। যাও বৌমা, আজ বাপের বাড়ি থেকে এসো।'

রাত্তিরে যখন সবাই খেতে বসেছি তখন মা বললেন, তোমরা শরীর খারাপ নিয়ে হঠাৎ ও বাড়িতে দুপুরে গেলে কেন ? তার আগে কোনের ঘরেই বা গিয়েছিলে কেন ?

ছোট পীসি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমাকে বাঁচাবার জন্যে।

বিশ্বকর্মা পূজা

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

[বিশ্বকর্মা স্বর্গের দেবতাদের ইঞ্জিনীয়ার। তিনি তাঁদের ঘর-বাড়ীর নক্সা তৈরি করেন, কল-কারখানা ও কামারশালার তদ্বির করেন, যুদ্ধ বাধলে অস্ত্র-শস্ত্র করিয়ে দেন। এ৽ ছাড়া শুনেছি যে, আবার বৎসরান্তে পৃথিবীতে এসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি ঘুঁড়িও উড়িয়ে যান।]

ওই এলো রে বিশ্বকর্মা
ঘুড়ি লাটাই হাতে
খোকাখুকু ভিড় করেছে
বাড়ীর ছাদে ছাদে।
ভাঙা কাচের টুকরো নিয়ে
সবার কাড়াকাড়ি,
গুঁড়িয়ে তাকে চিঁড়ের সাথে
করছে মাড়ামাড়ি॥

আধেক সাদা আধেক কালো
'মুখপোড়া' নাম তার,
তার জোড়াটি কিনতে গেলে
মেলা হবে ভার।
লাল, সবুজ, বেগ্‌নে, নীল
হলদে সাদা কালো,
'পেট কাট্টা' আর 'চাঁদিয়াল'
নামগুলি সব ভালো॥

মাঞ্জা দেবে সুতোর গায়ে
সর রে ওধার সর,
হাওয়ায় ভাসে কাটা ঘুড়ি
ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌।
সকাল থেকে ছেলে-বুড়োর
কত রকম কাজ,
চান করা, খাবার খাওয়ার
ফুরসত নেই আজ॥

'ভো-মারা' ও 'ভো-কাট্টা'
শুনি কোলাহল,
'সুতা ছাড়ে না জুতা খায়'
হাঁকে আর এক দল।
রকমারি উড়ছে ঘুড়ি
হাওয়ায় ভেসে ভেসে
হাল্লা করে কুঁচোরা সব
হা হা হি হি হেসে॥

ট্রামের তারে আট্‌কে গিয়ে
কাটা ঘুড়ি ওড়ে,
লগি হাতে ছেলে-বুড়ো
মুখ থুবড়ে পড়ে।
বটগাছে ওই আটকেছে রে
জোড়া ঘুড়ি দুটি
মরিয়া হয়ে চল ছুটে যাই
মগডালেতে উঠি॥

হাত পা ভেঙে পড়ি যদি
নেই কো ক্ষতি তাতে,
কোমর ভেঙেও সুখ পাবো ভাই
পেলে ঘুড়ি হাতে।
উড়িয়ে ঘুড়ি বিশ্বকর্মা
ফিরে গেলেন দেশে,
ছোটরাও সব ফিরলো ঘরে
কেউ কেঁদে, কেউ হেসে॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(৭)

এতদিন আহ্লাদী আর জল্লাদী রাজাকে যতরাজ্যের আজব কথা বলে ভুলিয়ে, তার ভাল ভাল খাবার গপাগপ গিলেছে। তাদের মুখে দত্যিদানা, ভূতপেত্নী, রাক্কোস-খোক্কোস ও আজগুবী রাজরাজড়ার গল্প রাজা হাঁ করে শুনেছে। আর সেই ফাঁকে তার মুখে তারা গুঁজে দিয়েছে ওঁছা পচা জিনিস। তাতে রাজা খোঁচাখুঁচি করেনি।

কিন্তু কোত্থেকে কবিরাজ যেন বাজপাখীর মত উড়ে এল! এসে তাদের চালাকির প্যাঁচ খ্যাচ করে কেটে দিল। তাদের এদ্দিনের মজা তছনছ হয়ে গেল!

রাজা রোগা হচ্ছে বলে তাকে গুচ্ছের বিতিকিচ্ছি ওষুধ খাওয়ান আচ্ছা কথা। কিন্তু তাদের জন্য হাড়পিত্ত জ্বালান তেতো ওষুধ ব্যবস্থা করায় তারা আঁতকে ওঠে।

শুধু তাই নয়। কোবরেজ রোজ এসে খোঁজ করে। বাজপড়ার মত আওয়াজে কৈফিয়ৎ করে। বলে, "রাজাকে গণেশ ঠাকুরের মত গোলগাল না করলে তাদের কপালে শুঁয়োপোকা বড়ি আছে।" চমকান নাম শুনে তাদের গা চুলকায়। তখন কি আর করা? তারা জিভ সামলে রাজাকে এবার ভাল খাবার খাওয়ায়।

নিজেদের চেহারা আর চালচলনে মিল না থাকলেও, এবার তারা হাত মেলায়। বলে, "আয় সই পাতি।"

রাজার খাবার চুরি করে খেতে তাদের ঝগড়াঝাটি হ'ত। কিন্তু আজ বেকায়দায় পড়ে তারা খিটিমিটি মেটাতে রাজি।

জল্লাদী তার জল্লাদের মত গোল গোল চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি দিয়ে সই পাতবি লা ?" আহ্লাদী তার আহ্লাদে মুখ কাত করে বলে, "চুল ছড়িয়ে।"

তার মাথায় অনেক চুল, জল্লাদীর বেলা বিশ্বকর্মা ভুল করে তা মাথার বদলে দিয়েছে তার গায়ে। সে মুলোর মত দাঁত দেখিয়ে গলায় ঢাক বাজিয়ে শোনায়, "উহু, গল্‌গা (গঙ্গা) জল চাই। তার ব্যাঙের মত নাকে ন ল শোনায়। তখন তারা দুটিতে জোট পাকিয়ে পুকুরের ঘাটে নাবে। ঘটা করে এক ঘটি জল বয়ে আনে। তাতে গোটাকতক ধানদুর্বা, বাটা চন্দন আর দৈ ছিটায়। তারপর তা সাক্ষী করে সই পাতায়। খেংরাকাঠির মত আহ্লাদী আর গণ্ডারের মত জল্লাদী ঝগড়ার ধুলোকাদা যেন এক পাপোষে পুছে আপোষ করে!

রাজা মোটাসোটা হয়, কিন্তু তাকে সামলান যায় না। সে বাঁধাবাঁধিতে আর রাজি হয় না। চড়ে-বড়ে বেড়াতে চায়। শুধু তাই নয়। আহ্লাদ বেড়েই চলে। সে বলে "হাতি হও, ঘোড়া হও আর যে জন্তুই হও পিঠে চড়ব।"

রাজার আবদার! তারা চার হাত পায়ে ঘোড়া হয়, হাতি হয়।

রাজা এখন ফুলে হোঁৎকা হয়েছে। ঐ ওজন নিয়ে রোগা আহ্লাদীর পিঠে বসে। তার বেণী ধরে লাগাম বানায়। তারপর বলে, "ঘোড়া হেঠ হেঠ।"

তখন আহ্লাদী কাৎ হয়ে রাজাকে ফেলে দেয়। রাজা বলে, "ফেলে দিলে যে!"

আহ্লাদী বলে, "ঘোড়া ছুটলে অমন হয়।"

তখন সে জল্লাদীর পিঠে চড়ে। সে হাতি। তার মাথায় গুঁতো মেরে বলে, "চল।" জল্লাদী তার কান ধরে নাবায়। রাজা বলে, "কান ধরে নাবালে যে।"

জল্লাদী বলে, "হাতির শুঁড় আছে কি জন্য ? রাজাকে, অমল লা (অমন না) করলে কি মাল্য (মান্য) হয় ?"

তাও তো বটে! তখন সে খেলা ছেড়ে রাজা বলে, "পাল্কী চড়ব।" আহ্লাদী আর জল্লাদী হাত ধরাধরি করে পাল্কী বানায়। রাজা পা ঝুলিয়ে বসে। তারা "হেইও হেইও" করে পাল্কী বয়। রাজা পাল্কীতে বসে নাচে। রাজার ভারে হাত ছিঁড়ে যেতে চায়। তারা নাবাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সহজে রেহাই দেবার ছেলে রাজা নয়। নাচে আর বলে, "হেইও বল।" আহ্লাদী আর জল্লাদী এ ওর মুখ চায়। তারপর একসময় হাতের শেকল আল্‌গা করে। আর রাজা ধপাস করে নিচে পড়ে। তারপর ভ্যাঁ করে চেঁচায়।

আহ্লাদী আর জল্লাদী বোঝায়, রাজা খুব ভারি বলে পাল্কী ভেঙ্গে গেছে। দেখেছ—মেঝে ফেটে গেছে। এখন কি হবে?"

রাজা দেখে সত্যি মেঝে ফাটা দাগ! ওদের আঁটসাট চালাকী মেনে নেয়। নেয় বটে, কিন্তু তার হাঁদা মাথায় দুষ্টুমীর পাখসাট মারে।

মহারাণীর মাথায় একরাশ চুল। কুড়েমী করে তা শুকোয় না। উকুন জমে। একটা দুটো নয়,—অনেক। তা কুট্ কুট্ করে কামড়ায়, আর মহারাণী দু'হাতে মাথা চুল্‌কে কূল পায় না। আহ্লাদী আর জল্লাদীকে বলে, "তোরা দু'জনে আছিস্ কি জন্য?"

আহ্লাদী আহ্লাদ করে বলে, "তোমার মহল ধন্য করতে রাণীমা।" মহারাণী মুখ ঝামটা মেরে বলে, "খুব তো কচ্ছিস। আমার মাথায় উকুন পড়েছে। কুলের শত্রু শকুন আর চুলের শত্রু উকুন। মাথা চুলকে মরি জল্লাদী বলে, "অত চুল রাখতে লেই (নেই) রালীমা (রাণীমা)। লাপিত (নাপিত) ডেকে কেটে ফেল। চুল কালো আর উকুল (উকুন) কালো,—ভালোয় ভালোয় মিশে আছে! তাই চুলকায়।"

মহারাণী রেগে যায়। গলা চড়িয়ে বলে, "হ'ত তোদের মাথায়, বুঝতিস। কামড়ে নাচায়।"

আহ্লাদী হাল্‌কা গলায় বলে, "এট্টু নাচ না রাণী মা, দেখি।" মহারাণী তার চুল টেনে বলে, "আয় তোকে দেখাই।" আহ্লাদী বলে, "দেখেছি, দেখেছি। দিচ্ছি উকুন মেরে।"

মহারাণী জলচৌকিতে বসে। আর আহ্লাদী জল্লাদী আঙুলে চুল ফাঁক করে উকুন তোলে। বাঁ হাতের বুড়ো নখে রেখে, ডান হাতের নখের চাপ দেয় আর পুট্ করে শব্দ হয়। রাজা শুনে বলে, "কিসের শব্দ?"

জল্লাদী বলে, "উকুল মারার।"

রাজা বলে, "আমি উকুন দেখব।"

জল্লাদী বলে, "হাত পাত।"

রাজা হাত পাতে। জল্লাদী তার হাতে দিয়ে বলে, "দেখ কত বড় উকুল। কাছিমের মতল (মতন)।"

রাজা বলে, "দূর। এটা তো ছোট্ট। কাছিমের মত একটা দাও।"

আহ্লাদী বলে, "আহা রে! এর চেয়ে বড় উকুন নেই।"

রাজা বলে, "মের না। আমি পুষব। কাছিমের মত বড় করব।"

রাজা উকুন শিশিতে রেখে ছিপি আটকায়।

কিন্তু আহ্লাদী আর জল্লাদী অত উকুন দিতে চায় না।

বলে, "উকুনকে ভাল বাসতে নেই। ওরা ছিপি খুলে ভালবাসা খুঁজবে। আবার আমাদের মাথায় এসে ভাল বাসা বেঁধে কুটুস্ কুটুস্ করবে।"

ওরা শিশি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। রাজা রেগেমেগে শিশি নিয়ে ভেগে যায়।

মাঝ রাতে খাই খাই করে রাজার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কোবরেজ তার রাক্ষুসে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রাত্তিরে যা খায় তা একটিপ নস্য। তাই মাঝ রাতে ক্ষুধায় তার ঘুম ভাঙ্গে। উকুনের শিশি শিয়রে করে সে ঘুমিয়েছিল। খাবে বলে সেটা খুলে দেখে তা উকুন। তা' তো আর খাওয়া যায় না। হঠাৎ মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল। আহ্লাদী জল্লাদী শিশি নিয়ে তার খেলা বাতিল করেছে। ওদের জব্দ করার এ মস্ত সুযোগ। সে কান খাড়া করল।

পাশের ঘরে আহ্লাদী আর জল্লাদী শোয়। ঘুমিয়ে ওদের দু'জনের নাক ডাকে। একজনের নাকে টিকাড়া-নাকাড়া আর একজনের নাকে শানাই বাজে। কার নাকে কি বাজে রাজা তা চিনে নিয়েছে।

রাজা পা টিপে নাবে। ওদের জব্দ করাব ফুর্তিতে পেট-ভর্তি ক্ষিধে সে ভুলে যায়। চুপি চুপি ও ঘরে গিয়ে শিশির ছিপি খোলে। তারপর সব উকুন গুণে গুণে ভাগ করে আহ্লাদী আর জল্লাদীর চুলে ছেড়ে দেয়। দিয়ে তার কি হাসি! কিন্তু ওরা টের পায় না। একজন হাঁ ক'রে, আর একজন মুখ বাঁকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। এক এক রকম ঘুমে তারা এক এক রকম বাজনা বাজায়। যারা বাজনা ভালবাসে তারা তাদের কাছে ব'সে, খাজনা না দিয়ে শুনে যেতে পারে। এবার আহ্লাদীর নাকে বাজছিল 'ফ্যাত ফ্যাত ফ্যাঙ' আর জল্লাদীর নাকে 'ফোঁ ফোঁ ফ্যোঙ।'

রাজা উঁকি দিয়ে দেখে ওদের নাকে কোলাব্যাঙ লুকিয়ে আছে কিনা। তা নেই।

এবার আহ্লাদী আর জল্লাদী পাশ ফিরে মুখোমুখি হয়ে শোয়। মনে হয়, ঘুমের মধ্যে ওরা দু'জন শাসাচ্ছে। এ বলে, "আয় দিকি!" ও বলে, "চুল ছিঁড়তে ডরাই নাকি?"

রাজা খালি শিশি নিয়ে বিছানায় ফিরে যায়। তারপর খিল্‌খিল্ করে হাসে। মহারাণীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। বলে, "কি হ'ল খোকন?"

রাজা হাসি চেপে বলে, "স্বপ্ন দেখলেম মনের মতন। তোমার মাথায় উকুন আহ্লাদী আর জল্লাদীর মাথায় চলান করে দিচ্ছি।" মহারাণী বলে, "আহা এমন স্বপ্নের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক!"

(৮)

সত্যি স্বপ্নের মুখে ফুল-চন্দন পড়ে। ঘুম থেকে উঠে আহ্লাদী আর জল্লাদী মাথা চুলকোয়, আর ধেই ধেই নাচে!

মহারাণী, "কি হ'ল লা? নাচ শিখছিস?"

জল্লাদী বলে, "লয়, লয়। উকুল।" (নয়, নয়। উকুন) আহ্লাদী বলে, "ঘুমুবার আগে ছেল না, রাণীমা! জেগে দেখি কিনা—"

মহারাণী বলে, "ঘুমের মধ্যেই ধুমধাড়াক্কা হয়। রাজার রাজত্বে বাস। যুদ্ধ, লড়াই, দিক্বিজয় (দিগ্বিজয়)! কোন্ রাজ্যির উকুন দিগ্বিজয়ে এল কে জানে?"

শুনে ওরা ভয় পায়। উকুনের দিগ্বিজয়,—ওরে বাবা রে! আহ্লাদী মাথা নেড়ে বলে, "সব্বোনাশ! শোলোক আছে—উকুনের শোকে কাগাটি-বগাটি নদী ঘোর—"

তখন মহারাণীর সভা বসে। মহারাণী বলে, "আহ্লাদী জল্লাদী—"

ওরা বলে, "কি রাণীমা?"

মহারাণী বলে, "এক কাজ কর—"

ওরা বলে, "কি কাজ রাণীমা?"

মহারাণী বলে, "একজন আর একজনের উকুন তোল।" ওরা দু'জনে ফোঁস করে ওঠে। বলে, "ঈস্, দাসী-বাঁদী নাকি? ওর মাথায় উকুন তুলব!"

তাও তো কথা! তারা মহারাণীর দাসী-বাঁদী। একজন আর একজনের নয়। তখন মহারাণী বলে, "সোডা আর গরমজলে চুল সেদ্দ কর।"

ওরা বলে, "বাবা রে, চুল সেদ্দ হয়ে মাথাসুদ্ধ পুড়ে যাবে।" মহারাণী বলে, "তা হলে কেঁচি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কেটে দে।" জল্লাদীর তাতে আপত্তি নেই। তার জট-পাকান খাটো চুল। তা, থাকলে যা, গেলেও তা। তার মাথা মুড়োতেও আপত্তি নেই। ঘোল না ঢাললেই হ'ল।

কিন্তু আহ্লাদীর আপত্তি আছে। তার মথায় অনেক চুল। মহারাণী যখন ঘুমিয়ে থাকে, সে তার সুগন্ধী তেল নিজের চুলে মাখে। আর শিশিতে সস্তার নারকেল তেল মিশিয়ে পুরো করে রাখে। মহারাণীর চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ায় আর নাক টেনে বলে "কি ম ম গন্ধ!" মহারাণী তার চুরি টের পায় না, বলে, "যা বলেছিস! আমার মাথার তেল তো!" এমন চুলের অনেক মায়া। তার সঙ্গে মিলিয়ে আহ্লাদী মেঘ রঙের শাড়ী, সায়া পরে। জল্লাদীর সে বালাই নেই। সে চুল কামিয়ে ফেলে।

আহ্লাদী হাততালি দিয়ে বলে, "টিকি কৈ?"

জল্লাদী বলে, "আমি টিকটিকি লই (নই) যে লেজুর থাকবে।"

আহ্লাদী বলে, "তা নয়। এই মুখপোড়া হনুমান!"

"তবে রে!" জল্লাদী তাকে তাড়া দেয়। আহ্লাদীর হাল্কা শরীর। চোখের পলকে পালায়। আর জল্লাদীর মোটা শরীর। হোঁচট খেয়ে লুটোপুটি!

তারপর খেতে বসে তাদের আপোস হয়। জল্লাদী পেটুক, অনেক খেতে পারে। আর আহ্লাদী খায় বেছে বেছে। কিছু ফেলে দেয়। জল্লাদী বলে, "ফেলিস কেল (কেন) লা? লক্ষীর দালা (দানা) ফেলতে লেই।" আহ্লাদী বলে, "খেতে পারি না। কি করব?"

জল্লাদী ঢোক গিলে বলে, "কি করবি? দাল (দান) কর। দালের (দানের) মত পুল্যি (পুণ্যি) নেই। ধাল (ধান) ছড়ার মত পুল্যি হবে। ধল্য (ধন্য) হবি।"

এমন কথা! আহ্লাদী তাকে দেয়, জল্লাদী হাপুস-হুপুস করে খায়। খেয়ে খেয়ে আর উঠতে পারে না। বলে, "আহ্লাদী, বোলটি (বোনটি)। এত করলি, আর এট্টু উপকার কর।"

জল্লাদী বলে, "আরও! আর কিছু নেই। নুন খাবি?"

আহ্লাদী বলে, "আর খাব লা। খাবি খাচ্ছি। উঠতে পারছি না। ধরে তোল।"

খেয়ে খেয়ে জল্লাদীর ওজন বেড়েছে। হাত ধরে আহ্লাদী তাকে তুলতে পারে না। তখন দু'জনে বলে, "মার টান হেইও, সাবাস জোয়ান হেইও।"

তারপর হঠাৎ জল্লাদী উঠে পড়ে। আর তার ধাক্কা লেগে আহ্লাদী চিৎপটাং।

আপোস হয়ে গেছে। পান খেতে খেতে তারা ফিস্‌ফিস্ সলা পরামর্শ করে। আহ্লাদী বলে, "জান্‌লি জল্লাদী?"

জল্লাদী বলে, "কি গো ভাই আহ্লাদী?"

আহ্লাদী বলে, "ভালো কথা নয়।"

জল্লাদী চোখ গোল করে বলে, "কি হ'ল লা। মল্দ (মন্দ) কথা কি?"

আহ্লাদী বলে, "উকুনের কথা আর রাজার কথা। রাজা উকুন পোষে শুনেছিল?"

জল্লাদী নেড়া মাথা নেড়ে বলে, "উহু। লা তো (না তো)!

আহ্লাদী বলে, "রাজার ছেলে শিকার করবে, দিগ্বিজয় করবে, মানুষ মারবে-কাটবে। কিন্তু নিরামিষ! কোবরাজের কারসাজি!"

জল্লাদী বলে, "তা' হলে উকুন জমায় কেল? খায় লা?"

আহ্লাদী বলে, "দুর দুর। আমরা মারি বলে নিয়ে বাঁচায়। আবার কার মাথায় ছাড়ে কে জানে? বোষ্টম রাজা ভাল নয়, কি বলিস?"

জল্লাদী বলে, "লিচ্চয় (নিশ্চয়) ভগবান শক্ত পোক্ত দাঁত দিয়েছে কি জল্যি? মাছের মুড়ো আর মাল্‌স (মাংস) খেতে।"

আহ্লাদী ফিস্ ফিস্ করে বলে, "তাজা মাছ কোটা আর পাঁঠা কাটা দেখিয়ে ওকে হিংসা শেখা।"

তারা তাই করে। গল্প করে ভুলিয়ে জ্যান্ত মাছ কোটা, পাঁঠা কাটা দেখায়। কৈ, মাগুর মাছ আর পাঁঠা ধড়ফড় করে। গলগল করে রক্ত বেরোয়। শুরুতে রাজার কষ্ট হয়। চোখ বুজে বলে, "আহা অমন করে মের না।"

তারা বোঝায়, "মারি না। খাবার তৈরী করি। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, ময়দা চটকান দেখেছ তো? এও তেমন। ওরা কষ্ট পায় না। পেলে কাঁদত।"

তাও তো বটে! তবু রাজা জিজ্ঞেস করে, "রক্ত বেরোয় যে।" ওরা বোঝায়, মানুষ ছাড়া কারু রক্ত নেই। ওদের হ'ল গিয়ে লাল রং। ওরা লাল কালি খায় কিনা, তাই—"

হবেও বা! রাজা মেনে নেয়। আস্তে আস্তে সয়েও যায়।...রাজা আরও বড় হয়। ডাগর রাজার রগড়ে দাঁত। সে সব কিছু খেতে শিখেছে। এখন ছোট নেই। ছোটে, চলে, ডিগবাজি খায়, ডুগডুগি বাজায়। মহারাণীর আঁচল ধরে আর থাকতে চায় না। কিন্তু মহারাজার ছেলে তো। তার প্রজার সঙ্গে খেলতে নেই। কিন্তু সে আবদার করে, "মা, আমি খেলব।"

মহারাণী বলে, "খেলবে? বেশ তো!"

রাজার খেলার জন্য অনেক খেলনা আনা হয়। কাঠের মাটির হাতি, ঘোড়া, পাল্‌কী, নৌকা, ঘণ্টা। রাজা ক'দিন ঘটা করে খেলে। তারপর পুরানো হয়ে যায়। বলে, "নতুন খেলা খেলব।"

আসে বাঁশী, ভেঁপু, ডুগডুগি, ঢোল। রাজার বাদ্যে সবার কান ঝালাপালা। আহ্লাদী জল্লাদীর জ্বালা বাড়ে। রাজার পেছনে অষ্টক্ষণ মিসিল করে চল। কাঁহাতক পারা যায়। ওদের কানমলা খেতে ইচ্ছা হয়।

আহ্লাদী চালাক মেয়ে। রাজাকে অন্দর থেকে বার করার জন্য মহারাণীকে একদিন বলে, "ভাল হচ্ছে না, রাণী মা।"

মহারাণী বলে, "কি ভাল হচ্ছে না লা? পোলাউ না পরমান্ন?"

আহ্লাদী বলে, "রাজাকে আঁচল চাপা দিয়ে রাখা।"

মহারাণী বলে, "কে আঁচল চাপা দিচ্ছে লা? আহা বাছার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করবে যে।"

আহ্লাদী বলে, "ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব রাণী মা?"

মহারাণী বলে, "নির্ভয়ে বল।"

তখন আহ্লাদী চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলে, "তুমি রয়েছ রাণী মা। বাইরে যেতে দাও না, খোলা মাঠে খেলতে দাও না। রাজার ছেলের বীর হতে হবে, শিকার করতে হবে, দিগ্বিজয় করতে হবে। তবে তো সবাই জয় জয় করবে।"

(ক্রমশঃ)

রশিদুল হোসেন

আফ্রিকার কেনিয়ায় রুডলফ্ হ্রদের এক দ্বীপে এক জাতি বাস করে তাদের "৯৯" বলা হয়। কারণ গত দু'শ বছর ধরে খাদ্যের অভাবে এই জাতির সংখ্যা বাড়ছেও না, কমছেও না।

* *

আকাশ-পথে সর্বপ্রথম জিনিস পাঠান হয়েছিল ৯৫৫ বছর আগে। মিশরের খলিফা আজিজ চেরীফল সত্বর পাঠাবার জন্য আদেশ দেন। ৬০০ পায়রার সাহায্যে তাঁকে চেরীফল পাঠিয়ে এই নির্দেশ পালন করা হয়।

* *

পায়রাই একমাত্র পাখী যারা চুষে পান করতে পারে। অন্য সব পাখীরা ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা তুলে তবেই পান করতে পারে।

* *

পাখীদের ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদ গ্রহণের শক্তি নেই।

* *

অর্ধচন্দ্রের চেয়ে পূর্ণচন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য নয়গুণ বেশী। অর্ধচন্দ্রের যে অংশ আমরা দেখতে পাই, তা হচ্ছে চাঁদের পর্বতসঙ্কুল অসমতল স্থান এবং এই অংশের সূর্যকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা পূর্ণচন্দ্রের চেয়ে ১৯ ভাগ কম।

* *

কড মাছের (Codfish) দুটো মুখ আছে।

* *

গাটাপার্চা অনেকটা রবাবের মত একপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ। মালয়ে উৎপন্ন এক শ্রেণীর উদ্ভিদের রস (ল্যাটেক্স) থেকে গাটাপার্চা তৈরি হয়ে থাকে। অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ; তড়িৎ-রোধক পদার্থ হিসাবে অনেক সময় বৈদ্যুতিক তারে ও যন্ত্রাদিতে এর আবরণ দেওয়া হয়।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

শ্রীঅতীন বসু

কোন এক গ্রামে রহমন নামে এক চাষী ছিলো। একদিন সে এক গনৎকারের সামনে গিয়ে তার মুঠো করা হাতটা দেখিয়ে বল্লে—বলো তো ঠাকুর এর মধ্যে কি আছে?

গনৎঠাকুর বল্লে—অনেক কিছু আছে।

রহমন বল্লে—ধেৎ এটুকু মুঠোর মধ্যে অনেক কিছু কি করে থাকবে?

বলছি তো আছে।

আচ্ছা বলো তো কি কি আছে?

বল্লাম তো অনেক কিছু।

ধেৎ তুমি ছাই জানো। এই বলে চাষী মুটো খুলে বল্লে, ভাখো কিস্যু নেই।

গনৎঠাকুর চাষীর হাতটা কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, তোর বাড়ীতে বৌ আছে, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে আছে।

ঘাড় নেড়ে চাষী বল্লে, হঁ্যা তা আছে।

আচ্ছা অনেকগুলো মুরগী আছে?

এবার নড়েচড়ে বোসে চাষী বল্লে, একেবারে ঠিক বলেছ। আচ্ছা ঠাকুর আর কি রয়েছে?

তোর খুব ভাল সময় আসছে।

কত দেরি?

এই দিন সাতেকের মধ্যে।

কি করে বুঝবো?

একজন নতুন বন্ধু পাবি সেই তোর ভাল করবে।

বেশ ঠাকুর যদি তাই হয় তা'হলে তোমায় এমন এক বস্তু দেবো কখনো তুমি ভাখনি।

আচ্ছা তাই দিবি। এখন পালা।

চাষী বাড়ী ফিরে তার বৌ-এর কাছে সব বল্লে। বৌ শুনে বল্লে, রেখে দাও তোমার গণক ঠাকুরের কথা। সব যদি সত্যি হোত তা'হলে আর ঐ হাটের মাঝখানে বসে থাকত না।—

চাষী বল্লে, তুমি মোটে সাধু-সন্ন্যাসী কাউকে বিশ্বাস কর না।

সবই তো মেকী। আসল তো কেউ নেই। সব ভণ্ড, কাকে বিশ্বাস করব।

চাষী কিন্তু সেদিন থেকে দিন গুণতে লাগলো। একদিন বিকেলে যখন মাঠ থেকে ফিরছিল তখন পথে হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলো—হঁ্যা ভাই, অমুক জায়গায় যাবো কোন পথ দিয়ে?

চাষী বল্লে, তুমি বুঝি এ গাঁয়ের লোক নয়?

নাঃ। আমি পাশের গাঁয়ে থাকি।

অ তাই পথ গুলিয়ে ফেলেছ। চলো দেখিয়ে দিচ্ছি। লোকটা চাষীর সংগে এগোতো লাগলো। মন্দ বাজার, চাষ-বাসের কথা কিছু হোল। তারপর চাষী বল্লে, ঐ যে দূরে পথটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে, ঐ পথে গিয়ে ডাইনে সোজা চলে গেলে রঘুনাথপুর পাবে।

লোকটি বললে, খুব উপকার করলে ভাই। একদিন আমার বাড়ী বেড়াতে যেও।

আমি তো চিনি না।

তাতে কি হয়েছে, রঘুনাথপুরে গিয়ে তুমি যাকে প্রশ্ন করবে ইসলাম ভায়ার বাড়ী কোথায়, সবাই তোমাকে পৌছে দেবে।

বেশ তবে কালই যাবো।

পরের দিন চাষী রঘুনাথপুরে গেল। একটা চায়ের দোকানে ইসলাম ভায়ার বাড়ী যাবো বলতেই দোকানদার রাস্তায় বেরিয়ে এসে বল্লে.—ঐ যে সাদা রঙের মস্ত বাড়ী, ঐ টা। চাষী গিয়ে দেখলো চারতলা মস্ত বাড়ী। লোকজন, পশুপাখী সব ভর্তি। একজনকে বল্লে, ভাই ইসলাম সাহেবকে ডেকে দেবে। লোকটা বাড়ীর ভেতর চলে গেল। একটু পরেই ইসলাম সাহেব এসে চাষীর পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন, চলো ভাই উপরে। তুমি যে আমার কথা মনে রেখে আজই এসেছ তাতে খুব আনন্দ হোল। চলো উপরে। চাষীর অত বড় বাড়ী দেখে মাথা ঘুরে গেছে। উপরের ঘরে গিয়ে বসলো। কী সুন্দর সাজানো ঘর। অনেক গল্প হোল। চাষীকে পেঠ ভরে খাওয়ালো, কত রকমের খাওয়া। চাষী কথায় কথায় বল্লে, আচ্ছা সাহেব আপনি এত বড়লোক হলে কি করে ?

সে এক কাহিনী। তবে তুমিও হতে পারো।

চাষী ইসলাম সাহেবের হাত দুটো চেপে ধরে বল্লে,—বলো না ভাই কি ব্যাপার।

ভাখো চাষী আমিও তোমার মতন গরীব ছিলাম। তারপর আমার হঠাৎ বড়লোক হবার কথা আমি কাউকে বলিনি তোমাকে কি জানি খুব ভাল লেগেছে। তাই বলবো। কিন্তু কাউকে বোল না।

না না তুমি পাগল হয়েছেন।

তবে শোন। একদিন সংসারে অভাবের জ্বালায়, মনের দুঃখে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম। যে পথে যাচ্ছিলাম সেই পথে কিছু দূর এগোবার পর দেখলাম একটা কবরস্থান খুব নোংরা হয়ে আছে। আমি সেটা পরিষ্কার করলাম। তারপর আরো কিছু দূর যাবার পর দেখলাম একটা ভাঙা মসজিদের রোয়াকে একজন সাধু বসে আছে। তার চারপাশে ভীষণ নোংরা। ভাবলাম, আত্মহত্যা যখন করবই মরার আগে একটু পুণ্য করি। এই ভেবে সাধুর চারপাশ ভাল ভাবে পরিষ্কার করে দিলাম। তারপর একটা প্রণাম করে

'সাধু বল্লে—যা মরতে হবে না'

চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সেই সাধু বল্লে,—দাঁড়া, তুই মনের দুঃখে মরতে যাচ্ছিস?

বল্লাম, হ্যাঁ ঠাকুর।

সাধু বল্লে,—যা মরতে হবে না। শোন্, সোজা উত্তরে চলে যাবি, গিয়ে দেখবি একটা মস্ত দিঘী, সেখানে একটা ডুব দিবি! তারপর দক্ষিণ পাড়ে একটা ছোট টিনের চালা ঘর আছে, সেখানে ঢুকে দেখবি অনেকগুলো সাজী আছে। তোর খুসী মতন একটা নিয়ে চলে আসবি। তারপর সেই সাজী হাতে করে যাকে যা বলবি তাই হবে। আমি তো সাধুর কথা মতন কাজ করলাম। সাজী নিয়ে এসে যাকে যা বল্লাম সব হোল।

এবার চাষী বল্লে, সেটা কোন পথ দিয়ে গেছলে? কাল যেখানে তোমার সংগে ছাখা হয়েছিল, সেই জায়গায় থেকে সোজা পশ্চিম দিকে চলে যাবে।

চাষী বিদায় নিয়ে চলে গেলো। পরের দিন সেও ইসলাম সাহেবের কথামুযায়ী চল্লো। পথে যেতে যেতে সেই মসজীদ, সেই কবরখানা, সেই সাধু সবই চোখে পড়লো। কিন্তু মনে মনে বল্লে, ধেৎ এসব নোংরা কে পরিষ্কার করবে? এই বলে সোজা দীঘিতে গিয়ে ডুব দিলো। তারপর সেই ঘরে গিয়ে দেখলো, সোনা, হীরে, রূপা, কাগজ ও ফুলের বিভিন্ন রকমের সাজী সাজানো রয়েছে। চাষী হীরের সাজীটা তুলে নিয়ে চলে এলো। বাড়ী এসে বৌকে বল্লে, ছাখো এক মিনিটে তোমায় তাক লাগিয়ে দেবো। এই না বলে বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে যেই বলেছে, সাজী আমার এ কুঁড়ে ঘর ভেঙে এখুনি একে বিরাট অট্টালিকা করে দাও: অমনি সেই কুঁড়ে ঘর জলতে লাগলো। এক মিনিটে চারিদিকে আগুন। চাষী তো ভয়ে কাঁপতে লাগলো। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে পারল না। তার বৌ, ছেলেমেয়ে যা ছিলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল—তার দুঃখের সীমা রইল না। সেই সময় ইসলাম ভায়া কাঁধে হাত রেখে বল্লে, ভাই তুমি পথে ঠাকুর-দেবতাকে ঘৃণা করেছিলে আর লোভের বসে সবচেয়ে দামী সাজীটা নিয়ে এসেছিলে, তাই তোমার এ অবস্থা হোল,—একেবারে এত লোভ কি ভাল?

মানচিত্র

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

'ম্যাপ' কথাটি কি তা তোমরা সবাই খুব ভাল ভাবেই জানো। বাঙলায় তাকে আমরা বলি মানচিত্র। এই মানচিত্র বস্তুটি হচ্ছে দেশ-বিদেশ, সাগর-মহাসাগর, নদী-হ্রদ, পাহাড় পর্বত, প্রান্তর-মরুভূমি-সমতলভূমির স্থান বিন্যাসের চিত্র। আকাশের বাতাসের মানচিত্রও মানুষ তৈরী করেছে, তবে সে কথায় এখন আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, এখনকার মত আমরা যা মেনে নিচ্ছি—তা হচ্ছে এই পৃথিবীটার শুধু উপর-মুখের চিত্র।

এই ম্যাপ তৈরী মানুষের খুব একটি প্রাচীন শিল্প বা কর্মবিভাগ, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ করে আসছে। আমাদের বর্তমান কালের এই আধুনিক পদ্ধতির ম্যাপ-তৈরীর আরম্ভ হয় গ্রীক সভ্যতার কাল থেকে। তারা হয়তো এটা শিখেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী মানুষ—মিশরী, ব্যাবিলনী বা ফোনিশিয়দের কাছ থেকে।

কলম্বাস, ভাস্কো-দা-গামা, ড্রেক, হকিন্স, ক্যাপটেন কুক এরা সবাই ছিলেন ওস্তাদ ম্যাপ প্রস্তুতকারী। এরা যখন দেশ-বিদেশ সফর আর আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিলেন, তখন অনেক দেশেরই ম্যাপ ছিল না, কারণ ইউরোপের তুলনায় সে সব দেশ তখনও বর্তমানকালের এই সভ্যতার আলোক মোটেই পায়নি। উপরন্তু ইউরোপের নিজের সাগর-পার ছাড়া দূর সমুদ্রের কোন ম্যাপই তখন ছিল না; তাই তাদের সেই সব সাগর, উপসাগর, মহাসাগরের ম্যাপ তৈরী করতে হয়েছে—দ্বীপ, দেশ, মহাদেশের ম্যাপ তৈরী করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কেবল সরকারের বা জনসাধারণের পেয়ারের লোক, যারা দেশ-বিদেশ আবিষ্কার, ব্যবসা-বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা দেখতে গেছলেন তারাই যে মাত্র সাহায্য করেছেন তা নয়। বিস্তর জলদস্যু যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজ, রাষ্ট্র বা মনুষ্যত্বের শত্রু, তারও ম্যাপ তৈরীতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তবে তারা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে পুষ্ট করবার জন্য তা করেনি, তারা করেছিল তাদের নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু পরবর্তীকালে তা' নানা ভাবে, নানা কারণে, তাদের হাত থেকে বেরিয়ে এসে সমগ্র মানবজাতির কাজে লেগেছে।

সব দেশেরই সরকারের ম্যাপ তৈরী ও ম্যাপ সংরক্ষণের একটি সুবৃহৎ বিভাগ আছে। সেখানে এখন অনেক ভাল ভাল বিদ্বান, উৎসাহী, জ্ঞানী-গুণী মানুষ আছেন যাঁরা ম্যাপ নিয়ে সর্বদাই ঘাঁটাঘাটি কচ্ছেন—কারণ, সব ম্যাপই যে একেবারে তৈরী হ'য়ে যায় তাও যেমন নয়, তেমনি আবার আজ যে ম্যাপ তৈরী হলো পৃথিবীর অবস্থাগতিকে কাল বা দু'বৎসর পরে ঠিক সেই ম্যাপই যে থেকে যাবে তাও নয়। পৃথিবীতে চলেছে একটি নিরন্তর পরিবর্তন—সামাজিক,

রাষ্ট্রীক ও প্রাকৃতিক। হিমালয় পর্বত বা এশিয়া মহাদেশ বা ভারত মহাসাগর বা গঙ্গা নদী এরা শাশ্বত, কিন্তু এদের আকার শাশ্বত নয়। গঙ্গার গতিবেগ প্রতি বৎসর পালটে যাচ্ছে, হয়তো এক পাড় ভাঙছে আর এক পাড়ে দেখা দিচ্ছে চড়া। সমুদ্রের তীরে এক স্থানে হয়তো বালি জমছে আর এক স্থানের বালি কেটে তৈরী হচ্ছে খাড়ী। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ভেঙে উড়ে ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে পাহাড়, আবার হয়তো নতুন পাহাড়ের সৃষ্টি হচ্ছে এই অগ্ন্যুৎপাতেই। কিছুদিন পূর্বে এই শতকের চতুর্থ দশকে মেক্সিকোর কাছে প্যারিকুটিন বলে একটি গ্রামে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে একেবারে সমতল জমিতে একটি নতুন পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, আবার গত শতকের নবম দশকে ১৮৮৩ সালে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপ দুটির কাছাকাছি ক্রাকাটোয়া বলে একটি পাহাড়ী দ্বীপের অর্ধেকেরই বেশী উড়ে গেছে। তাই সে সব জায়গার ম্যাপকে আবার নতুন করে আঁকতে হয়েছে যোগ-বিয়োগ করে।

প্রকৃতি যেমন ম্যাপকে পরিবর্তিত করে, মানুষ নিজেও তা করে বরং হয়তো বেশীই করে। মানুষ নিরন্তর রাস্তা তৈরী করছে, পুল তৈরী করছে, বাঁধ তৈরী করছে, খাল তৈরী করছে, রেলপথ তৈরী করছে, কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করছে, এয়ারোড্রোম তৈরী করছে, শহর তৈরী করছে, নগর তৈরী করছে, পোতাশ্রয় তৈরী করছে। নিরন্তর জেলার, বিভাগের, প্রদেশের, দেশের সীমানা পরিবর্তন করছে।

ওদিকে আবার ভেঙেও যাচ্ছে। নিজে থেকেও ভাঙছে, আবার মানুষকেও ভাঙতে হচ্ছে তার আপন প্রয়োজনে। এক সময় তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক ছিল বাঙলা দেশের একটি বড় রকম বন্দর, সেখান থেকে দেশ-বিদেশে জাহাজ যেত সওদাগরী মালপত্তর নিয়ে, আবার দেশ-বিদেশ থেকে জাহাজও আসত সেখানে। আজ সে তমলুক একটি সামান্য গ্রাম মাত্র। বড়জোর একটি ছোট মফঃস্বল শহর। তিনশ বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদ ছিল বাঙলা দেশের সর্ববৃহৎ শহর ; কিন্তু আজকের বাঙলার সর্ববৃহৎ শহর হলো কলকাতা। অথচ এই কলকাতার বয়েস মাত্র দু'শ-নব্বই বৎসর, এ হলো আমাদের দেশে ইংরেজের তৈরী অনেক নগরীর একটি নগর। তিনশ' বৎসর পূর্বে এখানে ছিল জলা, নালা, খাল, হোগলার বন, শুয়োর, হরিণ, বাঘ, কুমীর আর কয়েকটা জেলে ও চাষীদের কুঁড়ে ঘর। কলকাতা শহরের বালিগঞ্জের লেক-পাড়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল না। কারণ, এই লেকই ছিল না ওখানে পঞ্চাশ বৎসর আগে। সেদিন পর্যন্তও বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ ছিল ঝোপ-ঝাড় আর জঙ্গল। লবণ হ্রদেও বসবাসের জন্য বাড়ী-ঘর তোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে, বাঙলা দেশে কল্যাণী বলেও একটি নতুন শহর তৈরী হয়েছে নিতান্তই সাম্প্রতিক কালে। চণ্ডীগড়, ভিলাই, দুর্গাপুর,

করবেন। এরা ভারতবর্ষের স্বাধীনোত্তরকালের শহর, নগর।

শহরেরই যে কেবল পরিবর্তন হচ্ছে আর শহরই যে কেবল পত্তন করা হচ্ছে তা নয়। গ্রামও পত্তন হচ্ছে আর গ্রামেরও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে প্রতি নিয়তই। পূর্ববঙ্গের অনেক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসায় অনেক পতিত জমিতেই গ্রাম গজিয়ে উঠেছে, অনেক গ্রামই শহরের মর্যাদা পেয়েছে। আজ যদি একটা গ্রামের ম্যাপ তৈরী করে রাখা যায় পাচ বৎসরের মধ্যে দেখা যাবে তার ভিতরে হয়েছে কত পরিবর্তন। তোমরা যারা গ্রামে থাকো এটা করে দেখতে পারো। প্রথমেই বেশী খুঁটিনাটির মধ্যে যাবার প্রয়োজন নেই। গ্রামের কয়েকটি বিশেষ বস্তু নিয়ে আরম্ভ করবে তোমাদের ম্যাপে—স্কুল, হাসপাতাল, পোষ্ট-অফিস, ষ্টেশন, মন্দির, রাজ-বাড়ী, পুকুর, বাজার, লোকালয়, আর দুটো একটা বিশেষ রাস্তা ও গাছ। আরম্ভ করে একবার মজা দেখলেই দেখতে পার বিশদে। উদ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে কাজ করবে দল পাকিয়ে। তোমাদের এই ম্যাপই যে একদিন এই গ্রামের ইতিহাস রচনা করবে কিনা সে কথাই বা বলা যায় কি?

অন্ধকারের ছড়া

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

কনকন করে দাঁত,
খনখনে গলা,
গনগনে আগুনে কে
ভাজে কাঁচকলা।

ঘনঘন কেন যাও
চনচনে রোদে,
ঝনঝন থালা ফেলে
টনটনে বোধে।

ঠনঠন করে ঘটি,
ঢনঢনে ঘড়া,
বনবন করে চাকা
ঘোরে কেটে ছড়া।

ভনভন করে মাছি
ওড়ে চারিপাশে,
সনসন করে বায়ু
জোরে ছুটে আসে।

হনহন করে খোকা
পথে হেঁটে যায়,
মা এসে অমনি কোলে
তুলে চুমা খায়।

দিব্যদৃষ্টির ম্যাজিক

যাদুরত্নাকর এ. সি. সরকার

তোমাদের মধ্যে যারা আমার ম্যাজিক দেখেছ বা আমার ম্যাজিকের কথা শুনেছ বা পড়েছ তারা সবাই জানো যে প্লাস্টার, তুলো, ব্যাণ্ডজ আর ক্যানভাসের ব্যাগ দিয়ে আমার দু'চোখ ভালভাবে বন্ধ করে দিলেও আমি স্বচ্ছন্দে বোর্ডের উপরে দর্শকদের লেখা বিভিন্ন ভাষা লিখে দিই বা পড়ে দিই—দর্শকদের দেওয়া ছোট্ট একটা ফুটকী বা রেখা থেকে চোখ বাঁধা অবস্থাতে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকি। এইভাবে চোখ বেঁধে দেওয়া অবস্থায় বহুবার যে আমি পৃথিবীর নানা দেশে নানা শহরের জন-যানবহুল রাজপথে মাইলের পর মাইল মোটর সাইকেল চালিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছি সে কথাও তোমরা পড়েছ খবরের কাগজে। অনেকে আবার এ খেলা হয়তো দেখেও থাকবে স্বচক্ষে! আমার এই অদ্ভুত খেলাটার নাম সাংবাদিকরা দিয়েছেন 'ইলেক্ট্রনিক ভিসন' বা 'এক্স-রে দৃষ্টি'। বহুদিনের সাধনার ফলে আমি লাভ করেছি সব কিছু ভেদ করে দৃষ্টি চালনার এই অদ্ভুত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা লাভ করার জন্য 'যোগবিদ্যা'-র অনেক কঠিন কঠিন ক্রিয়া অনুশীলন করতে হয়েছে আমাকে বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কঠিন যোগ সাধনায় সিদ্ধির ফলেই এই দিব্যদৃষ্টি আমার আয়ত্তে এসেছে।

একটি সাধারণ কৌশলের আশ্রয় নিয়েও এমনি ধারা একটি নকল 'দিব্যদৃষ্টির' (?) খেলা তোমরা দেখতে পারো। কেমন করে তাই এখন বলছি শোন :

খেলাটা হচ্ছে মোটামুটি এইরকম : যাদুকরের ষ্টেজের এক পাশে আছে একটা বড় ব্ল্যাকবোর্ড। যাদুকর দাঁড়িয়ে আছে স্টেজের অন্য পাশে। একজন দর্শক এসে রুমাল দিয়ে আচ্ছা করে চেপে বেঁধে দিলেন যাদুকরের দুটো চোখ। ভাল করে চেপে টিপে দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে, যাদুকর কোনভাবেই দেখতে পাচ্ছে না।

এইবার দর্শকদের এক এক জন এসে বোর্ডের উপরে চক দিয়ে এক একটি সংখ্যা লিখতে থাকলেন আর যাদুকর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই সংখ্যা পড়ে দিতে থাকলো না দেখে!

কি, ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর লাগছে না? খেলাটা যত বিস্ময়করই লাগুক না কেন, এর কৌশল কিন্তু খুব সোজা। এক টুকরো শক্ত অথচ সরু কালো সুতোর দৌলতেই এই অসম্ভব কাণ্ডটা সম্ভব হয়। যাদুকর দাঁড়িয়ে থাকে স্টেজের এক পাশে। উইংসের কাছাকাছি। কালো সুতোটার এক মাথা বাঁধা থাকে যাদুকরের সহকারীর হাতে। সহকারী উইংসের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সুতো টেনে সঙ্কেত পাঠায় যাদুকরের কাছে। বোর্ডে যত লেখা হয় সহকারী সুতো টানে ঠিক ততবার। যাদুকর মনোযোগ দিয়ে সুতোর টানের সংখ্যা গুণে যাদুকরী কায়দায় মুখে উচ্চারণ করে সংখ্যাটা! যেমন ধরো বোর্ডে লেখা হ'ল ৫ সংখ্যাটা। যাদুকরের সহকারী সুতোটাকে পাঁচবার টানলো। টানা শেষ হতেই যাদুকর বললো, "বন্ধুগণ, এখন বোর্ডে আপনারা লিখেছেন পাঁচ।"

একটু ভালোভাবে সহকারীর সঙ্গে তালিম দিয়ে অভ্যাস করে নিতে পারলে তোমরা এই খেলা দিয়ে বড়দেরও মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারবে।
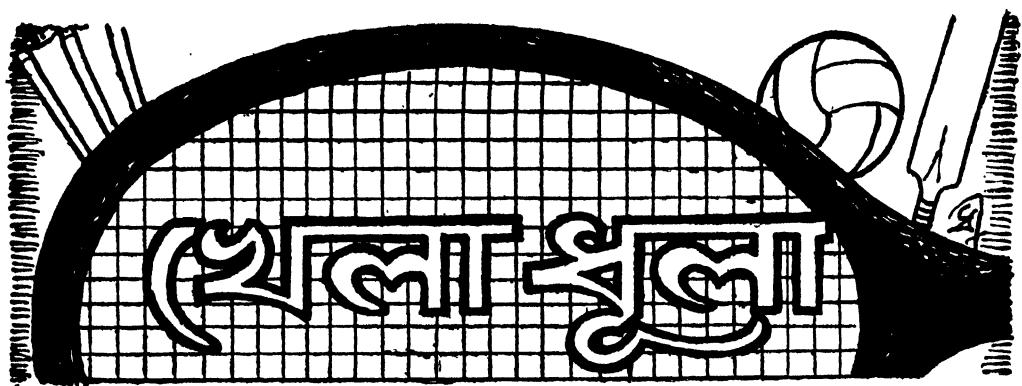
মেঠুড়ে

টেনিস

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকোম্ব এবং আমেরিকার মিসেস বিলি জিন কিং এবার 'রাজা' ও 'রাণী'র সম্মান পেয়েছেন। বিলি জিন আগেই উইম্বলডনের 'রাণী' ছিলেন। গত বছরের ফাইন্যালে তিনবারের বিজয়িনী ব্রাজিলের মেরিয়া বুনোকে হারিয়ে তিনি পেয়েছিলেন চ্যাম্পিয়নশিপ। কিন্তু এবার কিং শুধু 'রাণী' নন, সম্রাজ্ঞীঃ উইম্বলডনে 'ত্রি-মুকুটে'র অধিকারিণী। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে হারিয়েছেন গ্রেট ব্রিটেনের গর্ব মিসেস অ্যান হেডন জোনসকে, মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যালে স্বদেশের রোজমেরী ক্যাসলকে নিয়ে খেলে এক নম্বর বাছাই জুটি মিস মেরিয়া বুনো ও মিস ন্যানসী রিচেকে এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার ওয়েন ডেভিডসনকে সঙ্গে করে দু নম্বর বাছাই জুটি কেন ফ্রেচার ও মেরিয়া বুনোকে।

এবার উইম্বলডনে যাঁর রাজার সম্মান, তাঁর জয় অপ্রত্যাশিত হলেও একেবারে অভাবনীয় নয়। নিউকোম্বে সাত বছর ধরে উইম্বলডনে খেলছেন। ফাইন্যালে নিউকোম্বে হারিয়ে দেন পশ্চিম জার্মেনীর উইলহেম বুংগার্টকে মাত্র বাহাত্তর মিনিটে এবং স্ট্রেট সেটে।

উইম্বলডনে এবার ভারতের খেলোয়াড়রা তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। খেলার তালিকায় এবার প্রথম দিনেই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হওয়াই হয়তো ভারতীয় খেলোয়াড়দের অসাফল্যের মূল কারণ।

অ্যাথলীট

বাইশ বছর আগে সুইডেনের গুন্দার হেগ যেদিন ৪ মিনিট ৪·৬ সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়েছিলেন, সেদিন অ্যাথলীট বিশারদরা তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে কোনো দৌড়বীর আপনার এ রেকর্ড ভাঙতে পারবেন না।

ক'দিন আগে এক খবরে জানা গেছে, কুড়ি বছরের এক তরুণ আমেরিকান নিগ্রো দৌড়বীর জিম রায়ান ৩ মিনিট ৫১·১ সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়েছেন। দৌড় শেষে রায়ান বলেছেন: ট্র্যাক থেকে বিদায় নেবার আগে মাইলকে ৩ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডের

মধ্যে টেনে আনবই। রায়ানের এই কথা শোনার পর তোমরা অবাক পক্ষে অসম্ভবকে সম্ভব করা কিছুই অসাধ্য ও আশ্চর্যের নয়—রায়ান যদি না পারেন তার পর আর কেউ হয়তো অধ্যবসায় ও কঠিন সাধনা দিয়ে তা পূরণ করবেন।

ফুটবল

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের দু'ভাগ খেলা শেষ হয়েছে, এক ভাগের কিছু কম খেলা বাকি। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় প্রাধান্য সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল দলের গোল করতে না পারার কারণ পুরোভাগের ব্যর্থতা এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের রক্ষণভাগের দৃঢ়তা। কয়েকটা খেলায় দেখা গেছে ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের খেলোয়াড়রা আগের মতন আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেননি।

মোহনবাগান দলও এবার তেমন সুবিধে করতে পারছেন না।

ক্রিকেট

তোমরা সকলেই জানো পাকিস্তান ক্রিকেট দল এ বছর ইংলণ্ড সফর করছে। ইতোমধ্যে ইংলণ্ড দলের সঙ্গে তারা দুটো টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। লর্ডসে প্রথম টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। পাঁচদিনব্যাপী প্রথম টেস্টের শেষ দিনে ইংলণ্ড দল ৯ উইকেটে ২৪১ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ ঘোষণা করে পাকিস্তানকে জয়লাভের জন্যে ২১০ মিনিটে ২৫৭ রান করার সুযোগ দেয়, কিন্তু পাকিস্তান দল শেষ পর্যন্ত ৩ উইকেট হারিয়ে ৮৮ রান করে। পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানেরা দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু থেকেই জয়লাভের বদলে খেলাটা অমীমাংসিত রাখার দিকে নজর দেন। ইংলণ্ড দল সে-কথা বুঝতে পেরে চেষ্টা করতে থাকেন কী করে তাঁদের হারাবেন। ইংলণ্ড দলের সমস্ত খেলোয়াড়ের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে পাকিস্তান দল শেষ পর্যন্ত খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে।

নটিংহামের দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ড দল পাকিস্তান দলকে দশ উইকেটে হারিয়ে দেন। এ খেলায় পাকিস্তান দল বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি।

*   *   *

"মৌচাক"-এর 'খেলাধূলা'-র পাতায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল এখন ইংলণ্ডের স্কুল দলগুলোর সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে গেছে এ খবর তোমরা আগেই পড়েছো। ভারতীয় স্কুল দল গ্লষ্টার স্কুলের বিরুদ্ধে দু'দিনব্যাপী খেলার শেষ দিনে স্থানীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৭৪ রানে শেষ করে দলটিকে ফলো অনে নামায়। গ্লস্টার দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ে ভারতীয় স্কুল দলের বোলার দীপঙ্কর সরকার প্রধান ভূমিকা নেয়—এর লেগ স্পিন বলে ছ-জন ব্যাটসম্যান মাত্র ১৮ রানে বিদায় নেয়। শেষ পর্যন্ত খেলাটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ওয়েলস দলের সঙ্গে দু'দিনের খেলাতেও ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা এক ইনিংস ও ৯৬ রানে জয়ী হয়। ভারতীয় স্কুল দলের জয়লাভে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় দীপঙ্কর সরকার। দীপঙ্কর দু'ইনিংসে বিপক্ষের মোট ন'জন ব্যাটসম্যানকে মাত্র ৪৬ রানে আউট করে দেয়।

অনুতাপ
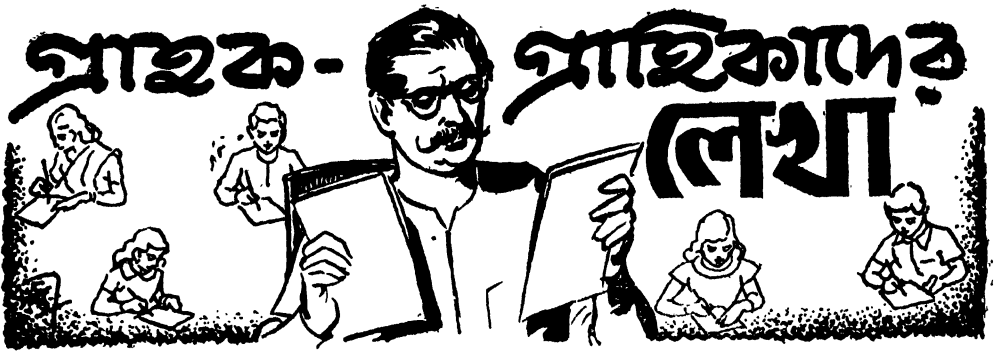
সেদিন ছিল অমাবস্যা। চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। হঠাৎ শম্ভুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। শম্ভু চেয়ে দেখল চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু উত্তর দিক থেকে একটা বীভৎস চীৎকার তার কানে এসে পৌছাতেই সে একেবারে আঁত্‌কে উঠল। কিছুক্ষণ সে ভাবতে লাগল। পরক্ষণেই অনুভব করল এ যেন কার চেনা স্বর। সে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না এ আওয়াজ কার। সে পুনরায় বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই আবার সেই বীভৎস চীৎকার শুনতে পেল। এবার সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। যেভাবে সে সেই রাত্রিটা কাটিয়েছিল তা একমাত্র সেই জানে!

পরদিন সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে চা খাচ্ছে, এমন সময় একদল পুলিশকে সে উত্তর দিকে দ্রুত যেতে দেখল। উত্তর দিকে পুলিশদলকে যেতে দেখে তার গত-রাত্রের কথা মনে পড়ল। কোন রকমে সে চা শেষ করে উর্দ্ধশ্বাসে উত্তর দিকে ছুটল। সেদিকে গিয়ে দেখল, চারিদিক পুলিশে ভর্তি এবং গ্রামের লোকে লোকারণ্য। কোন-রকমে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তা দেখে সে একেবারে শিউরে উঠল। 'এ যে আমাদেরই পরিতোষবাবু!' বলেই সে বিস্ময়ে একেবারে যেন হতবাক হয়ে গেল!

পরিতোষবাবু ছিলেন উত্তর গ্রামেরই একজন মোড়ল। বয়স তার খুব বেশী নয়। তাঁর বাড়ি উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা পুরানো তেঁতুলগাছ ছিল। সেই তেঁতুলগাছের তলায়ই ছিল পরিতোষবাবুর একমাত্র নির্জন আসরের স্থান। শম্ভু, বিপ্লব, দয়ারাম ও পবিত্র ছিল পরিতোষবাবুর আসরের শ্রোতা। তাদের মধ্যে শম্ভুই ছিল পরিতোষবাবুর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। পরিতোষবাবু প্রত্যেক দিন·বিকালে সকলকে কত ডিটেকটিভ্ গল্প, কত অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প শোনাতেন আর বলতেন, 'তোমরা মৃত্যুকে কোনদিন ভয় করো না। মৃত্যু কিছুই নয়। মৃত্যু হ'ল একটা দেহের রূপান্তর। সাপ যেমন তার পুরানো খোলসকে বদলিয়ে নূতন খোলস গ্রহণ করে; মানুষের মৃত্যুও সেইরূপ একটা সাপের খোলস মাত্র।'

যে পরিতোষবাবু সকলকে কত বিচিত্র কাহিনী ও উপমার সাহায্যে বুঝাতেন, সেই পরিতোষবাবু আজ নাকি নিষ্ঠুর হত্যাকারীর তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে মৃত—এ কিছুতেই যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শম্ভু নির্বাকভাবে সেই জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পুলিশের ধাক্কায় সে আর বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তবুও সে পরিতোষবাবুর শেষ মুখখানা বার বার দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে পুলিশ-সার্জেণ্ট পরিতোষবাবুর মৃতদেহটি গাড়ীতে তুলবার আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ পুলিশেরা পরিতোষবাবুর মৃতদেহটি গাড়ীতে তুলে ফেলল এবং গাড়ীও ষ্টার্ট দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলল।

শম্ভু একদৃষ্টে চেয়ে রইল চলমান পুলিশের গাড়ীর দিকে। যখন পুলিশের গাড়ী আর দেখা গেল না, তখন সে বিষণ্ণবদনে বাড়ীতে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। তার বার বার মনে হতে লাগল—পরিতোষবাবুর মৃত্যুর জন্য সেই একমাত্র দায়ী। কারণ গত রাত্রে যখন সে উত্তর দিক থেকে বীভৎস চীৎকার শুনে ভয় পেয়েছিল, তখন যদি সে যেত তা'হলে বোধ হয় পরিতোষবাবুর এ দশা ঘটত না। এরপর থেকে সে একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। সে কোনদিন খায় আবার কোনদিন খায় না! এভাবে শম্ভুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। সে দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকে আর নিজের মনেই বলে, 'আমিই দায়ী, আমিই দায়ী!'

দুশ্চিন্তা যে মানুষকে একেবারে দুর্বল করে ফেলে, শম্ভুর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। একদিন গভীর রাত্রিতে শম্ভু হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল। অনুতাপের জন্যই শম্ভু নিজের সুস্থ শরীরটাকে চিরকালের জন্যে নষ্ট করে ফেললে।

শ্রীপরেশচন্দ্র মোদক
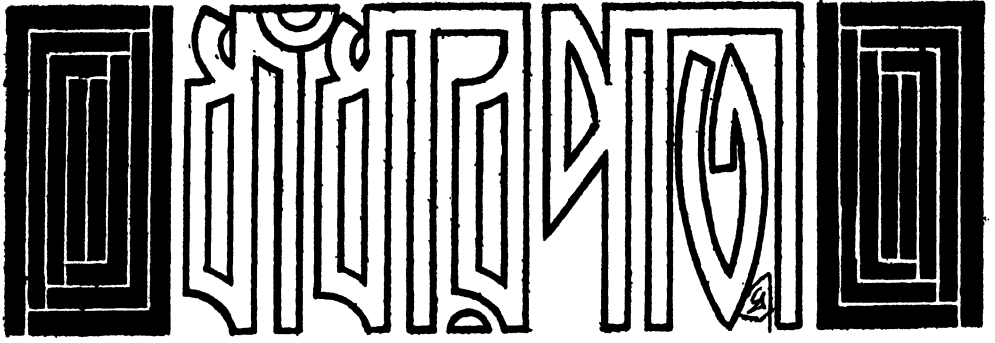
শব্দ নিয়ে ধাঁধা

শ্রীবিনয় বাগচী

১। নীচে চারটি তিন অক্ষরের শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেকটির নীচে এমন দেখে দুটি করে তিন অক্ষরের শব্দ বসাতে হবে যাতে খাড়াখাড়ি প্রথম সারি এবং পাশাপাশি প্রথম সারিতে একই শব্দ হবে, আবার খাড়াখাড়ি দ্বিতীয় সারি এবং পাশাপাশি দ্বিতীয় সারিতে একই শব্দ হবে, আর খাড়াখাড়ি তৃতীয় সারি ও পাশাপাশি তৃতীয় সারিতে একই শব্দ হবে।

১। মৌচাক ২। কাগজ ৩। আকাশ ৪। তপন

একটি নমুনা দেখান হল। আশাকরি, এবার তোমরা একটু চেষ্টা করলেই পারবে :—

বিছানা

ছাতিম

নামব

২। নীচের তিন অক্ষরের শব্দ দুটির নীচে এমন দেখে দুটি করে তিন অক্ষরের শব্দ বসাতে হবে যাতে পাশাপাশি প্রথম সারি ও খাড়াখাড়ি প্রথম সারিতে একই শব্দ হয়, পাশাপাশি দ্বিতীয় সারি এবং খাড়াখাড়ি দ্বিতীয় সারিতে একই শব্দ হয়, আবার পাশাপাশি তৃতীয় সারি এবং খাড়াখাড়ি তৃতীয় সারিতে একই শব্দ হয়।

(ক) জাহাজ (খ) শীতল

৩। এমন ছয়জন খ্যাতনামা বাঙালীর নাম কর যাঁদের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে তাদের মধ্যের একজনের সম্পূর্ণ নাম হয়।

৪। দ্বাপরের এক মহাবীর

এ যুগেও আছে স্থির

কেবা তিনি বলতো সুধীর ?

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

হোঁদল কুৎকুৎ—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০

তোমাদের জন্যে অনেক বই লিখেছেন প্রফুল্লবাবু। ভারী মজার মজার সব বই। তোমরা তো তাঁর মজার উপন্যাস 'আজব নগর' এই কাগজেই পড়ছ। 'হোঁদল কুৎকুৎ' নামটি শুনলেই যেমন হাসি পায়, তেমনি পড়লে তোমরা সে হাসি বা মজার মাত্রা যে কতখানি তা বুঝতে পারবে। হোঁদল, ভজন ও ভোজন, পণ্ডিতমশাই, ঠাকুমা প্রভৃতিদের নিয়ে এই উপন্যাস তোমাদের সকলেরই ভাল লাগবে, এবং আগেও যে লেগেছে তার প্রমাণ, বইখানির ৮টি সংস্করণ হয়েছে। ভিতরে ছবি আছে অনেকগুলি এবং উপরের প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

ফুজিয়ামার রূপকাহিনী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা। আর্ট ইউনিয়ন, ৮০।১৫, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৫০

ছবিতে-ছবিতে ভরা জাপানী গল্পের একটি সুন্দর বই 'ফুজিয়ামার রূপকাহিনী'। প্রত্যেকটি গল্পই পড়ে তোমরা আনন্দ পাবে। সতীন্দ্রনাথ শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর অনুবাদের মিষ্টি ভাষায় সার্থক হয়ে উঠেছে এই গল্পের বইটি।

কিশোর গ্রন্থাবলী—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০

'কিশোর গ্রন্থাবলী'র কয়েকটি সিরিজ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। একসঙ্গে বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের নানা ধরণের রচনা পড়ার আনন্দ পাবে তোমরা এই সিরিজ থেকে।

স্বর্গত বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর একটি উপন্যাস একটি নাটক, আটটি গল্প ও তিনটি কবিতা আছে এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে। প্রত্যেকটি রচনাই ছবির দ্বারা সুশোভিত। উপরের প্রচ্ছদপটটিও আকর্ষণীয়।

ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন—শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৫০

মানুষ-দৈত্য বিশেষ ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন-এর নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। মেরী শেলীর এই বই যেমন পুরাতন, তেমনি চির-নতুন। পড়তে পড়তে সমস্ত শরীরে কাঁটা দেয়, কোথাও কোথাও ভয়ও করে। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত সুন্দর করে এই রোমাঞ্চকর কাহিনী তোমাদের উপহার দিয়েছেন। অনেকগুলি ছবি বইখানিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে আর ছাড়তে পারবে না তোমরা।

খরাত্রাণের জন্য গত কয়েকমাস ধরে যা দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ শুনছিলাম, সংবাদপত্রে পড়ছিলাম—তার কিছু লাঘব হয়েছে। স্থানে স্থানে বর্ষণের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। বর্ষাকে আমরা এড়িয়ে যেতে যাই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অনেক সময় বিপর্যস্ত হয় মনে করে, কিন্তু তাকে যে আমাদের কত প্রয়োজন তার পরিচয় আমরা পাই সব সময়। বর্ষাকে আহ্বান জানাতে সকলেই তৎপর হয়ে ওঠে। তোমরা যারা বর্ষামঙ্গল অনুষ্টান করো, তাও তো তার আবাহন-সংগীত। প্রচণ্ড দাবদাহের পর শীতল নবধারা জলে মানুষ তৃপ্ত হয়ে ওঠে।

এর পরেই আসবে পূজো। চারিদিকে দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্যাভাবের মধ্যেই বেজে উঠবে পূজোর বাজনা। বর্তমানে সর্বত্র এই অভাব-অভিযোগের মধ্যে সবই যেন বেসুরোর মত লাগে।

গল্পের মত

এই ক'দিন রথের মেলা শেষ হয়েছে। ছোটদের মন থেকে তার রেশ সবেমাত্র কাটতে শুরু করেছে, এমনি সময় আবার নতুন মেলার তোড়জোড়—এবার জন্মাষ্টমী। প্রতি বছরের মত এবছরেও তার আয়োজন উদ্যোগ চলছে। এবারও মেলা বসবে। তাই ছোটদের উৎসাহে নতুন করে জোয়ার এসেছে।

স্কুল ছুটির পর রঞ্জনদের পাড়ায় এই সময়টা রোজই ফুটবলের মরশুম চলে, কিন্তু আজ ফুটবল অচল। মাঝে মাঝে বৃষ্টির আনাগোনা। স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাঠ, খেলা বন্ধ, তা' বলে গল্পগুজব তো বন্ধ নয়। গল্পের অলি-গলি পেরিয়ে মোড় দেখা দিচ্ছিল সেই চিরকালের ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌছান হলো না। চন্দন জন্মাষ্টমীর মেলার খবর দিতেই সকলে এক সঙ্গে বলে উঠলো : এবার জন্মাষ্টমীর মেলার আনন্দ রথ-যাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাক সবার ইচ্ছে। আলোচনা হতে হতে কখন যেন আবার রথের মেলার অভিজ্ঞতার কথা উঠলো। রজত বলছিল : জানিস এবার রথের মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ স্কুল-ডাক্তার পাশে আমগাছতলায় দেখা গিয়েছিল। এ খবরটি যাদের জান

ছিল না, তারা বললে : সেখানে আবার কী আকর্ষণ? তাই রজতকে বুঝিয়ে বলতে হলো ব্যাপারটা।

সারা বছর আমগাছতলায় বড় কেউ যেতো না, অবশ্য মরশুম ছাড়া—কিন্তু এবার গাছের তলা পরিষ্কার করে সেখানে আসন তৈরী হলো, আর রথযাত্রার দিন থেকে দেখা গেল আসন জুড়ে বসে আছেন এক গৈরিকধারী সন্ন্যাসী—মাথাভর্তি জটা, তার উপর পাগড়ী, গলায় রুদ্রাক্ষ আর পাথরের মালা। ক্রমে তাঁকে ঘিরে বাড়তে লাগলো লোকের ভিড়। যে ক'দিন ঐখানে ছিলেন লোকের আনাগোনার বিরাম ছিল না। সকাল-সন্ধ্যা ভিড় হতো বেশী। রজত দূর থেকে তাঁকে দেখেছে কিন্তু কাছে যেতে ভরসা পায়নি। শুনেছে ত্রিকাল তাঁর নখদর্পণে। ভবিষ্যৎ নিয়ে রজতের মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তাঁর অতীত আর বর্তমান খুঁজলে দু'চারটে অন্যায়, যার কথা মাষ্টারমশাই বা বাড়ীর লোকরা কেউ জানে না, তা বেরিয়ে পড়বে—কি দরকার সে সব ঘাঁটিয়ে?

কিন্তু সুশান্তর সাহস অনেক বেশী। সে কাছেও গেছে, সাধুপুরুষের কথাবার্তা ও নিজের চোখে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতেও দেখেছে, তাছাড়া রজত আর সুশান্ত দু'জনেই প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আরো অনেক অঘটন ঘটার কাহিনী শুনেছে। তাই নিয়ে জোর আলোচনা চলছিল। কোথায় কবে আসনে বসে শূন্য থেকে তার হাতে ভর্তি হয়ে এলো টাটকা ফলের ঝুড়ি, কাশ্মীরের উপত্যকা ছাড়া ওরকম টাটকা ফল কোথাও পাওয়া যায় না। দুর্গম ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স-এর টাটকা রংবেরং-এর ফুল ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ বলেছে, তারা নিজের চোখে দেখেছে সাধুপুরুষ জলের ওপর দিয়ে হেঁটে নদীর ওপারে চলে যেতেন। কারুর বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করলে তিনি জল, স্থল আর আকাশে স্বাধীনভাবে যখন যেখানে খুশি যেতে পারেন।

ছোট মেয়ে তুলসী সকলের সঙ্গে এক কোণে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিল। সবাই ভাবছে : জন্মাষ্টমীর মেলায় যদি সাধুর দর্শন পাওয়া যায় তাহলে এবার ভালো করে তাঁকে জানবে, কাছে বসবে, উপদেশ নেবে। তাঁর আশীর্বাদ পেলে সবই সম্ভব। পরীক্ষার পাশ, নম্বর জানা তো সহজ ব্যাপার। মনে মনে এমনি সব কথা ভাবছে এরা—হঠাৎ কানে এলো তুলসীর কণ্ঠস্বর—সে বলছে, আমি দাদার বইতে পড়েছি—রজতের দল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে : গল্প হয় তো শুনবো। তুলসী বললে : হ্যাঁ গল্পই তো, তবে অনেকদিন আগের, আর সে গল্প বলেছিলেন বুদ্ধদেব।

দুই ভাই, বড় আর দশজনের মত কাজকর্ম শিখে সংসারে রইল, আর ছোট দেশ ছেড়ে লেখাপড়ার জন্য দূর দেশে চলে এলো। তারপর অনেক শুধু লেখাপড়াই নয়, নানা রকম বিদ্যা শিখে বাড়ী ফিরে এলো। ভাইকে পেয়ে দাদার খুব আনন্দ হলো। তারপর একদিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করলো : কী কি শিখেছিস ।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। ভাই বললে: দেখবে? বলেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল, আবার তেমনি করেই ফিরে এলো। বড়ভাই বললে: এই শেখার জন্যে তুই বিদেশে কাটিয়ে এলি? ওর মূল্য তো এককড়ি। আমরা যখন নদীর ওপারে কোনো কাজে যাই, পাটনীকে এককড়ি দিলেই সে পারাপার করে দেয়। এই পর্যন্ত বলে তুলসী চুপ করলো।

রজতের দলরা বললে ও তারপর?

তুলসী বললে: তারপর জানি না।

রজতের দল নিষ্প্রভ হয়ে গেল—তারা সাধুপুরুষকে ধরে কিছু করিয়ে নেবে, অর্থাৎ পরীক্ষায় পাশ ইত্যাদি তাদের হবে বলে মনে হলো না।

আসলে, তুলসীর পড়া গল্পের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথার আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন—চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। অসাধারণ কিছু করার শক্তি অর্জন করা বড় কথা, কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা কিংবা লোকের মনে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। যাতে মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ হতে পারে, সমাজের উন্নতি হতে পারে, সেদিকে যদি প্রত্যেকে শক্তি-সামর্থ্য সাধ্য মত নিয়োগ করে, তা' হলেই প্রকৃত মঙ্গলসাধন হয়॥

চিঠি পেলাম:

বেনারস থেকে—রীতা ভট্টাচার্য, কুমকুম রায়; কোলকাতা থেকে—রত্না বন্দোপাধ্যায়, রত্না রায়, নূপুর দত্ত, অনীতা পত্রনবীশ, মালা, হীরক, বক্তু, জ্যোৎস্না দাস, আম্রপালী বসু; হাওড়া থেকে—রীতা লাহিড়ী, সৌমিত্র রায়; দিল্লী থেকে—উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়।

শুভেচ্ছা সহ—মধুমি'

মৌচাকের পূজা সংখ্যা

মৌচাকের আগামী আশ্বিন-সংখ্যা পূজা-সংখ্যা হিসাবে বর্ধিত আকারে এবং বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় সুচিত্রিত হয়ে পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। আকারে বর্ধিত হলেও, এই সংখ্যার মূল্য বর্ধিত হবে না।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
[illegible] প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

"শান্ত নদীটি যেন পটে আঁকা ছবিটি"

※ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ※
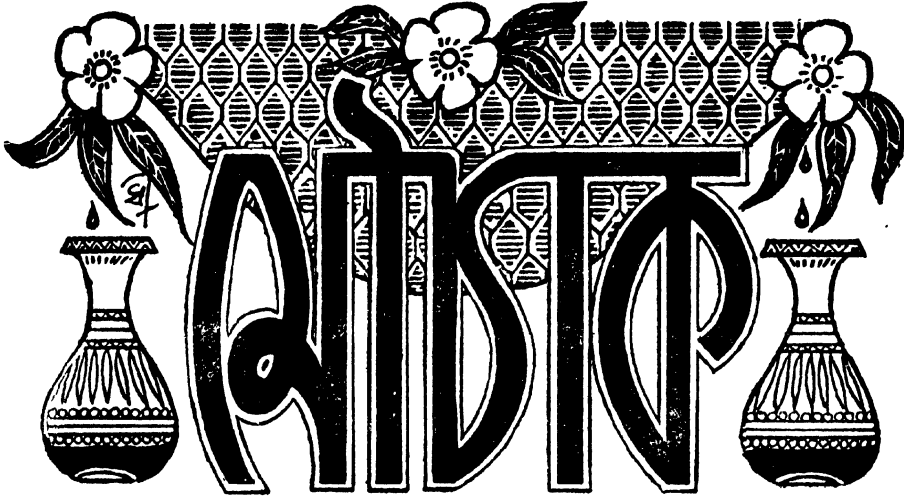
৪৮শ বর্ষ] কার্তিক : ১৩৭৪ [৭ম সংখ্যা

মেঘে আঁকা ছবি

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা শুধু,
মাথার উপর চলছে অনেক খেলা,
দুপুর রোদে এ-মন করলে ধু ধু,
হঠাৎ ডাকে পক্ষীরাজের চেলা।

মনটা তখন সরিয়ে মেঘের পাহাড়
লুকিয়ে দেখে অনেক কিছুই নাকি,
সত্য-মিথ্যা—কে করে তার বিচার,
ছবির পরে ছবি কি হয় ফাঁকি ?

কে দাঁড়িয়ে ? ওই যে একুশ হাত
সত্যযুগের মানুষ মেঘের কোলে !
এক নিমেষে কোথায় বা তার হাত ?
ঈশান কোণে শুঁড়টা কেমন দোলে !

হরিণ-চিতা-জিরাফ কিংবা উট
একের পর এক মেঘের রঙে আঁকা,
কোনোটা এক মাইল লম্বা, কোনোটা দু'ফুট ;
দু'চোখ মেলে তাকিয়ে শুধু থাকা।

ছবি আঁকার অনিয়ম যার জানা—
আঁকতে শেখে মেঘ দেখে সে ছবি,
সাতটি রঙে রামধনুটা রাঙা,
মেঘ দেখে হয় অকবিরাও কবি।

তারায় তারায় যখন ঠোকাঠুকি,
কিংবা যখন ধাক্কা মেঘে মেঘে
হঠাৎ আলোয় তখন কে দেয় উঁকি ?
জল ঝরে যায় ভীষণ ঝড়ের বেগে।

ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছে কে ?
তারায় তারায় ঠোকাঠুকির ভয় ?
মেঘের মধ্যে লুকিয়ে আছে কে ?
কা'র তুলিতে অজানা বিস্ময় !

আমি যেদিন বড় হব

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমি পাড়াগাঁয়ের স্কুলের শিক্ষক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রমথনাথ আমার বন্ধু। কলেজে একসঙ্গে বি. এ. পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলাম।

বন্ধুর একান্ত অনুরোধে একবার গরমের ছুটিতে ওঁর কর্মস্থল কুচবিহারে আমাকে যেতে হ'ল। বলা বাহুল্য বন্ধু খুব খুশী হলেন।

অনেক কাল পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সেই-যে এক সঙ্গে ফিলজফির নোট কণ্ঠস্থ করে বি. এ. পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া? তারপর কোথায় আমি, আর কোথায় আমার বন্ধুবর! ওঁর ভাগ্যে সেই চাকুরি লাভ যার সম্বন্ধে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বরং ভাড়াটিয়া গাড়ির ঘোড়া হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু হাল-আমলের ডেপুটি হইতে প্রস্তুত নই।' আর আমি হলাম স্কুল মাস্টার! তাও আবার এক অজ পাড়াগাঁয়ে।

যা হোক, বন্ধুর বাড়িতে আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। বন্ধুর ছোট ছেলে মলয় ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছে। সে আমার সঙ্গে খায়দায়, বেড়াতে যায়, এমন কি আমার সঙ্গে না শুতে পেলে কান্নাকাটি করে। দুপুরবেলায় বন্ধু যখন কোর্ট-কাছারিতে থাকেন, তখন মলয়ের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা ও গল্প বলে আমার সময় কোন রকমে কেটে যায়।

ছেলেটি বেশ চালাক, চটপটে। বয়স বছর দশেক। লেখাপড়ায় ইতিমধ্যেই সে বেশ অগ্রসর হয়েছে।

একদিন কৌতূহলবশতঃ আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা মলয়, তুমি লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে কী করবে?

মলয় তৎক্ষণাৎ উত্তর করল: আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব। ঐ যে বড় লাল বাড়িটা দেখছেন, ওটা ডাক্তার সুরেনবাবুর বাড়ি। একটা মস্ত বড় মোটর গাড়ি আছে ওঁর। ঐ গাড়ি চড়ে তিনি বেড়ান। ও রকম একটা গাড়ি আমার চাই। খুব উৎসাহের সঙ্গে এই কথাগুলো সে বলেছিল।

বন্ধুর ওখানে আরো দিন কতক থেকে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখি। বন্ধু কখনো-সখনো এদিকে এলে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বন্ধুপুত্র মলয়ের সঙ্গে বহুদিন আর দেখা হয়নি। আমার অনুরোধে এক পূজোর ছুটিতে মলয় আমার এখানে বেড়াতে এল। ও এখন হায়ার সেকণ্ডারি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে।

একদিন কথায় কথায় বললাম: তুমি বলেছিলে পাশ করে ডাক্তার হবে, তোমাদের

সেই সুরেন ডাক্তারের মোটর গাড়ির মত একটা বড় গাড়ি কিনবে। তোমার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বজায় আছে তো ?

আমার কথায় মলয় যেন আশ্চর্য হ'ল। বলল : বড় হয়ে ডাক্তার হব বলেছিলাম নাকি ? মনে নেই কিছু। যাক, সেই সুরেন বাবু কবে মারা গেছেন, গাড়িটাও নেই। আর, ডাক্তারী করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি বরং ব্যারিষ্টারি করব।

আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম : বেশ তো। বড় ব্যারিষ্টার হওয়া চাই কিন্তু ! দেখছ তো ওদের কীরকম নামডাক—রোজগারও প্রচুর !

এর পরে আবার বেশ কিছুকাল মলয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

একদিন হঠাৎ শহরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। ও তখন কলেজে পড়ে। কুশল জিজ্ঞাসা ও অন্যান্য কথাবার্তার পরে বললাম, তোমার ভবিষ্যৎ সঙ্কল্পের আর পরিবর্তন হয়নি আশা করি ? ঐ যে বলেছিলে ব্যারিষ্টার হবে ?

মলয় কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বলল : আমার সে ইচ্ছা বদলে গেছে, কাকাবাবু। ওকালতি কিংবা ব্যারিষ্টরি করতে চাই নে। ও কাজে বড় কূটবুদ্ধির দরকার। আর মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় কথায় কথায় ; তাছাড়া দিনকে রাত রাতকে দিন করতে হয়। আমি ও-লাইনে যাব না। ব্যবসার দিকে আমার একটা ঝোঁক আছে, ভাবছি, সে লাইনে গেলে কেমন হয় ? চাকরি করা আমার পোষাবে না ! আর, কত টাকাই বা তাতে রোজগার করতে পারব ? সকলেই তো চাকরি করছে। বাবাও তো বড় চাকরিই করছেন, কিন্তু টাকা-পয়সার দিক দিয়ে তেমন সুবিধে তো কিছু হ'ল না ? আমি তাই একবার ব্যবসার দিকটা পরখ করে দেখব। কি বলেন ?

বললাম, সে তো ভাল কথা। তোমার প্রস্তাবে আমার সায় আছে। দূর দেশের লোক এসে এখানে ব্যবসা করে সব লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ছেলেরা কেবল চাকরি খোঁজে। তাই আমাদের আজ এই দুর্দশা। জান তো পি. সি. রায় মশায় সারাজীবন বাঙ্গালী ছেলেদের পরামর্শ দিয়েছিলেন ব্যবসা করতে, কিন্তু কম লোকেই তাঁর কথা শুনেছে। তুমি একটা দৃষ্টান্ত দেখাও।

আবার প্রায় তিন চার বছর পরে মলয়ের সঙ্গে শহরেই দেখা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে দু'বার বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছে। নানা কথার পরে বললাম, তুমি বলেছিলে ব্যবসা করবে। যদি সে ইচ্ছাই থেকে থাকে তবে আর কেন কলেজের আর্ট বিভাগে শুধু শুধু টাকা ও সময় নষ্ট করছ ?

উত্তরে মলয় বলল : ভেবেচিন্তে দেখলাম ব্যবসা করাও আমার দ্বারা হবে না।

'মনে পড়ল দশ বছর বয়সে তার সেই ডাক্তার হওয়ার দুরাশার কথা!'

কত ঝামেলা, কত ঝকমারি। ও সব আমার পোষাবে না। তা ছাড়া, আজকালকার কাণ্ড-কারখানা দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সৎপথে থেকে ব্যবসা করা দায়, উন্নতি করাও কষ্টকর। জানেন তো আজকাল কার ব্যবসা হ'ল কালোবাজারের ব্যবসা। তাই আপাতত ও-দিকে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। আর, সম্প্রতি দেখছি কবিতা রচনার দিকে আমার কেমন একটা ঝোঁক এসে গেছে ইতিমধ্যেই একখানি মোটা খাতা নানা কবিতা লিখে ভরে ফেলেছি। সমস্ত মনোযোগ এখন এই দিকেই দিতে চাই। বন্ধুবান্ধবরাও তাই বলছে।

দেখলাম, ওর মনে এখনও উচ্চাশা আছে। কিন্তু নিজে মনে মনে একটু না হেসেও পারলাম না। যা হোক, প্রার্থনা করলাম, ঈশ্বর এই কবি-যশ-প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

এর-পরে আবার বছর কয়েক মলয়ের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তার পিতার সঙ্গেও আমি যোগাযোগ রাখতে পারিনি, কেননা নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। যা হোক, সেদিন প্রয়োজনবশতঃ বর্ধমান ষ্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলাম। ট্রেন আসতে তখনো বিলম্ব ছিল। হঠাৎ একখানি চেনা মুখ নজরে পড়ল। আমার সেই বন্ধুপুত্রের মুখ। মলয়ও দেখতে পেয়েছে আমাকে। কাছে এসে আমাকে অভিবাদন করল।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ? কোথায়, কী করছ আজকাল? বাবার খবর কি?

মলয় মুখ নীচু করে বলল, সম্প্রতি রেলের চাকরীতে ঢুকেছি। এই বর্ধমানেই আছি। বাবা মারা গেছেন কিছুদিন হ'ল।

বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করে প্রশ্ন করলুম: রেলে কী কাজ করছ? কত মাইনে পাও?

সে উত্তর করল: এখানকারই মালগুদামের আমি বড়বাবু। মাইনেপত্তর ভাল নয়, তবে বেশ দু'পয়সা উপরি পাওনা আছে।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছাড়বার উপক্রম হ'ল। পুরনো কথা স্মরণ করে ব্যথিত চিত্তে আমি গাড়ির একটা কামরায় উঠে পড়লাম। মনে পড়ল দশ বছর বয়সে তার সেই ডাক্তার হওয়ার দুরাশার কথা!

ছোটে ও মোটে

শ্রীগোপাল ভৌমিক

এক সময় ছোটে ও মোটে নামে দুই ভাই ছিল। তারা দরিদ্র হলেও খুব পরিশ্রমী ছিল এবং নিজেদের গাঁয়ে দিন-মজুরি খেটে খেটে তারা ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। কাজেই তারা অন্যত্র গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করবে বলে স্থির করেছিল। তারা দু'জনে দূরের একটি গ্রামে গেল। সেখানে ছোটে কাজ নিল একজন তেলির কাছে আর মোটে কাজ নিল একটি কুমোরের কাছে। দু'জনেরই কাজের চুক্তি হ'ল এক বছরের ভিত্তিতে।

ছোটের কাজ ছিল সকালে বলদের সাহায্যে তেলের ঘানি চালানো এবং দুপুরে খাবার খেয়ে ঘানির বলদকে খাওয়ানো এবং বলদটিকে নিয়ে মাঠে চরাতে যাওয়া। বলদটি কিন্তু খইল খেয়ে পেট ভরা থাকায় একজায়গায় স্থির হয়ে ঘাস খেত না—ছুটে বেড়াত গরুর পালের পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে বেচারী ছোটেকেও ছুটোছুটি করতে হ'ত তার পিছনে। প্রতিদিন এই রকম করে সে কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এই রকম কঠিন কাজ সে নিয়েছে বলে সে খুবই দুঃখিত হয়ে মনে মনে ঠিক করল যে, কোনরকমে চুক্তির বছরটা কেটে গেলে সে আর এ কাজে থাকবে না।

ওদিকে মোটের অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। কুমোর তাকে খুব বেশি খাটাতো; তাকে দিয়ে জল বয়ে আনাতো—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি খোঁড়াতো। আর এই এত কঠিন কাজের বিনিময়ে সে প্রভুর কাছ থেকে পেত শুধু ভর্ৎসনা।

একদিন দুই ভাই-এর দেখা হয়ে যাওয়ায় ছোটের কাজ কেমন চলছে জিজ্ঞাসা করল মোটে। ছোটে জবাব দিল: আঃ, আমি খুব সুখে আছি। সারা সকাল আমি আরাম করে ঘানির উপর বসে থাকি। তারপর পেট পুরে আহার করে বলদ চরাতে চলে যাই। খইল খেয়ে বলদের পেট ভর্তি থাকে বলে সে আমাকে কোন কষ্ট না দিয়ে এক জায়গায় শুয়ে থাকে। আমিও আরাম করে গাছের ছায়ায় বসে থাকি।

মোটে বলল: আমারও ভাগ্য খুব খারাপ নয়। আমাকে শুধু তিন-চার ঘড়া জল আনতে হয়। তারপর আমি ঘরের খেয়ে বিশ্রাম করি। তারপর মাটি খুঁড়ে এনে আমাকে তা চালতে হয়। তবু আমার কাজ তোমার মত কম তা আমি বলতে পারি না। তুমি কি তিন-চার দিনের জন্যে তোমার কাজ আমার সঙ্গে পালটে নেবে? তাহলে আমি একটু বিশ্রাম করতে পারি!

ছোটে সানন্দে রাজি হ'ল এবং দুই ভাই-এর প্রত্যেকে ভাবল যে সে লাভবান হয়েছে সকালে ঘানি চালাতে গিয়ে মোটের খুবই ভাল লাগল এবং দুপুরে বলদ চরাতে যাবার

'টাকার ঘড়া নিয়ে দু'জনে মিলে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব করল।'

সময় সে শোবার জন্যে একটি খাটিয়া নিল সঙ্গে। কিন্তু গ্রাম ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই বলদটি ডাক ছেড়ে ছুটল অন্য গরুর পালের পিছনে। আর সঙ্গে সঙ্গে মোটেকেও খাটিয়া মাথায় করে তার পিছনে ছুটতে হ'ল। সারা বিকাল বলদটি এই ভাবে তাকে ছুটিয়ে মারল।

এদিকে ছোটের অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। অনবরত জল ব'য়ে ব'য়ে তার অনভ্যস্ত কাঁধে ঘা হয়েগেল। কুমোরের বাড়িতে একটা আতা গাছ ছিল এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে আতা গাছের গোড়ায় টাকা পোঁতা ছিল। অপরিচিত ছোটে তা জানত না বলে কুমোর তাকে দিয়ে আতা গাছের গোড়ায় বার বার জল ঢালতে লাগল। তাকে বলা হ'ল যে, এই ভাবে এখানকার মাটি নরম হলে তা দিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করা হবে। ছোটে জল ঢেলে আতা গাছের গোড়ার মাটিটা নরম করল এবং সে জায়গাটা খুঁড়তে গিয়ে সে আবিষ্কার করল কয়েক ঘড়া টাকা। কাজেই সে আবার মাটি দিয়ে ঢেকে রেখে অন্য জায়গায় মাটি খুঁড়ল। সন্ধ্যায় মোটের কাছে গিয়ে সে সব বলল এবং টাকার ঘড়া নিয়ে দু'জনে মিলে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব করল। মধ্যরাত্রে দু'জনে আতা গাছের গোড়া খুঁড়ে টাকার ঘড়া তুলে নিয়ে পালিয়ে চলে গেল নিজেদের বাড়িতে। একমাস দু'মাসেও কেউ যখন তাদের খোঁজ করল না, তখন তাদের মনে হ'ল যে বিপদ কেটে গেছে। সেই টাকা নিয়ে জমি ও গরু কিনে তারা হালচাষে মন দিল এবং শীঘ্রই দু'ভাই ধনী হয়ে উঠল।

চুহলিকার চালাকী

শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

এক দিন সন্ধ্যাবেলা স্বদেশী যুগের নেতাদের কথা হতে হতে যেই মদনমোহন মালবীয়র কথা হয়েছে অমনি চুহলিকা বলে উঠলো. 'বাঃ বেশ নাম তো, সব 'ম' দিয়ে!' দাদু তার বুদ্ধি দেখে খুসী হয়ে বললেন, 'বা রে দাদুভাই, ঠিক ধরেছ তো!' তারপর বললেন, 'ওকে বলে অনুপ্রাস।' চুহলিকা জিজ্ঞেস করল, 'কাকে?' দাদু বললেন, 'ঐ রকম পরপর কথায় একই অক্ষর ব্যবহার করাকে, যেমন: মদনমোহন মালবীয় বা শ্যামবাজারের শশীবাবু।'

তারপর ক'দিন কেটে গেছে, কিন্তু ব্যাপারটা যে চুহলিকা ভুলে যায়নি সেটা টের পাওয়া গেল যখন সকালবেলা বাগানে দাদুর কাজের টেবিলের কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, 'দাদুভাই, আমার নামে যে বইটা তুমি লিখেছ সেটা কি ছাপতে চলে গেছে?' দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, কেন বল তো?' চুহলিকা বলল, 'না, তা'হলে নামটা বদলানো যেত!' দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'চুহলিকা নামটা তোমার পছন্দ হয় না?' চুহলিকা বলল, 'না, ভাল, তবে 'চুহলিকা চ্যাটার্জি হলে আরও ভাল হ'ত, দুটো "চ" হ'ত।' দাদু শুনে খুসী হয়ে বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু ইংরিজি তো চলবে না, ওটা করতে হবে, 'চুহলিকা চট্টোপাধ্যায়।' তাই শুনে চুহলিকা বলল, 'কিন্তু আমি যে জুতো পরে আছি!' দাদু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার সঙ্গে নামের কি সম্পর্ক?' চুহলিকা জবাব দিল, 'ঐ যে বললে, চটি পায়ে দেয়!' দাদু হেসে বললেন, 'চট্টোপাধ্যায়, হাঁদু, বাঙলায় চ্যাটার্জিকে চট্টোপাধ্যায় বলে।' চুহলিকা বলল, 'তা হলেও তো দুটো "চ" হয়?' দাদু বললেন, 'চামচিকে চট্টোপাধ্যায়' হলে আরও ভাল হ'ত, তিনটে "চ" হ'ত!' চুহলিকা হেসে ধ্যাৎ বলে আবার বলল, 'তোমার নামও তো, 'কে. কে. মুখার্জি, দুটো "ক"।' দাদু বললেন,

কে. কে. 'কাঞ্জিলাল' হলে আরও ভাল হ'ত, তিনটে "ক" হ'ত।' চুহুলিকা বলল, 'তুমি তো মুখার্জি,' কাঞ্জিলাল হবে কি করে?' দাদু বললেন, 'তা'হলে মুখার্জির সঙ্গে মিলিয়ে নাম হওয়া উচিত ছিল, মুরারীমোহন মুখার্জি।'
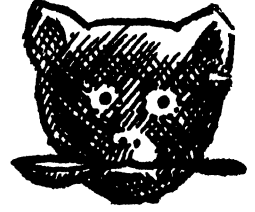
এই হ'ল আরম্ভ কথার খেলা নিয়ে। প্রথম প্রথম নাম নিয়েই হ'ত, যেমন: বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভস্মভূষণ ভট্টাচার্য, গোলাপগন্ধ গাঙ্গুলী, মৃগাঙ্কমৌলি মিত্র—এই সব।

ধীরে ধীরে কিন্তু ব্যাপারটাকে চুহুলিকা ক্রমেই জটিল করে আনলো। সে দাদুকে উস্কে দেবার জন্য নিজেই অনুপ্রাস দিয়ে কথা বলতো, যাতে দাদু তার জবাব দেবার জন্য মাথা ঘামান। এই যেমন একদিন সে বলল, 'দাদুভাই, চটপট চটি পরে চল, দিদিভাই ডাকছেন।' দাদু জবাবে বলতে বাধ্য হলেন, 'যাচ্ছি, কিন্তু যাবার জো কি? যা জবড়জং জুতো?' চুহুলিকা খুব খুসী।

আর একদিন সে চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে এসে বলল, 'দাদুভাই, কাকাতুয়া কত কথা কয়।' দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, আর কাঠঠোকরা কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে।' আরও একদিন সে বলল, 'বাইরে বাগানে বড় বেড়ালটা বিকট চ্যাচাচ্ছে।' দাদুকে জবাব দিতেই হ'ল, 'বোকা, ওকে বুনোবেড়াল বলে. বনবিহারীকে বলো বাক্সে বন্ধ করতে।'

এই থেকে কখন যে চুহুলিকা চালাকী করে দাদুকে অনুপ্রাসের কবিতায় নিয়ে গেল, দাদু টেরও পেলেন না। একদিন সে এসে বলল, 'দাদুভাই আমি একটি অনুপ্রাসের কবিতা বনিয়েছি।' দাদু বললেন, 'তাই নাকি, শুনি।' চুহুলিকা বলল,

'চুহু বলে চৈ, চৈ,
চিনির চামচ কৈ?'

দাদু তো শুনে খুব খুসী, বললেন, 'চালাক চুহু, চমৎকার!'

বললেন বটে, কিন্তু তাঁর মাথার মধ্যে 'অনুপ্রাসের' কবিতার কথা কেবলই ঘুরতে লাগলো। পরের দিন তিনি চুহুলিকাকে ডেকে বললেন, 'কাল তুমি চিনির চামচ খুঁজছিলে, তার কি হ'ল জানো? চুহুলিকা ঘাড় নেড়ে 'না' বলাতে দাদু বললেন, তবে শোনো—

চিনির চামচ নিয়ে চামচিকে পালালো,
চৈ আর চুহুলিকা চেঁচামেচি চালালো।

মা আর মঞ্জরী 'মার, মার' মুখেতে
দাদু আর দিদিভাই দুরু দুরু বুকেতে।
বন্দুক বগলেতে বুড়ো বুড্ডুর বাপ,
লিকলিকে ল্যাঙপ্যাঙে, লাগালো সে লাফ-ঝাঁপ।
তাই দেখে হিংসুটে হ্যাংলাটা হাসলো
চিমসুটে মুখ থেকে চামচেটা খসলো।
চোঁচা ছুটে চৈ আর চুহুলিকা চটপট
চামচেটা থামচিয়ে তুলে নিলো খটপট।
চিন্তিত চামচিকে চিৎকার চালালো,
পেত্নী-পিসীর বাড়ি পাটনায় পালালো!'

শুনে চুহুলিকার খুসী-ভরা চোখ দুটিতে দুষ্টুমির আলো জ্বলে উঠলো। সে বলল, 'দাদুভাই, চামচিকের পেত্নী-পিসীর বাড়ি যদি পাটনায় না হ'ত তবে তুমি কি করতে?' দাদু তাড়াতাড়ি কথাটা বদলাবার জন্য বললেন, 'আমি তোমার চামচ খুঁজেদিলুম আর তুমি আমায় মুস্কিলে ফেলবার চেষ্টা করছ?' চুহুলিকা বলল, 'না, দাদুভাই, বল না লক্ষীটি কি করতে?' দাদু এই ফাঁকে একটু ভেবে নিয়েছিলেন, বললেন, 'তা'হলে বলতুম—

চিন্তিত চামচিকে চিৎকার চালালো,
পেত্নী-পিসীর বাড়ি পাইপাই পালালো!'

দাদু পরীক্ষায় পাস হয়ে গেলেন দেখে চুহুলিকা খুব খুসী। সে বলল, 'দাদুভাই, তুমি ভয়ানক চালাক!'
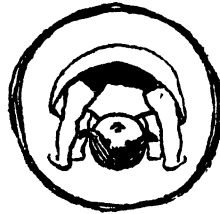
দিনের বেলা একটা জাহাজের যা ওজন হয়, রাত্রে তার চেয়ে কমে যায়। এটা হয় চাঁদের জন্য। জলকে আকর্ষণ করার ক্ষমতার চেয়ে একটা জাহাজকে আকর্ষণ করার শক্তি চাঁদের বেশী। ফলে, জাহাজের স্থানচ্যুতি কমে যায় ও রাত্রে তার ওজনও কমে যায়।

ভীমের সহস্রদল পদ্ম সংগ্রহ

শ্রীকমলেন্দু রায়

দূরে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর। কল্পনায় দেখা যায় ময়দানবের সৃষ্টি। শঙ্খধবল প্রাকার বেষ্টিত প্রাসাদ। প্রভাতে রামধনু রঙ্ তার শিখরে রঞ্জিত হয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

কিন্তু বৃথা এই কল্পনা! সবই আজ স্বপ্ন বলে মনে হয় পাণ্ডবদের। কল্পনা আর হৃদয়-চাঞ্চল্যই সার। কিন্তু এতে তৃপ্ত হয় না। বরং দুঃখই বাড়ে।

শকুনীর ষড়যন্ত্রে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত বিপর্যস্ত পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করে অবশেষে পুণ্য বদরিকাশ্রম এসে পৌচেছেন। বদরিকাশ্রমের পাশেই স্বচ্ছতোয়া গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। তটিনীর নিকটে দ্রৌপদী বসে থাকেন। পুণ্যতোয়া গঙ্গার দিকে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। গঙ্গার শরীর-শোভা তাঁর ভালো লাগে দেখতে। কেমন ফুলে-কেঁপে ওঠে কুলমালিনীর রূপ!

একে একে কতদিন পার হয়ে গেল পাণ্ডবদের বনবাসের। আরো কয়েক বৎসর পর তার মেয়াদ শেষ হবে। তটিনীর সিক্ততায় দ্রৌপদী বসে ভাবেন তাঁদের জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। কোথায় গেল সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর, আর তার শোভা, ঐশ্বর্য?

মনে পড়ে দ্যূত-সভায় আপন লাঞ্ছনার কথা। জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ সেদিন রক্ষা না করলে দুঃশাসনের হাত থেকে কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারত না। দুঃশাসনের রূঢ় আক্রমণে সমস্ত সভামণ্ডলী সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর ভয়-বিহ্বল ও করুণ দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে কৃষ্ণকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মনে মনে আকুল আহ্বান জানিয়েছিল।

হ্যাঁ, সেদিন দুঃশাসনের লজ্জাজনক অত্যাচার থেকে বাসুদেবই রক্ষা করেছিলেন। তাঁর সেই আর্তনাদে সেদিন তিনিই একমাত্র সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি যে বিপদত্রাতা নারায়ণ।

তারপর কালস্রোতে কেবল স্মৃতিচিহ্নই পড়ে আছে। গঙ্গার তীরে পরিভ্রমণ করতে থাকেন দ্রৌপদী। স্নিগ্ধ বাতাস। গঙ্গার কল কল শব্দ দ্রৌপদীর ক্লান্তি দূর করে। গঙ্গার সঙ্গে যেন তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

একদিন গঙ্গায় একটি সুগন্ধ, সুন্দর ও সহস্রদল পদ্ম ভেসে আসতে দেখে দ্রৌপদী ভীমকে অনুরোধ করেন, "দেখ দেখ, কী সুন্দর সহস্রদল পদ্ম! আমাকে আরো পদ্ম এনে দাও না।"

ভীম সেই সুগন্ধ, সুন্দর সহস্রদল পদ্ম সংগ্রহের জন্যে গন্ধমাদন পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু তিনি ভুল করে মানুষের অগম্য স্বর্গের পথে অগ্রসর হওয়ায়, তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান রুগ্ন বানরের রূপ ধরে পথরোধ করে শুয়ে থাকলো। ভীম বিস্মিত হন। কে এই

রুগ্ন বানর? মনে হয় রুগ্ন, অথচ বিশাল পর্বতের মতো এর আকৃতি!

যেন ভীমের সশব্দ নিঃশ্বাসের আঘাতেই নিদ্রা ভেঙ্গে যায় হনুমানের। সদ্য ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সে যেন বিরক্ত হয়েছে। রাগতস্বরে বলে, "ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে কেন?"

বিস্মিত ভীম বলে, "পথ ছেড়ে দাও।"

ঈষৎ হেসে উত্তর দান করেন হনুমান, "কেন?"

বিরক্তির সঙ্গে ভীম বলে, "পথ ছেড়ে দাও। গন্ধমাদন পর্বতে যাব।"

: কেন?

: দরকার আছে।

: কি দরকার?

: তা দিয়ে তোমার কি দরকার?

: তা'হলে পথ ছাড়বো না।

তখন ভীম বললেন, "হনুমান যেমন করে সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন, আমিও সেই রকম তোমাকে লঙ্ঘন করে যেতে পারতাম, কিন্তু প্রতি প্রাণীতে পরমাত্মা আছেন, তাই তোমাকে লঙ্ঘন করবো না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।"

ভীমের কথা শুনে হনুমান হেসে ওঠেন, "হাঃ হাঃ!" তারপর ভীমের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন। ভীমের মুখে নিজের নাম শুনতে পেয়ে তিনি রহস্য করে জিজ্ঞাসা করেন, "হনুমান কে? তিনি কি আমার চেয়েও বড়ো?"

ভীম হেসে ওঠেন। তীব্র শ্লেষের সঙ্গে উত্তর দেন, "হ্যাঁ, বানরপুঙ্গব! হনুমান পবনদেবের পুত্র। আর আমার অগ্রজ। তাঁর মতো আমিও শক্তিশালী। পথ ছেড়ে না দিলে যমালয়ে যেতে হবে!"

হনুমান যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন, এমনি বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিতভাবে বলেন, "তুমি এক মূঢ় বালক। আচ্ছা তোমাকে পথ ছেড়ে দেব। কিন্তু আমি বার্ধক্যের জন্য উঠতে অসমর্থ। আমার লেজটি সরিয়ে যাও।"

ভীম ভাবলো, এই বানরের এত বড় স্পর্ধা। এখনই এই সামান্য মর্কটের দর্পচূর্ণ করবো। ভীম বাঁ হাত দিয়ে হনুমানের লেজ তুলতে গিয়ে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে পড়লো। অতঃপর সে দুই হাত দিয়ে লেজটি তুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। এই পরিশ্রমে তাঁর শরীর থেকে স্বেদবিন্দু ঝ'রে পড়তে লাগলো। ওদিকে কিন্তু হনুমান নির্বিকারভাবে শুয়ে হাসতে লাগলেন। তখন বিস্মিত অথচ ভীত ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

অবশেষে ভীমের দর্পচূর্ণ হতে দেখে হনুমান নিজের পরিচয় দিল, "আমি রামভক্ত পবননন্দন হনুমান।"

'অতঃপর সে দুই হাত দিয়ে লেজটি তুলতে চেষ্টা করলো।'—পৃঃ ৩৩৪

এই কথা শুনে ভীম তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য সমুদ্র-লঙ্ঘনের সময় তাঁর যে রূপ ছিল, তা দেখাতে বললেন। হনুমানের ভীষণ বিন্ধ্যপর্বততুল্য দেহ দেখে ভীম অবাক বিস্ময়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

তারপর হনুমান ভীমকে পদ্মবনের সন্ধান দিয়ে বললেন, "কুবের ভবনের কাছে এক নদীতে এই পদ্ম আছে। কিন্তু সাবধান। কুবেরের অনুচররা সহজে পদ্ম দেবে না।"

কুবেরের অনুচরদের পরাস্ত করে ভীম সেই পদ্ম সংগ্রহ করে এনে দেন দ্রৌপদীকে।

আজব কুম্ভকর্ণ

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

আলসে কুড়ে ঘুম-কাতুরে
কুম্ভকর্ণ দাদা,
বপুটি কী বিরাট তাহার
দেখেই লাগে ধাঁধা
কাজকর্ম নেইকো তাহার,
পড়েই থাকে ঘুমের পাহাড় ;
বিরক্তি তার নেই একটু
শব্দ কর যত,
নড়ন চড়ন নেই কো চেতন
ঘুমায় অবিরত।

কুম্ভকর্ণ নাম কি সাধে
দিয়েছে সব লোকে ?
ঘুম তাড়াতে পারে না কেউ
নিত্য বকে বকে !
প্রহার খেলে আচ্ছা মতন,
তবেই হয় নড়ন চড়ন ;
ক্ষিদে তেষ্টা তবেই জাগে—
কোথায় এমন পাবে !
মোদের গাঁয়ের কুম্ভকর্ণ
কে দেখতে যাবে ?

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

খানিক বাদে চারজন চিনচিনিয়া কাকিনী মাসীকে ঝিনুকের খোলায় বসিয়ে ধরাধরি করে রাজসভায় হাজির করল। এই কাকীবুড়ী আশ্চর্য নগরের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তাই এর এত আদর।

সব শুনে কাকীবুড়ী বললে, "উঁহু, ও তিনটে মেয়েকে তো দেওয়া যাবে না। বড় জোর এমন অবস্থা করা যাবে যে, এদেশের পাঁচিলের ওপার থেকে তাদের তোমরা দেখতে পাবে।"

গুগ্‌লীঝিনুক বললে, "মুস্কিল হচ্ছে ওদের কেউই জানে না যে ওদের বাবা ফাঁসির আসামী। শীঘ্র তার ফাঁসি হবে। কাজেই যাতে কোন কাণাঘুষো ওদের কানে না পৌঁছয় সেজন্য ওদের একেবারে আলাদা করে ফেলা হবে। ওদের পরস্পর থেকেও ওরা আলাদা থাকবে। এসব ব্যবস্থার জন্যে ওদের নিয়ে আমাদের মস্ত এক সমস্যা।"

কাকিনী মাসী বললে, "ওদের প্রত্যেককে আলাদা করে এক-একটা বাগানের মধ্যে রাখতে হবে। মধ্যে থাকবে পাঁচিল। এক সঙ্গে মিশতে দিলে ভাতখেকোদের দেশের মত ওদের শিক্ষাদীক্ষা হবে এক প্যাটার্ণের। ভাতখেকোরা এমন উজবুক যে শয়ে শয়ে ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গে স্কুলে পড়তে পাঠায়—তার ফলে একের কু-অভ্যাস অন্যে শিখে ফেলে—একের দেখা-দেখি অন্যে হয় মুখ্যু, নানা কুসংস্কারে পূর্ণ, নকলনবীশ, অপদার্থ।"

গুগ্‌লীঝিনুক বললে, "আপনি যা বলবেন সেই ব্যবস্থাই করা হবে। এখন পাঁচিল খুব উঁচু করার দরকার নেই। ওরা যেমন বেড়ে উঠবে, দেওয়াল সেই সঙ্গে একটু একটু

করে উঁচু করলেই হবে। আমাদের মেয়েদের যেমন প্রত্যেক জন্মদিনে এক ফালি করে কেক জুড়ে তাদের বাড়াই—এই তিনটে ভাতখেকোর বেলায় সেই ব্যবস্থা পাঁচিলের উপর ইঁট বসিয়ে করা হবে। দেওয়াল তুলে আলাদা না করলে একজনের ভুল আরেকজন চট্ করে নকল করে খারাপ হয়ে যাবে। এক সঙ্গে পড়ানোর ফলেই ভাতখেকোদের মুল্লুকে এত বোকামি আর মুখ্যুমি। আশ্চর্য নগরে একটা নতুন আদর্শ শিক্ষার পরীক্ষা চলেছে।"

খুড়ো বললে, "কিন্তু আমাদের কি হবে?"

খুড়ী কাঁদোকাঁদো হয়ে বললে, "মেয়ে তিনটি তা'হলে আমরা পাবো না?"

চোরামাণিক্য ওদের কথায় কান না দিয়ে বলে উঠলেন, "কুচকাওয়াজ—সৈন্যদের মার্চ হবে এবার।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে একদল ক্ষুদে ক্ষুদে হাত-পাওলা ডিমের মত জীব এসে উট সেনাপতিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো। তারা সব বেঁটে লম্বা নানা আকারের। কিন্তু এমনভাবে সার দিয়ে দাঁড়ালো যে, প্রত্যেকে তার সামনের জীবটির চেয়ে ঢ্যাঙা এবং তার মাথার উপর দিয়ে সামনের সব কিছু দেখতে পায়।

এরাই এদেশের সৈন্য।

এদের সামনে একটি ফুটফুটে মেয়েকে একটা চেয়ারে বসানো হ'ল। এটি কয়েদীর মেয়ে। একে কুচকাওয়াজ দেখাবার জন্যে আনা হয়েছিল।

কাক হুশ করে উড়ে এসে খুড়ো-খুড়ীর কানে কানে এসে বললে, "তোমাদের তিনটি মেয়ের একটি ঐ মেয়েটি।"

সৈন্যরা একজন আরেকজনের পিছনে এই ভাবে দাঁড়ালো সারবন্দী হয়ে!

চোরামাণিক্য বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আশ্চর্য নগরের সৈন্য সংখ্যায় একশত দুইজন।"

গুগ্‌লীঝিনুক খাঁ বললে, "আগে আমাদের একশত জন সৈন্য ছিল। কিন্তু আমি বহু চিন্তার পর এর উপর দুটি সৈন্য বাড়িয়েছি। সামনে একটি আর পিছনে একটি। তার ফলে এদের মার্চ করানোর কত সুবিধা হয়েছে লক্ষ্য করবেন।"

মার্চ শুরু হ'ল—এদের মার্চ করার পদ্ধতিটি একটু ঘোরালো ধরণের। এরা দু' পা এগোয় তারপর এক পা পেছোয়। এগোবার সঙ্গে সঙ্গে এদের পায়ের শাদা ছাপ পড়ে মাঠের উপর। পেছোবার সময় সেই শাদা ছাপে পা মিলিয়ে ফেলে পেছোতে হয়।

আবার যখন পেছু হটবার দরকার হয় এরা দু' পা পেছোয়, তারপর এক পা এগোয়। এমন করে করে এরা খানিক এগিয়ে আবার পেছিয়ে চলে গেল। হন্‌হন্ করে এগোনো

ঝা ঝন্‌ঝন্‌ করে পেছোনো এদের নিষেধ।

কুচকাওয়াজের পর এদের একটা করে পিজবোর্ডের বাক্সের মধ্যে শুইয়ে দু'জন চিনচিনিয়া এদের বয়ে নিয়ে যেতে লাগল সেনানিবেশে।

হঠাৎ খুড়ো লক্ষ্য করলে কাকীবুড়ীর চোখটা যেন তার দিকে তাকিয়ে তাকে ইশারা করে কাছে যেতে বলছে। খুড়ো তার দিকে এগুতে গিয়ে দেখলে যে, সে দাঁড়কাকটা বুক থেকে ঝোলানো চোখটার দিকেই এগুচ্ছে। আসলে সেইটাই কাকীবুড়ীর চোখ কাজেই শেষ পর্যন্ত খুড়ো কাকীবুড়ীর দিকেই এগুলো।

কাকীবুড়ী তার ঝিনুকের খোলের মধ্যে বসেছিল। সে খুড়োকে বললে, "সৈন্য কাকে বলে তা এরা কেউ জানে না; দেশ ছেড়ে তো জন্মে কেউ বেরোয় নি! তা দুনিয়া কোথায় কি ঘট্‌ছে জানবে কি করে!"

কাকীবুড়ী বললে, "নিশ্চয়ই। আমি জানি সৈন্যরা মাংস কেটে ভাতখেকোদের খাবার ব্যবস্থা করে। তারা গাছ কেটে শিংওলা জন্তুদের খেতে দেয়। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি—সৈন্যরা ছুরি, করাত, বল্লম, তলোয়ার, কাস্তে, কুড়ুল নিয়ে ঘোরে—তারা পটকা ফাটায়, ছুঁচোবাজী ছাড়ে।" খুড়ো বললে, "সৈন্যদের আসল কাজ হ'ল যুদ্ধ করা।" কাকীবুড়ী বললে, "এ রকম অদ্ভুত কথা তো শুনিনি। যুদ্ধ যদি করে তো কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?" খুড়ো বললে, "কেন, অপর পক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে।"

কাকীবুড়ী কোকো করে হেসে বললে, "সে কি করে সম্ভব! নিজেরা নিজেদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? একথা শুনিনি, দেখিনি, পড়িনি—বিশ্বাস হয় না।"

খুড়ো বললে, "বিশ্বাস করো ছাই না করো, আমি যা বলছি তা সত্যি-সত্যি-সত্যি।"

কাকীবুড়ী অবিশ্বাসের হাসি হেসে ফিস্‌ফিস্‌ করে গুগ্‌লীঝিনুক খাঁ-কে বললে, "সৈন্য কি সে সম্বন্ধে এ লোকটা কিচ্ছু জানে না।"

গুগ্‌লীঝিনুক খাঁ বললে, "সে কথা আর বলতে, লোকটা একেবারে চৈতন!—"

কাকীবুড়ী তাকে বলতে লাগল, "একবার সে অনেক অনেক বছর আগে একবার আমার এক জ্ঞাতি আমাকে একটা ছবি পাঠিয়েছিল। সেটা এক দেশের রাজসভার ছবি। তাতে পুস্পানিয়ার রাজাকে ঘিরে কতকগুলো সৈন্য দাঁড়িয়েছিল; তাদের বুকগুলো সোনার পাত দিয়ে মোড়া—আসলে সেগুলো সোনার ডিমের খোলা। সেই দেখাদেখি আমরাও একটা সৈন্যদল গড়ে ফেললুম। আমাদের সৈন্যরা হচ্ছে হাত পা-ওলা ডিম। কিন্তু এদের হাতে অস্ত্র দিতে বলেছিলুম, কই অস্ত্র তো দেয়নি। বিশবার করে বললুম অস্ত্র দিতে। অস্ত্র না হলে আবার সৈন্য হবে কি করে, শুধু মাথায় পালক গুঁজে দিলে বুঝি সৈন্য হয়!"

একটু বেড়াও-চেড়াও আশ্চর্য নগরটা দেখে যাক-

.. বললে, "বড্ড 'ক্ষিদে—"

খুড়ো বললে, "যা বলেছ! পেট চুঁই চুঁই করছে—খাবারের খোঁজে আমরা রইলুম!"

গুগ্লীঝিনুক ঝাঁ বললে, "রাজামশাই, সভাভঙ্গ না করলে কিচ্ছুটি হচ্ছে না!"

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ একটা ঝাপ্সা কুয়াশা ধোঁয়ার মত নেমে এল আর শ্লেটের উপর নেতা বুলুলে যেমন করে শ্লেটের লেখা বেমালুম মুছে যায়, তেমনি রাজসভাটা গেল হাওয়া হয়ে!

শুধু রইল গুগ্লীঝিনুক ঝাঁ, প্যাপীলিক আর খুড়ো আর খুড়ী।

হঠাৎ গুগ্লী বলে উঠল, "খাবার, খাবার—দরজা দিয়ে এসো—দরজা দিয়ে এসো—"

খুড়ী প্যাপীলিককে জিজ্ঞাসা করলে, "বলি, দরজা আবার কোথায়? ধারে-কাছে কই তো দরজা-টরজা কিছু দেখছি না।"

প্যাপীলিক বললে, "দেয়াল নেই কিন্তু দরজা আছে, তাই চোখে পড়ছে না—ঐ দেখ দরজা, আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে—"

বাগানের প্রান্তে মাটি থেকে একটা দরজা বসানো। সেখানে গুটিপোকা দ্বার রক্ষা করছে। সে তেমনি পেল্লায় চাবি হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

প্যাপীলিক বললে, "দরজাটা ইচ্ছে করেই ছোট করা হয়েছে—যাতে এক সঙ্গে একজন মাত্র যেতে পারে।

রান্নাঘরে সবাই খেতে বসেছে। খুড়ো খুড়ী কিছু খেয়ে নিয়ে আর কি খাওয়া যায় তাই ভাবছে—এমন সময় মাঠের দিকে একটা আর্ত-আওয়াজ উঠল: "জেলখানা আসছে—জেলখানা ধরতে আসছে—পালাও, পালাও..."

সঙ্গে সঙ্গে খাউনেরা সব পিল্‌পিল্ করে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। খাবারগুলোও রান্নাঘর থেকে দে দৌড়...

মাঠের মধ্য দিয়ে গুগ্লীঝিনুক ঝাঁ, চোরামাণিক্য বাহাদুর, সারস সেনাপতি, দাঁড়-কাক সব্বাই ছুটতে লাগল।

প্যাপীলিক বললে, "এ দেশের জেলখানা চলন্ত—কয়েদী জেলের মধ্যে বন্দী হয়ে দৌড়োয়—জেলখানা গাড়ীর মত চাকার ওপর গড়িয়ে চলে—দেশময় ঘুরে বেড়ায়। আমাদের জেলখানায় একজন মাত্র কয়েদী অত্যন্ত দুর্দান্ত সে।"

চীৎকার ক্রমশঃ বেড়ে সেইদিকেই সোরগোল এগুতে লাগল। প্যাপীলিক বললে, "এই ধারে সরে দাঁড়াও—ঐ দেখ একটা আখের ক্ষেত এগিয়ে আসছে—"

আরো কাছে এলে দেখা গেল—জেলখানাটা আখ গাছ দিয়ে ঘন করে ঘেরা খাঁচার মত। খাঁচাটা ঝড়-খাওয়া বাঁশ ঝাড়ের মত এগিয়ে আসছে।

খাঁচার ধাক্কায় কয়েকটা বাড়ী হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। কিছু কেকরালি ইত্যাদি চাপা পড়ে মরে পড়ে রইল পথের মাঝে।

আরো কাছে এলে দেখা গেল, আখের খাঁচার মধ্যে কয়েকটা ইঁদুর বসে আছে কাচের মার্বেলের মত তাদের চোখ জ্বলছে। তাদের পায়ে দমকলওলাদের মত গামবুট, গায়ে বর্ষাতি, মাথায় লোহার টুপী। তাদের কারো হাতে ঝারি, কারো হাতে হোস্‌পাইপ্‌ বা পিচকারী—সবাই আখের গোড়ায় জল ঢালছে।

আখের ক্ষেতের পিছনে পিছনে একটা জলের ট্যাঙ্ক চাকার উপর গড়গড়িয়ে বিপুল শব্দে এগিয়ে আসছে—তাকে টেনে নিয়ে আসছে একটা সজারু—তার মুখে লাগাম পরানো, আর তাকে চালাচ্ছে খরগোশ গাড়োয়ান।

জেলখানা এগুতে দেখে একদল পরচুলওলা রান্নাঘরের মালপত্র, চেয়ার-টেবিল সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

ক্রমশঃ আখের ক্ষেত একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। ইতিমধ্যে গোড়ায় জল পেয়ে আখের গাছগুলো বেড়ে বেড়ে প্রায় বাঁশের মত হয়ে উঠেছিল। সেই বড়ো বড়ো বাঁশের মত আখের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একজন দাড়িওলা ঢ্যাঙা বুড়োকে, তার পরনে ছেঁড়াখোঁড়া ধুধ্‌ধুড়ি পাজামা আর সার্ট। এই লোকটাই তবে কয়েদী। একী পাগল? এর গলা থেকে মালার মত খালি দেশলাইয়ের খোল ঝোলানো। লোকটা মট্‌ মট্‌ করে আখ গাছ ভেঙে জেলখানা থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জল দেবার জন্যে আবার নতুন গাছ জন্মে ফাঁক পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

খুড়ো বললে, "লোকটা আস্ত পাগল!"

খুড়ী বলে উঠল, "পাগল না হাতী! ঐ ওরাই ওকে পাগল করে তুলেছে।"

খুড়ো বললে, "জানো? এরই তিনটে সুন্দরী মেয়েকে ওরা বন্দী করে রেখেছে।"

খুড়ী বললে, "ওকে আর ওর মেয়েদের নিয়ে আমাদের পালাতে হবে এদেশ থেকে।"

দেখা গেল জেলখানার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক উড়ুক্কু মাছ উড়ে উড়ে আসছিল। তাদের মুখে নথের মত একটা করে গোল আংটি লাগানো—তারা আখের মাথা ছোঁয়া মাত্র আখ গাছ শুকিয়ে যাচ্ছিল। আর জল দেবার জন্যে তারা আবার গজাচ্ছিল—কাজেই কয়েদীর বন্দী দশা ঘুচছিল না।

প্যাপীলিকের কাছ থেকে খুড়ো খুড়ী জানলে যে, উড়ুক্কু মাছেদের মুখে আংটি পরিয়েছিল গুগ্‌লীঝিনুক খাঁ। এগুলো ম্যাজিক আংটি। এর ছোঁয়ায় জিনিস গজানো বা বেড়ে ওঠা বন্ধ হয়।

হঠাৎ দেখা গেল কয়েদী জেলখানার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। এত খাটলে ঘুম পাওয়াই তো স্বাভাবিক। সে ঘুমিয়ে পড়ায় ইঁদুরগুলো কাজ বন্ধ করে হাত পা ছড়িয়ে জিরোতে লাগ্‌ল। জল দেওয়া বন্ধ হ'ল। জেলখানা সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

সীতা-হরণ

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

বহুদিন পরে তাপসের চিঠি পেলুম। লিখেছে বছরখানেক আগে ইতালী থেকে সে দেশে ফিরেছে, কিন্তু তাকে সোজা দিল্লী যেতে হয়েছিল ভারত সরকারের জন্য কয়েকটা ছবি আঁকতে। পরশু দিল্লী থেকে ফিরেছে, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে খুবই ক্লান্তি বোধ করছে বলে সে আসতে পারছে না। আমিই যেন তার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করি।

কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বছর ছয়েক আগে সে ইউরোপে গিয়েছিল সে দেশের আধুনিক আর্ট সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে। বিদেশে যাবার পর থেকে তার আর কোনো খবর পাইনি। এতদিন পরে এই চিঠি।

তাপসের চিঠি পেয়ে পরের দিনই বিকেলে তার বালীগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। দরজায় বেল টিপতেই তাপসের বাবার আমলের চাকর নিতাইদা দরজা খুলে আমাকে দেখেই একটু হেসে বললো, মানস দাদাবাবু যে! এসো, এসো, ঘরে বোসো। দাদাবাবু বাড়ীতেই আছে, ডেকে দিচ্ছি।

বাইরের ঘরে ঢোকবার পরেই সামনের দেয়ালে নজর পড়লো। দেখলুম, প্রায় দু'হাত লম্বা ও দেড়হাত চওড়া সোনালী ফ্রেমে একটা হালকা নীল রঙের কাগজ বাঁধিয়ে টাঙানো রয়েছে। এতো দামী ফ্রেমে শুধু একটা কাগজ বাঁধিয়ে রাখার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলুম না। একটু এগিয়ে ফ্রেমটার কাছে গিয়ে দেখে বুঝলুম, যেটাকে শুধু কাগজ বলে মনে করেছিলুম সেটা তা নয়—, কিন্তু তাতে যা আঁকা আছে, তা এতোই সূক্ষ্ম যে কাছ থেকে না দেখলে নজরে পড়ে না। দেখলুম, কাগজটার মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত একটা মাত্র সরলরেখা, আর সেই রেখার ঠিক মাঝখান থেকে নীচের দিকে একটা অর্ধবৃত্তের রেখা ছাড়া সেই কাগজটার ওপরে আর কিছুই নেই।

ছবিটার সামনে দাঁড়িয়েই সেটার মর্ম বুঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় ভেতর দিকের দরজা দিয়ে তাপস ঢুকলো এবং আমাকে দেখেই চেচিয়ে উঠলো, আরে মানস! উঃ কতদিন পরে দেখা! হাত ধরে টেনে বললো, আয়, বোস্।

দুই বন্ধুতে একটা কোচ দখল করে বসবার পর, তাপস পকেট থেকে আমাকে একটা লজেন্স দিয়ে নিজে একটা নিয়ে বললো, যে ছবিটা তুই অত তন্ময় হয়ে দেখছিলি সেটা দেখে তুই বোধ হয় বেশ একটু অবাক হয়ে গেছিস্, তাই না? তা অবাক হবার কথাই, কারণ ওটা একটা আলট্রা-মডার্ণ,—মানে অতি-আধুনিক আর্টের নমুনা। এতদিন এ দেশে এই আর্টের চলন ছিল না, আমিই প্রথমে এদেশে এর প্রবর্তন করেছি। ও ছবির কথা এখন থাক, পরে হবে।

সে কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বোস্, আগে চা ও কিছু খাবারের কথা বলে আসি।

চা ও জলখাবার খাওয়া শেষ করে কৌচে আরাম করে বসার পর তাপস বললো, ইউরোপ থেকে ফেরার পর সে দেশে শেখা অঙ্কনপদ্ধতি অনুসরণ করে আজ পর্যন্ত অনেকগুলি ছবি এঁকেছি ও বিক্রী করেছি। আমি এ ঘরে আসবার আগে তুই ঐ যে ছবিটা দেখছিলি, ওটাই আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি,—অতি আধুনিক আর্টের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ছবিটা সম্বন্ধে তাপসের উচ্ছ্বাস শোনবার পর আমি একটু ভয়ে-ভয়েই বললুম। তুই যখন বলছিস ঐ ছবিটা তোর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তখন ওটা নিশ্চয়ই তাই হবে। কিন্তু আমি তো ভাই বুঝতে পারছি না ওটা কিসের ছবি।

আমার কথায় তাপস যেন একটু অবাক হয়ে গেলো, সে কি রে? আজ পর্যন্ত আমি যতগুলি ছবি এঁকেছি, এটার মতো কোনোটাই এত স্পষ্ট নয়। তবু কেন যে তুই বুঝতে পারলিনে আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না!

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললুম, আমি ভাই আর্টিষ্ট নই। সাধারণ জ্ঞানের একজন মানুষ। বলনা ভাই ওটা কিসের ছবি?

কেমন যেন ভাবগদগদ কণ্ঠে তাপস বললো, সীতা-হরণের।

ঘুমন্ত অবস্থায় তাপস যদি আমার বুকে আচমকা একটা চড় মারতো তাতে আমি যতটা না চমকে উঠতুম, তার চেয়ে ঢের বেশী চমকে উঠলুম ওটা সীতা-হরণের ছবি শুনে। কি হিসাবে ওটা সীতা-হরণের ছবি হতে পারে কিছুতেই তা মাথায় ঢুকলো না। মনে মনে ভাবলুম, এটাই যদি তাপসের আঁকা অন্য সব ছবিগুলোর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে আকার নমুনা হয়, তবে তার অন্য ছবিগুলো যে কেমন হতে পারে ভাবতে গিয়ে শরীরটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠলো। যাহোক একটু সামলে নিয়ে তাপসকে বললুম, ছবিটাতে যে সরল ও অর্ধবৃত্ত রেখা দুটো আছে সেগুলো যে স্পষ্ট তাতে কোনো সন্দেহই নেই, কিন্তু ভাই, ঐ দুটো রেখা দিয়ে আঁকা ছবিটা কি করে সীতা-হরণের ছবি হয়, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু বুঝিয়ে দিবি ভাই।

তাপস বললো, নিশ্চয়ই দেবো, কিন্তু তার আগে রামায়ণের সীতা-হরণের পর্বটা একটু সংক্ষেপে ঝালিয়ে নিলে বোধ হয় ভালো হয়, নইলে ছবিটার মর্মার্থ ঠিক হয়ত বুঝতে পারবি না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে তাপস আবার শুরু করলো। বনবাসে থাকা কালে যখন রাম পঞ্চবটীবনে কুটীর নির্মাণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বসবাস করছিলেন, তখন একদিন
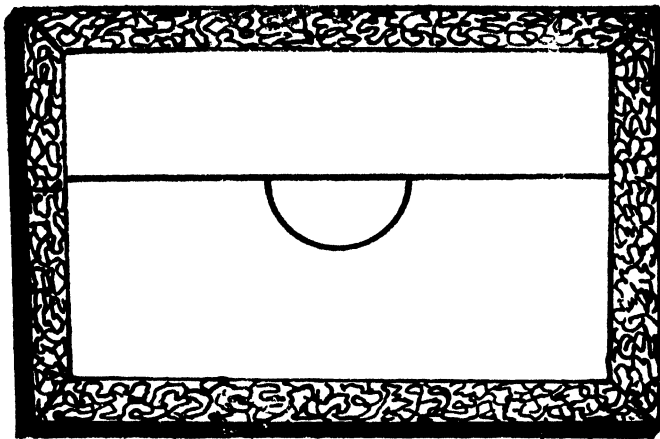
সূর্পণখার অশিষ্ট আচরণের জন্য লক্ষ্মণ তার নাক কেটে দেন। সূর্পণখার মুখে তার দুর্দশার কথা শুনে তার দাদা রাবণ প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তাঁর আদেশে মারীচ রাক্ষস স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করে পঞ্চবটী বনে গিয়ে সীতাকে প্রলো-ভিত করলো। সীতার অনু-রোধ এড়াতে না পেরে রাম স্বর্ণমৃগ ধরতে গেলেন এবং লক্ষ্মণকে পাহারায় রেখে গেলেন। কিছু সময় পরে রামের কণ্ঠের 'হা লক্ষ্মণ'-'হা লক্ষ্মণ' আর্তনাদ শুনে রামের সাহায্যে সীতা লক্ষ্মণকে পাঠালেন। যাবার আগে লক্ষ্মণ কুটীর দ্বারের সামনে একটা গণ্ডি কেটে সীতাকে বলে গেলেন, তিনি যেন কোনো কারণেই সেই গণ্ডির বাইরে না যান। রাম ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুনির ছদ্মবেশে রাবণ সীতার কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন। সীতা গণ্ডীর ভেতর থেকেই ভিক্ষা দিতে গেলে রাবণ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতিথি নারায়ণ ফিরে গেলে স্বামী ও দেবরের অকল্যাণ হবে এই চিন্তায় লক্ষ্মণের সতর্কবাণী ভুলে গিয়ে সীতা গণ্ডির বাইরে আসতেই রাবণ তাঁকে হরণ করলেন।

এই পর্যন্ত বলে তাপস মাথা ঘুরিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললো, ঐ যে সরু লাইনটা, যেটা এধার থেকে ওধার পর্যন্ত চলে গেছে, সেটা তোর চোখে সামান্য একটা সরু সরলরেখা বলে মনে হোলেও ওটা তা নয়। ওটা হোলো পঞ্চবটি বনের দিগন্ত রেখা। আর ঐ যে অর্ধবৃত্তটা দেখছিস,—ওটাই তো লক্ষ্মণের দেওয়া সেই গণ্ডি।

তাপস এবার আমার দিকে ফিরে বললো, জানিস মানস, নিভৃতে যখনই ঐ ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই যেন সীতা-হরণের দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কানেও যেন শুনতে পাই রাবণ-কবলিত সীতার কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ!

এক রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সত্যি তো! মহারাণী কথাটা মহারাজার কাছে পাড়ে। নানা কাজে মহারাজার সময় নেই। দুপুরে খাবার সময় কথা বলার সুযোগ। মহারাজা মখমলের আসনে খেতে বসে। সোনার থালায় সোনার বাটিতে, সোনার গেলাসে খায়। পোলাউ, মাছ, মাংস, মোণ্ডা-মেঠাই, দই-ক্ষীর থরে থরে সাজান। মাহারাণী কাছে বসে, সোনা-বাঁধান ময়ূরের পাখায় হাওয়া করে।

মহারাণী বলি-বলি করে কথাটা বলল। ভাল কথা, তাই ধান-দূর্বা নিয়ে বসেছে।

আজ পিঁয়াজের ফোড়ন দিয়ে নানা ভাজাভুজি, পোলাউ, কোর্মা রান্না হয়েছে। খেয়ে মহারাজার মনে তাজা তাজা ভাব।—

রাজার খেলার কথা শুনে বলল, "ছেলেমানুষ খেলবে বই কি?"

মহারণী বলে, "সঙ্গী নিয়ে খেলতে চায়।"

মহারাজা বলে, "তা ছাড়া কি খেলা হয়? তা সঙ্গীর অভাব কি? তুমি আছ, আমি আছি, আহ্লাদী আছে, জল্লাদী আছে, রঙ্গ করে খেলা করুক।"

মহারাণী বলে, "এ সঙ্গী নিয়ে নয়।"

মহারাজা বলে, "তা হলে মহামন্ত্রী আছে, মহাসেনাপতি আছে, মহাকোটাল আছে, কোলাকুলি খেলা খেলুক।"

মহারাণী বলে, "ওরা তো বুড়োমানুষ। ওদের ছেলে হলে বরং—"

মহারাজা তখন চোখবুজে কৈ মাছের মুড়ো চিবুচ্ছিল। খেই হারিয়ে বলল, "আচ্ছা ওদের ছেলে হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করব।"

মহারাণী বলল, "বাঃ রে, ওদের ছেলে হ'তে শাঁখের ফুঁ শুনলে, খাজা-গজা পাঠান হ'ল, ওদের নামে 'মহা'শব্দ জুড়লে!"

মহারাজা দু'হাতে মথা চুলকে বলে, "তাই তো! রাজকার্যে নিজের নাম ভুল হয়ে যায়। আর এ তো পরের ছেলে।"

মহারাণী বলে, "ওদের ছেলে কতবড়টি হয়েছে?"

মহারাজা হাঁক দেয়, "মহাকোটাল।"

মহারাণী বলে, "তাকে কেন?"

মহারাজা বলে, "ওদের ছেলেদের মেপে দেখুক কত বড় হয়েছে।"

মহরাণী বলে, "ওরা তো রাজার এক মাস পর পর হয়েছে।"

মহারাজা হাঁকে, "রাজা!"

রাজা তখন আহ্লাদীর পিঠে ঘোড়া চেপেছে। বলে, "হেট হেট।" সে অবস্থায় কাছে এসে বলে, "কি বাবা?"

মহারাজা বলে, "এসো তো, মেপে দেখি।"

রাজা এসে দাঁড়ায়। মহারাজা এঁটো হাতে তাকে মেপে দেখে। তারপর মহারাণীকে বলে, "মাসে ক'আঙ্গুল বড় হয়েছিল মহারাণী?"

মহারাণী তা জানে না। বলে, "কেন?"

মহারাজা বলে, "ওরা রাজার একমাস পরপর হয়েছিল তো। আন্দাজ করা যেত। ধর—" মহারাজা আঙ্গুল দেখায়।

মহারাণী তা ধরে। মহারাজা বলে, "আঙ্গুল ধরলে যে!"

মহারণী বলে, "ধরতে বললে যে!"

মহারাজা বলে, "উঁহু হু! ধরার জন্য ধরতে বলিনি। হিসেবের জন্য ধরতে বলেছি। যেমন ধর, ধরহে লক্ষ্মণ।" তারপর মহারাজা হিসেব করে বোঝায়—"একদিনে যদি এক চুল বড় হয়, এক মাসে অর্থাৎ তিরিশ দিনে হবে তিরিশ চুল।" তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মহারাণীর চুল ধরে।

মহারাণী আহা আহা করে বলে, "এঁটো হাতে ধরলে! এখন আবার চান করতে হবে।"

মহারাজা বলে, "ধরার জন্ম ধরিনি। মাপার জন্ম ধরেছি। তা মনে করে নিতে হয়। তিরিশ চুলে ক'আঙুল দেখতে হবে তো! তবেই না বুঝব, রাজার চেয়ে ওরা কতখানি ছোট।"

মহারাণী তার চুলের মাপ বোঝে। কিন্তু শক্ত-পোক্ত অঙ্কের মাপ বোঝে না। তাই ক ধাপ পিছিয়ে মহারাজার দিকে চেয়ে থাকে।

মহারাজা বলে, "ঠিক আছে। হয়ে যাবে'খন। ওদের ডেকে পাঠাই। তুমি মেপে-জোকে দেখ। প্রজার ছেলে যখন নয়, মজা করে খেলবে।"

খবর পেয়ে মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি আর মহাকোটালের ছেলেরা আসে। নিজের ছেলে রাজার তারা খেলার সাথী হবে বলে মহারাণীর আহ্লাদের সীমা নেই।

মহারাণী শাঁখ বাজায়, অহ্লাদী বাজায় কাঁসর, আর জল্লাদী ঘণ্টা। মহারাণী তাদের কানে প্রসাদী ফুল গুঁজে দেয়। তারপর ঘটা করে খাওয়ায়। উলু দেয়। আর উলু শুনে রাজার মন আহ্লাদে চুলবুল করে। তার খেলার লায়েক কিনা তা পরখ করার জন্ম মহারাণী তাদের মেপে দেখে, টিপে দেখে। তারপর তাদের খেলার জায়গা দেখিয়ে দেয়। শ্যাওড়া, গাব আর তেঁতুল তলায় শান বাঁধান স্থান। মহারাণীর জানালা থেকে দেখা যায়।

তারা মহারাণীকে প্রণাম করে যায়। রাজা বাইরে এসে বলে, "আমি রাজা। কিসে যাব? পাল্কী কই?"

সত্যি তো! পাল্কী নেই। মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল এ-ওর দিকে চায়। তারপর হাত-ধরাধরি করে পাল্কী বানায়।

রাজা বসে। বলে, "হাঁক দাও।"

পাল্কী-বেয়ারার শব্দ করতে হয়। তারা শব্দ করে—

"রাজা বড় ভারি, রাজা বড় ভারি।
হাতির মতন অনেক ওজন,
বইতে নারে পারি। রাজা বড় ভারি—"

সত্যি তারা পারে না। খানিক যেয়ে তাদের হাত খুলে যায়,—আর রাজা ঝুলে পড়ে। ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে বলে, "কেমন বেয়ারা?"

ওরা বলে, "আমরা পেয়ারের পাত্র-মিত্র। শ্যাওড়া তলায় নিয়ে যাচ্ছি।

রাজা বেদীতে গ্যাঁট হয়ে বসে। বলে, "কি বল মন্ত্রী?"

ওরা রাজসভার আদবকায়দা জানে না।

মন্ত্রী বলে, "কিছু বলিনি।"

তখন রাজা বলে, "কি বল সেনাপতি?"

সেনাপতি বলে, "কিছু বলিনি।"

তখন রাজা রেগে যায়। বলে, "তোমরা কিস্‌স্যু জান না। আমি যা বল্‌ব তোমরা বল্‌বে ঠিক।"

ওরা তিনজন চেঁচিয়ে ওঠে, "ঠিক।"

রাজা শেখায়, "অমি করে নয়। একজন একজন করে।"

ওরা তাই করে। রাজা বলে, "উহু, যার নাম ধরে ডাকব, সে বল্‌বে ঠিক।"

ওরা ঠিক শিখে নেয়। রাজকার্য শুরু হয়।

রাজা বলে, "শিকার করতে হবে। তার তীর-ধনুক কৈ?"

ওরা তিনজনে বলে, "ঠিক।"

রাজা হাতবাড়িয়ে বাঁশ ঝাড় দেখায়। বলে, "বাঁশ দিয়ে তৈরী করতে হবে। দা চাই, দড়ি চাই।"

তারা দৌড়াদৌড়ি, করে আনে। বাঁশ কেটে তীর-ধনুক তৈরী করে। তারপর আশ মিটিয়ে শিকার খোঁজে। কাঁচা হাত। তাক করতে পারে না। আর পাখীগুলো পাখ-সাট মেরে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। তখন ওরা পশু খোঁজে। তক্ষক, কাঠবেড়াল আর বানর। কিন্তু জুত হয় না। কাঠবেড়াল এ গাছে ও গাছে লাফিয়ে পালায়। বানর ভেংচি কাটে, কলা খেয়ে খোসা ছোঁড়ে। আর ওরা খোসায় পা পিছলে আলুর দম! ছুটে ছুটে ওদের দম আটকায়। তখন রাজা বলে, "তীর দিয়ে তাক হয় না কেন, মন্ত্রী?"

মন্ত্রী বলে, "তাগদ নেই। তাই—"

রাজা বলে, "কিসে তাগদ হয়?"

সেনাপতি বলে, "খেয়ে।"

কোটাল বলে, "ঠিক।"

গাছে গাছে অনেক ফল। তারা পেড়ে খায়। খেয়ে লোভ বাড়ে। তখন সব রকম ফল খেয়ে, খায় শাঁকালু। তারপর শাঁকালু ভেবে খায় ওলকচু! তারপর গলা চুটমুট করে, ফোলে। ওরা গলাধরা ভুলে গিয়ে বলে, মোটা হয়েছি। ঠিক আছে।"

এবার তাক লাগান দিগ্বিজয়! কিন্তু তার জন্য হাতি চাই। ঘোড়া-চাই। একদিন ছিল, আজ নেই। পরমাই শেষ হতে মরে গেছে।

রাজা বলে, "মন্ত্রী—"

মন্ত্রী বলে, "ঠিক—"

রাজা বলে, "হাতি শালে হাতি নেই, কিন্তু ষাঁড় আছে। ঘোড়া শালে ঘোড়া নেই, কিন্তু গাধা আছে। আর গোশালে আছে গোরু, ছাগল, ভেড়া। তাতে চলবে না?"

সেনাপতি বলে, "ঠিক।"

তখন তারা ষাঁড়, গাধা, ছাগল, ভেড়া নিয়ে আসে। হাওদা নেই, জিন নেই,—তার কুচপরোয়া নেই। পিঠে চড়ে যাওয়া কথা। রাজা সবচেয়ে বড়। সে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে। পিঠে ধনুর্বাণ, হাতে লাল নিশান। মন্ত্রী চড়ে গাধায়, সেনাপতি ভেড়ায়, আর কোটাল রাম ছাগলে।—

কিন্তু বাহনগুলো এগুতে চায় না। দিগ্বিজয় রাজার ধর্ম,—তা মস্তবড় কর্ম। কিন্তু ওরা তার মর্ম বোঝে না। আসলে ওরা চর্মসার। হাড় বার করা শরীরে বোঝা বইতে পারে না। তখন রাজা বুদ্ধি বার করে।

কোটালকে বলে, "ঘাস পাতার আঁটি বাঁধ। তারপর ওদের দেখিয়ে গুটি গুটি এগোও।

কোটাল তা করে। তখন খাবার লোভে বাহনগুলো এগোয়। এগোয় কি, নেচে নেচে চলে। আর তাদের পিঠে ঝকর ঝকর করে রাজা, মন্ত্রী আর সেনাপতির পেছনের ছাল ওঠে। দিগ্বিজয় মাথায় থাক, তারা নাবতে পারলে বাঁচে।

রাজা বলে, "আজ এই অবধি। একদিনে বেশী হলে আর কোন রাজ্যই থাকবে না।"

মন্ত্রী আর সেনাপতি বলে, "ঠিক।"

রাজা লাল নিশান ওড়ায়। তারপর তা পুঁতে চিহ্ন দিয়ে রাখবে। কিন্তু তা আর হয় না। লাল রং দেখে ষাঁড় রুখে দাঁড়ায়। ক্ষেপে গিয়ে শিং দিয়ে মাটি গুঁতায়।

ওদের পূর্বপুরুষের কেউ নাকি মোষের সঙ্গে লড়ে মরেছে। মোষের গুঁতোয় পেট ফুঁড়ে বেরিয়েছিল অনেক লাল রক্ত। তাই লাল রং দেখে এখনো তারা রেগে তপ্ত হয়।

রাজা ছিটকে পড়ল। রাজা বলে ষাঁড় তাকে গুঁতাল না। তা না গুঁতাক। গায়ে ব্যথা আর ধুলো কাদা লেগেছিল। রাজা কাঁদ কাঁদ হ'ল। বলল, "আরও গায়ে জোর করে তবে দিগ্বিজয়।" সঙ্গীরা বলে, "ঠিক।"

তখন জোরদার হবার জন্ত তারা ডাংগুটি, গোল্লাছুট, হাডুডু খেলা ধরে।

ক'দিন পরে রাজা হাত বাড়িয়ে বলে, "মন্ত্রী, হাত বাড়াও।"

মন্ত্রী হাত বাড়ায়, আর রাজা হাত মুচড়ে দেয়। মন্ত্রী হাত টেনে বলে "কি হ'ল?"

রাজা বলে, "পাঞ্জা লড়ে দেখলাম কত জোর হ'ল।"—

কিন্তু জোর আর হয় না। তখন তারা লাফায়, ঝাপায়, ডিগবাজি খায়, ঢিল ছোঁড়ে। যেখানে-সেখানে ঢিল, তারপর একদিন মারে মৌচাকে!

মৌমাছি ওরা দেখেছে। গুনগুন করে ফুলের মধু খায়। তাদের মধুর স্বভাব বলেই জানে। হলে কেমন শূলের খোঁচা তা জানে না। ওদের মধুভাণ্ড খেতে অনেক আনন্দ। এক সঙ্গে তাক আর তাগদ দুই হবে। কিন্তু যেই মৌচাকে ঢিল লাগা, ভ্যান্ ভ্যান্ করে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল।

আকাশ-যুদ্ধ ওরাই প্রথম বার করেছে। শয়ে শয়ে মৌমাছি ওদের আক্রমণ করল। মধু খেয়েও হলে বিষ। ওরা কুটুস কুটুস হুল ফোটায় আর বাবারে বলে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল বেহুস হয়ে ছোটে! কিন্তু বাড়ী ফিরে আজকের জেরবারের কথা রাজা কাউকে বলে না। আহ্লাদী আর জল্লাদী জিজ্ঞেস করে, "ফুলে ঢোল হলে কি করে?"

রাজা বলে, "গোল্লাছুট খেলে।" (ক্রমশঃ)

রামধনু

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

তোমরা নিশ্চয়ই রামধনু দেখেছো, তাই না? বৃষ্টির ঠিক পরে সূর্য বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশের যে দিকে থাকে, ঠিক তার বিপরীত দিকে অপরূপ বর্ণের অর্ধবৃত্তাকার একটি বিরাট ধনুক যখন হাসতে থাকে, খুব সুন্দর লাগে দেখতে, না? ছোট ভাইবোনেরা দেখতে পেলে ছুটে এসে বলে, "দাদা, দাদা দেখবে এসো, কি সুন্দর রামধনু উঠেছে আকাশে!" মা-ঠাকুমারা কি বলেন বলতো—শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক, তাই না? বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু সে কথা মানেন না—যেমন তাঁরা মানেন না যে, আমাদের এই বিশাল পৃথিবীটা নাগরাজ বাসুকীর সহস্র ফণার উপর বিরাজ করে।

আকাশের বুকে ঐ বিচিত্র বর্ণময় ধনুকটি শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক, আমাদের এই পৃথিবী বাসুকীর ফণার উপর বিরাজ করছে এবং বাসুকী ক্লান্ত হয়ে পড়লেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়, এসব বিশ্বাস করার মধ্যে কিন্তু বেশ আনন্দ আছে। কারণ, এ আমাদের ছোটবেলা থেকে শোনা মা-ঠাকুমার স্নেহ-সিঞ্চিত গল্প-কথা। এ ধরণের গল্প কিন্তু বিদেশেও প্রচলিত আছে। যেমন, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেল ধর্মগ্রন্থে অ্যাদম ও ইভের একটি সুন্দর গল্প বলা হয়েছে।

এ গল্পকথা আমাদের মনকে ভরিয়ে তোলে, আর বিজ্ঞানের সত্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণ মনকে ভাবিয়ে তোলে; একটিতে সহজ ও সরল আনন্দের খোরাক জোটে, অপরটিতে সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা জাগে।

যাই হোক তোমাদের কাছে আজ আমি রামধনুর কথা বলবো, অর্থাৎ আকাশের বুকে ঐ বিচিত্র বর্ণময় ধনুকটি কেন দেখা যায় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তার আগে কিন্তু তোমাদের আলোকের বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী কি তা জানতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে সাদা আলোক (সূর্যরশ্মি) মৌলিক নয়, ইহা সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমষ্টি। এই বর্ণগুলি হলো যথাক্রমে বেগুনী (Violet), নীল (Indigo), আসমানী (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। নামগুলি মনে রাখার সুবিধের জন্য প্রতি বর্ণের ইংরাজী নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে 'VIBGYOR' কথাটি সৃষ্টি হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে বর্ণগুলির বাংলা নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে 'বেনীআসহকলা' কথাটি লিখেছেন। সাদা আলোক এই সাতটি বর্ণের রশ্মির সম্মিলিত রূপ। তোমরা অনেকে তিন পলা কাঁচ দেখে থাকবে, ইংরাজীতে এই তিন পলা কাঁচকে প্রিজম্ (Prism) বলে। পূর্বে উৎসব অনুষ্ঠানে যে সব ঝাড়লণ্ঠন জ্বালা হতো, তাতে

এই প্রিজমগুলিকে ঝুলিয়ে রাখা হতো। অবশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির যুগে ঝাড়লণ্ঠন এখন অতীতের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, হয়তো এখনও যে সব পল্লীগ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা নেই, সেখানে কোনও অভিজাত গৃহে থাকতে পারে। বিজ্ঞান-পরিকল্পিত সভ্যতায় এসেছে উগ্রতা তাই বৈদ্যুতিক তীব্র আলোকে অতীতের ম্লান ঝাড়লণ্ঠন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়।

এই তিন-পলা কাঁচ বা প্রিজ্‌মের মধ্যে দিয়ে সাদা আলোক গেলে তা সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে ভাগ হয়ে যায়, একেই আলোকের বিচ্ছুরণ বলা হয় এবং এই বিভক্ত রশ্মিগুলির সামনে একটি পর্দা রাখলে, পর্দার উপর বিভিন্ন বর্ণের যে রঙীন প্রতিফলন সৃষ্ট হয়, তাকে বর্ণালী বলা হয়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে স্যার আইজাক নিউটন সর্বপ্রথম আলোকের বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন এবং তিনিই প্রথম দেখান যে সাদা আলোক মৌলিক রশ্মি নয়, ইহা সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমষ্টি।

আকাশের বুকের বিচিত্র বর্ণময় ধনুকটি অর্থাৎ রামধনুর জন্য আলোকের বিচ্ছুরণই দায়ী। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আকাশের মেঘগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সূর্যের প্রখর তাপে নদ-নদী ও সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায় এবং মেঘের সৃষ্টি করে। বৃষ্টিপাতের ঠিক আগে কিংবা ঠিক পরে, মেঘের মধ্যেকার এই জলকণাগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে ওঠে, এবং এই জলকণাগুলিই প্রিজ্‌মের কাজ করে। সূর্যরশ্মি এই সকল জলকণারূপী প্রিজ্‌মের উপর পড়লে তা সাতটি বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে যায়, অর্থাৎ সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণ হয়। বিভিন্ন জলকণা থেকে ঐ একই ভাবে সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণের ফলে আকাশরূপ পর্দার বুকে জেগে ওঠে এক বিচিত্র বর্ণালী, যেন এক সুনিপুণ শিল্পীর অপরূপ শিল্পকর্ম। এই বিচিত্র বর্ণালীকেই আমরা রামধনু বলে থাকি। বৃষ্টির সঙ্গে এই রামধনুর নির্ভরশীলতার জন্য ইংরাজীতে রামধনুকে বলা হয় 'Rainbow'। তোমরা বড় হয়ে যখন বিজ্ঞান পড়বে, তখন এই রামধনু সম্পর্কে আরো অনেক জটিল তত্ত্ব জানতে পারবে।

তা'হলে আমরা এই জানলাম যে, রামধনু সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এবার ছোট ভাইবোনেরা যদি রামধনু দেখে ছুটে আসে তোমাদের কাছে, তা'হলে তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবে তো যে ও রামধনুর সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের কোন যোগ নেই।

মনে রাখবে রামধনু শুধুমাত্র বৃষ্টির ঠিক আগে কিংবা ঠিক পরে দেখা যেতে পারে, আকাশের যে দিকে সূর্য থাকবে ঠিক তার বিপরীত দিকে রামধনু সৃষ্ট হবে এবং সূর্যালোক না থাকলে অর্থাৎ রাত্রিকালে রামধনু দেখা যেতে পারে না।

রোগজীবাণু ও ধূলিকণা

সুখরঞ্জন রায়

পৃথিবী জল ও স্থল এই দু'ভাগে বিভক্ত বলে তোমরা জানো। আবার দৃশ্য ও অদৃশ্য এই দু'ভাগেও পৃথিবীকে ভাগ করা চলে। এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ পাশাপাশি রয়েছে, এবং শুধু পাশাপাশি কেন, একের ভেতরে অন্য প্রবেশ করে দু'য়ে ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে। দৃশ্য জগতে আছে জীবজন্তু, গাছপালা, পাথর, মাটি, নদী, গিরি, বন যা কিছু চোখে দেখা যায় সবই। যারা অদৃশ্য জগৎ গড়ে তুলেছে খালি চোখে তাদের দেখা যায় না, অথবা খুব কমই দেখা যায়। রোগের জীবাণু ও বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা এই অদৃশ্য জগতেরই অন্তর্গত। এই অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকের অণুবীক্ষণের কাছেই বেশী ধরা পড়ে। কোন কোন ধূলিকণা বিশেষ অবস্থায় খালি চোখে পড়লেও মোটের ওপর তা এত সূক্ষ্ম যে তাকেও অদৃশ্য জগতের বস্তুই বলা যেতে পারে।

এই অদৃশ্য জগৎ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর জিনিসে গঠিত। কিন্তু ক্ষুদ্রেরও যে কতবড় শক্তি, ক্ষুদ্রও যে বৃহৎকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং এমন কি বৃহতের সুখ-দুঃখ ও জীবন-মরণের কারণ হতে পারে, এই জীবাণু ও ধূলিকণার কথা ভাবলেই আমরা তা বুঝতে পারি।

এই ধূলিকণা শুষ্ক ও সূক্ষ্ম আকারে কঠিন অবস্থায় সর্বত্র বায়ুতে বিচরণ করছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ধূলি তরল অবস্থাতেও বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। যেখানে বায়ু সেখানেই ধূলি, ধূলি ছাড়া কোথাও বায়ু নেই। এই ধূলি প্রতিনিয়তই আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে গ্রহণ করছি।

বহু রোগের জীবাণু বাতাসে ভেসে বেড়ায় তা তোমরা হয়ত জান। এসব রোগের জীবাণু ধূলিকণার চেয়েও বহুগুণ সূক্ষ্ম। ধূলিকণাই হচ্ছে এসব রোগজীবাণুর বাহন, ধূলিকণাই রোগের জীবাণুকেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায়।

এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে বলেই ধূলি সম্বন্ধে লোকে এখন এত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। শহরের রাস্তায় সকাল-বিকাল জল দেবার রীতির কথা তোমরা জান। তা ধূলি নিবারণেরই উপায়। খাদ্যবস্তুতেও যাতে বাইরের ধূলি এসে না পড়তে পারে, সেজন্য মিষ্টি ও অন্যান্য অনেক খাবার-দোকানে খাদ্য সাজিয়ে রাখবার স্থান কাচ দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা আছে।

ধূলিকণা সম্বন্ধে এরূপ সাবধানতা প্রত্যেক বাড়িতেও অবশ্য অবলম্বন করা উচিত। খাদ্যদ্রব্য সর্বদাই ঢেকে রাখা দরকার। ঘর ঝাঁট দেবার আগে জল ছিটিয়ে নেবার রীতি আছে। এটা খুবই ভাল, এতে ধূলিকণাগুলি জমে আবর্জনার সঙ্গে ঘরের বাইরে পরিত্যক্ত

হতে পারে। ঘরের মেঝে এবং আসবাবপত্রও রোজই ভিজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলা ভাল ব্যবস্থা।

খাদ্যবস্তু ঘর ও ঘরের আসবাবপত্র সম্বন্ধে এই সাবধানতা নেওয়া সম্ভব। কিন্তু অসীম বায়ুমণ্ডলে ছড়ানো ধূলিকণায় চড়ে যে অসংখ্য রোগ-জীবাণু নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের শরীরের ভেতর প্রবেশ করছে, তাদের সম্বন্ধে কি বিধান? সারা দুনিয়ার পথ-ঘাট না হয় জলসিক্ত করে রাখা গেল, কিন্তু সমস্ত বায়ুমণ্ডলে জল ছিটিয়ে দেওয়া কিংবা তাতে ঝাঁটা চালানো তো আর সম্ভব নয়!

কাজেই প্রশ্ন হতে পারে—বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা যখন প্রতিনিয়তই আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে রোগের জীবাণু আমাদের শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তখন সব সময়ই আমাদের রোগ থাকে না কেন? এর উত্তর হচ্ছে—বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা রোগজীবাণু যেমন বয়ে বেড়াচ্ছে, আবার তেমনি জীবের শরীরে সেই রোগজীবাণুকে প্রতিরোধ করার কতকগুলি প্রকৃতিদত্ত উপায়ও রয়েছে। রোগজীবাণু-বাহক ধূলিকণা প্রথমে বাধা পায় নাকের রোমরাজিতে। নাকের সিক্ত রোমরাজিতে ধূলিকণা আটকিয়ে যায় বলে রোগজীবাণু চট করে শরীরের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না, আর সেই বাধা পেরিয়ে কোনো জীবাণু ভেতরে ঢুকলেও সেখানে রেহাই পায় না। শরীরের বাইরে বাতাসে যেমন শত্রু-জীবাণু রয়েছে, শরীরের ভেতরেও তেমনি রয়েছে মিত্র-জীবাণু তারা দেহরক্ষার কাজ করে থাকে। বাইরের শত্রু ভেতরে প্রবেশ করলেই দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং বেশীর ভাগ সময়ই শত্রুদের ঘটে পরাজয়। সময় সময় দেহরক্ষীরা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, অথবা শত্রুরা হয়ে ওঠে অতিশয় প্রবল, তখনই আমাদের রোগের উৎপত্তি হয়।

এদিক দিয়ে ধূলিকণা মানুষের চরম শত্রু। কিন্তু অন্যদিকে ধূলিকণা যে মানুষ এবং সমগ্র জীব ও উদ্ভিদ জগতের পরম মিত্রও এ কথা তোমরা হয়ত কল্পনাও করতে পার না। তোমরা হয়ত শুনে অবাক হবে যে, ধূলিকণা সূর্যালোককে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ এবং সমস্ত সৃষ্টির মহা উপকারসাধন করে থাকে।

তোমরা হয়ত মনে কর আমরা সূর্য থেকেই সাক্ষাৎভাবে আলো পেয়ে থাকি, কিন্তু তা' ভুল। সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলে ছড়ানো ধূলিকণায় এসে আগে পড়ে, এবং সেই ধূলিকণা থেকেই প্রতিফলিত হয়ে চারদিকে পৃথিবীর সমস্ত স্থানে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ধূলিকণা না থাকলে সূর্যের আলো পৃথিবীতে সমানভাবে কখনো ছড়াত না, এবং এক জায়গায় তীব্র আলোক অন্য জায়গায় ঘন অন্ধকার বিরাজ করত। গাছের দেয়ালের আড়াল, ঘরের ভেতর কিংবা সূর্যবিমুখ দিক—সূর্যের রশ্মি যেখানে সোজা পৌঁছয় না, ধূলিকণা থেকে

প্রতিফলিত আলোকের জন্যেই সেই সব স্থানে অস্পষ্ট আলো দেখতে পাই। বায়ু হতে ধূলিকণাকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে পারলে দেখা যেত গাছের নীচে, দেয়ালের আড়ালে কিংবা ঘরের পাশে সম্পূর্ণ নিবিড় অন্ধকার বিরাজ করছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানের বায়ু হতে ধূলিকণা সম্পূর্ণ দূর করা যায়। এইভাবে একটি আবদ্ধ কক্ষ থেকে ধূলিকণা সম্পূর্ণ দূর করে তাতে শুধু সূর্যালোক প্রবেশের একটিমাত্র ছিদ্র রেখে দেখা গেছে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মিরেখা ছাড়া সকল স্থানেই বিরাজ করছে নিবিড় আঁধার। কিন্তু তোমরা জান আবদ্ধ ঘরের বায়ু ধূলিপূর্ণ থাকা সাধারণ অবস্থায় সেই ঘরে কোন ছিদ্র-পথে একটিমাত্র সূর্যরশ্মি প্রবেশ করলেও সমস্ত ঘরটিই অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। ঘরের বায়ু ধূলিপূর্ণ না থাকলে সেই ছিদ্র দিয়ে সোজা সূর্যালোক প্রবেশের পথটি ছাড়া ঘরের অন্য সমস্ত অংশ সূচীভেদ্য জমাট অন্ধকারে পূর্ণ থাকত।

এ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধূলিকণাই সূর্যালোককে চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে দিবালোকের সাম্য রক্ষা করে। তা নইলে সমগ্র সৃষ্টিটাকে দিনের বেলায়ও সম্পূর্ণ সাদা এবং সম্পূর্ণ কালোয় ছককাটা ঘরের মত অথবা সাদা-কালো দাগকাটা সুবিশাল এক শঙ্খচূড়ের দেহের মত দেখাত।

একটি ঝিনুক

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

একটি ঝিনুক কুড়িয়ে পেলাম সাগর পারে
রাখবো তারে যতন করে, গাঁথবো হারে।
কা'রও চোখে দেয়নি ধরা লুকিয়ে থেকে,
আমায় যেন কুড়িয়ে নিতে বললো ডেকে।

ঝিনুকগুলো সাগর বুকে লুকিয়ে থাকে
কে জানে কোন রঙের কবি চিত্র আঁকে!
মরণ পরে ফুরিয়ে গেলেও জীবন-লীলা
রঙ ঢালে তায় পান্না চুনী সাগর নীলা।

হয়তো জানে আমার দু'চোখ রঙের আশে
বালির গাদায় খুঁজতে তাকে নিত্য আসে।
মরেও যে তার দাম কমেনি, হয়তো ভাবে
মধ্যমণির সম্মানই সে আগাম পাবে।

সে সব রঙের খাঁটি কদর বোঝে যারা
বুকে তুলে সত্যি আদর করবে তারা
পোকার হাড়ের মূল্য কি বা বলবে জানি
তবু ইনাম পাবে রঙিন নক্সাখানি।

ঠিক দাওয়াই

শ্রীঅরুণাভ চক্রবর্তী

শিয়ালপণ্ডিত আর পণ্ডিতগিরি করেন না। তিনি ক'দিন যাবৎ অসুখে ভুগছেন, খাবারও পান না। পাবেন কি করে, ছেলেপিলেরা যা অলস অকর্মা—কোন কাজই করতে চায় না। পণ্ডিতের গিন্নী ছেলেপিলেদের কত মারধোর করেন, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হয় না। এদিকে খাবার কেনার মতো টাকাকড়িও নেই, দেনাও জমেছে অনেক। কি করা যায়? অনেক দিন অসুখে ভোগার পর পণ্ডিতমশাই সেদিন কিছুটা সুস্থবোধ করছিলেন, তিনি চেয়ারে বসে এক মনে হুঁকো টানছেন। এমন সময় হঠাৎ হুঁকোটা নামিয়ে রেখে গিন্নীকে ডেকে বল্লেন—"তোমার ছেলেদের কাউকে মেরে-ধরে ডাক্তার ডাকতে পাঠাও না, আমার অসুখটা যদি আবার বাড়ে, তা'হলে সংসারের খাবার যোগাবে কে?"

শেয়াল-গিন্নী তার বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তারের খোঁজে। ছেলে কি আর করে, হাঁটতে হাঁটতে হাজির হ'ল বদ্যি পেঁচার কাছে। বদ্যি পেঁচা শিয়ালপণ্ডিতের ছেলেকে দেখে মোটা ঘাড়টা একটুখানি বাড়িয়ে বলে উঠলেন—"তোমার বাবার অসুখ তো, ও আমার দ্বারা হবে না। আমার তিনি-তিনটে বাচ্চাকে ও সাবাড় করেছে!" এই বলে বদ্যি পেঁচা কোটরের মধ্যে মাথা ঢুকালো। পণ্ডিতের ছেলে আবার হাঁটতে হাঁটতে ধর্ণা দিল গিয়ে বনবিড়ালের বাড়িতে। এই বিড়াল বাবাজীর ওষুধ একবার পড়লেই ঠিক কাজ হবে। কিন্তু বনবিড়াল বেরিয়ে এসেই ল্যাজ ফুলিয়ে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—"তোমার বাবার অসুখ? সে আমার মুখের খাবারটা থাবা মেরে নিয়ে গিয়েছিল, আর আমি কিনা দেব তার ওষুধ!" এই বলে সে তরতর করে গাছের মগডালে গিয়ে বসল।

ঠিক এই সময় পথ দিয়ে ফিরছিলেন ডাঃ হাতী, কম্পাউণ্ডার মিঃ জিরাফকে নিয়ে সিংহের বাড়ীর রুগী দেখে। পথে পণ্ডিতের ছেলে ডাঃ হাতীকে দেখে বলল—"ডাক্তারবাবু, বাড়ীতে বড়ই বিপদ। আপনি না হলেই নয়।" ডাঃ হাতী তাঁর কম্পাউণ্ডার জিরাফকে নিয়ে হাজির হলেন শিয়ালপণ্ডিতের সুড়ঙ্গের কাছে। ছেলে সুড়ঙ্গে ঢুকে তার বাবাকে বাইরে ডেকে দিলে। শিয়ালপণ্ডিতকে বাইরে আসতে দেখেই হাসতে হাসতে গলায় স্টেথিস্কোপটা ঝুলিয়ে ডাক্তার হাতী বল্লেন—"সুপ্রভাত পণ্ডিতমশাই, এরকমটা কাহিল হয়ে পড়লেন কেমন করে?"

"আর বলেন কেন মশাই, ঘরে টাকাকড়ির যা টানাটানি।"

ডাঃ হাতী একটু চিন্তিত মনে বল্লেন—"তা, আমার দক্ষিণাটা পাব তো?" "হ্যাঁ হ্যাঁ, তা পাবেন বৈকি, নিশ্চই পাবেন।"

এবার ডাঃ হাতী খুশি মনে তাঁর কম্পাউণ্ডার মিঃ জিরাফের গলা থেকে শুঁড় দিয়ে

'ডাঃ হাতী জিরাফের গলা থেকে ওষুধের ব্যাগটা নামিয়ে আনলেন।'

ওষুধের ব্যাগটা নামিয়ে আনলেন। খোঁজাখুঁজি করে হলুদ মতন একটা ওষুধ শিয়ালপণ্ডিতকে খেতে দিলেন।

"থুঃ থুঃ, ওয়াক্ থুঃ। কী তেতো ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু?" ডাঃ হাতী বল্লেন—"এই ওষুধ না খেলে আপনাকে আর বাঁচতে হচ্ছে না।"

কম্পাউণ্ডার জিরাফ তখন মালমশলা ঘষে-পিষে বারটা পুরিয়া তৈরী করে শিয়ালপণ্ডিতের হাতে দিয়ে বল্লেন—"সকাল-বিকাল দুটো করে।" তারপরই ডাঃ হাতী হঠাৎ বলে উঠলেন—"দেখি দেখি, আপনার বুক-পিঠটা। আরো দাওয়াই বোধহয় লাগবে।"—

এই না বলেই তিনি তার গলার স্টেথিস্কোপটা কুলোর মত কান দুটোতে লাগিয়ে পণ্ডিতের বুক-পিঠটা দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন—"নাঃ, বুকে কোন দোষ দেখছিনে, এবার দেখি পিঠটা।...এ কি! পিঠে এমন ঘা হ'ল কেমন করে? এ কথা তো আগে বলেন নি!"

শিয়ালপণ্ডিত কাঁদো কাঁদো স্বরে বলতে লাগলেন—"ওদিকে পাঁচু ঘোষালের বাড়ীতে দুটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগী প্রতিদিন চরে বেড়াত। আমি দূর থেকে তাই দাঁড়িয়ে দেখতাম। একদিন লোভ সামলাতে না পেরে একটার ঘাড়ে খ্যাক্ করে একটুখানি দাঁত বসিয়েছি কি ঘোষালের ছোট ছেলেটা ছুঁড়ে মারল বর্শা—ঠিক আমার পিঠটার উপর। আমি কোনো ক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। সেদিন থেকেই আমার—" আর বেশী না শুনেই ডাঃ হাতী শিয়ালপণ্ডিতের হাত থেকে পুরিয়াগুলি ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"ঠিক দাওয়াইটি তো আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। এবার চলি।"

চায় না, চায়

শ্রীমনোজিৎ বসু

এ-যুগেতে হলধর মারামারি চায় না,
বন্ধুর সাথে কভু ছাড়াছাড়ি চায় না,
দুধে-জলে এতটুকু মেশামেশি চায় না,
প্রতিবেশীদের সাথে রেষারেষি চায় না,
হাতে যদি আসে তবু কালো টাকা চায় না,
দিনের বেলায় ঘরে বাতি থাকা চায় না,
অপরের ঘাড় ভেঙ্গে কিছু পেতে চায় না,
সন্দেহ-বশে কারও পিছু যেতে চায় না,
নগদেই কেনে সব, বাকি নিতে চায় না,
সবচেয়ে তাজ্জব, ফাঁকি দিতে চায় না॥

এ-যুগেতে হলধর খিদে পেলে খেতে চায়,
ধার দিয়ে টাকাকড়ি তাও ফিরে পেতে চায়,
ঘুম পেলে হাই তুলে বিছানায় শুতে চায়,
ময়লা লাগিলে হাতে তাও নাকি ধুতে চায়,
ছেলেটা কাঁদিলে তারে কোলে তুলে নিতে চায়,
মেয়ে বড় হ'লে নাকি তার বিয়ে দিতে চায়,
শীতকালে কম্বল শরীরে জড়াতে চায়,
খেটেখুটে বাড়ি ফিরে পা-দুটো ছড়াতে চায়,
আঁধারেতে হলধর শুনি নাকি আলো চায়,
সবচেয়ে তাজ্জব, সকলেরি ভালো চায়॥

মণিপুরের দোল ও নাচ

শ্রীঅরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

মানুষের জীবনের আর পাঁচটা আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। নানা উৎসবের বিচিত্র প্রকাশ বিভিন্ন দেশে। ভারতের উৎসবেও বৈচিত্র্যের অভাব কোথায়? আর ভারত তো দেশ নয়, একটা গোটা মহাদেশ। তাই তার বিভিন্ন আঞ্চলিক উৎসবের কত না রকমফের!

এবার আমি আমাদের নিজেদের দেশের উৎসব নিয়েই কিছু লিখতে চাই। বারান্তরে বিদেশের দিকে ফিরলেই হবে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ক্ষুদ্র দেশ মণিপুর। এককালের বহু গৌরবের ঐতিহ্য বহন করছে এই ক্ষুদ্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি। এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৯ লক্ষের মত, আয়তনও নয় হাজার বর্গমাইলের কাছাকাছি। এই রাজ্যে মণিপুরীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, নাগাদের সংখ্যাও কম নয়। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও আছেন এখানে অনেক। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল শহরকে তো পুরোপুরি ওদেশের লোকের শহর বললে ভুল হয়। কারণ কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সারা ভারতের লোকের ভিড় ওখানে।

বেশবাস ও শিক্ষায় মণিপুর আজ সারা ভারতের মধ্যে বেশ অগ্রসর রাজ্য। এখানকার অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার পরিচয় তাদের ঝলমলে পোষাকে এবং মেদপুষ্ট পীতাভ শ্রীমণ্ডিত চেহারাতে। এটা বৈষ্ণবদের দেশ। তাই এদেশের উৎসবের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসবের মিল রয়েছে—চেহারায় না হলেও নামে।

দোল এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব। বাংলাদেশের দোলের মত এখানকার দোলের পরিসমাপ্তি মাত্র একদিনে নয়, দিন-তিনেক ধরে এটা চলে। আমাদের অঞ্চলের মত রং খেলা যার-তার মধ্যে ওখানে চলে না। রং খেলাটা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে ওখানে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাই রং দেওয়া নিয়ে কলকাতার মত মারামারি, হানাহানি ও মনোমালিন্য এখানে নেই।

দোলের উৎসবকে কেন্দ্র করে ছোট মেয়েদের আনন্দের শেষ নেই। এই সময় তারা ফূর্তির জোয়ারে ভেসে চলে। এ সময়টা তাদের অবাধ স্বাধীনতা চলে ঢালাও ভাবে পয়সা সংগ্রহের।

পথচারীর বিপদের শেষ নেই। দলে দলে মেয়েরা তাকে ছিনে জোঁকের মত ছেঁকে ধরবে। পয়সা না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া মুশকিল। তিন-চারদিন ধরে ওদের এই অভিযান চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, তারপর জাঁক করে চলে ভোজ-পর্ব।

এরপর শুরু হয় বিভিন্ন পাড়ার মাঠে-ময়দানে ঢালাওভাবে গণনৃত্য। ছেলেমেয়েরা

হাত ধরাধরি করে এক বিরাট বৃত্ত রচনা করে নেচে চলবে ঘন্টার পর ঘণ্টা। এ বৃত্ত অচল নয়, সচল। নৃত্যেরই তালে তালে এগিয়ে চলে মেয়ে-পুরুষরা। কেউ ক্লান্ত হলে তার স্থান পূরণ করে অন্য কেউ। এ নাচ বেশ কয়েকদিন ধরে চলে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার—এ নাচে যে-কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। সুন্দর এ নাচ। শিল্পীর কৌশল নাচের প্রতিটি ভঙ্গীতে। বহিরাগতদের তো কথাই নেই, এখানকার স্থায়ী অধিবাসীদের কাছেও এ নাচ স্বর্গরাজ্যের সুষমা নিয়ে হাজির হয়।

মণিপুরীদের শারীরিক শক্তি সারা ভারতে আদর্শস্থানীয়। তাই তাদের এতে ক্লান্তি নেই, বরঞ্চ এই নাচের মাঝেই এরা খুঁজে পায় জীবনের অর্থ, নূতন উৎসাহ ও ঘর-বাঁধবার প্রেরণা। বসন্তে এই হয় উৎসব। এ সময় বর্ণাঢ্য ফুলের সম্ভারে ঢেকে যায় মণিপুরের গাছপালা। এরই মাঝে উজ্জ্বল পোষাক পরা মেয়েদের নাচ ইন্দ্রপুরীর ঝলমলে চেহারা নিয়ে হাজির হয়।

কিন্তু মণিপুরী নাচ বোধ হয় একদিন তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে। কারণ তার সূচনা আজকেই দেখা দিয়েছে। আধুনিকরা আজ সযত্নে তাদের জাতীয় নাচ পরিহার করতে শুরু করেছে। নাচের এই দুর্বলতা বুদ্ধিমান দর্শকের অগোচরে থাকে না। কালের পরিবর্তনে এটা শুধু শিশু-নৃত্যে পর্যবসিত হলেও অবাক হব না।

পাখী

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ওড়ে পাখীগুলি, মেলি ছোট ছোট পাখা।
লাল, নীল—কত মত রঙ গায়ে মাখা।
দেখিলে সে রূপ, যায় জুড়াইয়া আঁখি,
বড় ভালবাসি তাই ছোট ছোট পাখী।

*

ওড়ে পাখীগুলি, গায় কত মত গান,
নীচু উঁচু কত সুর সুধার সমান।
শ্রবণ জুড়ায় শুনে, থির হয়ে থাকি,
বড় ভালবাসি তাই ছোট ছোট পাখী

*
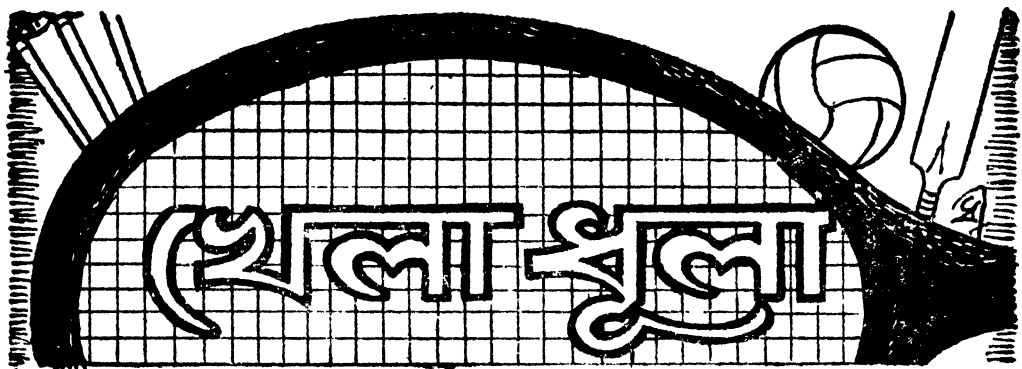
মেঠুড়ে

ফুটবল

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভেতর আই. এফ. এ. শীল্ডের ফাইন্যাল খেলায় হার-জিত মীমাংসা না হলেও কলকাতার ফুটবল মরশুম একরকম শেষ হয়েছে। নভেম্বর বা ডিসেম্বরে যদি ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেটা হবে এক পৃথক অনুষ্ঠান।

ফাইন্যাল খেলার দিন ইডেনের নরম মাঠ বৃষ্টি-ভেজা থাকায় এবং ওই দিন গুমোট আবহাওয়ার দরুন দু'দলের খেলা বিশেষ জমে ওঠেনি। ফলে খেলাটা দর্শকদের মোটেই আনন্দ দিতে পারেনি। আনন্দের কথা, দু'পক্ষের হাজারো সমর্থক এবং উত্তেজনা সত্ত্বেও খেলায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। জয়ের আনন্দ বা পরাজয়ের ব্যথা নিয়ে কেউ ঘরে ফেরেনি বটে, কিন্তু খোলা মাঠ থেকে খোলা মন নিয়ে সবাই ঘরে ফিরেছে।

টেনিস

ভারত ও জাপানের মধ্যে ডেভিস কাপের এশিয়া অঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় ভারত ৪—১ ম্যাচে জয়ী হয়ে আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে। এখন ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা টেনিসে শক্তিশালী। তাদের ক্লিফ ড্রিসডেল বিশ্ব টেনিসের এক নিপুণ খেলোয়াড়।

ভারত ও জাপান এশিয়ার দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী টেনিস-পটু দেশ। ডেভিস কাপে এবার ছিল তাদের সপ্তম সাক্ষাৎকার। এর ভেতর ভারত মাত্র একবার ১৯২১ সালে জাপানের কাছে হার স্বীকার করে। ভারতীয় দল গঠিত হয়েছিল রমানাথন কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিত লালকে নিয়ে। জাপানের দলে ছিলেন ইচিজো কোনিসি, কোজি ওয়াতানাবে ও ইসাও ওয়াতানাবে। সিঙ্গলসের প্রথম অনুষ্ঠানে প্রেমজিত সহজেই ওয়াতানাবেকে হারিয়ে দেন। এর পর বাকী খেলাগুলোতে ভারতই জয়ী হয়।

বিবিধ

কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলেও ভারতে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা জানুআরি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে। ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে কটকে জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফির খেলা শুরু হয়েছে। ১০ই অক্টোবর থেকে দিল্লিতে ডি. সি. এম.-এর খেলা আরম্ভ হয়েছে এবং ৫ই নভেম্বর থেকে বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলা আরম্ভ হবে। দিল্লিতে ডুরাণ্ড কাপের খেলা আরম্ভ হচ্ছে ৫ই ডিসেম্বর থেকে। সুতরাং ক্রিকেটের সঙ্গে ফুটবলের খবর জানার জন্যে আমাদের রেডিও-র খবর ও খবরের কাগজের পাতায় খেলা-ধূলোর খবর জানার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে হবে।

ভারতে এবার কোনো বিদেশী দলের ক্রিকেট সফরের ব্যবস্থা নেই। ভারতীয় ক্রিকেট দল অবশ্য নভেম্বরের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরের জন্যে বিদেশ যাত্রা করবে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরে পাতৌদির নবাব অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত ত্রিশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ইংলণ্ড সফরকারী দলের খেলোয়াড় সদানন্দ মোহল ও সুব্রত গুহর নাম নেই। অপর দিকে অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড় বিজয় মঞ্জরেকারকে দলে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফাস্ট বোলার বলতে এখনো যার শীর্ষস্থান সেই রামকান্ত দেশাইকে ডাকা হয়নি। নাদকার্নীর বাদ পড়াও বিস্ময়ের।

ত্রিশ জন খেলোয়াড়ের ভেতর যাঁরা টেষ্ট খেলেছেন তাঁরা সকলেই তোমাদের পরিচিত। স্কুল ক্রিকেট দলের দুই কৃতী খেলোয়াড় সুরেন্দ্র অমরনাথ এবং দীপঙ্কর সরকারের পরিচয় দান অনাবশ্যক। যাঁদের সম্বন্ধে তোমরা সামান্যই জানো তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাদ্রাজের ওপনিং ব্যাটসম্যান ও উইকেট কীপার রাজাগোপাল, হায়দ্রাবাদের ওপনিং ব্যাটসম্যান আবিদ আলি ও সীম বোলার গোবিন্দরাজ, বোম্বাইয়ের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ও ব্যাটস-ম্যান এ. ফার্ণাণ্ডেজ এবং লেগ স্পিনার ও ব্যাটসম্যান বিজয় ভোঁসলে আর সার্ভিসেস দলের ওপেনিং বোলার চক্রবর্তী। দিল্লির ওপনিং ব্যাটসমান আকাশ লাল এবং বাংলার ন্যাটা ব্যাটসম্যান অম্বর রায় টেস্ট না খেললেও ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে সুপরিচিত। দেখা যাক, এঁদের মধ্যে থেকে কে কে বাদ পড়েন, আর কোন কোন খেলোয়াড় দলে স্থান পান।

জাতীয় ফুটবল (সন্তোষ ট্রফি)

এ বছর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে মহীশূর বাংলাকে ১—০ গোলে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছে। খেলার প্রথমার্ধে আমজাদ খাঁন মহীশূরের পক্ষে জয়-সূচক গোলটা করেন। মহীশূর এবার নিয়ে ছ-বার ফাইন্যালে উঠে বাংলাকে হারিয়ে তিনবার সন্তোষ ট্রফি পাবার গৌরব অর্জন করে। ১৯৬২ সালে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ফাইন্যালে বাংলা ১—০ গোলে মহীশূরকে হারিয়ে ট্রফি লাভ করেছিল। এতদিনে মহীশূর তার প্রতিশোধ নিল। মহীশূর দল শেষ বার ট্রফিলাভ করেছিল ১৯৫২ সালে।

রশিদুল হোসেন

মানুষের কথা বলবার আশ্চর্য শক্তিই মানুষকে পশুর জগৎ থেকে প্রধানতঃ পৃথক করেছে। মানুষের বেঁচে থাকবার ক্ষমতাই হলো সবচেয়ে বিস্ময়ের, তার পরই মানুষের যেটা আশ্চর্যের সেটা হচ্ছে তার সমস্ত কিছুকেই ভাষায় প্রকাশ করা।

সৃষ্টির বিচিত্র খেয়ালে এর এক করুণ ব্যতিক্রম রয়ে গেছে। পৃথিবীতে এমন এক জাতির লোক বাস করে যারা আজ পর্যন্ত কোনদিনই কথা বলতে পারেনি। এই অদ্ভুত গোষ্ঠীর লোক সংখ্যা হ'ল ৪০,০০০ হাজারের মত। এদের বলা হয় কুরুনগুয়া ভারতীয় (Qurungua Indlaus)। এদের বাস হচ্ছে পূর্ব-বলিভিয়ার বনাঞ্চলে। এদের কণ্ঠ জন্ম থেকেই স্বাভাবিকভাবে সংকুচিত; তা ছাড়া স্বর সম্বন্ধীয় কিছু দোষও এদের রয়েছে। ফলে, এরা একদম কথা বলতে পারে না।

কোন্ সংখ্যাকে ১০ দিয়ে ভাগ দিলে ৯ অবশিষ্ট থাকে; ৯ দিয়ে ভাগ দিলে ৮ অবশিষ্ট থাকে; ৮ দিয়ে ভাগ দিলে ৭ অবশিষ্ট থাকে; ৭ দিয়ে ভাগ দিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে; ৬ দিয়ে ভাগ দিলে ৫ অবশিষ্ট থাকে; ৫ দিয়ে ভাগ দিলে ৪ অবশিষ্ট থাকে; ৪ দিয়ে ভাগ দিলে ৩ অবশিষ্ট থাকে; ৩ দিয়ে ভাগ দিলে ২ অবশিষ্ট থাকে আর ২ দিয়ে ভাগ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১?

উত্তর:—১৪,৬২২,০৪৭,৯৯৯

*

মিনিটে ঝিঁঝিপোকা যে ক'বার ডাকে, তার থেকে ৪০ বিয়োগ করে বিয়োগফলকে ৪ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ৫০ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে সেই দিনের তাপমাত্রা। কিন্তু এ কি কেউ বার করতে পারবে?
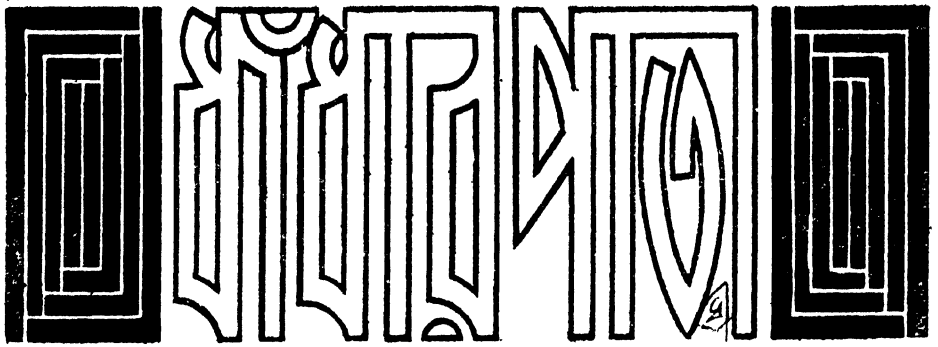
শ্রীবিনয় বাগচী

১। নীচে তিনটি তিন অক্ষরের শব্দ দেওয়া হ'ল। এদের নীচে এমন দেখে দুটি করে তিন অক্ষরের শব্দ বসাতে হবে যাতে প্রতি ক্ষেত্রেই পাশাপাশি ও খাড়াখাড়ি প্রথম সারিতে একই শব্দ হয়, পাশাপাশি ও খাড়াখাড়ি দ্বিতীয় সারিতে একই শব্দ হয় এবং পাশাপাশি ও খাড়াখাড়ি তৃতীয় সারিতে একই শব্দ হয়।

(ক) শশক (খ) বসতি (গ) রাখাল

২। জল ঝরে যাহে
শোভা পায় তাহে
কিছু বাদে জলই রহে।

৩। যাচ্ছে উড়ে রেখে মাটিতে পা'
বল তো কেমন করে হচ্ছে তা'?

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

গত ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর

১। মৌচাক	২। কাগজ	৩। আকাশ	৪। তপন
চাতাল	গমন	কাছারি	পনের
কলকে	জনতা	শমন	নরক

২। (ক) জাহাজ (খ) শীতল

জাহাজ	শীতল
হাজার	তরল
জরদা	লবণ

৩। কাশীরাম দাস, শীলভদ্র, রামপ্রসাদ সেন, মধুসূদন দত্ত, দাশরথী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। (কাশীরাম দাস) এ ছাড়াও অন্যান্য হয়।

৪। পার্থ (অর্জুন), অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের অন্যতম শহর 'পার্থ'।

বিদেশীয় সংবাদ-বৈচিত্র্য

বৃত্তকে চতুর্ভুজে পরিণত

বৃত্তকে কি চতুর্ভুজে পরিণত করা যায়? আমরা সবাই বলব এ অসম্ভব, এ হয় না। জ্যামিতির রাজা পাইথাগোরাস পর্যন্ত বলে গেছেন এর সমাধান নেই।

সমাধান নেই বলেই অঙ্ক-পাগল মানুষরা বসে নেই। এইরকম একজন অঙ্ক-পাগল হলেন পশ্চিম জার্মাণীর জারব্রুইকেনের ইঞ্জিনীয়ার মাথিয়াস ভেবের।

চল্লিশ বছর অঙ্ক-সাগরে ডুব দিয়ে মাথিয়াস বলেছেন যে, বৃত্তকে চতুর্ভুজে পরিণত করার সূত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন। শুধু বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে। মাথিয়াস তাও দাখিল করেছেন। দু'জন বাঘা বাঘা অঙ্কের পণ্ডিত পরীক্ষা করে বলেছেন যে, হ্যাঁ, মাথিয়াস প্রায় কাছাকাছি সমাধান করেছেন বটে তবে একেবারে পারেনি। আমরা বলব, মাথিয়াস যখন এতোটাই পেরেছে তখন আর কিছুদিনের মধ্যে কেউ না কেউ বৃত্তকে চতুর্ভুজে পরিণত করে ফেলবে। দুনিয়ায় এখন আর কিছুই আশ্চর্য নয়।

আপনা হাত জগন্নাথ

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মাণীতে পরিচালিত একটি সমীক্ষার ফলে প্রকাশ যে, জার্মাণীরা আজকাল তাদের ঘরসংসারের বেশির ভাগ মেরামতের কাজ নিজেরাই করে নিচ্ছে এবং সেটা গ্রামের চেয়ে শহরেই বেশি। কারণ শহরে মিস্ত্রী পাওয়া খুব মুশকিল এবং পেলেও তাদের পরিশ্রমের হার শুনলে নিজেরা করা ছাড়া উপায় নেই।

ধূমপানের এদিক ওদিক

ধূমপান করে বা করে না এরকম বারোশ' মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিচার বিশ্লেষণ ক'রে স্থানীয় একজন মনোবিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে, যারা ধূমপান করে তারা "ফূর্তিবাজ, আমুদে ও রসিক" হয়, আর যারা ধূমপান করে না তারা হয় কাজকর্মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিনয়ী, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির। এবার ঠিক করুন ধূমপান করবেন, না করবেন না।

ইউরেনিয়াম বনাম পাইন বন

উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত এই ছোট্ট শহরে স্বাস্থ্য ফেরাতে দেশবিদেশ থেকে লোক আসে আর তাদের পয়সায় এখানকার বহু হোটেল চলে। সম্প্রতি স্থানীয় হোটেলওয়ালারা ক্যাসাদে পড়েছে। কারণ এখানের মাটির তলায় দুষ্প্রাপ্য ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাইনের জঙ্গল সাফ ক'রে এখন ইউরেনিয়াম তোলার তোড়জোড় চলছে। কিন্তু হোটেলওয়ালারা বাধা দিচ্ছে কারণ সবুজ পাইনের বন না থাকলে স্বাস্থ্যান্বেষীরা কি আর আসবে?

(সমালোচনায় জন্ম দু'খানি বই পাঠাবেন)

বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী—শ্রীসতীকুমার নাগ। লেখক কর্তৃক ৪৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.৭৫

এই পুস্তকখানির প্রারম্ভে লিখিত আছে, 'সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে একশ শিক্ষকের প্রভাব অপেক্ষা সু-মাতার প্রভাবই অধিক।'—একথা যে কত সত্য তা ছোটদের খ্যাতিমান লেখক সতীকুমার নাগ-এর লেখা 'বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী'র জীবনী গ্রন্থখানিই তা প্রমাণ করে। দশটি মূল্যবান, সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ রচিত। ছোটরা এ বই পড়লে অবশ্যই উপকৃত হবে। বিদ্যাসাগরের নিজের ও তাঁর মাতা ও পিতার তিনখানি চিত্র আছে বইখানির মধ্যে।

শতদল (শারদ-সংকলন, ১৩৭৪)—শ্রীসরল দে সম্পাদিত। এস. চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ২-বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ০.৫০

'শতদল' শারদ-সংকলন ছোটদের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও ছড়া প্রভৃতির ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি সংকলন। এতে যাঁরা লিখেছেন, তাদের মধ্যে আছেন—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশা দেবী, বিশু মুখোপাধ্যায়, স্বপনবুড়ো, রেবতীভূষণ ঘোষ প্রভৃতি লেখক-লেখিকাগণ।

আনন্দ (পূজা-বার্ষিকী, ১৩৭৪)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর সম্পাদিত। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য ৫.০০

কয়েক বছর ধরে 'আনন্দ' ছোটদের বার্ষিকীর রাজ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। এই সুমুদ্রিত, সচিত্র বিরাট পূজা-বার্ষিকীর মধ্যে প্রায় শতাধিক বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের প্রকৃত ছোটদের উপযোগী নানা ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস আছে পাঁচখানি, নাটক দু'খানি, বাকী ঐতিহাসিক, সামাজিক, হাসির, ভূতের, রূপকথার পৌরাণিক, রহস্যময় ও শিকারের গল্প আছে এবং কবিতা ও ছড়াও আছে প্রচুর। অত্যন্ত সুসম্পাদিত এই বার্ষিকীটির ভূমিকা লিখেছেন বিখ্যাত কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। আমরা ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সুন্দর বার্ষিকীটির বহুল প্রচার কামনা করি।

তরুণ-তীর্থ (পূজা-বার্ষিকী, ১৩৭৪)—তরুণ সাথী সম্পাদিত। পল্লব সিংহ কর্তৃক ১৪, ছকু খানসামা লেন, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.২৫

'তরুণ-তীর্থ' ছোটদের নানাবিধ রচনায় ভরা একটি সুন্দর পূজা-বার্ষিকী। এর মধ্যে সুনির্বাচিত কতকগুলি গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও ছড়া আছে। প্রত্যেকটি লেখা পড়েই ছেলেমেয়েরা খুশি হবে।

পুজো শেষ হয়ে গেছে—বাংলা দেশের এত বড় উৎসব আর নেই– এই বড় উৎসবের স্পর্শটুকু সব দেশের মানুষের মন স্পর্শ করে। সকলেই তাই উৎসবশেষে বিজয়ার মিলনের কথা বিস্মরণ হন না। সত্যি এ উৎসবটি জাতির জীবনে কি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা! এইটুকু আছে বলেই হয়তো মানুষের মনের স্নেহপ্রীতি ভালবাসা জেগে আছে। বাঙালীর এই পর্বটি তাই এত মধুর। আপামর সাধারণ সকলেই আসেন বিজয়ার শেষে—মনের মালিন্য দূর করে আলিঙ্গন দিতে। ছোটরা বড়রা সকলেই যেন হাত বাড়িয়ে থাকেন। যত বিবাদ দ্বন্দ্ব রাগ দ্বেষ সব দূর হয়ে যায় বিজয়া উৎসবকে ঘিরে।

এই পুণ্য তিথিকে উপলক্ষ করে আমার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি ভালবাসা ও শুভেচ্ছা তোমাদের জানাচ্ছি।

আশা করি পুজো তোমাদের ভালভাবে কেটেছে। কে কি করলে, কারা বাইরে যেতে পারলে বা কি দেখলে? যারা দেশে বসেই চারিদিকে 'নেই নেই' রবের মধ্যে পুজো দেখলে তারাই বা মনে কি সঞ্চয় করলে? সকলের অনুভূতির সবচিত্রগুলো যদি আমার কাছে তুলে ধরো অর্থাৎ লিখে পাঠাও, তাহলে তা থেকে বিশেষ কিছু তোমার বন্ধুদের জানিয়ে দিতে পারি।

লোকমাতা—

তোমরা শুনেছ বা সংবাদপত্রে পড়েছ—গত বছর ২৮শে অক্টোবর থেকে লোকমাতা নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল তারই সমাপ্তি উৎসব হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। বিশেষ করে নিবেদিতা শতবার্ষিকী কমিটি এই উৎসবের আয়োজন করে দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সমাপ্তি উৎসবে কোলকাতার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিও সেমিনার ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। পুরো একটি বছর এরা নানা স্থানে নানাভাবে এই জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালন করেছেন।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ জুড়ে যে চেষ্টা চলছিল ভারতবর্ষকে নতুন রূপ দেবার,

সেই চেষ্টা পরিণত হলো বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদে। দুই শতকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন—তাদের অন্যতমা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে স্বামীজি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বামীজির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আইরিশ কন্যা ভারতপ্রাণা নিবেদিতা। ভারতবর্ষের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের বছরগুলি গাণিতিক হিসাবে খুব সামান্যই। প্রথম এসেছিলেন ভারতবর্ষে ১৮৯৮ খৃঃ জানুয়ারীতে। এরই দেড় বছর পরে স্বামীজির সঙ্গে ফিরে গেলেন পাশ্চাত্য দেশে ভারতের সেবার কাজ নিয়ে। মাত্র ক'টি বছরে যে প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি ভারতের সেবার কাজ করেছিলেন—তার তুলনা হয় না। তারপর স্বামীজীর অকাল প্রয়াণের পর তাঁর অসপূর্ণ কাজ নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর নিরর্থক পরিক্রমা চলেছিল—দেশের যুবশক্তিকে আহ্বান করে তিনি নতুন মন্ত্র দীক্ষা দিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হলেন।

স্বামীজির প্রাণচাঞ্চল্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত তাঁর জীবন। কর্মপ্রবাহে যুক্ত ছিল তাঁর জীবনের গতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত তাঁর কর্মের পরিধি—আর নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন মানুষের সেবায়। প্রণাম সেই আয়লণ্ড দুহিতা, ভারতপ্রাণা। লোকমাতা নিবেদিতাকে কর্ম ও সেবার সমন্বয় সাধনের মধ্যে যিনি জেগে আছেন মানুষের অন্তরে।

চিঠির উত্তর—

অসংখ্য তোমাদের বিজয়ালিপি—অকৃত্রিম ও সুগভীর ভালবাসায় ভরা। প্রত্যেককে পৃথক করে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়—তাই সকলকেই প্রত্যভিবাদন জানাচ্ছি।

কুন্তল রায়, হায়াৎ খাঁ লেন, কোলকাতা—তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে 'হ্যাঁ' বললেই যথেষ্ট হবে হয়তো।

মনা দেব, রায়গড়, শিলং—এখনও যোগ দিতে পারো কিনা জানতে চেয়েছ। যোগ দেওয়া তো অনেক ভাবেই যায়—বয়সের সীমা অতিক্রম করলেও।

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, টি রোড—তোমার প্রশ্নের উত্তরও এইমাত্র পেয়ে গেলে।

রীতা বরী, গোলপার্ক, কোলকাতা—বিজয়া প্রণামের সঙ্গে তোমার মন্তব্য—একদিন মা আপনার মধুচক্রে ছিলেন, এখন সেই স্থলে আমি এসেছি—এটা তো খুবই আনন্দের সংবাদকণা। সকলেই জন্মেই আসন পাতা আছে যে। তোমাদের

'মধুদি'।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যা স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৫০ পয়সা

✻ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✻
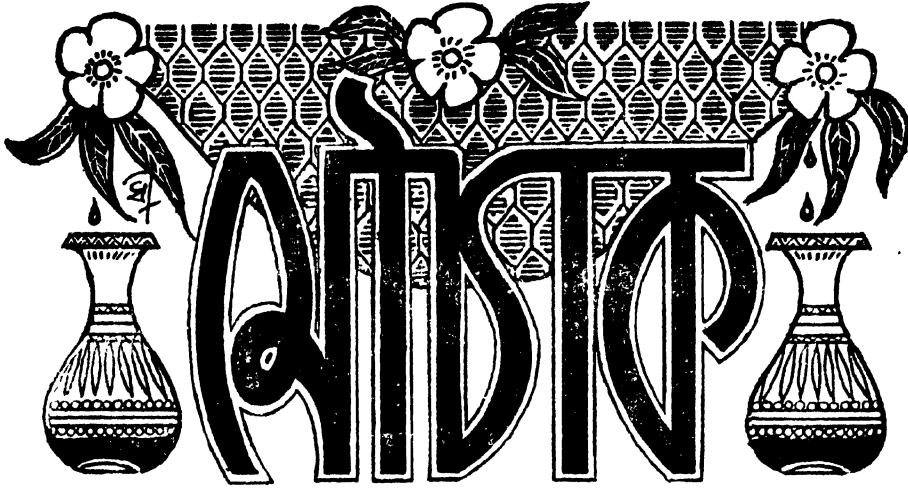
৪৮শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ : ১৩৭৪ [৮ম সংখ্যা

বর্ণ-বিপর্যয়

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

করবী লিখিতে কবরী লিখিলে,
গোলাপী লিখিতে গোপালী,
কমল তা'হলে কলম হইবে,
কলাপী হইবে কপালী।
প্রমথনাথকে প্রথম বলিলে
খুসী হতে পারে মনটা,
রিক্সা তা ব'লে রিশ্‌কা হইবে ?
ঘটনা হইবে ঘণ্টা ?
শিশির শিরীষ হবে নাকি শেষে ?
বিপিন বিপণি হবে কি ?

কত কথা কয় মিষ্টু মোদের—
কথকতা তা'রে কবে কি ?
খেঁক-শেয়ালীর বদলে কলমে
আসে যদি খেঁশ-কেয়ালী—
বাক্স না লিখে বাস্ক লেখাও
হয় তো মনের খেয়ালই।

গজেনবাবুকে যোগেন বল কি ?
বিজন জীবন-বাবুকে ?
জীবাণু বীজাণু—কোন্‌টা যে ঠিক—
বলে দিতে হবে হাবুকে।

নিবারণে যেন নি-বানর রূপে
দেখিনাকো কোনো বাসরে,
নিজেকে জাহির করিতে হাজির
হওয়া ভাল না কি আসরে ?

ডাক-নামে তব নাম-ডাক যদি
ছড়ায়—ছড়াক, দোষ নাই,
বাহার দেখাতে হাবার মতন
প্রকাশ কোরো না রোশনাই।

বরুণা অসীর মাঝখানে—তাই
বারাণসী বলে কাশীকে,
বেনারসী শাড়ী উপহার তবু
দিতে হবে কেন মাসীকে ?

পিশাচ না বলে পিচাশ বলাটা
ভাল কি ? বলুক সকলে—
ঠিক মত সব কথার হিসাব
রাখিও নিজের দখলে।

গোয়ানাকো

শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজী দৈনিক 'দি ষ্টেটস্‌ম্যান' কাগজে উটের মত দেহাকৃতি আর ক্যাঙ্গারুর মত মুখওলা একটি চতুষ্পদ প্রাণীর একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম নজরে ছবিটিকে একটি সাচকিত উট-শিশুর কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল। যদিও ছবির পরিচিতিতে প্রাণীটির নাম স্পষ্টাক্ষরেই লেখা ছিল 'গোয়ানাস্' বলে। ছবিতে ইংরেজীতে আরও লেখা ছিল—"এ বিস্‌ট অব বারডেন এ্যাট্ হাই অলটিচ্যুড্।" মাত্র ঐ ক'টি কথাতেই কিন্তু জন্তুটির সমগ্র পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সে পরিচয় পেতে হলে আরও অনেক কথার দরকার হয়। অত কথা এখানেও সম্ভব নয়। তবুও চেষ্টা করেছি সাধ্যমত সংক্ষিপ্তভাবে হায়দ্রাবাদ থেকে আগত দিল্লি জু'র এই নবাগত অতিথিটির পরিচয় তোমাদের কাছে দেবার জন্য।

গোড়াতেই কিন্তু একটু ভ্রম-সংশোধনের প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। তৃণভোজী চতুষ্পদ এই প্রাণীটি যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর জীবদের সাধারণভাবে নাম হ'ল 'গোয়ানাকো', 'গোয়ানাস্' নয় (রেফাঃ সর্টার অক্সফোর্ড ডিক্সনারী, ভলুঃ ১ম, পৃঃ ৮৪০)। উক্ত ডিক্সনারীর ব্যাখ্যা অনুসারেই জানা যায় যে, গোয়ানাকো হ'ল দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলের একটি স্তন্যপায়ী, তৃণভোজী চতুষ্পদ প্রাণী। এরা সব 'অচেনিয়া হিউয়েনাকো' শ্রেণীর তৃণভোজীদের অন্তর্ভুক্ত। এই 'অচেনিয়া হিউয়েনাকো' শ্রেণীর অপর প্রাণীই হ'ল 'আলপাকা' আর 'লামা'। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের গভীর অরণ্যই হ'ল গোয়েনাকোদের আদি পৈতৃক বাসভূমি। অতএব খোঁজ-খবর না করেও স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, দিল্লি জু'র ঐ নবাগত অতিথিটির পূর্বপুরুষরাও একদা পুণ্যের ফলেই বোধ হয়, তাদের ঐ দুর্গম হিমশীতল পার্বত্য আদি বাসস্থান থেকে বাসচ্যুত হয়ে নেহাত ভি. আই. পি'র সমাদরেই এসে হায়দ্রাবাদের জু'তে বসতি স্থাপনের সৌভাগ্যলাভ করেছিল। আর আজকের দিল্লি জু'র ঐ অতিথিটি সেই তাদেরই কারো নাতি বা পুতি গোছের একটা কিছু হবে বলে বোধ হয়।

গোয়ানাকোর আকৃতি আর প্রকৃতিতে উটের সঙ্গে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে একথা সত্য, কিন্তু তা হলেও ঘোড়ার সঙ্গে কিছু নেই এমন কথাও বলা চলে না। আছে। দুর্গম পার্বত্য-পথে উট ও ঘোড়া এই দুইয়ের কাজই করে গোয়ানাকো একা। অর্থাৎ ভার বহন ও আরোহী বহন, এই দুই কাজেই গোয়ানাকো ভিন্ন আর গতি নেই। এসব কাজের উপরও তার আরও কাজ আছে। উত্তুঙ্গ পার্বত্যঅঞ্চলের হিমশীতল এলাকার অধিবাসীদের শীত নিবারণে উপযুক্ত পরিধেয় নির্মাণের প্রয়োজনীয় পশম ও চামড়া এই গোয়ানাকোই সরবরাহ করে থাকে। পানীয় দুধ ও আহার্য মাংস তা'ও যোগায় এই গোয়েনাকো।

UTTARPARA

এত যার গুণ তার নাম যে গোয়ানাকো হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? সত্যিই বলে-কয়ে শেষ করা যায় না গোয়ানাকোর গুণের কথা।

গোয়ানাকোর আবাসস্থল কেবল দুর্গম পার্বত্যঅঞ্চলের গভীর অরণ্য বললেই কিন্তু সব বলা হয় না। দুর্গম হিমশীতল উত্তুঙ্গ'তে তো বটেই, তবে সে উত্তুঙ্গও আবার যে সে উত্তুঙ্গ নয়! ১০,০০০ থেকে ১৬,০০০ ফিট পর্যন্ত উঁচু! আর সেইখানেই হ'ল গোয়ানাকোর বাস্তু-ভিটে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়াডোর, পেরু, চিলি প্রভৃতি স্থানের পার্বত্য অঞ্চল ও এণ্ডিস পর্বতমালার ঢালের গভীর অরণ্যেই দলে দলে বিচরণ করে বেড়ায় বন্য গোয়ানাকোরা লোকচক্ষুর আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে। সেখান থেকেই এদের ধরে এনে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে রূপান্তরিত করা হয় গৃহপালিত আলপাকা আর ভারবাহী লামায়।

গোয়ানাকোরা আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যদিও চেহারা বা আকৃতি-প্রকৃতিতে গরমিলের চেয়ে মিলই এদের বেশী। এদের এক শ্রেণীকে বলা হয়, "লামা হিউয়েনাকাস্", আর অপর শ্রেণীকে বলা হয়, "লামা ভিকুনা।" এই লামা হিউয়েনাকাস্ শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, বন্য পাহাড়ী জীবনের অতি প্রয়োজনীয় গৃহপালিত চতুষ্পদ আলপাকা আর লামা। আলপাকার খ্যাতি তার রেশম-সম লোমের জন্য, আর লামা? সে হ'ল পার্বত্য অধিবাসী-দের অন্ধের নড়ি। যাকে ছাড়া এক পা চলাও দুঃসাধ্য। পাহাড়ী রাস্তায় ওস্তাদ ভারবাহী জীব হিসাবে লামাকে কখনও কখনও "সিপ্ অব দি হিলি ট্রাকট"ও বলা হয়ে থাকে। যেমন মরুপথের ভারবাহী জীব হিসাবে উটকে বলা হয় "সিপ অব দি ডেজার্ট।" অপর শ্রেণীর গোয়ানাকো হ'ল লামা ভিকুনারা। এরা এ পর্যন্ত মানুষের কোন কাজে এসেছে বলে জানা যায় না। আস্‌লেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। লামা ভিকুনার যে খবর জানা যায় তা হ'ল,—এরা সাদার্ন ইকোয়াডোর, পেরু এবং নর্দার্ন বোলিভিয়ায় বসবাস করে।

আলপাকার চেহারায় ভেড়ার চেহারার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ মিল আছে। মিল আছে তার মুখের আদলে আর পশমাবৃত দেহে। যদিও আলপাকার পশমের জলুসের সিকি ভাগও ভেড়ার পশমে নেই। তা মিল যেমন আছে, তেমন আবার গরমিও আছে বিলক্ষণ। আলপাকার গলা উটের মত লম্বা। ঠ্যাংও উটের মতই সরু আর লম্বা। আকারেও সে ভেড়ার চাইতে অনেক বড়। আলপাকার গা জুড়ে যে পশমের বাহার রয়েছে, সেই পশমই তার ঐ পাহাড়ী অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতে আত্মরক্ষার প্রধান ও একমাত্র আবরণ। মনে হয় ঐ আবরণের আকর্ষণেই বন্য রেড ইণ্ডিয়ানরা বোধ হয় বুনো আলপাকাকে ধরে এনে পোষ মানাবার কথা প্রথম চিন্তা করে। কারণ আল-পাকা নিধন তার আগেও প্রচলিত ছিল। সে কেবল চামড়া আর মাংসের প্রলোভনে। আজ আলপাকা গৃহপালিত হয়ে কেবল

চামড়া আর মাংসের প্রয়োজনই মেটাচ্ছে না, দুধ ও পশমের প্রয়োজনও আলপাকাই মেটাচ্ছে। ভিকুনার দেহেও নাকি পশম আছে। আর সে পশম নাকি আলপাকার পশমের চাইতেও সুদৃশ্য! তবে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়। কারণ তা অত্যধিক নরম হওয়ায় তা দিয়ে জামাকাপড় তৈরি করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই অতি সুদৃশ্য পশমের অধিকারী হয়েও বিদেশ তো কোন্ ছার, স্বদেশেও ভিকুনার কোন কদর নেই।

গোয়ানাকো

আকারে ভিকুনা আলপাকার চাইতে কিঞ্চিৎ বড়। তবে হিউয়েনাকাস্ শ্রেণীর অপর গৃহপালিত জীব 'কুব্জহীন উট' লামার চাইতে আকারে অনেক ছোট। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের ভাষায় আলপাকার অপর একটি নাম আছে, সেটি হচ্ছে 'লামাপেকোস্'। বিভিন্ন সূত্র থেকে যা জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, প্রতি বছর প্রায় ছয় মিলিয়ান পাউণ্ড মূল্যের আলপাকার পশম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়ে থাকে। তাহলেও আলপাকার পশম পাওয়া আজকাল খাঁটি দুধ পাওয়ার মতই দুরূহ ব্যাপার। যা পাওয়া যায়, তা প্রায়ই ঘিয়ের বদলে বনস্পতি ঘিয়ের মতই আসল আলপাকার পশম নয়।

এতক্ষণ হিউয়েনাকাস্ শ্রেণীর জীব আলপাকার কথা বললাম। এবার ঐ শ্রেণীরই অপর ঘরানা লামার কথা বলি। প্রাণীতত্ত্ববিদ্দের ভাষায় ঠিক আলপাকার মত লামারও অপর একটি নাম আছে, 'লামা গ্লামা'। শ্রেণী হিসাবে লামাদের আলপাকার বড় ভাই বলা যেতে পারে। অন্ততঃ চেহারার দিক থেকে তো বটেই এবং জাতিতেও উভয়েই লামা হিউয়েনাকাস্ শ্রেণীভুক্ত। উচ্চতায় লামা ঘাড়ের কাছ থেকে প্রায় ৬ফিট ৪ ইঞ্চির মত উচু। আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে তার দৈহিক শক্তির। প্রয়োজন হলে ১২০ পাউণ্ডের বোঝা কাঁধে নিয়ে লামা অনায়াসে ঐ পার্বত্য প্রদেশের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ঘণ্টায় দশ বার মাইল গতিতে চলা-ফেরা করতে পারে। চলন দেখে মনেও হবে না তার কোন ক্লেশ বা অসুবিধা হচ্ছে বলে। বন্য অবস্থায় লামা স্বভাবে উদ্ধত। কিন্তু একবার পোষ মানলে নাকি লামার সমতুল্য নম্র আর আজ্ঞাবহ প্রাণী কমই দৃষ্ট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি লামাই ছিল দুর্গম এণ্ডিস অঞ্চলের একমাত্র ভারবাহী ও যাত্রীবাহী বাহন। আজও পর্যন্ত সেসব অঞ্চলের তেমন তেমন দুর্গম এলাকায় লামাই একমাত্র ভরসাস্থল।

ঠিক কবে থেকে যে লামা এই 'সিপ অব দি হিলি ট্রাকট'-এর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তা হিসাব করে বলা সম্ভব নয়। কারণ, এর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। অনুমান ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তবে ইতিহাসের সাহয্য কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় বইকি। দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে স্প্যানিয়ার্ডরা যখন পেরু দখল করে, তখনই তারা পার্বত্যজাতী ইনকাস্দের মধ্যে লামার বহুল প্রচলন দেখতে পায়। অতএব ধরে নিলে অসঙ্গত হবে না যে, লামা এসে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে তারও বহু আগে থেকে। তবে তা যে কোন্ বিস্মৃত বর্ষ থেকে তার সন্ধান মেলা আজ প্রায় অসম্ভবেরই সামিল।

লামার স্বভাবে দুটি মজার বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে তার উল্লেখ না করলে লামার কথা নেহাতই অসমাপ্ত থেকে যাবে। ভারবহনে লামার এমনিতে কোন আপত্তি নেই; তবে সে ভার যদি মাত্রাধিক হয়, লামা তখন সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেয়। নন্ ভায়লেণ্ট পিকেটিং। সোজা লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকে ভার লাঘব না হওয়া অবধি। মারো আর ধরো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পুরোপুরি অহিংস সত্যাগ্রহ। তবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু কিঞ্চিৎ ভায়লেন্স ঘেষা। উত্যক্ত হলেই কেবল সে বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে পড়ে। তখন বেপরোয়া চলে থুতু বৃষ্টি। ভক্ষ্যবস্তু মিশ্রিত পুতিগন্ধময় থুতু। লামা ভেজেটেরিয়ান তাই বিদ্রোহেও সে ভেজেটেরিয়ান। কামড়া-কামড়ি খামচা-খামচির বালাই নেই। স্রেফ থুতুর ফুলঝুরি! লামা কথা বলতে জানে না তাই বোধ হয় কথার ফুলঝুরির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবেই সে থুতুর ফুলঝুরি কাজে লাগায়। তা লাগাক, লামা অথ গোয়ানাকো কাহিনী অতঃপর এখানেই শেষ করলাম।

মহারাণীর পত্র

(মধ্যপ্রদেশের লোককথা)

বোম্মনা বিশ্বনাথম্

'যাক, এই নাও টাকার থলি।'— পৃষ্ঠা ৩৭৪

মহাকোশলের ছোট্ট গ্রামে বাস করত গোপাল সিং। গুলের রাজা। বাচ্চা বয়স থেকে এত গুল মারত যে বড় হওয়ার পর সেই গ্রামে তার কথা আর কেউ বিশ্বাস করত না। গুল মারতে যারা ওস্তাদ তারা কাজের বেলায় কুঁড়ে হয়। গোপালও তাই হলো। কাজের নাম করলেই জ্বর আসতো তার। রোজগার না থাকলে যা হয়। তাই হলো ওর পরিবারে। অশান্তি বাড়ল। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে একদিন ঘরবাড়ি ছেড়ে গোপাল বেরিয়ে পড়লো চাকরির সন্ধানে। যেতে যেতে খোঁজ করতে করতে শেষে কাশ্মীরে সৈনিকের চাকরি পেল সে।

সৈনিকের চাকরি পেলেও গুল মারার স্বভাব যাবে কোথায়। তাই সে সহকর্মীদের মধ্যেও বড় বড় কথা বলত। একদিন বলল, আর বলো কেন ভাই, শুধু জেদের বশে, আর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই আমাকে সৈনিকের চাকরি নিতে হচ্ছে।

—কি রকম ?

—তাহলে বলি শোন, অনেক দিন আগে আমার রাজত্বে ঘুরে বেড়াচ্ছি, রাণীকে মানে আমার স্ত্রীকে,—ও হরি, আমি তোমাদের কাছে এখন আসল কথাই বলিনি। আমি যে ত্রিপুরার রাজা তা তো তোমাদের কাছে বলিনি কোনদিন !···

—সে কি তাহলে সৈনিকের চাকরি করছেন কেন ?

—আর বল কেন, ঐ যে বললাম স্রেফ জেদ।

—কি রকম ?

—ঐ যে বললাম, একদিন রাজত্বে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এক সৈনিকের খারাপ আচরণ দেখে তাকে প্রহার করতে বাধ্য হলাম। তখন আমার স্ত্রী, মানে মহারাণী বললেন, আপনি এত নির্দয় কেন ? আপনি নিজে সৈনিক হলে বুঝতেন।

—কী বলছ তুমি, আমি সৈনিকের কাজ করতে পারব না।

—না।

—ঠিক আছে। আমি আজই চললাম সৈনিকের কাজ করতে

—যাও না কেন। অত ভয় দেখাচ্ছ কাকে।

—একবার চলে গেলে বুঝবে কত ধানে কত চাল।

—আমিও কম নই। আমি নিজেই পারব রাজ্যশাসন করতে।

—ব্যাস, আর কথা নেই, সোজা বেরিয়ে পড়লাম।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে গোপাল সিং-এর কাছে স্ত্রীর চিঠি এলো। সৈনিক মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। চিঠিতে লেখা ছিল :

প্রিয় মহারাজ গোপাল সিং সমীপেষু—আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। এখন এখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঘটি সেনাপতির ঘাড় ভেঙে গেছে, হাঁড়ি কোতওয়াল উলটে পড়ে আছেন আর সিকে বরকন্দাজ অনেক দিন ধরে বহন করছেন শূন্য আধার। রাজকোষ শূন্য। এমতাবস্থায় আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। অতঃপর আপনি সমস্ত রাগ ভুলে ফিরে আসুন মহারাজ। ইতি—

আপনার প্রতীক্ষায়
মহারাণী।

চিঠিটি এ-হাত ও-হাত ঘুরে পড়ল গিয়ে সেই রাজ্যের সেনাপতির হাতে। সেনাপতি তো অবাক। তিনি সোজা গোপাল সিং-এর কাছে এসে বললেন, মহারাজ, আমি জানতাম না যে আপনি ত্রিপুরার মহারাজা। কী আশ্চর্য! আপনি ফিরে যান। আপনার এই সময় নিজের রাজত্বে ফিরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর এই নিন, আমাদের সামান্য উপহার।

সেনাপতি গোপাল সিং-এর হাতে তুলে দিল একটি টাকার থলি এবং তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য একটি ভাল ঘোড়া।

ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে ডাক দিল স্ত্রীকে : ময়না আমি এসে গেছি। তুমি দেখছি আমাকেও ঘোল খাইয়ে দিলে। ঘটি সেনাপতি মানে কি ?

—এই যে ঘাড় ভাঙা ঘটি আর হাঁড়ি ওলটানো, আর সিকের অবস্থা। কানা কড়িও নেই ঘরে।

—বুঝতে পেরেছি। না, গুল মারার ব্যাপারে দেখছি তুমি আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ। তোমার চিটি অন্য রকম হলে আমি হাতেনাতে ধরা পড়তাম। যাক, এই নাও টাকার থলি। আর আমাদের দিন-মজুরি করতে হবে না। এবার থেকে নিজের জমিতে চাষ করব।

—জমি পাবে কোথায় ?

—কী বলছ! আমি যে ত্রিপুরার রাজা, এই যে টাকার থলি। এই টাকা দিয়ে জমি কিনব। আর আমাদের অভাব নেই। আর গুল মেরে কাটাতে হবে না।

—তুমি আবার রাজা হলে কবে ?

—সব বলব। সে আনক কথা!

বিদ্যুতের খেলা

শ্রীমলয়কুমার সরকার

বিদ্যুৎকে তোমরা তো শুধু আকাশেই চমকাতে দেখেছ—তাই না? আর এক জায়গায় অবশ্য দেখেছ, তবে সেটা সোজাসুজি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেয়েছ। সেগুলোর নাম জান? বিজলী বাতি, বৈদ্যুতিক গাড়ী, ট্রেন, ট্রাম, তাছাড়া বৈদ্যুতিক পাখা, চুল্লি ইত্যাদি আরো অনেক জিনিসের সঙ্গে তোমাদের রোজকার পরিচয়। তবে এই বিদ্যুতের আসল ম্যাজিক বোধ হয় কেউ জানে না। ভারী আশ্চর্য এর খেলাগুলো। আর তেমনি সহজ। তোমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে এর খেলাগুলো শিখে নিতে পার।

বিজ্ঞানীরা বলেন—বিদ্যুৎ হ'ল একপ্রকার শক্তি। শুধু তাই নয়—এ শক্তির কিন্তু একটা মস্ত বড় নাম আছে। আর সে জন্যই তো শব্দ, তাপ, আলো ইত্যাদি শক্তির মধ্যে বিদ্যুৎ হ'ল সবচেয়ে সেরা। তোমরা হয়ত ভাবছ, এই বিরাট শক্তিকে তবে কিভাবে তৈরী করা যাবে? আর খেলাই বা করা যাবে কেমন করে? এ নিয়ে আর ভাববার দরকার নেই। ইচ্ছে করলে নিজে হাতে তুমিও একটা বিদ্যুৎ তৈরী করতে পার। বিজ্ঞানীরা বলেন—বিদ্যুৎ হ'ল দু'রকম। 'স্থির'-বিদ্যুৎ আর 'চল'-বিদ্যুৎ। এই নাম দুটো বোধহয় কেমন অদ্ভুত লাগছে—তাই না। আসলে কিন্তু এদের কাজ আর নিয়মগুলোও খুব অদ্ভুত। প্রথমত: 'স্থির'-বিদ্যুৎগুলো হ'ল—এমনি বিদ্যুৎ সেগুলো যেখানে উৎপন্ন হয় শুধুমাত্র সেখানেই স্থির থাকে। আর 'চল'-বিদ্যুৎগুলো কোন ধাতু পদার্থের মধ্যে দিয়ে দিব্যি চলাফেরা করতে পারে। তোমাদের মনে হয় এই দু'রকম বিদ্যুতের কথা এখন সবাই বেশ বুঝতে পেরেছ। এবার তবে খেলাটি শিখিয়ে দিই।

বিজ্ঞানীরা বলেন—এই স্থির-বিদ্যুৎ হ'ল আবার দু'রকম। ইংরেজীতে একটির নাম 'পজেটিভ' আর একটির নাম 'নেগেটিভ'। এখন তবে খেলাটি শিখে নাও। খেলাটির নাম দেবে বিদ্যুতের খেলা। কয়েক টুকরো রেশম ও পশমের কাপড়, কয়েকটা কাঁচের দণ্ড, কিছু রেশমের সুতো আর গোটা তিনেক এবোনাইট দণ্ড নাও। এই এবোনাইট জিনিসটা বোধহয় তোমাদের কাছে খুব নতুন শোনাচ্ছে, তাই না? আসলে তাপের সাহায্যে তৈরী করা এক রকম কঠিন রবারকেই এবোনাইট বলে। কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দোকানে নাম করে চাইলেই হবে। একটা কাঁচের দণ্ড এক টুকরো রেশমের কাপড়ের উপর রেখে ঘষতে থাক। কিছুক্ষণ পরে দণ্ডটির মধ্যে স্থির-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এবার ঐ দণ্ডটির মাঝখানে রেশমের সুতো বেঁধে একটি জায়গায় ঝুলিয়ে দাও। তারপর একটা এবোনাইট দণ্ড নিয়ে ঐ একইভাবে পশমের কাপড়ের উপর রেখে ঘষে তাকেও রেশমের সুতোয়
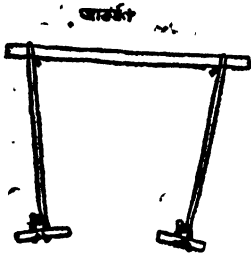
বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে। এবার যদি দণ্ড দুটোকে পরস্পরের কাছে আন তাহলে দেখতে পাবে তারা কেমন পরস্পরকে কাছে টানছে। এই অদ্ভুত কাণ্ডটা কি করে সম্ভব হ'ল জান? বিজ্ঞানীরা বলেন, দুটো আলাদা জাতের বিদ্যুৎ সব সময় পরস্পরকে কাছে টানে। তোমার এই খেলাটির বেলাতেও কিন্তু তাই হ'ল। প্রথমে কাঁচ দণ্ডে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ল তা পজেটিভ আর এবোনাইট দণ্ডে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ল তা নেগেটিভ। ঠিক এই জন্যই তোমার দণ্ড দুটো কেমন সুন্দর আস্তে আস্তে কাছে সরে এল। এবার ভাবো খেলাটি কি রকম মজার—তাই না?

এখন এই সঙ্গে আর একটা খেলাও শিখে নিতে পার। সেটা কিন্তু আরও মজার হবে। দুটো এবোনাইট দণ্ড নিয়ে একটা পশমের কাপড়ের উপর রেখে কিছুক্ষণ ঘষে তারপর সুতোয় বেঁধে দণ্ড দুটোকে ঝুলিয়ে দাও। এবার যদি ঐ দণ্ড দুটোকে পরস্পরের কাছে আন—তাহলে দেখতে পাবে, তারা ম্যাজিকের মত পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবারের আশ্চর্য কাণ্ডটা কি জান? বিজ্ঞানীরা বলেন—দুটো স্থির বিদ্যুৎ পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দেয়। তোমার এই খেলাটির বেলাতেও কিন্তু তাই হ'ল। এবোনাইটের সঙ্গে পশমের ঘষার ফলে দুটো স্থির নেগেটিভ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ল। আর ঠিক সেইজন্যই তোমার দণ্ড দুটো কেমন সুন্দর পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল। তবে একটা কথা কিন্তু ভুললে চলবে না—এই এবোনাইটে যেমন নেগেটিভ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ল, পশমেও সেরূপ একটা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ল। তার নাম পজেটিভ। তাহলে চিন্তা করে দেখ, এই খেলা দুটো কি রকম সুন্দর।
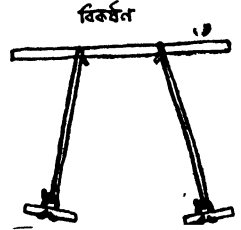
শুনে আশ্চর্য হবে—বিজ্ঞানীরা এই বিদ্যুৎ থেকে আরো কত শত মজার মজার খেলাই না আবিষ্কার করেছেন। শুধু কি তাই—এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কত বিরাট বিরাট যন্ত্র পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন তার ঠিক নেই। তোমরা হয়ত ভাবতেই পারবে না—আজকাল এই বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসা পর্যন্ত করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই বিদ্যুৎ যে আরো কত কাজে ব্যবহার হবে তার ঠিক নেই।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মস্তবড় রাজ্যের মহারাজা। তার হাতে মেপে পা ফেল্‌তে হয়। হাতে মাপা
নে দিনক্ষণ দেখা। তা দেখার জন্য গণকঠাকুর আছে। সে পাঁজি দেখে, খড়িমাটি দিয়ে
সব এঁকে বলে দেয়। খাওয়া, বসা, শোওয়া সব ছক কাটা। কবে বেগুন পোড়া,
পোড়া খেতে নেই, তাও বলা আছে। তা ছাড়া, আছে হাঁচি টিকটিকি এড়িয়ে চলা,
কের নিঃশ্বাস মিলিয়ে পা বাড়ানর ব্যাপার ধার্য করা।

রাজসভার কার্যভার,—সে এক বিষম ব্যাপার! এট্টুখানি অনাচারে হিম্‌সিম্
বার যোগাড়।

মহারাজা রাজসভায় বেরুবার আগে সবাই ভয়ে ভয়ে থাকে। কে হেঁচে ফেলে,
থায় টিকটিকি ডাকে,—সব আটকান চাই। আহ্লাদী, জল্লাদী লাঠি হাতে টিকটিকি
ড়ায়। আর সবাই নাকে কাপড় গেদে রাখে। হাঁচি পেলেও যাতে শব্দ না বেরোয়!

সারাবছর নিয়মমাফিক চলে। কিন্তু একদিন অনিয়ম হ'ল! চোত মাস,—কাঠফাটা
। আহ্লাদী আর জল্লাদী বাছাই-করা টক আচ্ছা রকম তেল, নুন, লঙ্কা দিয়ে
খছিল। দেখে জিভে জল আসে।

মহারাণী দেখে ফেলে। মোলায়েম গলায় বলে, কি মেখেছিস লা? দে তো
খাব্‌লা।"

তারা দেয়। মহারাণী এক চোখ বুজে মহা আরামে চুকচুক করে খায়। খেয়ে বলে, "কতটুকু দিলি। দে ত আরেকটু।"

এরকম করে অনেকখানি খেল। ননীর শরীর। অত টক সইল না। সর্দি হ'ল, আর—হ্যাঁচচো, ফ্যাঁচচো। নাকের নথের হ্যাঁচকা টানে মুখ পেঁচাপনা হয়। ওষুধ খেল, কর্পূর শুঁকল, তবু—হ্যাঁচচো, ফ্যাঁচচো—! মুস্কিলের কথা! এদিকে মহারাজার রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে। এ সময় মহারাণীর প্রসাদী ফুল হাতে-কাছে থাকা নিয়ম। মহারাজার কান ধরতে নয়, কানে ফুল গুঁজে দিতে। মহারাজা নাকের নিঃশ্বাস হাত দিয়ে দেখল। বাঁ নাকে বইছে। বাঁ পা বাড়াবার আগে বলল, "তৈরী?" সবাই নিঃশ্বাস আটকাল। মহারাণী আঁচল নাকে গেদে দিল। আর এক মিনিট। মহারাজা বাঁ পা বাড়িয়ে এগুলেই হয়ে গেল। তখন হাঁচো, নাচো—কিচ্ছু না।

কিন্তু মহারাজা খালি বাঁ পা বাড়াবে, হঠাৎ "হ্যাঁচচো, ফ্যাঁচচো!" হাত-হার্মোনিয়ামে টানা সরু সুর!

"কে, কে? সব্বোনাশ!" মহারাজা গলা ফাটিয়ে চেঁচায়,—আর মহারাণী মাথা গুঁজে পালায়! কে হাঁচি দিল মহারাজা জানে না। খালি আওয়াজ শুনেছে। রেগে টং হয়ে হাঁকল, "মহাকোটাল!"

মহাকোটাল ছুটে এল। বলল, "মহারাজ!"

মহারাজা বলল, "শূলে দাও।"

মহাকোটাল চাপদাড়ি চুলকে বলে, "কাকে মহারাজ?"

মহারাজা বলে, "যে হাঁচলো তাকে।"

এখন মহাকোটালও অনেক টক দৈ খেয়েছিল। তারও নাক-ভরা হাঁচি। মহারাজার জরুরি তলবে সে নাকে তুলা গুঁজে এসেছে। মহাকোটাল মহারাজাকে মানে। কিন্তু হাঁচি কাউকে মানে না। অ 'হাঁচচো' মহাকোটালের নাক থেকেও বেরিয়ে এল। সঙ্গে নিয়ে এল নাকের ছেঁদায় গাদা তুলো। আর তা ছিটকে পড়লো মহারাজার মুখে! মহারাজা আঁৎকে উঠে বলল, "হাঁচির সঙ্গে টিকটিকি! গণক গণক—"

পুঁথিপত্তর আর খড়িমাটি নিয়ে গণকঠাকুর আসে। তবে কপালে ফোঁটা, নাকে তিলক, মাথায় টিকি। এসে বলে, "মহারাজ—"

মহারাজা বলে, "হাঁচি টিকটিকির জট!"

গণকঠাকুর মালা টপকে বলে, "হিং টিং ছট! ছক কেটে ঠিক করে দিচ্ছি। কে হাঁচি দিল, কেন দিল, টিকটিকি কোথা থেকে পড়ল, ভেঙ্গে বলুন।"

এতক্ষণে সব জানাজানি হয়েছে।

মহারাজা বলে, "মহারাণী হাঁচি দিয়েছে বেরুবার মুখে, আর মহাকোটাল দিয়েছে বেরুবার পরে।"

গণকঠাকুর বলে, "দাঁড়ান মহারাজা, ছক কাটি। নাক কাটা ব্যাপার তো! ওঁদের হাত দেখি আগে।"

মহারাণী ঘোমটা টেনে বাঁ হাত বাড়ায়। হাত দেখে গণক জিজ্ঞেস করে, "হাঁচি হ'ল কেন রাণীমা?"

মহারাণী মুখ ঢেকে বলে, "আচার খেয়ে।"

তখন গণক মহাকোটালের হাত দেখে। জিজ্ঞেস করে, "হাঁচি হয় কেন?"

মহাকোটাল বলে, "গরমে বাঁচি না, তাই টক দৈ খেয়েছি।" তখন গণক তালপাতার পুঁথি ওল্টায়। তারপর হি হি করে হাসে।

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "কি হ'ল?"

গণক আরও খানিক হো হো করে হাসে, তারপর সামলে নিয়ে বলে, "সব গোল চুকে গেল।" সে চক দিয়ে গোল গোল দাগ কাটে। তারপর পুঁথি থেকে শ্লোক শোনায়—

"টকং, আচারং, আছাড়ংশ্চৈব
সমগোত্র বদাচরেৎ—

অর্থাৎ কিনা, টক খাওয়া, আচার খাওয়া, আর আছাড় খাওয়া এক গোত্র বলে মনে করবে। টক খেয়ে হাঁচি, আর আচার খেয়ে হাঁচি, আছাড় খাবার সামিল। কিস্‌স্যু না, কিস্‌স্যু না। হেসে উড়িয়ে দেবে। "হাঁচিই নয়।" গণকঠাকুর তিনটা তুড়ি দিয়ে সব থুড়ি করে দিল। মহাকোটাল আর মহারাণী গণকঠাকুরকে একত্র প্রণাম করতে গিয়ে মাথায় ঠোক্কর খায়! তারা জিভ কাটে। তারপর মহারাজা মহাকোটাল রাজসভায় যায়। আর মহারাণী খুঁটে খুঁটে নানা সিধে গণকঠাকুরের গামছার খুঁটে বেঁধে দেয়।

গোল কাটল বটে, কিন্তু মহারাজা দরবারে গিয়ে গোলমেলে কথা শোনে।

মহাসেনাপতি গোঁফ নাবিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহারাজা জিজ্ঞেস করল, "গোঁফ নাবান কেন মহাসেনাপতি?"

মহাসেনাপতি কাচুমাচু মুখে বলে, "একটা ঘোরাল খবর মহারাজ।"

মহারাজা বলে, "ঘোড়ার পিঠে এল বুঝি? কি খবর?" মহাসেনাপতি গোঁফ আরও নাবিয়ে বলে, "পেঁচাল খবর।" মহারাজা বলে, "ও, পেঁচার পিঠে এসেছে?" গোঁফ আরও নাবিয়ে মহাসেনাপতি বলে, "উঁহু। এনেছে ভূতে।"

মহারাজা বলে, "ভূতুড়ে খবর?"

মহাসেনাপতি বলে, "তাই বটে। ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব ?"

মহারাজা বলে, "নির্ভয়ে বল।"

মহাসেনাপতি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, "আমরা নেই মহারাজ।"

মহারাজা বলে, "নেই ? অ্যা! দেখত মহামন্ত্রী, আমার নাড়ী চলছে কিনা ?"

মহামন্ত্রী দেখে বলে, "চলছে মহারাজ।"

মহারাজা তখন হাত নিজের কানে দেয়। বলে, "ঠিক চলছে—টিক্‌টিক্‌। তা' হলে কি কথা বলছ মহাসেনাপতি ?" সেনাপতি ঢোক গিলে বলে, "এট্টু জল খাব।"

বড় বড় লড়াইতে সেনাপতির তেষ্টা পায় না। অথচ আজ কথা বলতে সে জল খেতে চায়! মহারাজার তালগোল লাগে। মহারাজা হাঁকে, "হুঁকো বরদার,—" আর নিজের মাথা দেখায়। হুঁকো বরদার এখন কলকেতে ফুঁ দিচ্ছিল। মহারাজা মাথা দেখিয়ে বোঝাতে চাইল, তার মাথা কেমন করছে। তাড়াতাড়ি তামাক লাগাও। আর হুঁকোবরদার ভাবল, মহারাজা তাকে মাথায় ফুঁ দিতে বলছে। সে এসে মহারাজার মাথায় ফুঁ দিতে লাগল। মহারাজা তখন পেছন দেখিয়ে বলে, "ওখানে।" অর্থাৎ কল্‌কেতে। কিন্তু কল্‌কে হুঁকোবরদারের হাতে, পেছনে নয়। পেছনে ছিল পাখাবরদার। আর তাই হুঁকোবরদার ফুঁ দেয় তার মাথায়।

জোরদার ফুঁ। সেই ধাক্কায় পাখার ঝালর ঢুকল তার নাকে। আর—হাঁচচো।

মহারাজা বলে, "আহা, ভাল কাজে বাঁধা।"

পাখাবরদারের তখন মিঠে তামাকের গন্ধে ঝিমান ভাব। সে নিজের নাক বন্ধ করার জন্য হুঁকোবরদারের নাক টিপে ধরে। তারপর ভুল বুঝে ছেড়ে দেয়।

হুঁকোবরদার গড়গড়ার নল এগিয়ে দেয়। আর মহারাজা ভুড়ুক ভুড়ুক করে টানে। তখন সেনাপতির জল তেষ্টার কথা মনে পড়ে। হাঁকে, "পানিপাড়ে।"

পানিপাড়ে বালতি নিয়ে ছুটে আসে। গোদা বানরটা একটু আগে তার জলের ঘটি কেড়ে নিয়েছে। সে আর একটা জোটাবার সময় পায়নি। পানিপাড়ে বালতি নিয়ে মহারাজার কাছে যায়। কিন্তু ভেংচি খায়। মহারাজার চোখ সেনাপতির দিকে। তখন ইশারা বুঝে সে যায় সেনাপতির কাছে। বেজায় তেষ্টা। সেনাপতির হাত পেতে জল খাবার অভ্যাস নেই। খেতে যেয়ে বিষম খায়। খুক্‌ খুক্‌ করে কাশে। আর মহারাজা খোক্‌ খোক্‌ করে হেসে উঠে। একেবারে অট্টহাসি।

কখন গোদা বানরটা উঁচু সিংহাসনের তলায় মৌজ করে বসেছিল। বসে কলা খাচ্ছিল ও সেই সঙ্গে রাজকার্য দেখছিল। কেউ টের পায়নি। কিন্তু সে অট্টহাসি টের

গেল। তার মনে হ'ল, কিষ্কিন্ধ্যারাজের কলা খাবার সময় ওরা এটিকেট ভেঙে ঠাটা ক'রে বলছে,—

'ও বানর কলা খাবি, জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি?
বড় বৌয়ের বাপ হবি? একটি করে পয়সা পাবি।'

সে ভীষণ চটে গেল। কোৎ করে কলা খাওয়া শেষ করে, গোৎ মেরে সিংহাসনের পেছন দিয়ে বেরুল। আর হঠাৎ সিংহাসন ধরে ক'টা রামধাক্কা! তামাকের মিঠে গন্ধে তখন সবার চোখ মিট্‌মিট্‌ করছে। মহারাজার চিৎকারে সবার মট্‌কা ভাঙল। ততক্ষণ সিংহাসনসুদ্ধ মহারাজকে চিৎপাত করে, চোখ মট্‌কে ভেংচে বানরটা সট্‌কান। মহারাজা চেঁচাচ্ছিল, "ভূমিকম্পো!—"

চেঁচামেচি শুনে হুতুম পেঁচা ভয় পেয়ে খোড়ল ছেড়ে উড়ল। আর তার ডানার সাপটে সাতিরে ঝোলান মাকড়সার ঝুল দুলে উঠল। সবাই তা দেখে ভাবল, সত্যি ভূমিকম্প—খট্‌কার কিছু নেই। শিঙা ফুঁকল। তারপর সভা ছেড়ে মহারাজা, মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি আর মহাকোটালের ভোঁ দৌড়ের ঝাপট লাগল। মহাসেনপতির মহাকথা আর শোনা হ'ল না।

খানিক বাদে তারা বুঝল, আসলে ভূমিকম্প নয়। মিছেই তারা লম্ফঝম্প দিয়ে বেরিয়েছিল। তারা আবার হন্তদন্ত হয়ে রাজসভায় ফিরে গেল।

তখন সেনাপতি বলল, "মহারাজ, আমরা মরিনি। কিন্তু বেঁচে নেই।"

মহারাজা বলে, "এ কেমনতর কথা মহাসেনাপতি? এর কোনটা ঠিক?"

মহাসেনাপতি বলে, "দুটোই ঠিক মহারাজ।"

মহারাজ পকেট থেকে ঘড়ি বের করে কানে দেয়। তারপর বলে, হাঁ, ঘড়ি জোড়া সোড়া ঠিক বলে। কিন্তু ঘড়ির কথা এক, আর ঘোড়সওয়ারের কথা আলাদা।"

সেনাপতি বলে, "ঠিক। কিন্তু আমার কথা ঝিক্‌ঝিক্‌ করে। প্রজারা নাকি রাজা-মহারাজার টিকি ধরে টাক বানাবে।" মহারাজা বলে, "টাক বানাবে! চুল ছিঁড়ে, না কামিয়ে?"

সেনাপতি বলে, "ছিঁড়ে!"

মহারাজা উহুহু করে ওঠে। তার এক মাথা ঝাকড়া শক্তপোক্ত চুল। তা টেনে ছেঁড়া কম কষ্ট নয়। যে ছেঁড়ে, যার ছেঁড়ে—দুয়েরই। মহামন্ত্রী ও মহাকোটাল হুস্‌ হুস্‌ শব্দ করে বলে, "কোন পাজির এ দুষ্ট বুদ্ধি! ওদের পাঁজাকোলা করে আনব। তারপর জুতো পায়জার পেটা।"

মহাসেনাপতি বলে, "ক'জনকে আনবেন মহারাজ? সব শেয়ালের এক রা, সব প্রজার এক গা। ওরা এক গাঠ্‌ঠা হয়েছে।"

মহারাজা ক্ষেপে বলে, "এত সাহস! আমার রাজ্যে বাস, আমার চুল ছেঁড়ার আশ।"

মহাসেনাপতি বলে, "প্রজারা কি বলে জানেন মহারাজ? তারা বলে, রাজারা আশ মিটিয়ে প্রজার চুল ছিঁড়েছে। টাক করেছে। আর সে চুল পরে রাজার জাঁক।"

মহারাজা বলে, "তাই ফাঁক করবে? সব ফাঁকা কথা। আমার চুল টেনে দেখ। নিজের চুল।"

মহাসেনপতি বলে, "তাতে ভুল নেই। কিন্তু রাজার বুদ্ধি আর প্রজার বুদ্ধির কোনও মিল নেই। তা হ'ল চিলের বুদ্ধি আর চামচিকের বুদ্ধি,—বেড়ালের বুদ্ধি আর ইঁদুরের বুদ্ধি। তেম্নি গরমিল। তাই ইঁদুর আজ বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে চায়!"

মহারাজা বলে, "আর বেড়ালের রাজার কাছে সাজা পায়।"

মহাসেনাপতি বলে, "সে মজার দিন ভাঙ্গতে ওরা দল বেঁধেছে। তখন রাজাকে ওরা প্রজা বানাবে।"

মহারাজা ভেংচি কেটে বলে, "আর নিজেরা রাজা হবে!" মহাসেনাপতি বলে, "উঁহু, ওরা রাজা হতে চায় না। সব প্রজাই থেকে যাবে।

মহারাজার পূর্বপুরুষ অনেকদিন আগে জবড়জঙ্গ রাজা ছিল। আজ ভেঙ্গে গেছে। পাহাড় ভেঙ্গে মাটির ঢিবি হয়েছে,—সমুদ্র শুকিয়ে খাল। তবু চাল ছাড়েনি!

মহারাজা গর্ব করে বলে, "অ্যায়সা ল্যাঙ্‌ মারব—"

মহাসেনাপতি বলে, "কিন্তু লাখ লাখ ব্যাঙ্‌। তার একটা সাপ কি করবে? ব্যাঙ্‌ কেঁচো খায়। এবার সাপ খাবে। সাপ-খেকো ব্যাঙ্‌।"

মহারাজা মাথা চুলকায়। বলে, "তাই তো মহামন্ত্রী! ওদের জোট ভাঙ্গা যায় না?"

মহামন্ত্রী দাড়ি চুলকে এতক্ষণ শুনছিল। বলে, "মহারাজ, এ যে জোটের মস্ত জট। এ খোলাও যাবে না, কাটাও যাবে না।" মহারাজা বলে, "এট্টুখানি খেলা খেলেও না? ঢোল দিয়ে সেদিনকার মত ঢোলা কথার খাবার খাইয়ে? তামাকের ধোঁয়া মুখে ছড়িয়ে?"

মহামন্ত্রী খুঁজে জবাব পায় না। সব বুদ্ধি ওরা যেন খবাই করেছে!

মহারাজা বলে, "মহাকোটাল, তুমি তো প্রজাদের হালচাল জান। আচ্ছা কানমলা দিয়ে প্রজাদের সামাল দাও।" মহাকোটাল চাপদাড়ি চুলকে বলে, "মহারাজ, প্রজাদের সব দামাল মোড়ল গজিয়েছে। তারা ঢোল দিচ্ছে। শুনে বেসামাল হতে হয়।"

মহারাজা টালুমালু করে পাত্রমিত্রের দিকে তাকায়। সবার কেমন যেন তালকাটা হাল। যেন জোর বাতাসে নৌকার হাল ভেঙ্গেছে, পাল ছিঁড়েছে। কেউ সামাল দিতে পারছে না। অত লড়াই, অত দিগ্বিজয়,—প্রজাদের জোটের কাছে কিছু নয়।

সভা ভেঙ্গে যায়। মহারাজা টলে টলে বাড়ী চলে। চিন্তার তালগোল পাকান ছাট লেগে জাঁদরেল তালগাছ যেন টলছে! (ক্রমশঃ)

নিবেদিতা

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

এক শ' বছর আগে অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে আয়র্ল্যাণ্ডের ডানগ্যানন্ নামক ছোট এক শহরে জন্মেছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। তাঁর পিতামহ জন্ নোবল্ ছিলেন গীর্জার ধর্মযাজক। ইংলণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামে তিনি যোগদান করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে ছিল ধর্মানুরাগের সঙ্গে স্বদেশানুরাগ। তাঁর এই উন্নত চরিত্রের প্রভাব পৌত্রী মার্গারেটের জীবনে বিস্তার লাভ করেছিল।

মার্গারেটের শৈশবকাল কেটেছিল পল্লীগ্রামে তাঁর ঠাকুরমার কাছে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের কোলে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলাও চলতো, আবার ভগবৎ-ভক্তিমতী পিতামহীর সংস্পর্শে তাঁর জীবনে ধর্মভাব প্রস্ফুটিত হতে থাকতো। তারপর একটু বড় হলে তিনি ইংলণ্ডের বড় শহর ওল্ডহ্যামে তাঁর মা বাবার কাছে আসেন। এখানে এসে প্রথমটায় তাঁর ভাল লাগেনি। শিশুমনের সহজ সুরটি পল্লীর নিরালায় যে তারে বাঁধা ছিল, এই জনকোলাহল নগরে এসে তা যেন আর তেমন করে বাজে না! কিন্তু ধর্মপ্রাণ পিতা স্যামুয়েলের জীবনের সান্নিধ্যে বালিকা জীবনেও ধর্মভাব প্রস্ফুটিত হতে থাকে। মার্গারেট ও তাঁর ছোট বোন মে হ্যালিফ্যাক্স কলেজে পড়াশুনা করেন এবং ঐ কলেজের বোর্ডিংএই বাস করতে থাকেন।

কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাশ করবার পর মার্গারেট নানা স্কুলের শিক্ষিকার কাজ করতে থাকেন। শিক্ষাদানকে তিনি খুব ভাল বাসতেন বরাবরই। নানা স্কুলে চাকরি করবার পর তিনি নিজেই লণ্ডন শহরে একটা স্কুল খুললেন, কারণ অন্যের স্কুলে চাকরি করলে নিজের মত অনুসারে কাজ করা চলে না সব সময়। এখন ইচ্ছামত নিজের স্কুলটিকে গড়ে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও চলতে লাগলো, কাগজে নানা প্রবন্ধ লিখে সুলেখিকা বলে পরিচিত হয়ে উঠলেন। 'সেসেমি ক্লাব' নামে একটা ছোটখাটো সাহিত্য আসর ছিল। মার্গারেট এই ক্লাবের সেক্রেটারি হলেন। বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রভৃতি বিখ্যাত লেখক ও বিজ্ঞানী মাঝে মাঝে এই 'সেসেমি ক্লাবে' গিয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার ফলে মার্গারেটের মনে নানা সৎচিন্তার বিকাশ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডনের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে প্রথম পদার্পণ করেন। উদ্দেশ্য বেদান্ত প্রচার। মার্গারেটের তরুণ জীবনে বিবেকানন্দের মহৎ জীবনের স্পর্শ লাগলো। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ মার্গারেটের জীবনের সবশ্রেষ্ঠ ঘটনা। বিবেকানন্দ লণ্ডনে এসে

হিন্দু যোগী রূপে শীঘ্রই পরিচিত হয়ে উঠলেন।

একদিন এক ছোটখাটো আসরে বিবেকানন্দকে কিছু বলবার জন্তে নিমন্ত্রণ করা হলো। সেই সভায় মার্গারেটও নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দের কথা শুনতে। ধর্ম বিষয়ে স্বামীজীর কথাবার্তা শুনে মার্গারেট মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মার্গারেটের মনে পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হলো। তবুও তাঁর মনে নানা সংশয় ও প্রশ্নের উদয় হতে লাগলো যার জন্তে স্বামীজীর সঙ্গে, পরবর্তী অনেক আসরে, আলোচনাদি চলতে লাগলো। ফলে মার্গারেট স্বামীজীর শিষ্য হয়ে পড়লেন। এমনকি কিছুকাল পরে তিনি ভারতবর্ষে এসে স্বামীজীর সঙ্গে একযোগে নানা মহৎ কাজে লেগে যেতে চাইলেন। স্বামীজীও বুঝেছিলেন যে এমন একটি রত্নকে যদি নিজের কাজে লাগান যায় তবে খুবই সুফল ফলবে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রথমটায় হঠাৎ রাজী না হয়ে, ভারতবর্ষে আসলে মার্গারেটের খুবই অসুবিধা ও কষ্ট হবে, এখানকার রীতি-নীতি সবই সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এখনে এসে তাঁকেও দারিদ্র্য বরণ করে নিতে হবে, ইত্যাদি নানাভাবে সতর্ক করে দিতে লাগলেন। কিন্তু উৎসাহী মার্গারেট কিছুতেই ভীত না হয়ে ভারতবর্ষে চলে আসতেই চাইলেন। তখন স্বামীজী আনন্দের সঙ্গে তাঁকে ভারতে আসতে আহ্বান করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে শিষ্যত্বে বরণ ক'রে রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কাজে ক্রমশঃ লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর নূতন নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। নিবেদিতা লাগলেন নারী-জাগরণের কাজে। এই সব কাজ বাংলাদেশে করতে গেলে বাংলা শেখা দরকার বোধে অল্প দিনেই খুব ভাল বাংলা ভাষা শিখে ফেললেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করে ফেললেন। মেয়েদের শিক্ষা দিতে গিয়ে বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যা বর্তমানে 'নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়' নামে সুপরিচিত এবং তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত, যাঁদের বলা হয় 'প্রব্রাজিকা'। এঁরা ইংরাজী ও বাংলায় কয়েকখানি নিবেদিতার জীবনী-পুস্তক লিখেছেন। তার মধ্যে একখানি বিশেষ করে ছোটদের জন্তে লেখা। সেখানি তোমরা পড়ে দেখতে পার।

যে রাস্তাটার উপর নিবেদিতা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তারও নাম হয়েছে 'নিবেদিতা লেন'।

এদেশের জনসেবায় নিবেদিতা লাগলেন আশ্চর্যভাবে। দুভিক্ষের সময় ক্ষুধিতের মুখে অন্নদান, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গ্রামে গ্রামে সেবা করতে গিয়ে নিজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া, প্রভৃতিতেও তিনি কখনও নিরস্ত হননি, তাঁর উদ্যম ছিল অদম্য। আর দুরন্ত প্লেগ মহামারী যখন কলকাতায় ভয়ংকর ভাবে দেখা দিল, তখন নিবেদিতা প্লেগ রোগীর সেবা ও চিকিৎসার

ব্যবস্থাদি করা, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজেও নির্ভীক চিত্তে যেতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে তাঁর নতুন নাম দিয়েছিলেন—'লোকমাতা নিবেদিতা'।

তারপর যখন বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলো, নিবেদিতা তাঁর পূর্ণ সমর্থন করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই পরাধীন দেশকে স্বাধীন না করতে পারলে প্রকৃতপক্ষে উন্নত করা যাবে না। তাই যাঁরা সে যুগে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই বিপ্লবী বীরগণকে তিনি গোপনে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে, যেমন—শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। আর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী অবলা বসুর সঙ্গে তাঁর এতই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে, প্রায়ই তাঁদের বাড়ীতে দীর্ঘকালের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। বস্তুতঃ তাঁদের পরিবারেরই একজন যেন হয়ে গিয়েছিলেন নিবেদিতা! এই সব মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানা কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন নিবেদিতা। অনেক বইও লিখতেন মাঝে মাঝে।

এই ভাবে কাজ করতে করতে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে দার্জিলিং যান স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য। কিন্তু উন্নতি তো হয়ই না, বরং সেখানে রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ডাক্তার নীলরতন সরকার ছিলেন তখন দার্জিলিং-এ। তিনি ছুটে এসে চিকিৎসা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং-এ মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী মহিলার দেহাবসান হয়।

তিনি চলে গেলেও বাংলা দেশ তাঁকে ভোলেনি। তাই গত ২৮শে অক্টোবর নিবেদিতার শতবার্ষিক জন্মোৎসব কলকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে খুব ধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন ও সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জন্মোৎসব সভার আয়োজন হয়েছিল মহাজাতি সদনে। সেখানে সভাপতি হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চটোপাধ্যায় ও বিদুষী অধ্যক্ষ ডক্টর রমা চৌধুরী। আর একটি সভা ঐ দিনেই হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, যেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন অপর জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা দিয়েছিলেন নিবেদিতার জীবনের ঘটনাবলী বলে ও গুণকীর্তন করে।

মিতুলের চিঠি

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার

ছোটন, ওই যে দেখছো দূরের ঝোপগুলোতে অঙ্গ নাচিয়ে শিষ দিচ্ছে একদল হলদে রঙের পাখি, ওদের সব দেয়ালপুরে বাস। বাতাসি নদীর ছায়ায় ছায়ায়, মাঝি-মাল্লার গানের তালে তালে সকাল-সাঁঝে যখনই তুমি যাবে দেয়ালপুরে, দেখবে ওরা পুচ্ছ তুলে দাঁড়িয়ে আছে উচে। স্থলপদ্ম গাছের আড়াল থেকে এসব দেখতে ভারী ভাল লাগবে তোমার। মাথার উপর লেজটাকে দোলাতে দোলাতে পয়লা নম্বরের দুষ্টু ওই কাঠবেড়ালিটা যদি লাল গানে নীল সুর দিয়ে গেয়ে ওঠে :

উপেনটি বাইস্কোপ
টুং টাং তেইসকোপ

তাহলে আমি অবাক হবো না মোটেই। জানাবে ছোটন ওর সাগরেদরাও একসঙ্গে গাইতে সুরু করেছে :

চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
আজ বলেছে যেতে
পান সুপারী খেতে
পানের মধ্যে ভোমরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া

এসব শুনে তুমি হয়ত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছো, ভাবছো পাখপাখালির জগতটাই বুঝি অন্যরকম। আসলে কিন্তু তা নয়। তালবনের সারি সারি গাছের অন্ধকার মাথায় বাবুই পাখিরা যখন ছানাপোনা নিয়ে ঘরকন্নার সুখদুঃখের গল্প করতে ব্যস্ত, একদল চড়ুই তখন তোমার আসার খবর বয়ে বেড়াচ্ছিল বাতাসে।

চিড়িক-চিক-চিক…

একটা নতুন লোক, ডাক দিয়ে দেয়ালপুরের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিম অবধি ছুটে বেড়াচ্ছিল, কখনো ঘূর্ণি হাওয়ার মত দু'পা আকাশে তুলে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে নেমে আসছিল বালি ছিটোতে ছিটোতে।

সবুজের উপর সোনালী ডোরাকাটা সোনাপোকারা চাপাঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাবৎ বিশ্ব দেখার কাজে ব্যস্ত। ঝাঁকানো আমগাছের সারির নিচের এই সবুজ জাজিমে রোদ এখন কম, বাতাসের ডানারা দু'একবার আলতো করে

ছুঁয়ে যাচ্ছে মাটি, লতানোকুসুম মাথা নাড়িয়ে জানান দিচ্ছে তার।

যদি ভাল করে কান পাতো, ধরতে পারো বাতাসের শব্দ, শুনবে কে যেন বলছে, বনের পৃথিবীটাকে দেখা অত সহজ কথা নয়। কত জীবজন্তুই তো আসে, শেষ পর্যন্ত কে-ই বলো সব কিছু দেখে যেতে পারে, তার আগেই তো তার দিন যায় ফুরিয়ে।

তবে আমরা কেমন করে জানবো এসব, কারা যেন ফিস-ফিসিয়ে উঠলো তখন।

ছোটন স্থলপদ্ম গাছের আড়াল থেকে পাখী আর কাঠবিড়ালিকে দেখছে।

প্রথমে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে চোখ দুটো শুধু খাড়া রেখে বুঝতে হয় বনের মনের চেহারাটা আজ কেমন ধারা। বড় জীবজন্তু, ভয়ের কিছু আসতে পারে কিনা। তা যদি আসার হয় তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে পথের চলাফেরা, কাঠবেড়ালিদের খুটখাট, শুবরে পোকাদের গান আর শালিক চড়ুইয়ের ঝগড়া।

গাছের পাতা নিথর। নিথর বনের আকাশ এমন যদি কখনো হয়, তাহলে জেনো সেদিন বড় ভয়।···

কিসের ভয়, কিসের ভয়···হঠাৎ ছোটন, আমার কি হলো জান, ঘুমটা ভেঙে গেল আর তাকিয়ে দেখি জানালার সামনের খোলা য়্যালবামে মস্ত বড় একটা বাঘের ছবি; সেই চিরপরিচিত সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। —মিতুল

অঘ্রানের ছড়া

শ্রীঅমর রাউত

কিচ্, কিচ্, কিচ্, চড়ুই নাচে,
ইঁদুর ধরে গান।
মাঠের পানে তাকিয়ে চাষীর,
মন করে আনচান্।

হিমেল হাওয়ায়, রঙ বদলায়
মাঠের সবুজ ধান,
সোনা রঙে ভরিয়ে দিতে
এলো রে অঘ্রান।

জাহাজের ইতিকথা

শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ

নদ-নদী হ্রদ-সমুদ্র মানুষকে চিরদিন হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। প্রয়োজনের তাগিদ তো আছেই, আর আছে মানুষের মনে একটা অদম্য উৎসাহ। দূরে যেতে হবে দূরকে জানতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করার বাসনা তার চিরকালের সেই আদিযুগ থেকে।

এই প্রেরণাতেই হয়ত মানুষ জলে ভাসিয়েছিল গাছের গুঁড়ি। তারপর গাছ কুঁদে তৈরি করেছিল ক্যানো নৌকা, পাশাপাশি গুঁড়ি বেঁধে তৈরি করেছিল ভেলা। এসবের প্রচলন আজও দেখা যায় এমন কি সমুদ্রের বুকেও।

আদি সভ্য দেশগুলির মধ্যে মিশরের দাবী অগ্রগণ্য। আজ থেকে ছ' হাজার বছর আগে তারা যে নৌকা করে নীল নদীতে যাতায়াত করত, তার বিবরণও ছোট আকারের মডেল কোন কোন মৃতদেহের (মমি) সঙ্গে রেখে দিয়েছিল। সে নৌকায় তারা ব্যবহার করেছে দাঁড় ও পাল। নৌকা না বলে ছোট জাহাজ বলাই বোধ হয় ঠিক। সেগুলি দু-তিনশ ফিটেরও বেশি লম্বা হ'ত—এগুলোয় তারা পিরামিড ও মন্দির তৈরি করার জন্মে দূর থেকে প্রকাণ্ড আকারের পাথর বহে আনত। এই ধরনের জাহাজ করে তারা সমুদ্রেও পাড়ি দিত, তবে তা হ'ত বেশি মজবুত এবং আকারে ছোট ৬০ থেকে ৮০ ফিটের মধ্যে। প্রাচীন অন্ত সভ্য জাতিগুলি যেমন, ক্রীট দেশের অধিবাসীরা, ফোনেশীয়রা, গ্রীকরা রোমানরা অনেকটা মিশরীয় জাহাজের মত জাহাজ তৈরি করত। তবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও কিছু ছিল। এদের জাহাজে একাধিক ডেকও থাকত, ডেকের ওপর ছাউনিও থাকত।

প্রাচীন সভ্য দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। সামরিক শক্তি বাড়াবার জন্মে প্রধানতঃ চাই নৌবহরকে শক্তিশালী করা। বলতে গেলে সমুদ্রের মাঝেই তাদের বাস। তাই যুদ্ধজাহাজের ও মালবাহী জাহাজের গঠনে পার্থক্য দেখা দিল। যুদ্ধ-জাহাজগুলি হ'ল সরু ও লম্বা, দু'পাশে দাঁড়; এমনও হ'ল—এক থাক দাঁড়ের ওপর আর এক বা দু'থাক দাঁড়। অর্থাৎ দু'পাশে চার থাক বা ছয় থাক দাঁড়। জাহাজে থাকত এক বা একের বেশি পাল, সাধারণতঃ চৌকো। ফলে যুদ্ধজাহাজ হ'ল দ্রুতগামী, বাঁক ফিরানও অনেক সহজ হ'ল। মালবাহী জাহাজ হ'ল চওড়া যাতে পণ্যবস্তু বেশি ধরতে পারে, দাঁড়ের চেয়ে পালেই চলত বেশি। রোমানদের আসলে একাধিক মাস্তল দেখা দিল, পালের সংখ্যা বাড়ল এবং বড় চৌকা পালের ওপরে একটা ত্রিকোণ ছোট পাল জোড়া হ'ল, তাতে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করান সুবিধা হ'ল। জাহাজে ছাউনি বা কেবিনের ব্যবস্থাও হ'ল। এই ধরনের জাহাজ করেই ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন জাতিগুলি, ফোনেশীয়রা, গ্রীকরা,

রোমনরা সমুদ্রে বহু দূর পর্যন্ত পাড়ি দিত—রোমানরা আফ্রিকা ঘুরে এসে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যও করত।

মধ্যযুগে পালতোলা জাহাজের মোটামুটি উন্নতি হয়েছে, বিশেষ করে দু'শ বছর ধরে যে ধর্মযুদ্ধ (ক্রুজেড ১১০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) হয় তার ফলে। জাহাজের খোলের মধ্যে ছোটখাট দুর্গও তৈরি হয়েছে। সমুদ্রের সমস্ত ধকল সইবার মত মজবুত ও বেশ কিছু লোক অনেক দিন ধরে যাতে জাহাজে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা মধ্যযুগের পালতোলা জাহাজগুলিতে করা হয়েছে। এই ধরনের জাহাজে করে ভাস্কোডিগামা ভারতে আসেন আর কলম্বাস নতুন দেশ আবিষ্কারে বের হন।

এই সময়ে ইতিহাসের মোড় ফিরল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলি উপনিবেশের দিকে ঝুঁকল। সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে যাতায়াত, উপনিবেশগুলিও দূরদূরান্তে, পালতোলা জাহাজই তখন ভরসা। তাই জাহাজের প্রচুর উন্নতি ঘটেছে এযুগে। স্টিয়ারিং হুইল, সেক্সট্যাণ্ট, ক্রোনোমিটার প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। গত শতকের প্রথম দিকে আমেরিকা পালতোলা জাহাজ দিয়েই নিয়মিত অতলান্তিক সাগর পারাপারের জন্য জাহাজ-সার্ভিস খুলেছিল। পণ্যবস্তু, যাত্রী ও চিঠি বহন করা হ'ত।

কিন্তু পালতোলা জাহাজের বড় অসুবিধা হ'ল বাতাসের ওপর নির্ভর করে চলতে এবং এর গতিবেগও তেমন দ্রুত হয় না। অথচ উপনিবেশের তাগিদে, যন্ত্রযুগের তাগিদে দ্রুতগতির প্রয়োজন খুবই। জাহাজে বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, যেমন স্থলপথে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্রুত যাতায়াতের হদিস দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই এ চেষ্টা শুরু হয়েছে। কে যে প্রথম বাষ্পীয়পোত চালান বা আবিষ্কার করেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে এ কথা জানা যায় যে, ডেনিস পেপিন নামে একজন ফরাসী ১৭০৭ সনে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের দ্বারা প্রথম পোত চালান ফুলডা (এলব-এর শাখা নদী) নদীতে। কিন্তু নদীর অন্য মাঝিরা জীবিকা খোয়ানোর ভয়ে সেই পোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ১৭৮৩ সনে ফ্রান্সের সাওন নদীতে বাষ্পীয় পোত চালান মারকুইস ক্লদ দ্য জাউফ্রয় দ্য-অবন্স। জেমস রাম্‌সে নামে একজন আমেরিকান কয়েকটি বাষ্পীয় পোত তৈরি করেন এবং ১৮৮৭ সনে পোটোম্যাক নদীতে ঘণ্টায় তিনমাইল গতিবেগে দু'ঘণ্টা ধরে কয়েক'শ লোকের সামনে একটি বাষ্পীয় পোত চালান। আর একজন আমেরিকান জন ফিচ্‌ একটি পোত তৈরি করেন (১৭৮৬) যার দু'পাশে সাধারণ নৌকার মত ছটি করে দাঁড়ের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেগুলি চলত বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে। অন্য মডেলেরও বাষ্পীয় পোত তিনি তৈরি

করেন এবং ১৭৯০ সনে স্টিমার-সার্ভিসের প্রবর্তন করেন, কিন্তু অনবরত আর্থিক অনটন সহ্য করতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যা করে নিস্তার পান। উইলিয়ম সিমিংটন নামে একজন স্কচ-ইঞ্জিনিয়ার ১৮০২ সনে ফোর্থ ও ক্লাইড খালে তাঁর তৈরি বাষ্পীয় পোতের দ্বারা দুটি পাখাবোট ঘণ্টায় তিন মাইল গতিবেগে ২০ মাইল টেনে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইঞ্জিন চললে জলে যে দারুণ তোলপাড় হবে, তাতে পাড় ভেঙে যাবে—এই যুক্তিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠে এবং তাঁর সার্ভিস খোলার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। সিমিংটনের জাহাজ চলা চোখে দেখেছিলেন আমেরিকান চিত্রকর রবার্ট ফাউন্টন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং ১৮০৭ সনের ১৭ই আগষ্ট নিউইয়র্ক থেকে আলবেনি পর্যন্ত একটি স্টিমার সার্ভিস খোলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ইতিহাসে দিনটি স্মরণীয়। এরপর বিভিন্ন নদীতে স্টিমার সার্ভিস খোলা হতে থাকে এবং স্টিমার সার্ভিসের প্রসার বাড়ে।

নদীতে স্টিমার-সার্ভিসের সাফল্যে ভরসা বাড়ল, তাহলে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে সমুদ্রও পেরন যাবে। আমেরিকান জাহাজ 'সাভানা' ১৮১৯ সনে আমেরিকার জর্জিয়া থেকে ইংলণ্ডের লিভারপুলে এসে পৌঁছয় ২৫ দিনে। এই জাহাজে পালের ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন—দু-এরই ব্যবস্থা ছিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যথেষ্ট গলদ ছিল। উন্নতির চেষ্টা চলতে লাগল। ১৮৩৩ সনে প্রথম সম্পূর্ণ সময় বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিয়ে অতলান্তিক সমুদ্র অতিক্রম করে ক্যানাডার জাহাজ 'রয়েল উইলিয়ম'। সে জাহাজ কুইবেক থেকে লণ্ডনে আসে ২৫ দিনে। এরপর থেকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে সমুদ্র পারাপার হওয়া রেওয়াজ হয়ে গেল এবং ১৮৪০ সনে ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'কানার্ড' লাইনের প্রবর্তন হ'ল। জাহাজের গঠনে ও ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতায় ক্রমশই উন্নতি হতে লাগল। জাহাজে কাঠের বদলে লোহার বেশি করে ব্যবহার হতে লাগল, জাহাজের আকার বাড়ল, নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাড়ল এবং যাত্রীদের আরাম দেবার প্রচুর ব্যবস্থা যুক্ত হতে লাগল।

এই শতকের প্রথম থেকে জাহাজের ও ইঞ্জিনের গঠনে বেশ উন্নতি হ'ল কতকগুলি কারণে। যেমন নতুন ধরনের বয়লার, কয়লার বদলে তেলের ব্যবহার, ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কার, বিদ্যুতের ব্যবহার, টারবাইনের ব্যবহার ইত্যাদি। এখন অনেক বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজ ডিজেল ইঞ্জিনে চলছে। টারবাইন-ব্যবস্থা সমন্বিত ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা অনেক বেশি বলে জাহাজগুলিতে এই ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার হচ্ছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেও এখন অনেক জাহাজ চলছে।

জহাজের এত উন্নতি হয়েছে যে, একটি জাহাজ দেখলে যেন একটি দুনিয়া বলে মনে হয়। ১৯৪০ সনে পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ 'কুইন এলিজাবেথ' ভাসান হয়। জাহাজটি

১০৩০ ফিট লম্বা, ১১৮ ফিট চওড়া, ৮৩ হাজার টন মাল বইতে পারে, ২৩০০ জন যাত্রী এতে থাকতে পারে, গতিবেগ ঘণ্টায় ৩২ নট। যাত্রীবাহী জাহাজগুলিতে যাত্রীদের যে কত রকমের আরামের ব্যবস্থা থাকে তা বলে শেষ করা যায় না, যেন ইন্দ্রপুরী? আর গতিবেগের কথা? ১৮১৯ সনে 'সাভানা'র অতলান্তিক পাড়ি দিতে লেগেছিল ২৫ দিন, এখন লাগে সাড়ে তিনদিন মাত্র!

আনবিক শক্তির কথা আমরা শুনেছি। আনবিক শক্তি যে কেবল ধ্বংসের কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে বা হচ্ছে তা নয়, মানুষের কল্যাণপ্রদ কাজেও এই শক্তিকে নিযুক্ত করা হচ্ছে। ১৯৫৯ সনে আনবিক শক্তির সাহায্যে প্রথম জাহাজ 'লেনিন' চালনা করে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন—উত্তর মেরুর সমুদ্রের বরফ পরিষ্কার করার জন্য জাহাজটি নিযুক্ত হয়। ঐ বছরেই আমেরিকা আনবিক শক্তি পরিচালিত 'সাভানা' (১৮১৯ সনের প্রথম জাহাজেরও নাম ছিল 'সাভানা') সমুদ্রে ভাসিয়েছে। গবেষণা কাজের জন্য জাহাজটি ব্যবহৃত হচ্ছে। আণবিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত এখন সাবমেরিন ও বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজও নির্মিত হচ্ছে।

সূয্যিমামা

শ্রীবিশ্বনাথ দে

মাগো, আমায় বলতে পারো তুমি
কেমন করে সূয্যিমামা ওঠে,
কেমন করে সবাই জাগার আগে
সূয্যিমামা নিজের কাজে ছোটে।

রোজ সে বুঝি জেগে কাটায় রাত
সকালে তাই ঠিক সময়ে আসে,
ছড়ায় আলো পাখির ডানা পাখায়
ছড়ায় আলো মাঠের ঘাসে ঘাসে।

মাগো, বলো, সূয্যিমামার কোনো
ঘর-বাড়ী কি নেইকো নিজের বলে,
সূয্যিমামা শোয় না বুঝি রাতে
আমার মতো আপন মায়ের কোলে?

সূয্যিমামা খায় কোথা মা দিনে
জলের গেলাস কে তার মুখে ধরে,
সূয্যিমামা বড়ই একা তাই
রাখবো তাকে পুপুর খেলাঘরে।

দিয়াশলাই কাঠির ভেল্কি

———————— শ্রীশচীদুলাল দে

যাদুকরের হাতে আছে দুটো দিয়াশলাই কাঠি (১নং চিত্র ক)। দর্শকদের এই দুটো দিয়াশলাই কাঠি দেখিয়ে যাদুকর বললেন, "বন্ধুগণ! এই দুটো দিয়াশলাই কাঠির মধ্যে আছে বৈরীভাব। একজনের সান্নিধ্য অন্যজনের কাছে বিষতুল্য। তাই এরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। প্রমাণ চান? তবে দেখুন।"

এই কথা বলে, যাদুকর দর্শকদের তাঁর হাতের দিয়াশলাই কাঠি দুটোর দিকে লক্ষ্য করতে বললেন। তারপর দেখা গেল, দিয়াশলাই কাঠি দুটো পরস্পর আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে (১নং চিত্র খ)। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে তো দর্শকেরা অবাক! আর সেই সঙ্গে তোমরা তো এই আজব কাণ্ডের কথা শুনে হতবাক।

এই আজব কাণ্ডের গোপন কৌশলটা চুপি চুপি শুনে নাও। এই খেলা দেখানোর জন্য চাই দুটো ম্যাচকাঠি এবং সামান্য একটা ভাল্ব-টিউব। এই ভাল্ব-টিউব সাইকেলের দোকান থেকে কিনে নেবে। ভাল্ব-টিউব রবারের তৈরী একথা তো জানো সবাই। রবারের ধর্মই হচ্ছে এই যে, চাপ দিলেই সংকুচিত হয় এবং ছেড়ে দিলেই প্রসারিত হয়। অর্থাৎ যেমন কে তেমন। রবারের এই বিশেষ গুণের ফলেই আমরা দেখাতে পারবো এই মজার ম্যাজিকটা। ভাল্ব-টিউবের দুটো প্রান্তে দুটো দিয়াশলাই কাঠি আটকে দাও। ২নং চিত্র দেখলে ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারবে।

ভাল্ব-টিউব

(২নং চিত্র—গুপ্ত কৌশল)
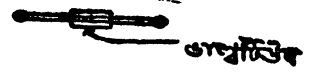
এইবার ভাল্ব-টিউব লাগান অবস্থায় সমস্ত জিনিসটাকে ১নং চিত্র ক-এর মত বাম হাত দিয়ে চেপে ধর, তা'হলে তারা পাশাপাশি থাকবে। আর আঙুলের চাপ সামান্য করে কমিয়ে নিলেই কাঠি দুটো পরস্পর আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে শুরু করবে (১নং চিত্র খ)।
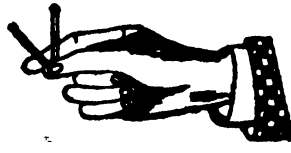
(১নং চিত্র—ক)

(১নং চিত্র—খ)

খেলাটা দেখানোর আগে কয়েকবার নিজে নিজে করে দেখলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিশেষে এই কৌশল-করা কাঠি দুটো কখনও দর্শকদের হাতে দেবে না কিন্তু।

খড় দিয়ে বোতল তোলা

আর একটা ম্যাজিকের কথা বলি, 'খড় দিয়ে বোতল তোলা'। কিন্তু এ কথাটা
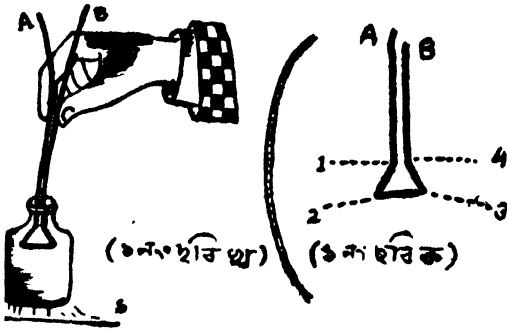
শুনেই বোধ হয় তোমাদের খুব হাসি পাচ্ছে। তাই তো, খড় দিয়ে আবার বোতল তোলা যায় নাকি? তার ওপর সেটা যদি একটা খড় হয়। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় ম্যাজিকের মন্ত্র দিয়ে, অর্থাৎ সামান্য বুদ্ধি খরচ করলেই তা সম্ভব হবে।

একটা সাধারণ কালো রং এর বোতল, তার ভেতর গলিয়ে দিলে দু' ভাঁজ করা একটা লম্বা খড়, আর মুখে বললেন ম্যাজিকের মন্ত্র—ওয়ান, টু, থ্রি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল মজার ব্যাপার। খড়টাতে সামান্য টান দিতেই বোতলটা উঠে এলো টেবিলের ওপর থেকে।

চুপি চুপি কৌশলটা শুনে নাও। বোতলের কোন চালাকি নেই। তবে বোতলটা কালো রং-এর কিংবা কোন গাঢ় রং-এর হওয়া চাই। তা না হলে ভেতরের অংশ দেখা যাবে এবং ফলে খেলাটা ধরা পড়ে যাবে। খড়টা কৌশলযুক্ত। প্রথমে একটা শক্ত ভাল দেখে খড় নাও; মনে কর খড়টার একটা প্রান্ত-A, এবং অপর প্রান্তটা-B. এবার ১নং ছবি 'ক'-এ যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইভাবে খড়টাকে মোট চার ভাঁজ করে নাও।

এইভাবে খড়টাকে আগেই তৈরী করে নিতে হবে। যখন খেলাটা দেখাবে, তখন খড়টাকে দু' ভাঁজ করে বোতলের মধ্যে গলিয়ে দেবে। এবার ১নং ছবি 'খ'-এ যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইভাবে বাঁ হাতে খড়টাকে আলগাভাবে ধরে, ডান হাত দিয়ে খড়ের B-প্রান্তটাতে চাপ দিলেই বোতলের ভেতর খড়টা একটা ত্রিভুজের আকৃতি ধারণ করবে, ফলে খড়টাকে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোতলটাও টেবিলের ওপর থেকে উঠে আসবে। ছবি দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে।

ট্রাক্টর দুর্ঘটনায় ওয়াশিংটনের রসলিনের উইলিয়াম লামসডেন ১৯৩০ সালের ৬ই জুলাই তাঁর বাঁ হাতখানি হারায়। তার বংশের সেই হ'ল চতুর্থ বংশধর যে দুর্ঘটনায় বাঁ হাত হারিয়েছে। উইলিয়াম যে বয়সে তার বাঁ হাত হারায়, ঠিক সেই বয়সেই তার প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতা তাঁদের বাঁ হাত হারান; অবশ্য বিভিন্ন দুর্ঘটনায়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্যাপীলিক খুড়ো খুড়ীকে বললে, "চলো, এই ফাঁকে দেশটা একবার দেখে আসি।"

খুড়ো খুড়ী বললে, "উহুঁ, বাদাম খোলায় আর ঢুকছি না"—

প্যাপীলিক বললে, "নাই ঢুকলে! চলো, একটু পা চালিয়ে"···

একটু যেতেই একটা জুতোর বাক্স দিয়ে তৈরী বাড়ী দেখা গেল। তার মধ্যে ঢুকেই একটা মস্ত বড় হলঘর। চারদিকে তার চারটে জানলা। একটা জানলা খুব নীচুতে। এই জানলা দিয়ে পরচুলওলারা বসে বসে বাইরের দৃশ্য দেখে। আরেকটা জানলা আরেকটু উপরে—এই জানলা দিয়ে পরচুলওলারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে।

প্যাপীলিকের কাছে এইসব খবর পাওয়া গেল। সে বলতে লাগল, "ঐতিহাসিককে যখন ঐ ঘরটা প্রথম ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল, তখন ঘরে ঐ দুটো মাত্র জানালা ছিল। ঐতিহাসিক দেখলেন যে, ঐ দুটো জানলা দিয়ে তাঁর কাজ চলবে না—পরচুলওলাদের চেয়ে তিনি বেশ খানিকটা ঢ্যাঙা প্রায় তাদের দ্বিগুণ, কাজেই যাতে তিনি বসে ও দাঁড়িয়ে দেখতে পান সেজন্য আরো দুটো নতুন জানলা করানো হ'ল।"

"ঐতিহাসিক এত ঢ্যাঙা কেন?" জিজ্ঞাসা করল খুড়ো।

প্যাপীলিক বললে, "এসব কাকীবুড়ীর বুদ্ধিতে হয়েছে। ঢ্যাঙা না হলে তিনি বহুদূর পর্যন্ত দেখবেন কি করে? তাই অনেক কষ্টে খুঁজে-পেতে তাঁকে যোগাড় করতে হয়েছে।

হ্যাঁ, লোকটার বুদ্ধি আছে। এর দুটো পোষা উড়ুক্কু মাছ আছে। এদেশে অনেকে উড়ুক্কু মাছ পোষে। এরা ফাইফরমাজ খাটতে ওস্তাদ। ছাদের উপর ঐতিহাসিক এদের আসা-যাওয়ার জন্যে ফুটো দুটো করিয়েছেন—বড়টার জন্যে একটা বড় ফুটো, আর ছোটটার জন্যে একটা ছোট ফুটো—কারণ ছোট ফুটো দিয়ে বড় মাছটা তো যাওয়া-আসা করতে পারবে না!"

খুড়ী বললে, "কেন, একটা বড় ফুটো করলেই তো ছোট ও বড় দুটোই-যাওয়া আসা করতে পারতো।"

প্যাপীলিক বললে, "হ্যাচ্ হ্যাচ্ হ্যাচ্! এ ঠিক ভাতখেকোদের বুদ্ধি! তাই হয় বুঝি কোনকালে হ্যাচ্ হ্যাচ্ হ্যাচ্। মুড়ি-মিছরীর একদর! এই জন্যে তোমাদের দেশে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ।"

হঠাৎ দরজা দিয়ে বাঁশের মত লম্বা একজন ল্যাগবেগে লোক ঘরে এসে টেবিলের সামনে বসে একটা টেলিস্কোপ চোখ লাগিয়ে একটা পাকানো কাগজ খুলে খুলে পড়তে লাগল।

আর এক হাতে খাগের কলম দিয়ে অং-বং আঁকি-বুঁকি কাটতে লাগল কাগজের ওপর। ঘরের মাঝখানে মস্ত একটা ভূগোলক। তাতে লাল নীল রঙের দেশগুলো আঁকা। আরেক ধারে পীজবোর্ডের মানুষ তৈরী করে দাঁড় করানো রয়েছে, তার দ্বারা কোন দেশে লোক কত পরিমাণ কেক খায় তা দেখানো হয়েছে।

হঠাৎ মাথার উপর খস্‌খস্ শব্দ শুনে খুড়ো খুড়ী ওপরে তাকালো—দেখলে গর্ত দিয়ে বড় উড়ুক্কু মাছটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পরিষ্কার গলায় বললে, "তিনটে বেজেছে।"

ঘরের এক কোণে একটা লাল মুরগী পা দিয়ে হলদে ও শাদা গুলি পাকাচ্ছিল। তিনটে বেজেছে শুনে ছ'টা হলদে গুলি তার ডানার মধ্যে লুকিয়ে ফেললে।

জানলা দিয়ে খুড়ো খুড়ী দেখলে বাজারের কাছে যে সব মজুররা কাজ করছিল তারা সব গামছা, চাদর ইত্যাদি বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্যাপীলিক বললে, "তিনটে বাজলে এদেশের সবাই বিশ্রাম করে।"

গুগলী ঝিনুক খাঁ দৌড়ে আসছিল মাঠ দিয়ে, তার লম্বা চুল হওয়ায় উড়ছিল। সে হাত ধরে একটি মেয়েকে নিয়ে আসছিল। সেটি কয়েদীর মেজ মেয়ে। কুচকাওয়াজের সময়ে দেখা গিয়েছিল বড় মেয়েকে।

প্যাপীলিক বললে, "এটি কয়েদীর মেজ মেয়ে।" মেয়েটির বড় বড় চোখ ঘুরে ঘুরে চারদিকের সব কিছু লক্ষ্য করছিল।

গুগলী ঝিনুক খাঁ তাকে দরজা ঠেলে একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে

শিকল উঠিয়ে দিয়ে মাঠের মাঝে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

দেখা গেল আকাশে একটা লাল উড়ুক্কু মাছ পাক দিয়ে দিয়ে শকুনের মত ঘুরতে লাগল।

প্যাপীলিক বললে, "মজা দেখ। মাছটা বোধ হয় গোয়েন্দা—কিসের সন্ধান করছে।"

মাছটা বোঁ করে খুড়ো খুড়ীর খুব কাছে উড়ে এসে বললে, "একবার গুণে দেখতো আমার গায়ে কতগুলো আঁশ আছে। ঐ কয়েদীর মেয়েটা আমার গায়ের টাকার মত একটা আঁশ চুরি করেছে। আমার গায়ে ছিল ৭৮২টা আঁশ, কিন্তু সব্বাই বলছে এখন ৭৮১টা আঁশ আছে।" বলেই বোঁ করে কোথায় উড়ে গেল।

এবার ছোট উড়ুক্কু মাছটা ছোট গর্ত দিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এসে একটা দাঁড়ে বসে ঘুমিয়ে পড়লো।

এইবার ঐতিহাসিক লম্বা হাত বাড়ালো মুরগীর দিকে। মুরগী ছ'টা ডিম তাকে দিয়ে দিলে। সে সেগুলো ঠোঁটের পাশের গর্ত দিয়ে ফেলে দিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে তিনটে করে দিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে ঘুমিয়ে পড়লো।

খুড়ো খুড়ী বললে, "উনি এবার ঘুমুচ্ছেন।"

ঐতিহাসিক অদ্ভুত মানুষ। অত্যন্ত রোগা আর মুখের জায়গায় মস্ত দুটো ঠোঁট। হাতীর চোখের মত ছোট ছোট কুঁৎকুতে তার চোখ—এ চোখ দুটো প্রায়ই বন্ধ থাকতো। তার গলায় একটা কম্বলের কম্ফর্টার জড়ানো।

সব্বাই ঘুমুচ্ছে দেখে খুড়ো খুড়ী সেই ফাঁকে এগিয়ে গেল ঐতিহাসিকের টেবিলের কাছে। টেবল-ভরা সব পাকানো কাগজ। সেগুলো খুলে-মেলে দিতে দেখা গেল এইসব লেখা :

বৃহস্পতিবার বেলা তিনটে।

বাজারের কাছে পার্কে সব বাড়ী পড়ে গেল।

নদী যখন শুকনো তখন কয়েদী নদী পার হ'ল।

চকোলেটের পাহাড় ধ্বসিয়ে কয়েদী লাফ দিল।

রান্নাঘরের উপর দিয়ে কয়েদখানা গেল—কিন্তু রান্নাঘরে কিছু ছিল না।

ভাতখেকো দুটোর বিচার হ'ল।

ভাতখেকোরা আমার ঘরে বন্দী হ'ল।

ইঁদুরেরা জল দিয়ে কয়েদখানা অটুট রাখলো।

সব্বাই সোরগোল তুললো, "জেলখানা আসছে—জেলখানা আসছে।"

খুড়ো বললে, "এসব কি আবোলতাবোল লেখা!"

খুড়ী বললে, "ঐ এই দেশের ইতিহাস।"

হঠাৎ খুড়ো একটা পেল্লায় গোটানো কাগজ খুলে বলে উঠলো, "পেয়েছি, পেয়েছি—"

খুড়ী বললে, "কি পেয়েছ?"

খুড়ো বললে, "কয়েদীর ইতিহাস। পড়ছি, শোনো"—

কয়েদীর ইতিহাস

যাকে সবাই কয়েদী বলে তার সম্বন্ধে আমি গবেষণা করে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছি তা হুবহু লিখে যাচ্ছি।

ও লোকটা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ও ভাতখেকো মুল্লুকের লোক। ওর আসল নাম 'যরলব' আর উপাধি 'হ'।

আমগাছের গারদে বন্দী হবার আগে ও এই সব কথা নিজে মুখে আমাকে বলেছিল।

লোকটা আসলে নাবিক। ওর গায়ে উল্কী আঁকা আছে। ওর গায়ে উল্কী দিয়ে যে সব কথা লেখা আছে তা বড় ভয়ানক, যেমন—

ওর কাঁধে লেখা আছে, "রান্নাবান্নার অসুবিধে থাকলে কাঁচা মাংস খাবে।"

ও নিজের মুখেই স্বীকার করেছে যে, ও সব জন্তুই খেতে অভ্যস্ত ছিল—খরগোশ, ছাগল, ভেড়া, পাখী···ওর বাঁ কাঁধে লেখা আছে, "জলের ধারে যাবে না।" ওর বুকের উপর লেখা আছে, "মদ, তাড়ি এন্তার খাও।" সন্ধ্যায় গরম কোন পানীয় খাবে। সূর্য আর বাতাসকে ভক্তি করবে।"

আমি বহু অনুসন্ধানের পর এইসব খবর সংগ্রহ করেছি যে, কয়েদী ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত চোয়াড়ে আর ঘ্যাচড়া ছিল। সে প্রায়ই বাড়ীর পিছনকার জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে সিগারেট ফুঁকতো। ওর মা ওকে খুঁজে খুঁজে বার করে ওকে ছাইদানিটা দিয়ে আসত। কিন্তু ছাইদানিতে ছাই ফেলার অভ্যাস ওর কোনদিনই ছিল না। ও ছাইদানিটা পকেটে রেখে সিগারেটের ছাইয়ে সারা পৃথিবী নোংরা করে বেড়াতো।

তাছাড়া আমরা চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মস্ত লম্বা ডাঁটিওলা কাঁচ দিয়ে পায়ের নখ কাটি, ও সে সব কিছু করে না। ও নখগুলো আঙুল থেকে উঠিয়ে ছোট কাঁচি দিয়ে ছেঁটে পায়ের আঙুলে আবার বসিয়ে দিত। ওর মা ছেলের এই সব বদভ্যাস দেখে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতো।

ও এমন বেরসিক যে কেউ যদি ওকে জিজ্ঞেস করত. "কটা বেজেছে?" ও অমনি

ব্যারোমীটার দেখে সময় বলে দিত। ও ভাল করেই জানে যে ঘড়ি দেখেই আসল সময় সঠিক ভাবে জানা যায়।

টেনিস-কোর্টে শাদা চক দিয়ে দাগ না দিয়ে ও সবুজ চক দিয়ে দাগ দেয়—শাদা চকে নাকি ঘাসের ক্ষতি হয়।

লোকটা আসলে পাপী, হাড়হাবাতে, নচ্ছার।

বিয়ের পর ওর তিনটে মেয়ে হয়—মেয়ে তিনটে পরমাসুন্দরী।···

এই পর্যন্ত পড়ে খুড়ো খুড়ী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলাবলি করতে লাগল—

দেখলে তো, সেই তিনটে মেয়ে।···

কাক এদের কথাই বলেছিল।···

আবার তারা পড়তে লাগল।···

ওর স্ত্রী যখন মারা যায় ও ঠিক করলে যে, ও ওর মেয়েদের নতুন ধরনে শিক্ষা দেবে।

ও ওর মেয়েদের এক সপ্তা মেয়েদের মত সাজগোজ পরাতো আর তার ঠিক পরের সপ্তাহে ওদের ছেলেদের মত সাজগোজ পরাতো। ফলে ওরা দু'রকমের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিখবে, এই ছিল ওর ধারণা। ওর উদ্দেশ্যটা ছিল ভালই, যাতে ওরা কোন অবস্থাতেই না কষ্ট পায়।

বিপদ হ'ল সেইদিন যেদিন ও এদেশের রাজার সামনেই বলে বসল, "আমার মেয়েদের মত সুন্দরী, বুদ্ধিমতী আর বিদুষী এদেশে নেই।"

রাজার ছিল, একটি মেয়ে। লোকটার আস্পর্ধা দেখে রাজা চটে গেলেন।

যদিও রাজার মেয়েটি লক্ষ্মী ট্যারা
এক কান বড়ো, এক কান ছোট,
বিদ্যেবুদ্ধি অষ্টরম্ভা
রূপে সাক্ষাৎ জগদম্বা।

তবুও রাজা চটে সরল ব'র বিচার দাবী করলেন।

রাজার বিচারক—মাথার ভিতরে বুদ্ধি, উপরে টাক। ঘণ্টা দুয়েক টাক চুলকে রক্ত বার করে হুকুম দিলেন, "প্রাণদণ্ড"। (ক্রমশঃ)

ব্যায়াম শিখবে ?

শ্রীশিশিরকুমার দত্ত

আচ্ছা বলতো 'মৌচাক'এর ছোট্ট মৌমাছিরা, একজন খুব শিক্ষিত অথচ চিররুগ্ন, ক্ষীণকায় লোক এবং একজন স্বাস্থ্যবান শক্তিমান শিক্ষিত লোক, এই দু'জনের মধ্যে কাকে তোমরা সবচেয়ে বেশী পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই দ্বিতীয় জনকে, তাই তো? কেন বলতো? দু'জনেই শিক্ষিত কাজেই এর মধ্যে শক্তিমান স্বাস্থ্যবান লোককেই যে তোমরা বেছে নেবে তাতে আর সন্দেহ কি থাকতে পারে? অতএব শেষ পর্যন্ত এই কথা দাঁড়াল যে, যিনি যতবড় শিক্ষিতই হন কেন, তাঁর সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য যদি তিনি শক্তিহীন দুর্বল ক্ষীণকায় হন। কেননা শিক্ষালাভ করার উদ্দেশ্য তো শুধু নিজের অথবা পরিবারের অন্নসংস্থান করা নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দেশে সত্যিকারের 'মানুষ' তৈরি করা— যারা সর্বদাই দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত, যারা সুশিক্ষিত হয়ে দেশের অগ্রগতিতে সকল সময় সাহায্য করতে তৈরি থাকবেন। কিন্তু এ সমস্ত কাজ দুর্বল, ক্ষীণকায়, চিররুগ্ন লোকেদের দ্বারা কোনমতেই সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সাহসী, শক্তিমান, সুস্থ সবল মানুষ। তোমরা হয়ত বলবে যে খুব মেধাবী ও প্রতিভাবান মানুষ কি দুর্বল হলেও দেশের কাজ করতে পারেন না বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে? আমি বলব, তাঁরা প্রতিভাবান হয়েও খুব বেশী দিন দেশের কাজ করতে পারেন না, কারণ শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার জন্য তাঁদের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যায়।

সত্যিকার 'মানুষ' হতে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে সাহস, মানসিক সবলতা ও দৃঢ়তা, তার সঙ্গে চাই শক্তি। সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে সাহস ও মনের জোর আসতে চায় না এ তোমরা নিজেরাই লক্ষ্য করে দেখবে। এবং সকল সাহস, শক্তি ও দৃঢ়তা লাভের একটি উপায়ই আছে, তা হচ্ছে 'ব্যায়াম চর্চা'। 'ব্যায়াম চর্চা' ব্যতীত শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভের কথা চিন্তাও করা যায় না! কাজেই তোমরা, মৌচাকের সকল ভাই-বোনেরা যদি সত্যিকারের 'মানুষ' হতে চাও, যদি তোমরা দেশের কাজ করতে চাও, তবে প্রথমেই শরীর ও মনকে তৈরী করার জন্য নিয়মিত 'ব্যায়াম' শুরু কর।

তোমরা ভেবো না আমি 'ব্যায়াম চর্চা' বলতে শুধু ডাম্বেল বা বারবেল নিয়ে কঠিন কঠিন ব্যায়াম করতেই বলছি। যে কোন প্রকারের ব্যায়ামই যেমন—যোগব্যায়াম, খালি-হাতে ব্যায়াম, মুদ্রা ও প্রণায়াম, গদা ও মুগুর ভাঁজা, কুস্তি, ভারোত্তলন, জিমনাস্টিক, দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার প্রভৃতিতে স্বাস্থ্য ভাল করা সম্ভব। আর তোমাদের ব্যায়াম করতে বলছি বলেই ভেবো না তোমাদের সকলকে গামা, গোবর বা ভীম ভবানীর মত হতে বলছি। প্রধানতঃ শরীরকে চিরদিন সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখার জন্যই তোমাদের ব্যায়াম করতে বলা। আর একটি মূল্যবান জিনিস তোমরা ব্যায়াম করে লাভ করবে যাহা কেউই দিতে পারে না বা পয়সা দিয়েও কেনা যায় না, তা হচ্ছে সাহস, মানসিক দৃঢ়তা ও স্থিরতা।

মেঠুড়ে

হকি
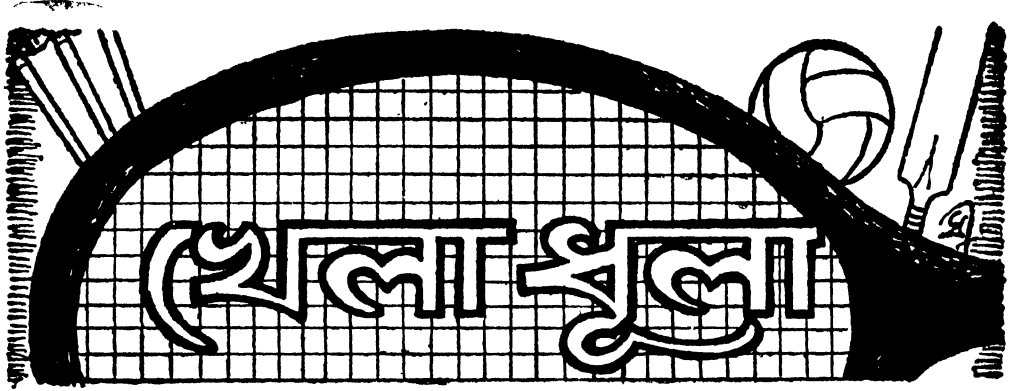
লণ্ডনে আয়োজিত প্রাক-অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের কাছে ভারতের ১—০ গোলে পরাজয় ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে খেলাধূলার সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক খবর। বিশ্ব হকির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভারতের এই পরাজয় এবং লীগ কোঠায় তৃতীয় স্থান লাভ নিঃসন্দেহে হকি-মানের ক্রমাবনতির পরিচয়।

লণ্ডনে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের খেলার কথায় বলা যায়, যোগ্য দল হিসেবেই পাকিস্তানের জয়। সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও হাতের কারিগরিতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা হয়তো দর্শকদের কিছু বাহবা কুড়িয়েছেন, কিন্তু খেলা জেতার জন্যে যে পদ্ধতি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন সে-দিক দিয়ে পাকিস্তানের ভূমিকা সফল। একটা মাত্র গোলের কথা বাদ দিলেও সারা খেলায় পাকিস্তানের পাঁচটা সর্ট কর্ণার এবং ভারতের একটা শর্ট কর্ণার পাবার ঘটনাও সে-কথা প্রমাণ করে।

১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ অলিম্পিক ফাইন্যাল থেকে শুরু করে অলিম্পিকে ও এশিয়ান গেমসে ভারত ও পাকিস্তান পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ছ-বার। এর ভেতর দু'দেশের ছিল তিনবার করে জয়ের সম্মান। হামবুর্গে আন্তর্জাতিক খেলার ফলাফল ছিল অমীমাংসিত। সুতরাং লণ্ডনের বর্তমান প্রতিযোগিতায় ভারতের বিরুদ্ধে জয়ের ফলে পাকিস্তান একধাপ এগিয়ে রইলো, যদিও লণ্ডন লীগ টেবলে ভারতের স্থান তৃতীয়, পাকিস্তানের চতুর্থ এবং তিনটে অলিম্পিক ফাইন্যালের ভেতর দুটো অলিম্পিকে ভারতের বিজয়মুকুট।

ফুটবল

আমেরিকার পেশাদার ফুটবল দল ডালাস টরনাডো ক্লাব ভারত সফরে এসে আই. এফ. এ. একাদশের সঙ্গে প্রথম খেলাটা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ করে। টেক্সাস রাজ্যের

এটি নামকরা দল হলেও আসলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পেশাদার খেলোয়াড়দের নিয়ে দলটা গড়া হয়েছে। দলে মাত্র একজনই খাস আমেরিকান খেলোয়াড় আছেন।

রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামের সুন্দর পরিবেশে ডালাস টরনাডোর সঙ্গে আই. এফ. এ-র সত্তর মিনিটব্যাপী খেলা দর্শকদের পুরোপুরি আনন্দ দিতে না পারলেও ফুটবলের ক্রীড়াশৈলীর সহজ ভঙ্গিমায় বিদেশী খেলোয়াড়রা দর্শক-মনে কিছুটা রেখাপাত করেছেন। দলটির খেলোয়াড়দের পায়ের ছোট ছোট কাজ খুবই ভালো, ছোট জায়গার মধ্যে দিয়ে বল পাস করে সঠিক নিশানায় পাঠিয়ে দেবার অর্থাৎ সহ-খেলোয়াড়দের পায়ের সামনে পৌঁছে দেবার পদ্ধতি চমৎকার। মাটির একটুও ওপরে যাতে বল না ওঠে সে বিষয়ে এঁরা সর্বদা সতর্ক। আক্রমণের সময় ছ-সাতজনের এগিয়ে আসা এবং রক্ষণের সময় সাত-আটজনের পিছিয়ে পড়ার পদ্ধতিতেও এঁরা পোক্ত।

এশিয়ান কাপের খেলায় দল গড়ার ব্যাপারে আই. এফ. এ-র অনেক খেলোয়াড় বোম্বাইয়ের শিক্ষাকেন্দ্রে আটকে থাকায় আই. এফ. এ-র নামডাকওয়ালা খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই এ খেলায় নামতে পারেন নি। চুনি গোস্বামী, শান্ত মিত্র, কাজল মুখার্জী, হাবিব, পাপ্পানা, রাজেন্দ্রমোহন প্রমুখ যে-সব খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়া হয়েছিল, তাঁরা কেউই এদিন খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। এই খেলায় আই. এফ. এ. দলের খেলোয়াড়রা যদি ভয়ে ভয়ে না খেলতেন তাহলে তাঁরা অনেক ভালো খেলতে পারতেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

ক্রিকেট

বোম্বাইয়ের মাঠে ভারতের সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা দলীপ ট্রফির ফাইন্যাল খেলা হয়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল ভারতের দুই সেরা ক্রিকেট অঞ্চল—দক্ষিণ ও পশ্চিম। ব্যাট-বলের লড়াইয়ে চারদিনের এই খেলা সকলের কাছে বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে এগিয়ে থাকায় দক্ষিণাঞ্চল দলীপ ট্রফি পরপর তিনবার ঘরে তোলার গৌরব অর্জন করেছে।

টসে জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগে বোম্বাই দল দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৩০৪ রাণ তোলে। ওয়াদেকার ঝড়ের গতিতে ১১৬ রাণ তুলে আউট হন। বহুদিন পরে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টরের মন-মাতানো ব্যাটিংয়ে দর্শকরা খুব আনন্দ পান। তিনি দিনের শেষে অপরাজিত অবস্থায় ১০৯ রাণ তোলেন। দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪২৩ রাণে। দক্ষিণাঞ্চলের ওপেনিং ব্যাটসম্যানরা পশ্চিমাঞ্চলের বড় রাণ সংখ্যার বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন না। ফলে তাঁদের প্রথম তিনটে উইকেট মাত্র ৪৪ রাণের ভেতর পড়ে যায়। অবশ্য দিনের শেষে তাঁরা ৪ উইকেটে ২৭৭ রাণ তোলেন। শেষ দিনে সকলের মনে এক প্রশ্ন : দক্ষিণাঞ্চল কি জিতবে? ঘড়িতে যখন চারটে চল্লিশ, পতৌদি আউট হলেন ঠিক ২০০ রাণে। দক্ষিণাঞ্চল ৭ উইকেটের বিনিময়ে সমাপ্তি ঘোষণা করল ৪৪০ রাণে। শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রা তুললেন ৬ উইকেটে ১০০ রাণ। খেলা শেষ হ'ল।

বিহারীনাথ পাহাড়ের স্মৃতি

তখন সবে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হাতে প্রচুর সময়ও রয়েছে। ভাবলাম যে, এটাই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার উপযুক্ত সময়, কাজেই এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। বাবার কাছে প্রস্তাবটা তোলা মাত্রই তিনি সানন্দে সম্মত হলেন। বাঁকুড়া জেলার বিহারীনাথ পাহাড়ের নিকটবর্তী 'শিরপুরা' নামে একটা জায়গা আছে। খুব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। সেখানকার এক বিশিষ্ট জমিদার বাবাকে সেখানে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। স্থির হ'ল সেখানেই যাওয়া হবে।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা মালপত্র গুছিয়ে মেদিনীপুর ষ্টেশন থেকে গোমো প্যাসেঞ্জার যোগে যাত্রা করলাম। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। যতই ষ্টেশন ছাড়তে লাগল, ততই ট্রেনের গতি বাড়তে লাগল। একে একে গোদা-পিয়াশাল, শালবনি, চন্দ্রকোণা-রোড, গড়বেতা ষ্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে। বিষ্ণুপুর ষ্টেশন ছাড়ানোর পরেই দূরে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলোর চূড়া দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে আর সেগুলো দেখা গেল না। এইভাবে বিভিন্ন দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা বাকুড়া ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। এখানে আমরা চা-জলখাবার সেরে নিলাম। মিনিট পনের পরে আবার ট্রেন ছেড়ে দিল। আর একটা ষ্টেশন অতিক্রম করার পরেই 'ঝাঁটিপাহাড়ী' ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। এখানে আমাদের নামবার কথা। মালপত্র-সহ আমরা নেমে পড়লাম। শিরপুরা এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। আমাদের জীপে করে যাওয়ার কথা। অদূরে একটা জীপ দাঁড়িয়েছিল, আমরা জীপে গিয়ে উঠলাম। দুরন্ত গতিতে জীপ ছুটে চলল। এ-অঞ্চলটা অবিকল ছোট নাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের মত। চারিদিকে উঁচুনীচু জমি। মাঝে মাঝে লাল পাথরের ঢিবি। দূরে বিহারীনাথ পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে বিহারীনাথ পাহাড় সুস্পষ্ট হয়ে আসছিল। এবার জীপ ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে; রাস্তার দু'ধারে বেশ ঘন অরণ্যরাজি, আর পাখীর কিচির-মিচির শব্দ। আমার পাশেই

ড্রাইভার বসেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে জায়গাটা কি রকম? সে উত্তর দিল, যে ভালই, তবে মাঝে মাঝে ডাকাতি হয়। এতে আমি কিছুমাত্র আশ্বস্ত হলাম না বরং ভয়টা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময় আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল অর্থাৎ শিরপুরায় গিয়ে পৌছলাম। জমিদারের বাড়ীটা বেশ বড়। দোতলার একটা ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। সেদিন এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে, তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ভোরবেলা মুখ-হাত-পা ধুয়ে ও জলখাবার খেয়ে জীপে করে বিহারীনাথ পাহাড় দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। শিরপুরা থেকে বিহারীনাথ পাহাড় মাত্র দুই মাইল দূরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌছে-গেলাম। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই মনোরম। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরেই কেবল উঁচু-নীচু পাহাড়। আমি পাহাড়ে উঠব বলে মনস্থির করলাম। কিন্তু দূর থেকে পাহাড়ে ওঠা যতটা সহজসাধ্য বলে মনে হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যে সেটা বাতুলতা মাত্র। পাহাড়ের পাদদেশে একটা শীতল জলের উৎস আছে। সেখানে মাটির তল থেকে আপনা হতেই শীতল জল উঠে আসছে। দেখে খুব বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমি প্রাণভরে সেই জল পান করলাম। এখানে একটা ছোট্ট শিবমন্দির আছে; মন্দিরের শিবঠাকুর নাকি খুবই জাগ্রত। চৈত্র-সংক্রান্তির সময় এখানে বিরাট মেলা বসে, তখন প্রচুর জনসমাগম হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম। শিরপুরা থেকে রাত্রিবেলা বার্ণ-পুরের আলো দেখা যায়। দূরত্বটাও খুব একটা বেশি নয়, মাত্র তিন মাইল। মধ্যে দামোদরের ব্যবধান। একবার সেখানে যেতে ইচ্ছে করল, কিন্তু সময়াভাবে মনের সে বাসনা মনেই থেকে গেল। কোন কোন দিন আমি জমিদারের বাড়ীর সংলগ্ন পুকুরে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতাম। কারণ এটা ছিল আমার একটা বিশেষ সখ। এদিকে বাড়ী ফেরার পালা এসে গেল। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ছেড়ে চলে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু বাবার কাজের জন্য ফিরতেই হবে

অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে আমরা আবার বাক্স-বিছানা গুছিয়ে জীপে করে ঝাঁটিপাহাড়ী ষ্টেশন অভিমুখে রওনা দিলাম। পিছন থেকে বিহারীনাথ পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। ষ্টেশনে এসে দেখলাম যে, ট্রেন এসে গিয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি একটা ফাঁকা কামরায় উঠে পড়লাম। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল মেদিনীপুরের উদ্দেশে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় বাড়ী পৌছলাম।

বিহারীনাথ পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

—শ্রীঅভিজিৎ বাগচী

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

টোয়েণ্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দি সী—জুল ভার্ন। অনুবাদ: শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎ বুক হাউস, ১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩·০০

পাশ্চাত্য দেশে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প রচনায় জুল ভার্নের নাম সবার উপরে। বিশেষ করে ছোটদের জন্যে প্রথম দিকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও কাল্পনিক এমন সব রচনা তিনি লিখে গেছেন যা আজও ছোট-বড় সবাইকে অভিভূত করে। তাঁর এই বইখানিও একটি বিশেষ নাম করা অ্যাডভেঞ্চারের বই। অনুবাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জুল ভার্নের অনেক বই অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত এই বইখানি সংক্ষিপ্ত ভাবে করা হলেও, পড়তে পড়তে রচনার গুণে কোথাও অনুবাদ বলে মনে হবে না। সকলেই তোমরা বইখানি প'ড়ে আনন্দ পাবে। বইটিতে জুল ভার্নের ছবিসহ একটি ছোট্ট জীবনী থাকলে ভাল হ'ত।

রক্ত-তিলক—শ্রীসরেশ্বর সেন। নয়া প্রকাশ, ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬। মূল্য ২·০০

সাতটি গল্প আছে এই গল্প-গ্রন্থের মধ্যে। শেষ গল্পটির নামে বইটির নামকরণ হয়েছে। গল্পগুলি নানা ধরনের এবং সচিত্র। ছোটদের জন্য লেখা হলেও নামগুলির অধিকাংশই বড়দের মত ভারিক্কী চালের হয়ে গেছে। নির্বিষ, অঙ্গীকরণ, শিল্পী-দর্শন, নাম-আলেখ্য বা রক্ততিলক ছোটদের গল্পের নাম নয়। তা হলেও কয়েকটি গল্পের কাহিনী ছোটরা পড়ে খুবই খুশি হবে। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর।

গল্প বলি গল্প শোন—শিবরাম চক্রবর্তী। অশোক প্রকাশন, এ ৬২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩·৫০

আমাদের দেশের শিশু-সাহিত্যের রাজ্যে শিবরামবাবুর তুলনা নেই। হাসির গল্প আরও কেউ কেউ আজকাল লিখে থাকেন বটে, কিন্তু তাঁর গল্পের নাম থেকেই হাসি আরম্ভ হয়, তারপর যতই গল্পের মধ্যে পড়ুয়ারা প্রবেশ করে, ততই পেটে খিল ধরে। শিবরামবাবুর মজাদার, লাগসই কথায় ভরা গল্পগুলির ঘটনাগুলিও তেমনি বিচিত্র। এই বইয়ে সবসুদ্ধ বারোটি গল্প আছে এবং সবগুলির সঙ্গেই সুন্দর ছবি আছে শিল্পী শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়ের। প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০·৫০ পয়সা
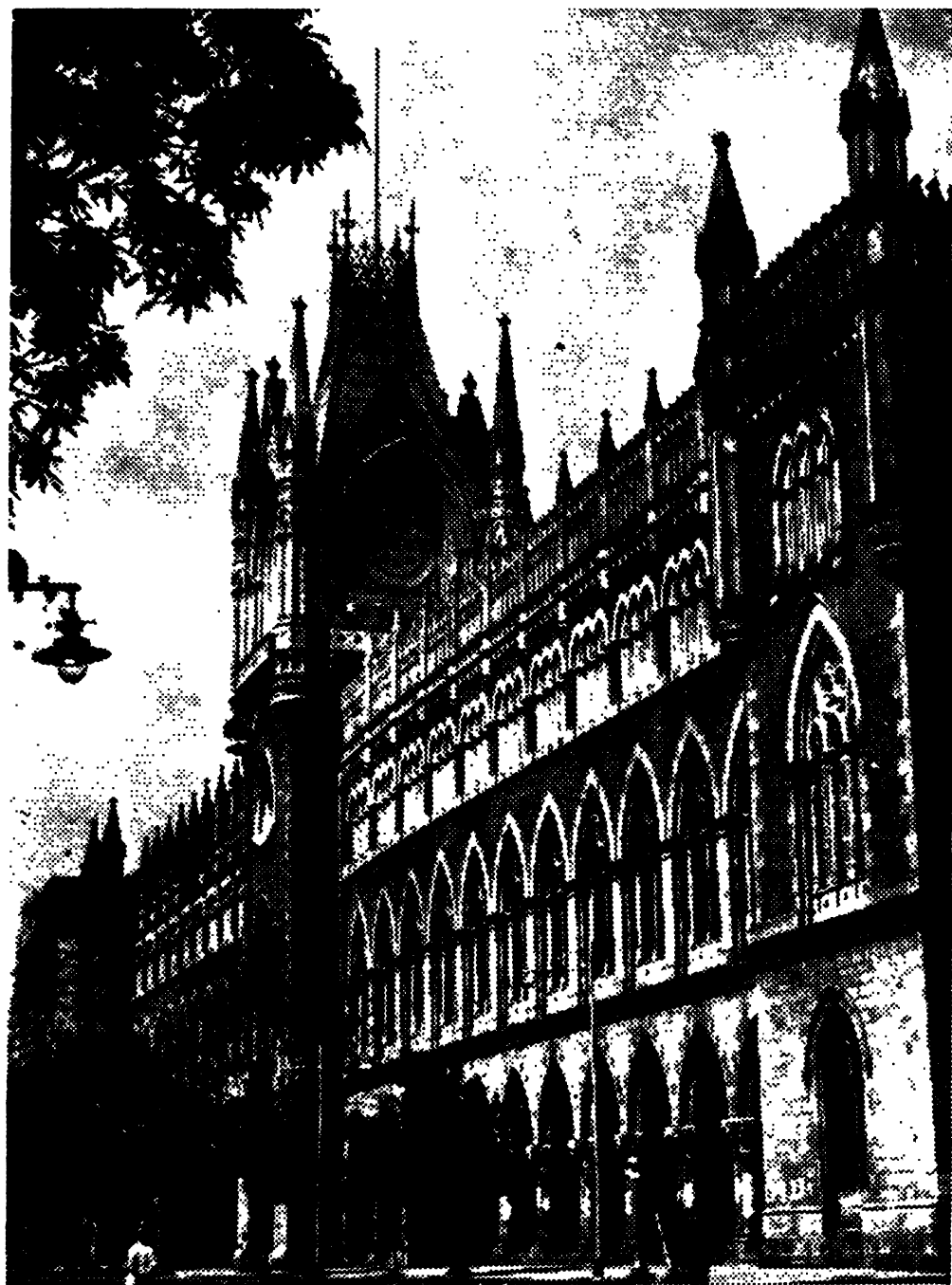
কলিকাতার হাইকোর্ট

※ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ※
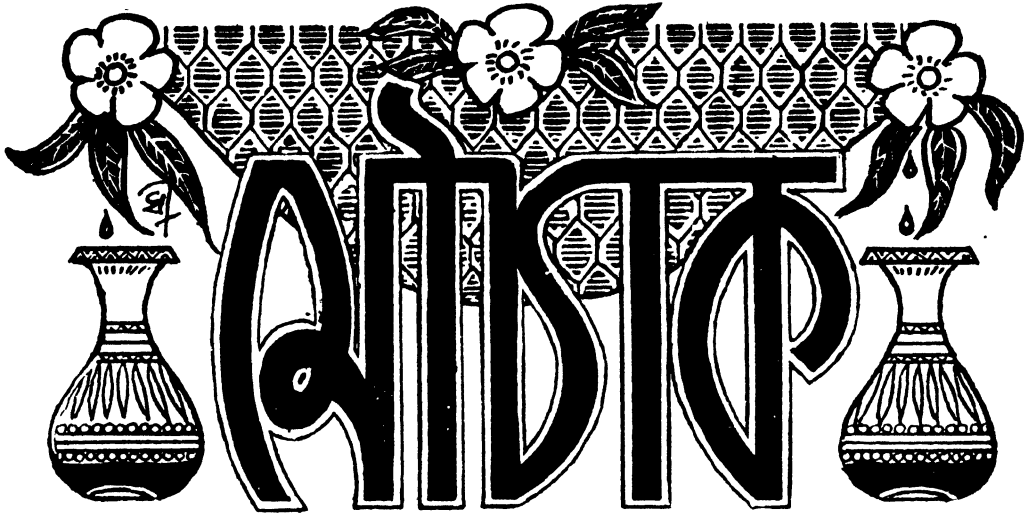
৪৮শ বর্ষ] পৌষ : ১৩৭৪ [৯ম সংখ্যা

হারিয়ে গেছে কোলকাতা

শ্রীরবি গুপ্ত

চারদিকেতেই জমাট বাঁধা দেখছি শুধুই 'গোল' দাদা,
হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে কোলকাতা!
পুরাতনকে করতে বাতিল ভেল্কি যুগের ঢেউ আনে
ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা কোথায় গেল কেউ জানে?
কালের রেখার বিন্দুগুলো বলবে তো নয় কেউ অমর,
বলছি তবু সত্যি ছিল স্বপ্নপুরি এই শহর।
স্বপ্নপুরি সত্যি ছিল কোন যুগে সে কোন কালে—
অস্তরবির মলিন আভা আজকে দেখি তার ভালে!
আজব শহর চিনতে পারি—চমকে উঠি গরমিলে।
জ্যান্ত ভূতের কারসাজিতে আঁতকে উঠি ঢোক গিলে,
চারদিকেতেই জমাট বাঁধা দেখছি শুধুই ''গোল' দাদা
হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে কোলকাতা!

অহর্নিশি গড়গড়িয়ে চলছে বটে ট্রামগাড়ি
'বাসে'র কথা আকাশকুসুম ভাগ্য মেনে দাও সারি।
বাদুড়-ঝোলা ঝুলতে এমন দেখবে শুধুই সার্কাসে
দেখবে না যা'—পিছলে গিয়ে পিণ্ডি এমন হাড়মাসে!
কয়লা পোড়া ময়লা ধোঁয়া কেবল টানো ফুসফুসে
বাঁচার মত বেঁচেই যাবে হয় যদি জ্বর ঘুসঘুসে!
দেশের দেহ করলে দু'ভাগ তুললে প্রাচীর কূট-মাথে,
চিনতে পারো?—রক্তধারা ছিট্‌কে এলো ফুটপাতে!
মানুষ-কুকুর এক সাথে ওই কুড়োয় খাবার ডাষ্টবিনে
এমনি বটে রেকর্ড বাজে ধরেই যদি রাষ্ট্র পিনে!
চারদিকেতেই জমাট বাঁধা দেখছি শুধুই 'গোল' দাদা,
হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে কোলকাতা!

চলতে দু'পা মানুষ ঠেলো—সামাল পকেট চিচিং ফাঁক
এমনতর দেখলে ম্যাজিক হবেই হবে রুদ্ধ বাক্।
গাড়ী ঘোড়া ছুটছে বেগে—সবারই তো স্বাধীন মন,
ট্রাম-লরিতে লেগেই আছে প্রাণ-জুড়ানো আলিঙ্গন।
সমস্যা তো নয় একটি—সামলাবে কোন্ দিক বলো,
কানাগলি ঠেকবে এসে যে পথ দিয়েই ঠিক চলো!
বিশ্বপথিক-জীবনবাণী রেখেছে কি কেউ মনে?
কোন ভগীরথ আনবে ধারা—তারি আশায় ঢেউ গোনে!
ন্যায়ের দণ্ড আসছে নেমে—তুচ্ছ বড়াই—চাল মিছে
রথের চাকা এমনি ঘোরে—আজ ওপরে কাল নিচে!
দুষ্ট ক্ষত চালাও ছুরি—নইলে হরিবোল দাদা,
হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে কোলকাতা!

'এপ্রিল ফুল'-এর ফ্যাসাদ

ডাঃ বিমলরঞ্জন দে

অনেক দিন আগেকার ঘটনা। কাছাড় জেলার একটি মফঃস্বল শহরের উচ্চ ইংরাজী স্কুলের বোর্ডিং-এ, ৩১ শে মার্চ, রবিবার ভোরবেলা, তিনটি কিশোর বসে গল্প-গুজব কচ্ছিল। আলোচনার বিষয় হলো "এপ্রিল ফুল",—এই দিনটাতে কি মজা করা যায়, কাকে ঠকানো যায় ইত্যাদি। তখনকার দিনে চিঠি লিখে ডাকাতি করা, ভয় দেখানো বা টাকা আদায় করার একটা হুজুক চলেছিল—তাই এরা ঠিক করলে জমিদার মশায়ের নামে ঐ রকম একটা চিঠি ডাকে দিয়ে দেখা যাক তামাসাটা কেমন হয় আর কদ্দুর গড়ায়। আলোচনা শেষ হতেই, চিঠি লেখা হয়ে গেল। তারপর দুই বন্ধু মিলে, সাইকেলে চেপে শহর থেকে মাইল চারেক দূরের একটা ডাকঘরের ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেলে দিয়ে এল।

পরের দিন (শুভ পয়লা এপ্রিল), তিনটি কিশোর স্কুলে বসে শুধু উস্‌খুস্ করছে। তিনজনই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র--পড়ায় মন নেই—মাষ্টার মশায়রা কি বলেছেন, শুধু শুনেই যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু "কাকস্য পরিবেদনা", অর্থাৎ জমিদার বাড়িতে কোনো গোলমালই বিকেল পর্যন্ত শোনাই গেল না সেই বাড়িরই একটি ছেলে তাদের সঙ্গে পড়ে, সেও কোনো "সুসংবাদ" দিতে পারল না। দিন গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত হলো—কিন্তু ডাকাতের চিঠির কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। চিঠি ডাকে দিয়ে নিজেরাই "এপ্রিল ফুল" হলো বলা চলে।

পরের দিন বেলা যখন দশটা, তখন শহর জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেল—কি না—ডাকাতে চিঠি দিয়েছে, "আজ রাত্তিরে দশ হাজার টাকা দিতে হবে, তা' না হলে ডাকাতি করে, তাদের দলের লোকেরা টাকা জোর করে নিয়ে যাবে—" দস্তখত করেছে, "গুলসদন খাঁ"—পরিষ্কার, সুন্দর বাংলা হরফে লেখা। যে ছেলে লিখেছে, তার হাতের ইংরাজী ও বাংলা লেখা খুব সুন্দর—সে সুন্দর হরফের হেরফের হয়নি। নামটা কিন্তু মৌলভী সাহেব গুলবাহার-টাহার বলে ক্লাসে কি ছাত্রদের বলছিলেন—ও থেকেই 'গুলসদন' করা হয়েছে।

একে তো জমিদার, তার উপর শহরের উপরেই এমন জুলুম হবে, এ কি বরদাস্ত করা চলে? কখনো না। সব হিতৈষীরা বিকেলের দিকে জমিদার বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন—থানার বড় দারোগা বাবু কোমর বন্ধে পিস্তল গুজে, সাঙ্গোপাঙ্গো, লাঠি-সোটা সব নিয়ে—"রোড মার্চ" করে যেয়ে পৌছলেন। তা' ছাড়া জমিদার বাবুর দারোয়ানরা তো রয়েছেই, গ্রাম থেকে লাঠিয়াল প্রজারাও এসেছে। লাঠিয়ালদের চিড়ে, মুড়ি গুড় পরিবেশন করা হলো—খেয়েই তারা পালা করে হাঁক-ডাক দিয়ে বাড়ির চারিদিকে চক্কোর দিতে থাকল। আর এদিকে এক প্রস্থ চা, লুচি, পেঁড়া, জিলিপী খেয়ে শুভানুধ্যায়ীরা

(আর ভলানটিয়াররা) রান্না শেষ হবার অপেক্ষায় পান, তামাক, তাস, দাবা, পাশা নিয়ে বসেছেন। ভলানটিয়াররা ঘন ঘন রান্নার খবর নিচ্ছে—খাওয়াটা যুৎসই না হলে, ডাকাতদের সঙ্গে লড়বেই বা কি করে? কথায় বলে, "পেটে খেলে পিঠে সয়"। তা' রান্নার মেনুটা মন্দ হয়নি। খিচুড়ী, ডালনা, আলুর দম, কচি পাঁঠার মাংসের ঝোল, চাটনী ইত্যাদি অনেক রকম হয়েছে।

ওদিকে বাড়ির দু'টি দারোয়ান বেশ করে সিদ্ধি খেয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে পুকুরের ঘাটে বসে "রাম নাম লেওরে মনুয়া" বলে সুর ভাঁজছে; আর যেমনি "এ সংসার তো দুদিনকা হ্যায়" লাইনটা সুর করে আওড়াচ্ছে—অমনি একটি আর একটির গলা জড়িয়ে "আরে মেরে ভেইয়া" বলে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিচ্ছে।

জমিদার বাবু একবার বাইরে এসে "হেঁ হেঁ আপনারা আছেন, দারোগা সাহেব (বাবু তখন সাহেব হয়েছেন) আছেন, আমার ভাববার আর কি আছে—"দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী" এই বলেই বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন। অন্দরমহলের দেউড়ির দোর বন্ধ করে, পাহারাদাররা "দেখে নেব, আসুক না—ভয় কিসের" বলে ঘুরপাক খেতে থাকল। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে।

সব্বাই নেমন্তন্ন খাওয়া শেষ করে, পানটান চিবুচ্ছেন। দারোগাবাবু কোমরবন্ধ খুলে রেখে, খেতে বসেছিলেন; অমন গুরু-ভোজনের পর সে কোমরবন্ধ তখুনি আর পরতে পারলেন না। তাই রিভালবার ইত্যাদি পাশে রেখে শুয়ে পড়লেন। শোবার আগে মাত্র দু'টি বাক্য উচ্চারণ করলেন, "ডেকে দিও"।

রাত্রি যখন প্রায় ১১টা,—সে সময় শহরের রাস্তায় যে ভলানটিয়াররা টহল দিচ্ছিল, তারা ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে, ছোট দারোগা ডাকাতকে পাকড়াও করে গারদে পুরে রেখেছেন। দারোগাবাবু ঘুমের ঘোরে "ডাকাত" শুনেই তড়াক করে উঠতেই পেন্টের বোতাম দু'একটা পঠাং পটাং শব্দে ছিড়ে গেল। তা হোক, তবু ছোট দারোগা বাহাদুরী নিয়ে নেবে তা হয় না—"তেওয়ারী" বলে হাক দিতেই কনেষ্টবল তেওয়ারী "হজৌর" বলেই হাজির। দারোগা সাহেব কোমরবন্ধ ফেলেই চটপট তাকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন।

এদিকে থানায় লোক গিজগিজ কচ্ছে। সেখানে পৌছেই দারোগাবাবু বললেন, "আসামীকে হাজির কর।" আসামী একটি লম্বা-চওড়া (আর য্যাইসা মোছ ত্যাইসা দাড়ি) কাবুলিওয়ালা। সে তো গারদ থেকে বেরিয়ে কেবল "এ ক্যায়া, এ ক্যায়া" করতে লাগল। তা করুক। দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ক্যা ক্যা করো মৎ। ঠিক ঠিক বাত বোলবে। কাঁহাসে আয়া সে ভি বোলবে, আউর কি করতে আয়া সে ভি ঝুটা মৎ বলেগা।"

"হাঁ হাঁ জরুর বলে গা—হামারা নাম গুলজার খাঁ—"

আর কিছু শুনবার আগেই দারোগাবাবুর হুকুম মত, তার হাত দু'খানতে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো!

গুলজার শুধু "এ ক্যায়া করতে হ্যায়—তুমলোক পাগল্ হো গিয়া" বলে সব্বাইর মুখের দিকে কেমন যেন ভড়কে গিয়ে তাকাতে থাকল।

দারোগাবাবু বললেন, "অাভি বাপু বলো—তুম ডাকুকো সর্দার হ্যায়—চিঠটি লিখতা হ্যায়?"

এদিকে ছোট দারোগা কাবুলিওয়ালার জাব্বা-জোব্বা খানাতল্লাসী করে অনেকগুলি কাগজপত্র, টাকা-পয়সা, আতর মাখানো রুমাল ইত্যাদি বের করলো—তবে ছোরা-ছুরি, পিস্তল বা তেমন কিছু পাওয়া গেল না।

যাক্, বেচারা যা বললে, তার সরল মানে হলো—সে এই শহরের "জমিদার সাহেবের" প্রজা—বৎসরের খাজনা (সরকারী বৎসর ২১ শে মার্চ্চ শেষ হয়—সে হিসাবে) নিয়ে এসেছে। তার গ্রাম এখান থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে—আরো কয়েকঘর পেশোয়ারী সেখানে থাকে—তা ছাড়া অন্যান্য প্রজারাও আছে। খাজনা আদায় করার ভার তারই উপর।

এদিকে ডাকাত ধরা পড়েছে শুনে জমিদারবাবু নায়েবকে থানায় যেয়ে সব খবর নিয়ে আসতে বললেন। নায়েব দু'টি লাঠিয়াল নিয়ে থানায় যেয়ে হাজির হলেন। উঃ, রাস্তায় কি ভয়ে-ভয়েই না আসতে হয়েছে—লাঠিয়াল দু'টি তো দু'পাশেই ছিল, তবু বলা যায় না তো বিপদ কোন্ দিক দিয়ে আসে।

থানায় ঢুকে গুলজারকে দেখেই নায়েব বললেন, "আরে এ তো আমাদেরই প্রজা।"

দারোগা হেসে বললেন, "তা' প্রজা বুঝি ডাকাতি করতে পারে না!" বলেই একটা মস্ত বড় ঢেঁকুর তুললেন—খাওয়াটা বড্ড বেশী হয়ে গেছে।

গুলজার তো কেঁদেই ফেললে। অমন মস্ত জোয়ান যেন ইজ্জত হারিয়ে ভেঙে পড়েছে। নায়েব কাগজ-পত্র দেখিয়ে বললেন, "এ সব চিঠা, ফারগ, খাজনার রসিদ—এ বেচারা তো খাজনা আদায় করে জমা দিতে এসেছে। একে ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়েই চলুন-না জমিদার বাড়ি।

দারোগাবাবু বললেন, "বেশ তো চলুন—এই তেওয়ারী, হাতকড়া খুলে দেও।"

সবাই জমিদার বাড়ি রওয়ানা হলেন—দারোগা সাহেব আবার কোমরবন্ধের সঙ্গে আঁটা পিস্তলটা ফেলে আসছিলেন, আবার গিয়ে নিয়ে এলেন।

জমিদারবাবু সব শুনে বেরিয়ে আসতেই গুলজার তো হাউমাও করে কেঁদে উঠলো—

বললে, "এ ক্যায়া—হামারা ইজ্জত গিয়া, ক্যা কসুর কিয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাকে অনেক বুঝিয়ে, বিশ্রাম করার জন্ম অতিথিদের থাকবার ঘরে শুতে দেওয়া হলো। সে রাত্তিরে সে কিছু খেলও না।

দারোয়ান দু'টি সিদ্ধি খেয়ে পুকুর ঘাটে রাম নাম গান কচ্ছিল। ডাকু একেবারে বাড়িতে এসে গেছে খবর শুনে—"আর ভেইয়া রাম কহো" ব'লে একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরে গড়াগড়ি দিয়ে পুকুরের জলে পড়ে চেঁচামেচি করতে, লোকজন যেয়ে তাদের জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে এল।

রাত্তির তো শেষ হতে চললো,—সব হিতৈষীরা তাই একেবারে ভোর বেলা হাত মুখ ধুয়ে বেশ করে চা-টা খেয়ে ফিরে গেলেন। সবাই বলতে লাগল, "নাঃ, এটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে, দেখা যাক কি হয়!" শলা-পরামর্শের অভাব হলো না—কিন্তু ডাকাতরা আর এলো না দেখে, হয়ত বা কেউ ঠাট্টা-তামাসা করেছে বলেই অনেকে ধরে নিলে।

এখন কিশোর তিনটির অবস্থা না বললেও তোমরা বুঝতে পারছ। কি করতে কি হয়ে গেল! ১লা তারিখ চিঠি পৌছলে এ সব হাঙ্গামা নিশ্চয়ই হতো না। জমিদার বাড়ি থেকে যে ছেলেটি তাদের এক সঙ্গে পড়ে—সে আবার ভয়ানক রগচটা, অল্পেই রেগে যায়—আর রাগলেই তোতলায়। তাকে এরা জেরা করতে থাকল—চিঠি পৌছতে দেরি কেন হলো, কে ডাকের চিঠি দেখে এমন সব প্রশ্ন। সে চটে গিয়ে বললে, "তোম তোম—রা, কি ফ্যাস্ ফ্যাস্ ফ্যাসাদ বাধ ইয়ে ইয়েছ!" ওরা বললে, "চুপ কর বাপু—অমন ফ্যাস ফ্যাস করিস নি।"

তাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ওরা খবর নিতে বললে। সে পরের দিন যা বললে, তা' শুনে সবাই তো হতভম্ব। চিঠিখানা ডাকে দেওয়া হয়েছে টিকেট না এঁটে, কাজেই বেয়ারিং ডাকে পরের দিন এখানকার ডাকঘরে এসে পৌচেছে। সেই বেয়ারিং চিঠি তার পরের দিন ভোর বেলা বিলি হয়েছে।

"এপ্রিল ফুল"-এর ফ্যাসাদটা বেয়ারীং চিঠি দু' তারিখে ঘটিয়েছে।

বিনামূল্যে ছাতা ভাড়া

চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছেন, কিন্তু ছাতা আনতে ভুলে গেছেন। হঠাৎ হয়তো ঝেঁকে বৃষ্টি এলো কিংবা কড়া রোদ উঠলো। কোন ভয় নেই। জার্মানীতে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ আপনাকে ছাতা ভাড়া দেবে। ভাড়া নিতে কোন পয়সা লাগে না বটে, তবে বেরুবার পথে দয়া ক'রে ছাতাটি রেখে যেতে হয়, এই যা!

আগ্নেয়গিরি

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

আগ্নেয়গিরি কথাটা সবারই জানা। অর্থটা অত্যন্ত সহজ, 'আগ্নেয়' অর্থ হলো অগ্নি সম্বন্ধীয় আর গিরি অর্থ হলো পর্বত, অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে আগুন উদগিরণকারী পাহাড়। এই আগুন উদগিরণকারী পাহাড় তৈরী হয় দু'উপায়ে। এক, বহুদিন ধরে আগুন উদগিরণ করে করে তার ভিতরের লাভাপ্রবাহ বাইরে বেরিয়ে এসে চারধারে মাটি আর পাথর জমিয়ে তুলে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা, আর দ্বিতীয়টি আদিম পৃথিবীতে হয়তো ঠেলে উঠেছিল পাহাড়, তারপর শীর্ষদেশ ভেদ করে হয়েছে তার অগ্নুৎপাত।

এই আগ্নেয় পাহাড়গুলি কেন হয় তা জানতে হলে প্রথমেই আমাদের এই পৃথিবী আর তার আভ্যন্তরিক রূপটি জানা দরকার।

পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের পৃথিবী ও সৌরজগতের আর সব গ্রহগুলোই তৈরী হয়েছিল সুদূর অতীতে সূর্যের কতক অংশ ভেঙে ছিটকে এসে, আর সেটা ঘটেছিল তিনশ' কোটি থেকে পাঁচশ' কোটি বৎসর পূর্বে। সেই যে প্রথম প্রস্তুতি তখন এই পৃথিবীটা ছিল নিতান্তই কাঁচা, অতিশয় উষ্ণ একটি অগ্নিপিণ্ড মাত্র আর তার ভিতরে ছিল সমস্ত রকম পদার্থ —লোহা, সোনা, রূপা, তামা, শিষে, নিকেল, পাথর, অভ্র, সোরা, লবণ, গন্ধক সবকিছুই গলিত অবস্থায়। আর জ্বলন্ত পিণ্ডটি উদগিরণ কচ্ছিল রাশি রাশি বাষ্প যা কেবলই উঠে যাচ্ছিল আকাশে মেঘ রূপে। পৃথিবীর গা থেকে কেবলই বিচ্ছুরিত হচ্ছিল লেলিহান অগ্নিশিখা, কেবলই চলছিল বৈশ্বানরের প্রলয় নাচন—হিস্‌হিস্‌ শিষ্‌শিষ্‌ শব্দে। ক্রমে সে অবস্থা কমে এল, আগুন নিভ্‌ল, মূল পদার্থ সকল কাঠিন্য লাভ করল। উপর-মুখে দেখা দিল পাথরের ডাঙ্গা, খানা-গহ্বর-নিম্নস্থান ভর্তি হলো জলে, তৈরী হলো হ্রদ-সাগর-মহাসাগর। কিন্তু সেটা শুধুই উপর-মুখে, ভিতরে রয়ে গেল আগুন, তাপ আর মন্থন। তাপ থাকলেই সেখানে মন্থনও থাকবেই এটা প্রকৃতির নিয়ম।

যখন পৃথিবী এমনি করে জমাট বাঁধছিল, তার ওজনে ভারী বস্তু অর্থাৎ সোনা, রূপা, লোহা, শিষে, নিকেল ইত্যাদি ধাতুসম্ভার স্থিতিলাভ করল কেন্দ্রে। সে আজও আছে সেই কেন্দ্রেই গলা অবস্থায়। কারণ পৃথিবীর বাইরের আগুনই শুধু নিভেছে, কিন্তু তার ভিতরটা আজও আছে তেমনি জ্বলন্ত—হয়তো সেদিনের তুলনায় সামান্য একটুখানি কম। কেন্দ্রের এই ধাতু সম্ভারের উপরে জমল গলা পাথরের মাল-মসলা, তারও উপরে রইল জমে যাওয়া পাথর আর একেবারে উপরে পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে তৈরী হলো মাটির আস্তরণ।

এই যে মাটির নীচে জমা পাথর এটা সব জায়গায়ই সমান ছড়িয়ে নয়, তার ভিতরে আছে অনেক ফাঁক-ফোঁকর। সেই ফাঁক-ফোঁকর দিয়েই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে পৃথিবীর অভ্যন্তরিক ওই সব গলিত মাল-মসলা। সেটাই যখন ভিতরে থাকে ইংরেজীতে বলা হয় Magma (ম্যাগ্‌মা) আর বাইরে বেরিয়ে এলে বলা হয় Lava (লাভা)।

আগেই বলা হয়েছে সেখানে ধাতু ও পাথর সবই রয়েছে গলা অবস্থায়, আর তাতে চলেছে নিরন্তর মন্থন। এই ম্যাগমা কেবলই চাইছে প্রসারিত হতে কারণ তাপের ফলে কোন বস্তু গলে গেলে তার ধর্মই হচ্ছে বিস্তার লাভ করা, এটাও প্রকৃতিরই নিয়ম। কিন্তু প্রসারিত হবার জায়গা নেই সেখানে, তাই তার কাজ হচ্ছে সেখানে বসে বসে কেবলই মথিত হওয়া। আর যখনই সে পায় পৃথিবীর উপরে কোন ছিদ্রপথ বা দুর্বল স্থান, তখনই প্রবল আবেগে সেই স্থান ভেদ করে সে বেরিয়ে আসে বাইরে, ছড়িয়ে পড়ে এই পৃথিবীর গায়ের উপর। সেখানেই তৈরী হয় এই আগ্নেয় পর্বত।

সে যে নিরন্তর অগ্নি-উদগিরণ করতেই থাকে আর বার করে দিতে থাকে তার 'ম্যাগ্‌মা' তা নয়। বহুদিন থাকে নিস্তব্ধ তারপর হয়তো হঠাৎ একদিন ধ'রে বসে তার সংহার মূর্তি, কয়েক দিন সমানে চলে অগ্নি-উদগিরণ আরম্ভ হয় তার প্রলয় নৃত্য, বাইরে বেরোয় ছাই, বেরোয় লাভারূপী ম্যাগমা, আকাশে ছুঁড়ে মারে ছোট-বড় অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড সুবৃহৎ ক্ষেপনাস্ত্রের মত, জ্বল জ্বল করে বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে অগ্নিময়ী শিখা। আবার তারও একদিন শেষ হয়, বন্ধ হয় তার নৃত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী, আবার এক প্রলয়ঙ্করী নৃত্যের অপেক্ষায়।

আদিম পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরি ছিল সারা পৃথিবী ময়, অবিশ্রাম অগ্নি-উদগিরণ তার চলতই। কিন্তু কালের বিবর্তনে সেটা তার বন্ধ হয়েছে বটে, তবু আজকের পৃথিবীতেও আগ্নেয়গিরি আছে অনেক জায়গাতেই—কখনো তার ভয়ংকর রূপ নিয়ে, কখনো স্তিমিত রূপে। দু'হাজার বৎসর পূর্বে ইটালী দেশের পশ্চিম উপকূলে ভিসুভিয়াস নামে এক পর্বতে হয়েছিল ভয়ংকর এক অগ্ন্যুৎপাত, যার ফলে ছাইচাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল নিকটবর্তী দু'টি বর্ধিষ্ণু শহর—পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়াম। সাম্প্রতিককালে গত শতকের ১৮৮৪ সালে এক আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে প্রশান্ত মহাসাগরের জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মাঝামাঝি ক্রাকোটোয়া নামে একটি ছোট্ট দ্বীপের অর্ধেকেরও বেশী উড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই শতকের ১৯৪৩ সালে উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোর কাছে প্যারিকুটান নামে একটি গ্রামে কয়েক দিনের ব্যবধানে তৈরী হয়েছে এক নতুন আগ্নেয়গিরি।

জন্ ড্যালটন

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

জন্ ড্যালটন

বারো বছরের একটি ছেলে কিনা একটা স্কুলের হেডমাষ্টার! ভাবতে পার তোমরা? আচ্ছা তাঁর জীবন-কথাই কিছু আজ বলি শোন।

তিনি পরবর্তীকালে হয়েছিলেন এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক। নাম তাঁর জন্ ড্যালটন। তাঁর শেষ বয়সে তাঁকে যখন একটি প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলে সম্বর্ধনা করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন—প্রতিভার কথা জানি না, আমি যদি জীবনে কিছু করে থাকি, তা প্রধানতঃ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে। এই রকম কথা তাঁর সময়ের একশ বছর পরে আর এক জন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, যাঁর নাম টমাস্ এডিসন। ইংরেজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে—Great men think alike. অর্থাৎ মহৎ লোকদের চিন্তা একই রকম হয়ে থাকে। টমাস এডিসন বলেছিলেন,—Genius is one per cent inspiration and ninety nine percent perspiration. মানে—অধিদেবতা হতে গেলে এক শতাংশ দৈবশক্তির সঙ্গে মেশাতে হয় নিরানব্বই অংশ ঘর্মাক্ত অধ্যবসায়। বাস্তবিক তাঁরা জীবনভোর কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই এসব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের।

১৭৬৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ঈগ্‌লসফিল্ড নামক ইংলণ্ডের এক গ্রামে জন্ ড্যালটন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন দরিদ্র তাঁতী ও চাষী। চাষের সময় মাঠে মাঠে চাষ করতেন, অন্য সময় ঘরে বসে তাঁত বুনতেন। কিন্তু পুত্র জন-এর প্রতিভা খুব অল্প বয়সেই লক্ষিত হয়। প্রথমে গ্রামেরই এক ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত সামান্য একটা স্কুলে ধর্মবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অংক, বিজ্ঞান এবং ইংরেজী ব্যাকরণ তিনি শিক্ষা করেন। ঐ সময়েই অংকশাস্ত্রে এই বালক খ্যাতিঅর্জন করেন এবং ১২ বৎসর বয়সেই গ্রামের কর্তৃপক্ষ তার জ্ঞান বুদ্ধি লক্ষ ক'রে তাকে দিয়ে একটা আলাদা স্কুল স্থাপন করিয়ে, সেই স্কুলেরই করে দেন প্রধান শিক্ষক! সেখানের স্কুলে যে সব ছাত্র পড়তো, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল তার চেয়ে বয়সে বড়।

এই সময় থেকেই আবহাওয়া সম্পর্কে ড্যালটন বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন। তখনই তাঁর

নিজের একটি যন্ত্র তিনি নির্মাণ করিয়ে নেন। আবহাওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞান তাঁর জীবনভোর গবেষণার একটি বিষয় ছিল। তখন থেকেই তিনি যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন তা তাঁর খাতায় লিখে রাখতেন। এমনকি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে কিছু লিখে গেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন, অধ্যবসায় অত্যাবশ্যক।

কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যান্য বিষয়ে অবহেলা করতেন না। যখন তিনি গ্রামের এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক, তখনই সঙ্গে সঙ্গে পিতার চাষ-আবাদের কাজও কিছু কিছু করতেন এবং অবসর সময়ে তাঁর আবহাওয়া নিরীক্ষণ চলতো ও সেই সঙ্গেই ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিখতেন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানচর্চাও করতেন। এ সবই তাঁর নিজের চেষ্টায়। তবেই ভেবে দেখ, কী কঠোর পরিশ্রম সেই কাঁচা বয়স থেকেই করেছেন তিনি।

এই ছোট গ্রামের স্কুলেই ড্যালটন তিন বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন এবং তাঁর ১৫ বছর বয়সে তিনি চলে যান কেণ্ডাল নামে একটা বড় গ্রামে। সেখানে ১২ বছর ধরে বিদ্যা বিতরণ করতে থাকেন অনেক ছাত্রকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নানা বিষয়ে বহু পড়াশুনা ক'রে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। কবি সত্যিই বিদ্যাধন সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

কেণ্ডালে থাকা কালে তিনি বিজ্ঞানের একটা আলোচনা-গোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের বাগ্মিতার শক্তি ছিল না, আর ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তিও ছিল না তাঁর। তাই তিনি এ বিষয়ে সফলকাম হননি। এই প্রকার অনেক অসুবিধার অন্তরায়কেও অতিক্রম করে তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন।

১৭৯৩ সালে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারের একটা কলেজে শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হন। সেখানে অংকশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। কিন্তু সে কাজ তাঁর পছন্দ হয় না এই কারণে যে, কলেজের শিক্ষকতার কাজে এত বেশী সময় লাগতো যে নিজের পড়াশুনা বা বিজ্ঞানচর্চার সময় পেতেন না। সেই জন্যে ডালটন ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপনার কাজটা ছেড়ে দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। এই কর্ম-পরিবর্তনের দরুণ আর্থিক দিক দিয়ে যদিও তাঁর খুবই ক্ষতি হলো, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদির বিশেষ সুযোগ হলো ব'লে দু'চারজন ছাত্রকে শিক্ষাদান করে তিনি যে অর্থ পেতেন, তাতেই সন্তুষ্ট থেকে নিজের ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক কাজ করে যেতেন।

আর একটা কারণে তিনি কলেজের কাজটা সহজে ছেড়েছিলেন এই জন্য যে, কেণ্ডালে থাকাকালে জন্ গফ্ নামে একজন জন্মান্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, যাঁর

প্রভাবে এই সময় তিনি খুবই উপকৃত হন। জন্ গফ্ অন্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু অন্ধ অবস্থাতেই প্রভূত বিদ্যা অর্জন করে একজন প্রখ্যাত মনীষী হয়ে উঠেছিলেন।

অনেক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ড্যালটন এবং উদ্ভিদবিদ্যায় এমন আশ্চর্য ওস্তাদ ছিলেন যে, মাইলের পর মাইল চলতে চলতে যে-কোনো লতাপাতা হাতে পেতেন তা-ই তিনি চিনতে পারতেন। কারণ তাদের স্পর্শ, গন্ধ ও আস্বাদ নিয়েই তিনি বুঝতে পারতেন কোন্‌টার কি পরিচয়। আর আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গভীর ছিল এবং এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাতেই ড্যালটনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ হয়। অন্ধ গফ্‌ই ড্যালটনকে এই সময় তাঁর আবহাওয়া সম্পর্কে পরীক্ষাদির ফলাফল ধারাবাহিকভাবে সাময়িক বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে মুদ্রিত করতে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতে থাকেন। এবং ঐ সকল রচনা মুদ্রণের ফলেই ড্যালটনের নামডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ম্যাঞ্চেষ্টারের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন সম্প্রদায়ের অনুরোধে তিনি লেখার পর লেখা পাঠাতে থাকেন। এই সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগসূত্র তিনি জীবনভোর রেখেছিলেন। একশ'র বেশী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই সম্প্রদায়ের সভায় পাঠ করেছিলেন তিনি। সুতরাং তাঁর উন্নতির সুরুতে সহায় স্বরূপ ছিলেন প্রবীণ ও পণ্ডিত এই জন্মান্ধ জন্ গফ্।

ড্যালটন বায়ুমণ্ডলের প্রতিই মনোযোগী হওয়ার ফলে প্রত্যেক পদার্থ যে নিজ নিজ পরমাণু দ্বারা গঠিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর এই পরমাণু-ব্যাখ্যা জগতের বিজ্ঞানীগণ মেনে নেন। ড্যালটনের একশত বৎসর পূর্বে রবার্ট বয়েল নামক আয়রল্যাণ্ডের রাসায়ন ও পদার্থ-বৈজ্ঞানিক বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা করেছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বাতাস বিবিধ গ্যাসের সমষ্টি। পরবর্তীকালে ক্যাভেণ্ডিস্, ল্যাভয়সিয়ার ও প্রিষ্ট্‌লী পরীক্ষাদির দ্বারা স্থির করেছিলেন যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কারবনিক অ্যাসিড্ গ্যাস্ এবং বাষ্প এই চারের সংমিশ্রণে বাতাস গঠিত। এবং তাঁদেরও পরে ড্যালটন তাঁদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও পরীক্ষাদি করেন এবং আরও কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন।

ড্যালটন চিরকুমার থেকে চিরকাল বিজ্ঞান-সাধনায় জীবন উৎসর্গ ক'রে গেছেন। আমাদের দেশেরও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চিরকুমার ব্রত নিয়ে বিজ্ঞান-সাধনায় ব্রতী থেকে দেশের ও জগতের বহু কল্যাণসাধন করে গেছেন। তিনিও তাঁর রাসায়নিক আবিষ্কারের ফলে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন।

ড্যালটনের অ্যাটমিক ওজন সিদ্ধান্তের ফলে রসায়ন ও পদার্থ-শাস্ত্রের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়—যার ফলে আবিষ্কৃত হয় যে জগতের সকল পদার্থই বিদ্যুতগর্ভ। এই আবিষ্কারের পরবর্তী অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হয় অ্যাটম্ বোম্। অবিশ্যি তা সম্ভব হয়েছে পরবর্তীকালের পর পর বহু বৈজ্ঞানিক-পরম্পরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। তাঁরা অবিশ্যি শান্তিকালীন মানবহিতের মনোবৃত্তি নিয়েই আবিষ্কার করেছিলেন, যদিও তা প্রথম কাজে লাগলো আসুরিক শক্তি প্রয়োগের চূড়ান্ত অশুভ মুহূর্তে! যুদ্ধবিগ্রহকালে মানুষ তো আর মানুষ থাকে না!

১৮৪৪ সালে যেদিন ড্যালটনের মৃত্যু হয়, সেদিন তাঁর মৃতদেহ বহনের সময় যে শোক-মিছিল হয়েছিল, তাতে লোক সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজারের উপর।

কিঁদুষক চা

শ্রীসাধনাপ্রসাদ দাসগুপ্ত

মহারাজা হবুচন্দ্র তাড়াতাড়ি রাজসভায় ঢুকেই হাঁক দিলেন, "মন্ত্রী, মন্ত্রী।" মন্ত্রী গবুচন্দ্র দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই হবুচন্দ্র আদেশ দিলেন, "একজন কিঁদুষক চাই। এক্ষুনি চাই। যেখান থেকে পার, আনো। আমার সভায় সব আছে, কিন্তু কিঁদুষক নেই। কিঁদুষক থাকলে মনে এতো অশান্তি হতো না আমার। বুঝলে?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে গবুচন্দ্র জবাব দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

"বুঝতেই যখন পেরেছো, তখন দেরি আর নাই বা করলে, মন্ত্রী। তবে ভালো কিঁদুষক দরকার। আমি বাজিয়ে দেখেশুনে আর পরীক্ষা করে নেবো। বুঝেছো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"সারা রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে দাও কিঁদুষকের জন্য। যাকে-তাকে এই কাজের ভার দিও না। ছোট নগর কোতোয়ালকে ঢুলীর সঙ্গে পাঠাবে। বুঝলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আজকাল দেখছি সব কথাই তুমি একবারেই বুঝতে পারছো। তা, বেশ বেশ। আজকে সভার কাজ এখানেই শেষ। আমি চললাম, দেখি শ্রীমান্ নাদুসচন্দ্র কি অবস্থায় আছে।"

মহারাজা হবুচন্দ্র প্রাসাদে ঢুকলেন। মন্ত্রী গবুচন্দ্র বিশেষ দূত পাঠালেন ছোট নগর কোতোয়ালের কাছে, তাঁর সঙ্গে এখুনি দেখা করবার জন্য।

রাজধানীর প্রধান পথে ঢুলীরা বড় বড় ঢোল বাজাতে বাজাতে চলেছে। পেছনে ঘোড়ার পিঠে ছোট নগর কোতোয়াল। হাতে হুঁকো। হুঁকো টানছেন আরামে চোখ বন্ধ করে। ঢুলীরা ঢোল বাজিয়ে বাজিয়ে বলছিল, "আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনুন। মহারাজা হবুচন্দ্রের রাজসভার জন্য একজন কিঁদুষক দরকার। যিনি এই চাকরি চান, তাঁকে আসছে কাল সকালে রাজসভায় উপস্থিত হতে হবে। সেখানে স্বয়ং মহারাজা পরীক্ষা করে যোগ্য লোককে বাছাই করবেন। মাইনের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না: রাজসভার চাকরি। বুঝতেই তো পারছেন।"

প্রজারা অনেক কিছু বুঝতে পারলেও কিন্তু ঐ 'কিঁদুষক' কথাটার মানে বুঝতে পারে না। কিঁদুষক? সে আবার কি? যা হোক, আদার ব্যাপারীর নাকি জাহাজের খবরের দরকার হয় না। তাই অনেক প্রজাই ঘোষণার কথা শুনে যে-যার কাজে চলে যায়। কিন্তু রাস্তার সামনে এক বাড়ীর রকে বসেছিল একদল বেকার। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "চাকরির একটা খোঁজ যখন পাওয়া গেছে, তখন সুযোগকে অবহেলা

করা ঠিক হবে না। সুতরাং, কোতোয়ালকে প্রশ্ন করে জানতে হবে কিঁভুষক মানে কি এবং তার কি কি যোগ্যতা আবশ্যক।"

"নমস্কার মহামান্য কোতোয়াল মশাই।"

কোতোয়াল মশাই আরামে হুঁকো টানছিলেন। হঠাৎ এ রকমের বাধার সৃষ্টি হওয়াতে রেগে উঠলেন। বললেন, "কি ব্যাপার? তোমরা কে?"

'ঢুলিরা ঢোল বাজাতে-বাজাতে চলেছে, আর ঘোড়ার পিঠে ছোট নগর কোতোয়াল।'

"আজ্ঞে, আমরা জনকয়েক বেকার। চাকরির চেষ্টায় আছি।"

"বেশ বেশ। যতোদিন তোমাদের চাকরি-টাকরি না হয়, ততোদিন কিন্তু শান্ত সুবোধ হয়ে থেকো। আইন-টাইনগুলি আবার ভেঙো না যেন।"

"না না, আমরা সেরকমের ছেলে নই। আর, আপনার যে কড়া শাসন, তাতে বড় গুণ্ডারাও সব সাধু হয়ে গেছে।"

"হতেই হবে। আর কেন হবে নাই বা বলো? আমি গুণ্ডাদের বলে দিয়েছি, গুণ্ডামী করেছো কি আমার তলোয়ারে দু'টুকরো হয়েছো।"

"কিন্তু, কোতোয়াল মশাই, তরোয়ালটা কোথায়? কোমরে ঝোলানো দেখছি না তো।"

কোতোয়াল খুব বেকাদায় পড়ে গেলেন। কিন্তু দমবার পাত্র নন তিনি। চোখ রাঙিয়ে প্রশ্ন করেন, "তোমাদের কি বলবার আছে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় আমার অল্প।"

"ব্যাপার কি জানেন, কোতোয়াল মশাই? আপনাদের ঘোষণার ঐ কিঁদূষক শব্দটার মানে আমরা বুঝতে পারছি না। তাই জানতে চাই, ওর অর্থটা কি?"

চমকে হুঁকোটা নামিয়ে ফেললেন তিনি মুখ থেকে। সত্যিই তো, শব্দটার অর্থ তো তিনিও জানেন না এবং জেনে না নিয়েই ঘোষণা করতে বের হয়েছেন। কিন্তু এই ছোকরাদের কাছে নিজের বোকামি প্রকাশ করতে চাইলেন না। উল্টে ধমক দিয়ে বললেন, "কোন্ গুরুমশায়ের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছো? ছিঃ ছিঃ, দেখছি তিনি কিছুই শেখান নি তোমাদের। এই সামান্য শব্দটার অর্থ জানো না?"

এই বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। ঘোড়া হাঁকিয়ে সোজা চলে এলেন মন্ত্রী গবুচন্দ্রের কাছে। গবুচন্দ্রও অর্থটা জানতেন না। ছুটলেন তাই মহারাজার খাসকামরায়। মহারাজা তো ঘটনা শুনে চটেই লাল। প্রজারা এমন মূর্খ যে এই সাধারণ শব্দটার অর্থ জানে না? মূর্খ প্রজা রেখে লাভ নেই। তাই হুকুম দিলেন, রাজ্যের সব প্রজাদের মাথা কেটে ফেলতে। মন্ত্রী জানালেন যে তাতে আসল শাস্তি হবে না। মরে গেলে তো সব শেষই হয়ে গেল। তার চাইতে ওরা বেঁচেই থাকুক আরও নতুন নতুন করের বোঝা মাথায় নিয়ে। নতুন নতুন আর কি কি কর হতে পারে, সেটা তো মন্ত্রীর মাথায় অনেক দিন আগে থেকেই বাসা বেঁধে রয়েছে।

মন্ত্রীর প্রস্তাব জেনে মহারাজা খুসী হয়ে বললেন, "কিঁদূষক মানে এমন লোক যিনি মানুষকে কাঁদাতে পারবেন। আমার দরবারে 'বিদূষক' আছেন আমাকে হাসাবার জন্য, কিন্তু একজন কিঁদূষকের দরকার হয়ে পড়েছে আমার ছেলে, যুবরাজ নাদুসচন্দ্রকে কাঁদাবার জন্য। বুঝলে?" অর্থ বুঝে মন্ত্রী ছুটলেন কোতোয়ালকে জানাবার জন্য। মন্ত্রীর কাছে মানে বুঝে কোতোয়াল আবার রওয়ানা হলেন ঘোষণা করতে। ওধারে যথাসময়ে রাজ-সভায় ঘোষণা শুনে হাজির হয়েছেন চল্লিশজন লোক। তাঁরা ঐ চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন লেখক, চিত্রকর, গায়ক ইত্যাদি। প্রথমে ডাক পড়ে লেখকের। তিনি মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আমার এই সাতশো পাতার বই-এ পাবেন তিনশোটি মৃত্যু। সে কি আর আজেবাজে মৃত্যু? বড় করুণ আর নিষ্ঠুর সেই মৃত্যু! যুবরাজকে আমি নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়ে ছাড়বো।"

লেখক পড়তে থাকেন। কিন্তু নাদুসচন্দ্র শুধু হেসেই যান। তাকে বাদ দিয়ে চিত্র-করকে ডাকা হলো। তিনি নানারকমের করুণ দৃশ্যের ছবি এনে হাজির করেন। কিন্তু নাদুসচন্দ্রের মুখের হাসি থামে না। চিত্রকরকে থামিয়ে তখন গায়ককে গাইতে হুকুম দিলেন মহারাজ। এই গায়কের গানে নাকি পাথরও জল হয়ে যায়। কিন্তু রাজকুমারের

মুখের হাসি বন্ধ করা গেল না। ফলে, রাজা রেগে-মেগে সভা ছেড়ে ভেতরে চলে গেলেন।

এখন আগের কথায় আসা যাক। মহারাজা হবুচন্দ্রের মাত্র একটি ছেলে। নাম নাদুসচন্দ্র। তাঁর অনেক আশা এই ছেলেকে নিয়ে। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে অনেক রাজাই এসেছে এবং আসবে, কিন্তু তাঁর মতো চিরকাল পর্যন্ত বিখ্যাত হয়ে কেউই থাকবে না। লেখকরা তাঁকে নিয়ে যতো রচনা লিখেছেন, ততো রচনার কারণ কোনো রাজা হননি এবং হবেনও না। কিন্তু এখন তাঁর বয়স হয়েছে। আগে-পরে শ্রীমান্ নাদুসচন্দ্রই সিংহাসনে বসবে। তাঁর ইচ্ছা, ছেলে বাবার মতোই বিখ্যাত হোক এবং লেখকদের রচনার খোরাক জোগাক। স্থতরাং, পুত্রকে যথাযোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই, পুত্রকে গুরুগৃহে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষা নেবার জন্য। এখনকার মতো আগে দেশে স্কুল-কলেজ ছিল না; তখন ছাত্ররা পড়বার জন্যে গুরুর বাড়ীতে যেতেন এবং পড়াশোনা শেষ করে গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে স্বগৃহে ফিরতেন।

শ্রীমান নাদুসচন্দ্র যখন বিত্তাশিক্ষা শেষ করে প্রাসাদে ফিরলেন, তখন তাঁর অবস্থা এবং কাজকর্ম দেখে হবু এবং গবু হতাশায় ভেঙে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, আর সভার রাজবিদুষক দস্তুরমতো চাকরি যাবার ভয়ে প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

মহারাজকুমার নাদুসচন্দ্র গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসে সব সময়ই হাসতে থাকেন। তিনি কথা বলতে বলতে হাসেন, হাঁটতে হাঁটতে হাসেন, সভায় বসে বসে হাসেন, খেতে খেতে হাসেন, স্নান করতে করতে হাসেন, শুয়ে শুয়ে হাসেন, এবং এমনকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হাসেন। হাসি যেন তাঁর ঠোঁটে আঠার মতো লেগে আছে—সব কথায়, সব কাজে এবং সব সময়ে হাসি। কেন দিনরাত্রি শুধু হেসেই যাচ্ছেন, মহারাজার এই প্রশ্নের উত্তরে নাদুসচন্দ্র হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, "গুরুর আদেশ, বাবা। গুরু জানিয়েছেন, জীবন তো পদ্মপাতায় এক ফোঁটা জলের মতো। এই আছে, এই নেই। তাই তার হুকুম, হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়। এই জন্যই তো বাবা, হাসছি। শুধু হাসছি এবং সারাজীবন সব সময় শুধু হেসেই যাবো। আস্থক রোগ, আস্থক যন্ত্রণা, আস্থক অশান্তি—হাসি আমি ছাড়বো না। আর কোনো অবস্থায়ই আমি কান্নাকাটি করতে পারবো না। কারণ একবার কাঁদলেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ। আর একবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলেই আমাকে সাধারণ মানুষের মতো হাসিকান্নার মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে।"

ওধারে বিদূষক ভয়ানক চিন্তায় পড়লেন। তাঁর কাজ, মহারাজকে সব সময় হাসানো। রাজারা হাসেন না প্রায় বললেই চলে। কারণ, কি ভাবে এবং কি করলে রাজ্য রক্ষা হবে, এই ভাবনা নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। তখন বিদূষক নানা রকমের কথা বলে এবং অঙ্গ-

ভঙ্গী করে তাঁদের হাসিয়ে থাকেন। কিন্তু হবুচন্দ্রের পরে যখন নাদুসচন্দ্র সিংহাসনে বসবেন, তখন বিদূষকের চাকরি যাবে। কারণ, নাদুসচন্দ্রের মুখে তো হাসি লেগেই আছে। ঐ অবস্থায় বিদূষক অথবা ভাঁড়ের প্রয়োজন কি? সুতরাং এই বুড়ো বয়সে চাকরি গেলে কোথায় যাবেন, কি খাবেন, এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েন বিদূষক।

ব্যাপার যখন এ রকমের, তখুনি মহারাজ মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছিলেন, একজন কিঁদূষক আনতে রাজকুমারকে কাঁদাবার জন্য এবং অনেক চেষ্টা করেও কেউই নাদুসচন্দ্রকে কাঁদতে পারলো না। হবু এবং গবু তো হতাশায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদূষককে আজ কয়েক দিন থেকেই বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছে। মহারাজ আনন্দের কারণ জানতে চাইলে বিদূষক জানালেন যে, আরও কয়েক দিন না গেলে তিনি কিছুই বলবেন না।

সেদিন সকালবেলা। রাজসভায় বসে তাঁর নিয়ম মতো হাসতে হাসতে মাঝে মাঝে একটু একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন নাদুসচন্দ্র। তারপর হঠাৎ কাউকে কিছু না বলেই সভা ছেড়ে প্রাসাদের ভেতরে ছুটে চলে গেলেন। তখন বিদূষক হবুচন্দ্রের কানে কানে বলেন, "ওষুধ ধরেছে, মহারাজ। চলুন, আমরাও রাজকুমারের পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে যাই।"

মহারাজ মন্ত্রীকে নিয়ে তাঁর ঘরে বসে আছেন। বিদূষক হঠাৎ দৌড়ে এসে বলেন, "কেঁদেছে, যুবরাজ কেঁদেছে। আমি দূর থেকে লুকিয়ে দেখলাম, রাজকুমার কাঁদছে, খুব কাঁদছে, লুকিয়ে লুকিয়ে। কাঁদো বাবাজী, কাঁদো!"

"মন্ত্রী, ঢোল পিটিয়ে দাও! রাজকুমার কেঁদেছে। এরজন্য তিনদিন তিনরাত্রি উৎসব চলবে।"

"মহারাজার আদেশ আমি এক্ষুনি প্রচার করছি।"

"কিন্তু, মন্ত্রী, হাজার হোক ছেলে তো আমার। বেচারী কাঁদছে। রাজবৈদ্যকে খবর দিলে ভালো হয়।"

বাধা দিয়ে বিদূষক বলে, "না, মহারাজ, এতো তাড়াতাড়ি রাজবৈদ্যকে ডাকা উচিত নয়। শ্রীমান্ আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে, মনে কষ্ট দিয়েছে। কাঁদুক, কাঁদুক, আরও কাঁদুক—একটু শাস্তি পাওয়া দরকার ওর!"

তারপর আনন্দে একটু নেচে বিদূষক বলেন, "মহারাজ, সেদিন সেই কিঁদূষক পরীক্ষা করবার সময় রাজকুমার মুখ হাঁ করে খুব হাসছিলো। তক্ষুনি দেখলাম, শ্রীমানের চোয়ালের কয়েকটি দাঁত পোকায় খাওয়া। আর তখুনি বুঝে নিলাম, আজ না হয় কাল, বাছাধনকে দাঁতের ব্যথায় কাঁদতেই হবে। কারণ, না কেঁদে উপায় নেই। দন্তশূল কি ভয়ানক যন্ত্রণা দেয়, যাঁদের হয়েছে, মাত্র তাঁরাই জানেন।"

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দাঁড়ে বসে উড়ুক্কু মাছ দুটো এবার ডানা ঝাপটাতে শুরু করে দিলে। তারপর পাগুলো টেনে টেনে সোজা করলে, তারপর বন্‌বন্‌ করে মুণ্ডু ঘোরাতে লাগল—একবার এদিক, একবার ওদিক।

বড়টা ছোটটাকে বললে, "কী রে! ঘুম ভাঙলো?"

ছোটটা বললে, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

তারা তাদের কাজে যাবার জন্যে তোড়জোড় করতে লাগল। তাদের কাজ হ'ল, রক্ষীর কাজ—পাহারা দেওয়া। এরা চৌকিদারের মত ক'টা বেজেছে তা দেশময় জানিয়ে দেয়।

হঠাৎ ছোটটা লক্ষ্য করলে যে বড়টার একটা চোখ নেই। সে কথা বড়টাকে জানাতে সে বললে, বোধহয় মুণ্ডু নাড়বার সময় কোথায় পড়ে গেছে! দু'জনে মেঝেতে নেমে হারানো চোখটা খুঁজতে লাগল। মুরগীটা জেগে উঠে খুঁজতে লাগল। তার ডানার ধাক্কায় একটা ফ্লাস্ক উল্টে তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারাঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেল। এ এক অদ্ভুত ধরণের ধোঁয়া—নানা রংয়ের ধোঁয়া স্তরে স্তরে জমতে লাগল—লাল, নীল, জাফরানি, সবুজ, হলদে···পাতলা ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল মুরগী খুঁজছে হারানো চোখটা—

খুঁজি খুঁজি নারি
যে পায় তারি⋯ ⋯

মুরগীটা হারানো চোখটা খুঁজে বার করলে। চোখটা সে ছোট উড়ুক্কু মাছটাকে দিলে।

ছোট উড়ুক্কু মাছটা বড়টাকে বললে, "আরে চোখটা যে এখনও বন্ধ রয়েছে!"

বড় উড়ুক্কু মাছটা বললে, "আরে! এখনও আমি ঘুমুচ্ছি—তাই চোখটা বোজাই রয়েছে।"

ছোট উড়ুক্কু মাছটা চোখটাকে ঝাঁকানি দিতেই সেটা খুলে গেল। তখন সেটা বড় উড়ুক্কু মাছের মুণ্ডুতে ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দিলে সে।

তারপর ভন্ ভন্ করতে করতে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে যে নানা রংয়ের ধোঁয়া জমেছিল এবার সেগুলো পাক খেতে খেতে নানা বর্ণের মালার মত দেখাতে লাগল। ঘরের জিনিসগুলো আবার দেখা যেতে লাগল।

ঐতিহাসিকের পায়ের ডগা আবার নড়তে দেখা গেল।

ঐতিহাসিক জেগে উঠলেন।

হাত-ধরাধরি করে খুড়ো-খুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু পার্কে এসে যেই না হাজির হওয়া অমনি পরচুলওয়ালারা ওদের ক্যাঁক্ করে ধরে নিয়ে গেল। আবার তাদের রান্নাঘরে হাজির করা হ'ল। খুড়ো-খুড়ী মনে করলে শীঘ্র সন্ধ্যা হবে, তাই কয়েদীর মেয়ে তিনটেকে দেখবার জন্যে তারা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

ওরা গানের সুরে গেয়ে উঠলো।⋯

এসেছি এই মজার দেশে
তিনটি মেয়ের সন্ধানে⋯

খুড়ো লক্ষ্য করলে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর থেকে সূর্য আকাশে ঠায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, একচুলও নড়েনি। সবাই যখন ঘুমুচ্ছিল তখন সূর্য্যিঠাকুর একচুলও নড়েন নি। সবার অলক্ষ্যে চলাটা অভদ্রতা এবং জুয়াচুরি বলে তিনি মনে করেন। এই দেশের নাম তাই আশ্চর্য নগর।

খুড়ো-খুড়ী রান্নাঘরে বসে ভাবছে, ততঃ কিম্—এবার কি করা যায়? এমন সময়ে মাঝারি আকৃতির একটা লোক ঘরে ঢুকে বজ্রগম্ভীর স্বরে হেঁকে উঠল:

"আরে! সেই উজবুক দুটো কোথায় গেল?"

খুড়ো খুড়ীর আড়ালে লুকোতে গেল—আর খুড়ী লুকোতে গেল একটা গাছের আড়ালে—গাছটা, অবশ্য, টবের গাছ।

যে লোকটা ঘরে এসে ঢুকলো এ মনে করে যে এ একটা মস্ত কেউকেটা হতে পারতো যদি—তার বাপ-মা কত কী ধারণা করেছিল কিন্তু এ হ'ল শেষ পর্যন্ত ডাক্তার। যেই ও ডাক্তার হ'ল অমনি ও ভাবলে যে ওর আর ঢ্যাঙা হওয়া চলবে না—তা'হলে ঝুঁকে ঝুঁকে রোগীদের পরীক্ষা করতে করতে ওর কোমর বেঁকে যাবেই। তাই ও হলো মাঝারি আকৃতির—না ঢ্যাঙা, না বেঁটে।

এর পিছনে এসেছিল একটি ক্ষুদে কম্পাউণ্ডার। লোকটিকে দেখতে ঠিক ঢাকের মত। তার মাথাটা ছোট্ট, পা দুটো লম্বা লিক্‌পিকে—পায়ের তলায় ছোট্ট ছোট্ট চাকা লাগানো। এর দু'হাতে নানান্ যন্ত্রপাতি আর প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধপত্র—ইঞ্জেকসানের সিরিঞ্জ, বোরিক তুলো, গজ্, মলম, আইডিন আর মেজার গ্লাস,—এর পকেটে দাঁত তোলার জন্য কর্ক-স্ক্রু।

ডাক্তার আবার বললো, "কৈ, কোথা গেল উজবুক দুটো? এই যা, নিয়ে আয় আমার জামা।" বলে কম্পাউণ্ডারকে দিল এক কনুয়ের গুঁতো।

ধাক্কা খেয়ে কম্পাউণ্ডার পায়ের তলার চাকার ওপর গড়গড়িয়ে দরজার মুখে চলে গেল। বাইরে একজোড়া গাধা দাঁড়িয়েছিল। দুটো গাধার সঙ্গে একটা চেয়ার উঁচু করে বাঁধা। ডাক্তার এই চেয়ারে বসে রোগী দেখতে যায়—গাধা দুটো টাট্টু ঘোড়ার মত তার চেয়ার টেনে নিয়ে যায়।

কম্পাউণ্ডার চেয়ারের ওপর থেকে ডাক্তারের জামা এনে দিলে—তার পকেটে যত রাজ্যের শিকড়-বাকড়, শিশি-বোতল, কৌটো, বাক্স, সব নানা রকম ওষুধে ভর্তি।

ডাক্তার খুঁজতে লাগলো—কৈ, কোথা গেল সে দুটো?

এই সময় কাক, চোরামাণিক্য আর গুগলী-ঝিনুক কয়েকজন পরচুলওলাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো।

তাদের জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার, "কোথা গেল তারা?"

চোরামাণিক্য বললে গুগলী-ঝিনুককে দেখিয়ে, "এই তো তাদের একজন।" প্যাপীলিক গুগলী-ঝিনুককে ধরেছিল একদিকে।

এতক্ষণে খুড়ো-খুড়ী বুঝলে যে ডাক্তার তাদের খোঁজেনি, রোগীদের খুঁজছিল।

ডাক্তার গুগলী-ঝিনুককে ভাল করে পরীক্ষা করে বললে, "এই তো এর পা-টা জখম হয়েছে।" সারস সার্জেণ্ট তার ভাঙা পা-টা টেবিলের ওপর রেখে দিল।

ডাক্তার মোমবাতি জেলে গালা আর মোম দিয়ে তার ভাঙা পাজোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে ঘরের বাইরে এক মহামারী কাণ্ড—চীৎকার, হট্টগোল, হৈ হৈ, কান্না··· সকলেই উত্তেজিত, সকলেই কাঁদছে, সকলেই চেঁচাচ্ছে।···

খবরের কাগজওয়ালা ভিড়ের মধ্যে খবরের কাগজ বিক্রী করছে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পরচুলওয়ালাদের সর্বনাশের কাহিনী শোনাচ্ছে।···

পার্কে পার্কে লোক ক্ষেপে ধেই ধেই করে নাচছে। জুতা, ছাতা, মাথা কার যে কোথায় যাচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই—সবাই মরীয়া হয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে আর চেঁচাচ্ছে।

রান্নাঘরের সবাই হায় হায় করে উঠলো, "হায়, কি সর্বনাশ! কি কষ্ট!" চোরা-মাণিক্য 'অত্যন্ত দুঃখিত'-মার্কা মুখোস মুখে দাঁড়িয়ে।

সারস সার্জেণ্ট বলে উঠলো, "বাজারের পার্কটা আবার কে তৈরী করবে। হায়, হায়, হায়, কি সর্বনাশ হ'ল আমাদের!"

চোরামাণিক্য জিজ্ঞেস করলে, "কে প্ল্যান তৈরী করবে, এইটাই এখন বড় সমস্যা!"

প্যাপীলিক বললে, "আমরা কোন প্ল্যান চাই না।"

কাক ক্যাস্‌কেসে গলায় বললে, "আগে তো বাড়ীগুলো তৈরী হোক, তারপর প্ল্যানের কথা ভাবা যাবে।"

চোরামাণিক্য বললে, "প্ল্যান নিশ্চয় আছে ওদের কাছে।"

প্যাপীলিক বললে, "ঘোড়ার ডিম। প্ল্যান সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

কাক বললে, "সব আহাম্মকের দল, বলতেই পারছে না প্ল্যানগুলো আগে তৈরী হয়েছিল, না বাড়ীগুলো আগে তৈরী হয়েছিল।"

প্যাপীলিক বললে, "এক কাজ করলে সব গোল চুকে যায়।"

কাক বললে, "কি, কি? বলেই ফেল।"

প্যাপীলিক বললে, "কাকী বুড়ীকে ডেকে তার পরামর্শ নেওয়া হোক্‌।"

এদিকে ডাক্তারের কাজ শেষ। পা-জোড়া লাগানো হয়ে গেছে। গুগলী-ঝিনুক মাথায় হাত দিয়ে বললে, "আমার এখানে বেজায় বেদনা হচ্ছে।"

চোরামাণিক্য বললে, "ও হচ্ছে পালা জ্বর, আর কিছু না।"

ডাক্তার ক্ষেপে উঠলো, "কে বললে পালা জ্বর? অবাক করলে! পা-টা গঁদ আর গালা দিয়ে জুড়ে দিয়েছি—জ্বর হতেই পারে না। হলেই হ'ল!"

আসল ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সকলের সম্মুখে বিরাট সমস্যা। আজ দেশব্যাপী মাথা ব্যথা—ভেবে দেখ কত বড় সমস্যা আমাদের সম্মুখে! (ক্রমশঃ)

চার বন্ধু ও বুদ্ধিমতী রাজকুমারী

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

মালব্য দেশের রাজা পরাক্রমের একমাত্র পুত্র বিক্রম। রাজার নয়নের মণি সে। দিব্যকান্তি তার চেহারা, আর কি মিষ্টি তার কথাবার্তা। তাকে দেখলে আর তার কথা শুনলে মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়। যুদ্ধবিদ্যা ও অসি-চালনায় তার জুড়ি নেই। রাজা নিজে তাকে রণকৌশল শিখিয়েছেন। শাসনকার্য ও বিচার-প্রণালীতে পারদর্শী করেছেন রাজ্যের উজির স্বয়ং। যৌবনে পদার্পণ করলে বিক্রমের যুদ্ধবিদ্যা ও সৌন্দর্যের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের বহু রাজা তাকে কন্যা সম্প্রদান করতে ইচ্ছুক হলেন।

যুবরাজ বিক্রমের অষ্টাদশ বয়ঃক্রম পূর্ণ হলে রাজা পরাক্রম তাকে একখানি সুন্দর ঘড় উপহার দিলেন। এক বিদেশী সওদাগর এটি রাজাকে ভেট দিয়েছিল। ঘড়িটির বিশেষত্ব হোল অন্ধকারে এর সময় দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রতি ঘণ্টায় পাখীর সুমিষ্ট সঙ্গীত বেজে ওঠে। এই অভিনব উপহার পেয়ে যুবরাজ খুব সন্তুষ্ট হোল। সে সর্বদা এটি নিজের কাছে রেখে দিত।

যুবরাজ বিক্রমের তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। স্বর্ণকার-পুত্র গুলাব, কৃষক-পুত্র রণবীর এবং ব্রাহ্মণ-পুত্র দিগম্বর। তারা যুবরাজের সঙ্গে একত্র শিক্ষালাভ করেছে এবং তাদের বন্ধুত্ব ছিল অচ্ছেদ্য। সামাজিক মর্যাদার তারতম্য তাদের মনে কখন উদয় হোত না, তারা পরস্পরকে সহোদরের মত ভালবাসত।

যুবরাজের জন্মতিথির পর কয়েকমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। বসন্তকাল উপস্থিত। প্রকৃতি অপরূপ সাজে সেজেছে। রঙীন কুসুম আর কিশলয়ে ছেয়ে গেছে চারদিক। বিক্রম এবং তার তিন বন্ধুর মন উতলা হয়ে উঠল। তারা ঠিক করে ফেললে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে তারা একবার পৃথিবীর চারদিকটা ঘুরে দেখবে। কেউ তখনো বিবাহ করেনি। অতএব গুরুজনদের অনুমতি পেতে দেরি হোল না। রাজা, স্বর্ণকার, কৃষক এবং ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে স্ব স্ব পুত্রকে সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং সেই সঙ্গে সকলে একই উপদেশ বিতরণ করলেন—অমূল্য বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটিও না, জীবনের কোন মুহূর্তে পরস্পরকে হীন ভেবো না, আর স্নেহপ্রীতি দিয়ে নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে।

এক সুন্দর সকালে চার বন্ধুর যাত্রা শুরু হোল। কত সমৃদ্ধ নগর, কত শান্ত মধুর পল্লী পার হোল তারা। বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হোল তাদের। পথে বার হবার সময় বিক্রম তার হাতঘড়িটি সঙ্গে নিয়েছিল। রাত্রে সময় জানবার জন্য তাদের আলোর প্রয়োজন হতো না। ঘড়িটি অন্ধকারে নক্ষত্রের ন্যায় জলজল করতো। সহজেই এক নজরে তারা বুঝে নিত রাত্রি কত।

এইভাবে পথ চলতে চলতে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা এক গুহার সম্মুখে এসে উপস্থিত হোল। বিকাল থেকে বেশ বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। চার বন্ধু অগত্যা সেই গুহামধ্যে আশ্রয় নিলে। গুহার অভ্যন্তরে ঘন অন্ধকার। যুবরাজ তার হাতঘড়িটি মণিবন্ধ থেকে খুলে মাথার কাছে রাখলে। তার সুমধুর বাদ্য-সঙ্গীত প্রতি ঘণ্টায় বেজে উঠছিল। সারাদিন ঘুরে চার বন্ধু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শোওয়া মাত্র তারা অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হোল।

পরদিন সকাল হতেই তারা বেরিয়ে পড়লো গুহা থেকে। মুখ-হাত ধুয়ে বনের ফল মূল সংগ্রহ করে তারা প্রাতরাশ সেরে নিলে। খাওয়ার সময় হঠাৎ কৃষক-পুত্র রণবীরের নজরে পড়লো যুবরাজকে কেমন অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ বোধ হচ্ছে। সে কৌতূহলী ও শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলো—প্রিয় বন্ধু! তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?

যুবরাজ শুষ্ককণ্ঠে বল্লে—ভাই! আমার ঘড়িটি চুরি হয়ে গেছে। যুবরাজ মনে মনে ভাবলে তার তিন বন্ধুর মধ্যে কেউ ঘড়িটি নিয়েছে। এখন যদি সে তাদের সরাসরি সন্দেহ করে, তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে। তাদের মধুর সম্পর্ক চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তার একমাত্র চিন্তা হোল বন্ধুদের কোন প্রকার সম্মানহানি না করে কি ভাবে ঘড়িটি উদ্ধার করা যায়। সে শুধু একবার বন্ধুদের সাহায্যলাভের সুরে প্রশ্ন করলে—বন্ধুগণ! তোমরা কি কেউ জান আমার ঘড়ির খবর? তিন বন্ধু সমস্বরে উত্তর দিলে—ভাই, আমরা তোমরা ঘড়ির সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

বিক্রম কোন কুলকিনারা না পেয়ে অবশেষে তার পিতাকে চিঠি লিখে জানাল। কারও সম্মানে আঘাত না দিয়ে ঘড়িটি উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করল সে।

রাজা বিক্রমের চিঠি পেয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। বন্ধুত্বে ফাটল না ধরে, কারও সম্মানের হানি না হয়, অথচ ঘড়িটি কৌশলে তাদের কাছ হতে উদ্ধার করতে হবে, এ তো বড় কঠিন সমস্যা! অগত্যা কোন উপায় বার করতে না পেরে তিনি সরাসরি দিল্লীর সম্রাটকে চিঠি লিখলেন।

দূত মারফত পত্র পেয়ে সম্রাটও মহা ভাবনায় পড়লেন। মালব্যরাজ তাঁকে মুস্কিলে ফেললো বটে! এতে তাঁর মানসম্মান নির্ভর করছে। সারা ভারতে তাঁর জ্ঞান-বিদ্যার খুবই প্রসিদ্ধি। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

সম্রাটের এক সপ্তদশী সুন্দরী কন্যা ছিল। বাবার এই অবস্থা সে লক্ষ্য করছিল। একদিন গভীর নিশীথে সম্রাটকে প্রাসাদের অলিন্দে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করতে দেখে সে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল—পিতা! ক'দিন থেকে আপনাকে বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখছি। কি হয়েছে আমায় বলবেন?

দিল্লীশ্বর কন্যার কাছে ব্যাপারটি গোপন করলেন না। খুলে বললেন।

রাজকন্যার ছিল প্রখর বুদ্ধি। সে যুবরাজ বিক্রমের নাম আগেই জানত, মনে মনে তাকে সে স্বামীরূপে কল্পনা করেছিল। সে তাই সম্রাটকে বললে—পিতা, আপনি যদি তাদের এখানে আনিয়ে দিতে পারেন আমি রহস্যের সমাধান করতে পারি।

কন্যার কথা শুনে দিল্লীশ্বর তৎক্ষণাৎ মালব্যরাজকে পত্র লিখলেন—অবিলম্বে আপনার পুত্র ও তার বন্ধুদের দিল্লী পাঠিয়ে দিন। রহস্যের কিনারা হবে।

রাজা পরাক্রমের নির্দেশ মত বিক্রম তিন বন্ধুসহ দিল্লীতে গিয়ে হাজির হলো। পদমর্যাদা অনুযায়ী তারা রাজধানীতে উপযুক্ত আশ্রয় পেলো। যুবরাজ আশ্রয় নিল রাজপ্রাসাদে, গুলাব বিখ্যাত স্বর্ণকারের গৃহে, রণবীর জমিদারের অট্টালিকায় এবং দিগম্বর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নিবাসে।

সেকালে নিয়ম ছিল রাত্রির আহার সন্ধ্যাকালে গ্রহণ করে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত সঙ্গীত ও গল্প শুনে কাটান। রাজকন্যা মালব্য দেশের যুবরাজকে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সে করলে কি, উজিরের ছদ্মবেশে বিক্রমের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোল। সনম্র মধুর স্বরে সে যুবরাজকে বললে—হে মালবে,র যুবরাজ! রাজকন্যা স্বয়ং আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন এবং আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা আমায় দয়া করে বলুন?

বিক্রম রাজকন্যার সৌন্দর্য ও প্রতিভার কথা শুনেছিল। সে মনে মনে চেয়েছিল রাজকন্যাকে বিবাহ করবে। তার রূপরাশি ও বুদ্ধি চাক্ষুষ দেখার জন্য সে চঞ্চল হয়ে উঠল। রাজকন্যা নিজে তার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের খবর নেওয়ায় বিক্রম খুব খুশি হোল। সে ছদ্মবেশী রাজকন্যাকে বললে—আমার যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত পেয়েছি, কোন অসুবিধা নেই। অনুগ্রহ করে রাজকন্যাকে আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন।

বিক্রমের ভদ্রোচিত ব্যবহারে রাজকন্যা মুগ্ধ হোল। রাজপুত্র সম্বন্ধে সে যা শুনেছিল চাক্ষুষ দেখে মনে হোল যেন তার থেকেও কিছু বেশী। সে যুবরাজকে মৃদু হেসে বললে—আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না শুনে রাজকন্যা সবিশেষে প্রীত হবেন। তবে নতুন স্থানে আপনার যাতে একাকী একঘেয়েমী না লাগে তার জন্যে আসুন একটু গল্প করা যাক। আপনার রাজ্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বিক্রম বললে—আমার রাজ্য আপনাদের রাজ্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। তাছাড়া আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পথে বার হয়েছি। তার চেয়ে আপনি কিছু বলুন, শুনে তৃষ্ণা মেটাই।

রাজকন্যা বললে—আমি আপনাকে একটি কাহিনী শোনাতে পারি।

যুবরাজ আগ্রহের সুরে বললে—সে তো ভারী সুন্দর হবে। আপনি শুরু করুন।

ছদ্মবেশী রাজকন্যা তখন গল্প বলতে শুরু করলে :

কিছুদিন আগের কথা। এই শহরে সত্যপ্রিয় ও বিষ্ণু নামে দুই বন্ধু থাকতো। তাদের বন্ধুত্ব ছিল বড় গভীর। একদিন তারা পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোল, তাদের মধ্যে যার প্রথম বিবাহ হবে সে বিবাহের পর প্রথম সপ্তাহ স্ত্রীকে বন্ধুর কাছে রাখবে।

কিছুদিন পর সত্যপ্রিয় প্রথম বিবাহ করলো। কিন্তু বিবাহের দিন থেকেই সে খুব মুষড়ে পড়ল। কেননা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্ত্রীকে এখন এক সপ্তাহের জন্য বন্ধুগৃহে পাঠাতে হয়। স্ত্রী সেকথা জানতে পেরে বললে—হে স্বামিন! তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ান মানুষের পবিত্র কর্তব্য। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। তুমি আমাকে বন্ধুগৃহে প্রেরণ করো। ঈশ্বর মহান্, তিনিই তোমার আমার সম্মান রক্ষা করবেন।

নববধূ উত্তমরূপে সাজসজ্জা করলে। সারা অঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কার পরলে। তারপর স্বামীর বন্ধুর জন্য কিছু ফলমূল ও খাদ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলে।

দুই বন্ধুর গৃহের ব্যবধান ছিল একটি ছোট্ট অরণ্য। হাতে একটি বাতি নিয়ে সে জঙ্গলের পথ ধরলে। ঠিক অরণ্যের মাঝামাঝি সে যখন পৌঁচেছে, তখন কয়েকজন ডাকাত তার পথরোধ করে দাঁড়াল। তারা বধূর মূল্যবান অলঙ্কারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি ফেলে বললে—এখনই তোমার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে দাও। নতুবা আমরা তোমাকে হত্যা করবো।

বধূ তখন হাত জোড় করে কাতরকণ্ঠে বললে—আমি একটি প্রতিশ্রুতি পালন করতে চলেছি। আমি কোনমতেই এ অলঙ্কার তোমাদের দিতে পারি না। তবে কথা দিচ্ছি কাজ শেষ করে ফিরে এলে তোমাদের হাতে আমি সমস্ত অলঙ্কার তুলে দোব।

ডাকাতরা তার কথা বিশ্বাসই করতে চাইল না। অবশেষে বার বার অনুরোধের ফলে তাদের মধ্যে একজন বললে—ঠিক আছে ভাই সব। স্ত্রীলোকটির কথা শুনে মনে হচ্ছে সে কোন কঠিন কর্তব্য করতে চলেছে। আমার মনে হয় ও ফিরে আসবে। তাছাড়া বনে যাতায়াতের পথ মাত্র একটি। ওকে এই পথেই ফিরতে হবে। অতএব আমরা ওর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

ডাকাতরা তাকে পথ ছেড়ে দিল। তারা অন্য শিকারের সন্ধানে চলল। কিছুদূর যাবার পর তারা একটা জনশূন্য বাড়ী দেখতে পেলো। দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতর ঢুকে তারা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেল। এত বিপুল ঐশ্বর্য তারা জীবনে কোনদিন কল্পনা করেনি। ডাকাতরা তখন সেই বধূর উদ্দেশে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলে। তাকে ছেড়ে না দিলে তারা কি এই বিশাল অর্থের সন্ধান পেতো?

'তীক্ষ্ণ ছুরি বার করে তার গলার কাছে খুলে ধরল।' পৃঃ—৪৩০

এদিকে বধূটি বিষ্ণুর বাড়ী গিয়ে হাজির। বিষ্ণু তো তাকে দেখে অবাক! এই রাত্রিকালে একটি সুন্দরী মেয়ে বধূ-বেশে তার দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? সে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল—হে ভগিনী, বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

বধূ সমস্ত সমাচার নিবেদন করে বললে—এখন আমি আপনার।

বিষ্ণু বিস্ময়ে ব্যথিত হোল। হায় রে! কেন তারা সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হয়েছিল। সে তখন আর্দ্রকণ্ঠে বললে—ভগিনী, আমি ইতিমধ্যে তোমায় ঐ নামে ডেকেছি। আমি সত্যপ্রিয়র প্রতিশ্রুতি রক্ষার সাহস দেখে তারিফ করি। সে একজন সৎ ও মহান্ বন্ধু। আমিও তার উপযুক্ত হতে চাই। অতএব হে নারী, তুমি স্বামীগৃহে ফিরে যাও।

বধূ জানতো এই রকমই ঘটবে। সেজন্য সে সাহস করে এই কাজে নেমেছিল। সে বনের পথ ধরে ফিরে চলল। মাঝপথে এসে দেখল, ডাকতরা তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে দেখতে পেয়ে দলপতি সশ্রদ্ধ সুরে বললে—হে ভগিনী, তুমি আমাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছো, তুমি চলে যাওয়ার পর আমরা এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। তাতে আমাদের সারা জীবন চলে যাবে। আমরা তোমার অলঙ্কার চাই না। তুমি নিরাপদে গৃহে ফিরে যাও। আর এই একশত মুদ্রা আমরা তোমাকে দিলাম। এটি তোমার সৎসাহস ও সত্যবাদিতার পুরস্কার।

বধূ স্বামীগৃহে ফিরে বনমধ্যে ও বন্ধুগৃহে যা যা ঘটেছিলো সত্যপ্রিয়কে জানাল। সত্যপ্রিয় শুনে খুব খুশি। সে মনে মনে ভাবল, এমন একটি নারীকে সে বিবাহ করেছে যার সংস্পর্শে এলে মানুষের সৎ প্রবৃত্তিগুলি শতদলের মত বিকশিত হয়।

যুবরাজ বিক্রম গভীর মনোযোগ সহকারে গল্পটি শুনছিল। গল্প শেষ করে ছদ্মবেশী রাজকুমারী যুবরাজকে প্রশ্ন করলো—কাহিনীটি আপনার কেমন লাগল? উপাখ্যানের চরিত্রগুলি কিরূপ?

যুবরাজ বললে—প্রত্যেকের চরিত্র নির্মল হয়ে ফুটে উঠেছে।

তখন রাজকন্যা কৃষকপুত্র রণবীরের কাছে গিয়ে হাজির হোল এবং তাকে অনুরূপ কাহিনী শুনিয়ে তার মতামত প্রার্থনা করল। রণবীরের উত্তর যুবরাজের মতই হোল। ব্রাহ্মণপুত্র দিগম্বর শুনে বললে—বড় সুন্দর কাহিনী। ততোধিক সুন্দর এর চরিত্রগুলি।

অবশেষে রাজকন্যা স্বর্ণকারপুত্র গুলাবের কাছে গেল। গল্পটি শুনে সে বললে—আপনার কাহিনীর পাত্রপাত্রী প্রত্যেকে এক একটি হস্তীমূর্খ। প্রথম মূর্খ সত্যপ্রিয়, সে তার স্ত্রীকে পরপুরুষের হাতে ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় মূর্খ মেয়েটি, পতি-বন্ধুর কাছে স্বচ্ছন্দে নিজেকে সমর্পণ করল। তৃতীয় মূর্খ বিষ্ণু, এমন একটি সুন্দরী মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিল। সর্বশেষ মূর্খ ডাকাতের দল, তারা মেয়েটির ধনযৌবন হেলায় হারাল।

গুলাবের উল্টো ব্যাখ্যা শুনে রাজকন্যা মুহূর্তে বুঝে নিল, এই ব্যক্তিই যুবরাজের ঘড়ি চুরি করেছে। সে তৎক্ষণাৎ কোমর হতে একটি তীক্ষ্ণ ছুরি বার করে তার গলার কাছে খুলে ধরল। বললে—স্বীকার করো তুমি রাজপুত্রের ঘড়ি চুরি করেছো, নতুবা এই ছুরিকা তোমার গলায় বিদ্ধ হবে।

গুলাব তার অপরাধ স্বীকার করল এবং ঘড়িটি রাজকন্যার হাতে ফিরিয়ে দিলে। রাজকন্যা তাকে কথা দিল কাকেও সে চুরির কথা জানাবে না এবং কিছুই ঘটেনি এরূপ ব্যবহারই সে পাবে।

পরদিন প্রাতে রাজকন্যার পরামর্শ অনুযায়ী সম্রাট চার বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন। রাজকন্যা অপহৃত ঘড়িটি যুবরাজের হাতে তুলে দিল।

প্রিয় ঘড়িটি ফিরে পেয়ে বিক্রম অত্যন্ত আনন্দিত হলো। সে রাজকন্যাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললে—হে মহান রাজকুমারী! তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি তুলনাহীন। তুমি এক আশ্চর্য সমস্যার সমাধান করেছো। আমার বন্ধুদের মধ্যে কে এটি অপহরণ করেছে না জেনে আমি ঘড়ি ফেরত পেয়েছি। এ বেশ ভাল হোল। কারো কোন সম্মানহানি হোল না অথচ কার্য সমাধান হয়ে গেল। আমি তোমার সৌন্দর্য ও জ্ঞানের খ্যাতি শুনেছিলাম। তোমাকে চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছা হয়েছিল, তা সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমি আনন্দিত ও সুখী।

রাজকুমারী সলজ্জ মৃদু হেসে বলল—আপনাকে দর্শন করে ও আপনার মধুর ব্যবহারে আমিও সুখী যুবরাজ!

তারপর এক শুভদিনে বিক্রম ও রাজকুমারীর বিবাহ হয়ে গেলো। বিক্রম শুধু ঘড়িই উদ্ধার করল না, তার সাথে লাভ করল এক মূল্যবান সম্পদ—দিল্লীর বিদুষী রাজকুমারী।

এক রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মহারাণীর নিজ হাতে কাজ করতে নেই। দাসদাসীরা সব করে। তবু যেটুকু না করলে নয়,-তাতেই হাঁসফাঁস করে। আধমেলা চোখে ঘুমোয়, আধবোজা চোখে জাগে। দাসীরা মুখ ধোয়ায়, চান করায়। মহারাণী শুধু হাতে মেখে খাবার মুখে তোলে। তা দাঁতে চিবোয়, জিভে নাড়ে, তারপর কোৎ করে গেলে। হজম করে। তা সোজা মেহন্নত নয়! তাছাড়া লাগ কথা কয় ও জাঁককরা শাড়ি সায়া গয়নাগাঁটির বোঝা বয়। এ সবের খাটাখাটুনী কম নয়। দাসীরা আহা আহা করে, আর দু'হাতে হাওয়া চালায়। এত কাজের মধ্যেও সে মহারাজার আহারের সময় কাছে বসে। সুখ-দুঃখের কথা কয়। দাসীরা বলে, বাহারে! মহারাণী কি সেবাই না করে!"

মহারাজা আর আর দিন রাজসভার মজাদার কথা কয়,—আর মহারাণী কয় তার উকুনের কথা, রাজার গুণ-বুদ্ধির কথা। কথা দিয়ে কথার মালা গাঁথা হয়। দু'জনে হেসে লুটোপুটি খায়।

কিন্তু আজ মহারাজা বোলে না, চালে না। সরু চালের ভাত নাড়ে চাড়ে, খায় না। গুমড়ো মুখে বসে থাকে চালকুমড়োর মত। মহারাণী মহারাজাকে হাসাতে চায়। বোকার চালাকী, আর চালাকের বোকামীর কথা কয়ে নিজে হাসে। আর ওদিকে রাজা কাঁদ কাঁদ

মুখে ভাবে, বোকা প্রজারা চালাক রাজাকে কেমন বোকা বানিয়ে দিল! আজ আর তাদের ধোঁকা দিবার জো নেই।

মহারাণীর অভ্যাস কথার মাঝে ভুলে যাওয়া। বলে, "কি বলছিলেন যেন?" মহারাজা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আজ মহারাজা মনে করাতে পারে না। তার মনে প্রজার হাতে সাজার কথা গজ্‌গজ্‌ করে। সে সেকথা বলে। মহারাণী আমল দেয় না। বলে, "প্রজা হবে রাজা? দূর দূর। চিঁড়ে গুড় খেয়ে ওদের অভ্যাস, তারা খাবে কিনা খাজা গজা, লুচি মোণ্ডা,—অবাক কাণ্ড!"

তারপর মজার গল্প শোনায়।—এক যে ছিল প্রজা। সে করল না কি? শ্বশুরবাড়ী গেল। রাত্রে তাকে খাইয়ে এক ঘরে চাটাই পেতে শুতে দিয়েছে। এ পাশে চিঁড়ের হাঁড়ি, আর ওপাশে গুড়ের হাঁড়ি। তাকে আর কে পায়? সারারাত সে এ পাশ ফেরে আর চিঁড়ে খায়, ও পাশ ফেরে আর গুড় খায়। সকাল বেলা দেখে পেট ফুলে ঢোল হয়েছে। এদিকে শাশুড়ী ভালোমন্দ খাবার সাজিয়ে ডাকাডাকি। কিন্তু তখন তার পেটে ঢাক গুড়গুড় বাজছে। সে মুখ ধোবার নাম করে সেই যে গেল, পেটের পুটপাটে একেবারে চম্পট। খাজা গজা পিঠে পায়েস মাথায় থাক, সোজা বাড়ী গিয়ে কোবরেজি পাকের বড়ি!...ব'লে মহারাণীর সে কি হাসি! হাসির রস থাক আর না থাক, প্রজা পালাল তা মস্ত খোশ-খবর। তাই মহারাজাও হাস্‌ল।

মহারাণী ভরসা দিয়ে বললে, "ওরাও এমন করে পালাবে। রাজা হওয়া সোজা কথা!"...

কিন্তু ক'দিন পর মহারাজার কান্না আসে। প্রজার মোড়লরা তক্‌মা-আঁটা ক'জন সরকারি লোকের সঙ্গে এল। তারা মহারাজা, মহাফেজ, আর আমলাদের ডাকে। পুরনো থেকে হাল আমলের কাগজপত্র দেখে জমি মাপজোক শুরু করে।

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "কি হবে?"

তারা জানায়, "রাজা, মহারাজা, প্রজা থাকবে না। সব একাকার হয়ে যাবে। যারা চাষবাস করে, জমি যাবে তাদের খাস দখলে।"

মহারাজা বলে, "বাসরে বাস! রাজাও থাকবে না, প্রজাও থাকবে না,— তা' হলে কি থাকবে?"

উত্তর হয়, "থাকবে মানুষ। আর যারা ফসল ফলাবে তারা হবে জমির মালিক। রাজা হয়ে যাবে তাদের মতনই দেশের লোক।"

মহারাজা বুঝতে পারে না। বলে, "দেশের নোলক?"

ঠাট্টা ভেবে তারা বলে, "হাঁ। খেটে খেলে নোলকের মত শোভা হবে বই কি?"

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "রাজাদের নিয়ে কি করবে?"

উত্তর হয়, "দেশের লোক দিয়ে যা করার তাই—।"

মহারাজা হাঁফ ছাড়ে। বাপ-ঠাকুর্দা থেকে রাজারা প্রজাদের উপর কম জুলুম করেনি। তবু যে প্রজারা বাঘের মত হালুম করে ঘাড় মট্‌কায় না তাই রক্ষে!···

প্রজার মোড়লরা চলে যেতে মহারাজা, মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি, আর মহাকোটালের দিকে চায়, আর ফোৎ ফোৎ করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। ওদের না হয় চাকরি যাবে, কিন্তু মহারাজার যাবে সব। ওরা চাকরি খুঁজে নেবে; কিন্তু মহারাজার সে উপায় নেই। সে শুধু হাত-পা গুটিয়ে আরাম করতে জানে, হাত-পা চালিয়ে পরিশ্রম করতে জানে না। এখন নাকি সবাইকে খেটে খেতে হবে। সব জমি ওরা নেবে না। কিছু থাকবে। তাতে চাষবাস কর, ফসল ফলিয়ে খাও। কিন্তু পরের ফসল জোর করে কেড়েকুড়ে ফলার খাওয়া চলবে না। গরু পোষ, গাওয়া ঘি আর গব্য জিনিস খাও, তার বাঁধা নেই। কিন্তু গায়ে হাওয়া দিয়ে আর বসে বসে চব্যচোষ্য খাবার জো নেই!·· বাবা রে, খেটে খেতে হবে! মহারাজার কান্না পায়। কিন্তু গলা ধরে কাঁদার লোক পায় না।

মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি, মহাকোটাল আর কর্মচারি ছিল। মহারাজার মাথায় হাত বুলিয়ে, তার তোয়াজ করে, আড়ালে লুটেপুটে খেয়েছে। এখানকার খাবারের পাতা ফুরালে অন্য কোথাও পাতা খুঁজে চেটেপুটে খাবে। কিন্তু মহারাজা কি তা পারে? তার মনমেজাজ খিঁচড়ে যায়।

পাঙ্খাদার পাখা নিয়ে আসে। মহারাজা বলে, "শীত লাগে। চলে যাও।"

হুঁকোবরদার আসে। মহারাজা বলে, "খুস্‌খুসে কাশি। চলে যাও।"

নকিব এসে শিঙা ফোঁকে। মহারাজ বলে, "কান ব্যথা। চলে যাও।"

তখন মহামন্ত্রী বলে, "একলার কথা নয়, মহারাজ। সব রাজা-মহারাজার রাজপাট গেল। কিন্তু হাট ভাঙেনি। তা চলবে।"

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "সেখানে সবাই কলামুলো বেচবে?"

মহামন্ত্রী বলে, "কি আর করা মহারাজ? পেটের খিদে মেটাতে হবে তো? ভূমিকম্প আর বন্যা দেখেছেন?"

মহারাজা মাথা নেড়ে বলে, "হুঁ।"

মহামন্ত্রী বলে, "এও তেমি—"

মহারাজা ভয় পেয়ে বলে, "বাঘের ফেউর মত, তাও এল নাকি?"

মহামন্ত্রী বলে, "এল বই কি! কথার কথা বল্‌লেম, মহারাজ। তখন সব ভেঙে, ভেসে তছনছ। বড় ছোট একাকার হয়।"

মহারাজা বলে, "তাই তো। কিন্তু এ যে রাজা-প্রজার কথা। গায়ের বোট্‌কা গন্ধ নিয়ে প্রজারা মহারাজার গা ঘেঁষে দাঁড়াবে।" মহারাজা মুখ ঢেকে ফোঁৎ ফোঁৎ করে ফোঁপায়।

রাজসভা আর জমে না। মহারাজা ডাকে, "মহাপ্রামাণিক!"

মহানাপিত এসে দণ্ডবৎ করে। বলে, "মহারাজা!"

মহারাজা বলে, "মাথা মুড়োতে জান?"

মহানাপিত বলে, "জানি মহারাজ। এই তো ব্যবসা। এ করেই খাই।"

মহারাজা বলে, "পরের মাথা মুড়িয়ে নিজে খাও?"

মহানাপিত বলে, "তাই তো চল্‌ছিল মহারাজ। কিন্তু—"

মহারাজা বলে, "তোমারও হয়ে গেল নাকি?"

মহানাপিত বলে, "হাঁ মহারাজ। শুন্‌ছি পয়সা না দিয়ে নাকি পেন্নাম দিয়ে যাবে।"

মহারাজা বলে, "তা তো কম নয়।"

মহানাপিত বলে, "কিন্তু তাতে তো পেট চলে না।"

মহারাজা বলে, "ঠিক। তা'হলে?"

মহানাপিত মহারাজার কানের কাছে বলে, "সেয়ানে-সেয়ানে মহারাজ। ওদের পেন্নামের আগে পেন্নাম দোব। কাটাকাটি হয়ে যাবে।"

মহারাজা বলে, "পেন্নাম। আমার মাথা মুড়িয়ে দাও।"

মহানাপিত বলে, "আমি কিন্তু আগে পেন্নাম করেছি মহারাজ।"

মহারাজা বলে, "ওহো। আচ্ছা দাও মুড়িয়ে।"

মহানাপিত মাথা মুড়িয়ে বলে, "একটা টিকি রাখলেম মহারাজ। মন্দ দিন কেটে যাবে। শুনেছি সব। কিন্তু বোষ্টমের শত্রু নেই।"

মহারাজা বলে, "ঠিক।"

মহারাজা মাথা নুয়ে বাড়ী ফিরল। নেড়া মাথা দেখে প্রথমে মহারাণী চিনতে পারল না। একগলা ঘোমটা টান্‌ল।

মহারাজা বলল, "আমি! রাজপাট ফুরাল, নটেগাছ মুড়িয়ে দিলেম।"

এবার মহারাণী চিন্‌ল। ঘোমটা ফেলে বলল, "তা'হলে টিকি কেন?"

মহারাজা বলে, "ধরে তোলার জন্য। এলিয়ে না যাই।"

মহারাণী নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "বেশ হ'ল। তেল খরচা কমল। হাওয়ার ঝাপ্টা ঢুকল।"

মহারাজা বললে, "যা গরম লাগত!"

মহারাণী বলে, "কে কামাল? ঘোল ঢালেনি তো?"

মহারাজা বলে, "সে ভয়ে রাজসভায় বসে কামালেম। রাজপাট গেছে, প্রজার সামিল হতে হবে।"

মহারাণী আক্ষেপ করে বলে, "আহা লেঠেল সর্দারের মত ঝাকড়া চুল ছিল গো। তবে গোবর দিলে চুল গজাবে।"

জল্লাদীর নেড়া মাথা, আর আহ্লাদীর বেণী কাটা। তারা দোরের আড়াল থেকে দেখে খুসী। আহ্লাদী ফিক্ ফিক্ করে হাসে,—আর জল্লাদী ফেক্ ফেক্ করে।

মহারাণী ধমক দেয়। আর ওরা পালাতে গিয়ে ঠোকাঠুকি খায়।

খেতে বসে মহারাজা খেতে পারে না। সব খাবার পাতে পড়ে থাকে। খানিক মহারাণী খায়, বাকিটা খায় আহ্লাদী আর জল্লাদী।

জল্লাদী খেতে খেতে বলে, "মাছ, মাংস, মেঠাই মহারাজা খেল লা কেল (খেল না কেন) লা? পেট ফুলেছে?"

আহ্লাদী বলে, "ধেৎ মুখ্যু! বোষ্টম হয়েছে। দেখিস্ নি নেড়া মাথায় টিকি?"

জল্লাদী বলে, "বেশ হ'ল। ওর ভাগের মাছ মাল্স (মাংস) আমরা খাব।"

আহ্লাদী ঠোঁট উল্টে বলে, "সে পাঠই উঠে গেল। প্রাণীহত্যা চলবে নি। ছারপোকা, উকুন, শুঁয়োপোকা, মাকড় কিলবিল করবে।"

শুনে জল্লাদী দু'হাতে মাথা আর গা চুলকায়।

কিন্তু সত্যাই আর মহারাজা নিরামিষ ধরে না। খাবার ঠাট কমিয়ে দেয়। সোনা রুপোর পাত্রের বদলে আস্তে আস্তে কলার পাতায় খায়।

আহ্লাদী আড়ালে বলে, "বলিনি? কলাপাতা ধরেছে। এবার মহারাজা খাবে কুলে আলোচাল, কাঁচকলা। মানকচু পাতায় কিনা কে জানে? মালসায়ও খেতে পারে।"

জল্লাদী গা কুঁচকে বলে, "আয় পালাই—"

আহ্লাদী বলে, "কোথায়?"

জল্লাদী বলে, "মহারাজা বোষ্টম, এ রাজ্যে মাছ মাল্স খতম। চল্ কসাই রাজ্যে চলে যাই।"

আহ্লাদী ভয় দেখায়। বলে, "তোকে খাসী ভেবে যদি জবাই করে?"

তাই তো! জল্লাদী ভয়ে ভয়ে বলে, "কি আর করা? চড়ুই, টিকটিকি ধরে চুরি করে খাব। কেমল (কেমন)?"...

আবার দিন যায় দিন আসে। ধীরে ধীরে প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। রাজবাড়ীর নহবৎ বাজনা বন্ধ হয়। হৈ-হল্লা ডামাডোল ঢিমে হয়। পাত্র-মিত্র, সভাসদ পাখাবরদার, হুঁকোবরদার কালো মুখে আসে। মহারাজাকে প্রণাম করে চলে যায়।

মহামন্ত্রী প্রজার মোড়লদের ডাকে। তারা তলব অমান্য করে না। আসে। এসে দণ্ডবৎও জানায়। কিন্তু আগেকার মত হাত জুড়ে গরুচোরের মত দাঁড়িয়ে থাকে না। পাত্র-মিত্রের খালি আসনে বসে।

মহামন্ত্রী দাড়ি চুলকে খাজনার কথা পাড়ে। মোড়লরা জানায়, "রাজা প্রজা রাজপাটই নেই। তার খাজনা কিসের?"

মহামন্ত্রী ঢোক গিলে বলে, "রাজা মহারাজা হ'ল গিয়ে ভগবান। তোমাদের ধর্মজ্ঞান আছে তো!—"

মোড়লরা বলে, "তাই প্রজাদের নিংড়ে কুড়ে রাজারা এদ্দিন যা নিয়েছে তা কেড়ে নিচ্ছি না। চাষবাসের জমি তাদের অগ্নি অগ্নি দিচ্ছি। ফসল যার, মাটি তার। ভগবান হাতরথ দিয়েছেন খেটে খাবার জন্যি।"

তারা চাঁচাছোলা কথা বলে। আবার দণ্ডবৎ জানিয়ে চলে যায়। দণ্ডবৎ নয়, এ যেন ডাণ্ডাঘাত! কিন্তু কপাল চাপড়ান ছাড়া পথ নেই! বর্গী আসেনি, বুলবুলিতে ধান খায়নি। কোথা থেকে রাজা-প্রজা একাকার করা খাজনা বন্ধের জোয়ার এল? মহারাজা মাথায় হাত দিয়ে ভাবে।

কিন্তু ভেবে মীমাংসা হয় না।

সুদিনে বন্ধু আসে, দুদিনে চলে যায়। পাত্রমিত্র, সভাষদ চলে গেছে। হুতুম পেঁচারও পাত্তা নেই।

ভেবে ভেবে হঠাৎ মহারাজা বলে, "মহামন্ত্রী!"

মহামন্ত্রী বলে, "আজ্ঞে মহারাজ—"

মহারাজা বলে, "ভালই হ'ল—"

মহামন্ত্রী জিজ্ঞেস করে, "কি ভাল হ'ল মহারাজ?"

মহারাজ বলে, "এই যে বোঝা কমল। রাজত্ব, রাজপাট, প্রজা এ কি সোজা বোঝা ছিল? তারপর ধর গিয়ে মুকুটের বোঝা, মাথার বোঝা, মগজের বোঝা, চুলের বোঝা, কথার বোঝা! সব বোঝা নামল,—বাঁচা গেল।"

মহামন্ত্রী বলে, "ঠিক।"

মহারাজা হাত বাড়িয়ে বলে, "ধর—"

মহামন্ত্রী রাজার হাত ধরতে এগিয়ে আসে। মহারাজা বলে, "উঁহু, ওখানে বসেই কর গুণে ধর।"

মহারাজা বলে, "ধর,—প্রজা শাসন করবে, খাজনা আদায় করবে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবে। সব চুকেবুকে গেল, ব্যস্।" তারপর হঠাৎ ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

মহামন্ত্রী জিজ্ঞেস করে, "হাসলেন কেন মহারাজ?"

মহারাজা বলে, "কেন হাসলেন? নিজের বুদ্ধি দেখে। আগেভাগে মাথা মুড়িয়েছি। প্রজারা চুল ধরতে পারবে না। হুঁকোবরদার—"

মহামন্ত্রী মনে করিয়ে দেয়, তাকে বিদায় করা হয়েছে। তখন মহারাজার মনে পড়ে। বলে, "আমার বুদ্ধি আছে।" মহারাজা থলে থেকে থেলো হুঁকো, তামাক, টিকে, কল্কে আর নল বার করে। নিজ হাতে সেজে তামাক টানে। বলে, "এবার কড়া তামাক। কিন্তু নিজের বুদ্ধির পুরস্কার কি করে দি। তামাকের ধোঁয়া ফুঁ করে মুখে দিতে হবে তো।"

ওরা বুঝল মহারাজা নিজেই নিজেকে পুরস্কার দেবে। মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি আর মহাকোটাল এগিয়ে আসে। নানা কসরৎ করে পারে না। তখন নল কেটে তার খানিক রাখে মহারাজার মুখের বাইরে, খানিক ভেতরে। বলে, "টেনে খানিক ধোঁয়া বাইরের নলে ফুঁ করে দিন। ঠিক মুখে যাবে।"

মহারাজা চেষ্টা করে, কিন্তু নল গলায় যায়, আর মহারাজা ওয়াক্ করে ওঠে। অবশেষে নিজের ধোঁয়া নিজের মুখে একটু যায়। আর ওরা জয়ধ্বনি করে, "জয়, মহারাজার জয়।"

তা করে বটে। কিন্তু ক'দিন পর মহাসেনাপতি গোঁফ নাবিয়ে বলে, "মহারাজ—"

মহারাজা বলে, "কি?"

মহাসেনাপতি বলে, "ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?"

মহারাজা বলে, "নির্ভয়ে বল—"

মহাসেনাপতি বলে, "লড়াই নেই, দিগ্বিজয় নেই। তলোয়ারে মরচে ধরেছে। তা যেমন তেমন। প্রজারা খাজনা দেয় না। মাইনে বন্ধ। দিন চলে না। কোথাও রুজিরোজগারে যাব,—নৈলে কি খাব?"

সে তলোয়ার মহারাজার পায়ের কাছে রাখে। তারপর দণ্ডবৎ করে চলে যায়।

মহাকোটালও তাই করে।

মহারাজা ছল্‌ছল্‌ চোখে চেয়ে দেখে। তারপর মহামন্ত্রীকে বলে, "তুমি কি করবে মহামন্ত্রী ?"

মহামন্ত্রী বলে, "মহারাজ, ওরা জোয়ান। বিদেশে খেটেখুটে যা হ'ক কামাই করবে। আমার বয়েস হয়েছে। রোগাপটকা শরীর। পারব না। যা জমিজমা আছে, প্রজার সঙ্গে মিলেমিশে চাষবাস করব। দেশেই যখন আছি, আপনাকে ছাড়ব না।" মহারাজা খুশি হয়ে তার মুখে একরাশ ধোঁয়া দেয়।

এরপর মহারাজা আর মহামন্ত্রী দু'জনে রাজসভা করে। লোকজন, জমাদার, ঝাড়ুদার নেই। দরবার ঘর ধুলো আর জঞ্জালে নোংরা হয়ে ওঠে। পিঁপড়ে, আরশুলা, পোকামাকড়, মাছি, টিকটিকি, ছুঁচো, চামচিকে আসর জমায়।

মহারাজা তা দেখে বলে, "প্রজা।"

এখন হুতুম পেঁচা চলে যেতে কোথা থেকে একজোড়া ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী এসে তার খোঁড়লে বাসা বেঁধেছিল। তারা দুটিতে কথা কয়। আর তাদের কথা হঠাৎ মহারাজা বোঝে। বোঝা কমেছে বলে সোজা মনে হয়। (ক্রমশঃ)

॥ উলটো ছবি

শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী যাবার ট্রেনটি গেল হাওড়া ছেড়ে যখন।
প্লাটফর্মে হাজির যাঁরা দেখতে পেলেন তখন ॥
নাক ফুঁপিয়ে একটি মেয়ে
কাঁদছে ট্রেনের দিকে চেয়ে
কি হয়েছে জানতে কাজেই এগিয়ে সবাই এলেন।
একলা মেয়ে কাঁদছে দেখে দুঃখু বড় পেলেন ॥

বুঝিয়ে তারে বলেন সবাই—কান্না এতো কিসের।
আমরাও তো বিদায় দিলাম মোদের মেসো-পিসের ॥
এম্নি তো যায় যাবার যারা
মেয়েটি কয় : কেঁদে সারা—
ওরাই যে ছাই এসেছিল বিদায় দিতে আমায়।
চাপল কিনা ওরাই ট্রেনে ভিড়ের হাংগামায় !

গাছের পাতা ঝরে যায় কেন

শ্রীঅসীমরঞ্জন পুরকায়েত

শীত এসে গেছে, তাই গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে। যারা গ্রামে বাস কর, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়। কিন্তু যারা শহরে থাক, তারা হয়ত লক্ষ্য করনি ব্যাপারটা। তাই যারা শহরবাসী, তারা যদি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশেষ উৎসুক হও, তবে শীতের সময় একবার চলে যাও হয় ইডেন গার্ডেনে, নয় বোটানিক্যাল গার্ডেনে। দেখবে গাছগুলো কেমন বিবর্ণ ও শ্রীহীন হয়ে গেছে। আর গাছগুলোর গোড়ার দিকে যদি একবার লক্ষ্য করে দেখ, দেখবে কত পাতা ঝরে গিয়ে ধূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এমনও অনেক গাছ দেখতে পাবে, যাদের পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথম দেখায় তোমাদের মনে হবে যে, গাছগুলো বোধহয় মরেই গেছে। আসলে কিন্তু কোনও গাছই মরে না। বসন্ত আসার সংগে সংগেই আবার গাছগুলো নবপল্লবে পল্লবিত হয়ে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, শীতকালে গাছের পাতা বেশি ঝরে যায় কেন? আর অন্য সময় তো এমন ঝরে যায় না। আর গাছের পাতা ঝরে গেলে গাছের কি আঘাত লাগে বা কষ্ট হয়? বিজ্ঞান এর উত্তর দিয়েছে। উত্তরটা কি জানা যাক এবার।

তোমরা প্রায় সকলেই জান যে, গাছ তার পাতার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়—অর্থাৎ বাতাস থেকে অক্‌সিজেন্ গ্রহণ এবং কার্বন্-ডাই-অক্‌সাইড ত্যাগ করে। এছাড়া কিন্তু পাতার আরো দুটো কাজ আছে। প্রথমটা হ'ল—'সালোক-সংশ্লেষ', অর্থাৎ সূর্যকিরণের সাহায্যে কার্বন্-ডাই-অক্‌সাইড উৎপন্ন করা ও জল থেকে খাদ্য প্রস্তুত করা। আর দ্বিতীয়টা হ'ল—'বাষ্পমোচন', অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পত্ররন্ধ্র দিয়ে বের করে দেওয়া। গাছের পাতা ঝরার ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হলে আগে আমাদের জেনে নিতে হবে পাতার ঐ 'বাষ্পমোচন' কাজটি।

মাটির মধ্যে যে সব খনিজ পদার্থ মিশে থাকে, তাদের আমরা বলি অজৈব লবণ। এগুলো গাছের উপাদেয় খাদ্য। গাছ মাটি থেকে অজৈব লবণগুলো কখনও কঠিন আকারে গ্রহণ করতে পারে না। এ সব লবণ মাটি ভিজে গেলে জলের সংগে দ্রবীভূত হয় না। যেগুলো হয় না সেগুলোর জন্য গাছকে চিন্তা করতে হয় না। গাছেরা মূল দিয়েও শ্বাসকার্য সাধিত করে। মূলের শ্বাসক্রিয়ার ফলে যে কার্বন্-ডাই-অক্‌সাইড্ উৎপন্ন হয়, তা জলের সংগে মিশে 'কার্বনিক্ অ্যাসিড' নামক এক অ্যাসিডে পরিণত হয়। যে সব লবণ সাধারণ জলে দ্রবীভূত হয় না, সেগুলোর প্রায় সবই এই কার্বনিক্ অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়। গাছেরা মূলরোম দিয়ে যে প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে এইসব অজৈব লবণ মিশ্রিত জল গ্রহণ করে, তাকে

বলে 'অস্‌মোসিস্'। 'অস্‌মোসিস্' প্রক্রিয়ায় গাছ মাটি থেকে যে জল গ্রহণ করে তা' অত্যন্ত লঘু, কারণ এতে সামান্য পরিমাণ অজৈব লবণ দ্রবীভূত থাকে। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে অজৈব লবণ পাবার জন্যে গাছকে অনেক জল শোষণ করতে হয়। কিন্তু এত জল গাছের আবশ্যক হয় না। গাছ প্রয়োজন মত সামান্য জল রেখে দিয়ে অধিকাংশ জল পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাষ্পাকারে বের করে দেয়। একেই বলে 'বাষ্পমোচন' বা 'ট্রান্‌স্‌পিরেশান্'। এখানে একটা কথা বলে দেওয়া দরকার যে, বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবন (ইভাপোরেশান্) এক ব্যাপার নয়। কোনও পাত্রে জলকে ফুটালে বা গরমের ফলে তরল যে পদ্ধতিতে বাষ্পে পরিণত হয়, তাকে বলা হয়—বাষ্পীভবন। আর যদি এ দুটো ব্যাপার একই হতো, তবে একই সময়ে সম পরিমাণ জল সমান ক্ষেত্রফলের জলতল ও গাছের সজীব তল থেকে উত্থিত হতো। দেখা গেছে, নির্দিষ্ট সময়ে গাছের সজীব তলের ক্ষেত্রফল হতে যে পরিমাণে জলের বাষ্পমোচন হয়, তা' সমান ক্ষেত্রফলের জলতল হতে বাষ্পীভবন অপেক্ষা কম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বাষ্পমোচন, বাষ্পীভবনের রূপান্তর মাত্র।

বাষ্পমোচন পাতার উপর ও নীচের দু'পিঠ থেকেই হয়ে থাকে। পাতার উপরের পিঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ থেকে বেশী বাষ্পমোচন হয়। পত্ররন্ধ্র ব্যতীত ত্বকের ভিতর দিয়েও বাষ্পমোচন হয়। এ প্রকার বাষ্পমোচনকে বলা হয় 'ত্বাচ্ বাষ্পমোচন'। সাধারণতঃ ত্বক অপেকা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বেশী বাষ্পমোচন হয়; তবে যে সব গাছ ছায়াযুক্ত বা আর্দ্রভূমিতে থাকে, তাদের বাষ্পমোচন প্রধানতঃ ত্বকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং গাছকে বেঁচে থাকার জন্যে বাষ্পমোচনের আবশ্যকতা আছে এবং এই আবশ্যকতাকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:—(১) গাছের মূলরোম দ্বারা শোষিত অতিরিক্ত জল দেহ থেকে বের করে দেওয়া। (২) মূল থেকে পাতায় আংশিকভাবে রস চালনা করা। (৩) উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের গাছকে শীতল রাখা। (৪) খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য অবিরাম অজৈব লবণ পাতায় সরবরাহ করা। এবার দেখা যাক বাষ্পমোচন কোন কোন জিনিসের উপর নির্ভর করে।

বাষ্পমোচন সাধারণতঃ ছ'টা জিনিসের উপর নির্ভরশীল। যথা:—(১) আলোক বেশী হলে বাষ্পমোচনও বেশী হয়। কারণ, পত্ররন্ধ্র খুলতে ও বন্ধ করতে আলোর প্রভাব যথেষ্ট আছে। (২) বায়ুর আর্দ্রতা—বায়ুর আর্দ্রতা যত বেশী বা কম হবে, বাষ্পমোচন তত কম বা বেশী হবে। (৩) বায়ুর উষ্ণতা—বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস ও বৃদ্ধির সংগে সংগে বাষ্পমোচনেরও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। কারণ, বায়ুর উষ্ণতা যত বাড়বে, বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাও তত বাড়বে। ফলে বাষ্পমোচন বেশী হবে। এরূপে উষ্ণতা যত কমবে বাষ্পমোচন তত কম হবে। (৪) বায়ুর চাপ ও (৫) বায়ুর প্রবাহ—বায়ুর চাপ ও প্রবাহ বাড়লে বাষ্পমোচন কমবে ও বাড়বে যথাক্রমে। (৬) মৃত্তিকা—বাষ্পমোচন পরোক্ষভাবে মাটির তাপের উপর নির্ভরশীল। কারণ, শোষণ-ক্রিয়ার

উপর এর প্রভাব আছে। মাটির জল ধরে রাখবার ক্ষমতা যত বাড়বে বাষ্পমোচন তত বাড়বে।

রাত্রিকালে বাষ্পমোচন বন্ধ থাকে, কিন্তু মূলরোম মাটি থেকে ক্রমাগত জল শোষণ করে। তখন অতিরিক্ত জল পাতার আগা বা কিনারায় অবস্থিত 'জলক্ষারী গ্রন্থি' থেকে তরল অবস্থায় বের হয়। একে বলে 'নিস্রাবণ'। এই নিস্রাবণের ফলে যে জল বের হয়, তা' অনেক সময় পরিষ্কার হয় না।

শীত পড়তে শুরু করলে, চারদিকের বায়ুমণ্ডলও শুষ্ক হতে শুরু করে। তার কারণ, শীতকালে বায়ু উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। উত্তরে হিমালয়ের হিমশীতল বায়ু কোনও সাগর বা মহাসাগরের উপর দিয়ে আসবার সুযোগ পায় না, কারণ আমাদের দক্ষিণেই তো সাগর আর মহাসাগরের রাজ্য। সেজন্য শীতকালে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ খুব কম থাকে। এই বিশুষ্ক বায়ু যেখানে যেটুকু জল পায়, সব টেনে নেবার চেষ্টা করে। ফলে মাটির কোমলতা নষ্ট হয়ে গিয়ে শক্ত ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। এমন কি এই শুষ্ক বায়ুর প্রভাবে আমাদের শরীর, ঠোঁট-মুখ ফাটতে আরম্ভ করে। মাটি নীরস ও শক্ত হয়ে যাবার ফলে গাছ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় রস শোষণ করতে পারে না। কিন্তু বাষ্পমোচন সমানভাবে চলতে থাকে। কারণ, আমরা জেনেছি বেঁচে থাকবার জন্য গাছের বাষ্পমোচনের আবশ্যকতা আছে। আবার অন্যকালের তুলনায় শীতকালে বায়ুর আর্দ্রতা ও উষ্ণতা কম থাকে। তার জন্য বাষ্পমোচনের মাত্রাও বেড়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শীতকালে একদিকে যেমন গাছ মাটি থেকে প্রয়োজনের কম জল পায়, তেমনি অপর দিকে বাষ্পমোচন বেড়ে যাবার ফলে, জলের অপচয়ও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে গাছকে চেষ্টা করতে হয় বাষ্পমোচন কমানোর জন্য। আর এজন্যেই গাছ বাষ্পমোচনের প্রধান উৎস কিছু পাতা ঝরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, গাছ এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়।

শীত পড়ার সংগে সংগে পাতার বৃন্ত ও গাছের প্রশাখার মধ্যে কোষের (সেল্) একটা দ্বৈতস্তর সৃষ্টি হতে থাকে। এই স্তরকে বলে পৃথকীকরণ স্তর। যতই এই স্তরটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে থাকে, ততই প্রশাখা থেকে রস পাতার মধ্যে কম যেতে থাকে, ফলে পাতাগুলো ক্রমশঃ নিস্তেজ ও বিবর্ণ হতে থাকে। যখন স্তরটির গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন প্রশাখা ও পাতার বৃন্তের মধ্যে বন্ধন খুব আলগা হয়ে যায়। তার ফলে একটু জোরে বাতাস বইলে বা শিশির লেগে পাতা ভারী হয়ে গেলে, পাতা ঝরতে শুরু করে।

এমন অনেক গাছ আছে, যাদের পাতা চিরসবুজ ও চিরসতেজ। এসব গাছ এমন জায়গায় বাস করে, যেখানে মাটি সব সময় প্রায় নরম থাকে অথ বা মূলগুলো এমন যে অনেক পরিমাণে জল মাটি থেকে সব সময়ই গ্রহণ করতে পারে। কাজেই কোন্ গাছের পাতা কি পরিমাণে ঝরে যাবে, সে সবই সেই গাছের উপর নির্ভরশীল। তোমরা শুনে বিস্মিত হবে যে, সাহারা মরুভূমিতে এক ধরনের গাছ আছে যারা চিরসবুজ।

শীতের মত গ্রীষ্মেও গাছের পাতা কিছু পরিমাণে ঝরে যায়। কারণ, তখন প্রচণ্ড গরমের জন্য গাছেদের বাষ্পমোচন বেড়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঝরিয়ে দেবার কাজটা গাছ নিজে থেকেই সম্পন্ন করে; আর সেইজন্যই পাতা ঝরে গেলে গাছের কোনও আঘাত লাগে না।

সরোখেল

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

কোন কোন ব্রাহ্মণের পদবী সরোখেল দেখা যায়। আবার ইতর পশু শ্রেণীর মধ্যেও সরোখেল নামে একটা জাতি আছে। এই সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলব। চলতি কথায় সরোখেলকে সারকেল, সড়েল ইত্যাদি বলে। যশোর, খুল্‌না, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি জেলাসমূহে এই জানোয়ার দেখা যায়। সরোখেল রাতে চরে। দিনের বেলায় গাছের গর্তে বা সুবিধামত ডালে ঘুমোয়। রোদ সহ্য করতে পারে না, ঝড় বৃষ্টিও না। সূর্যি ডুবে গেলে যখন আঁধার ঘনিয়ে আসে, তখন সে জাগে এবং নিজের থাকবার জায়গা থেকে দূরে একটা গাছে পায়খানা ক'রে, প্রস্রাব ক'রে। সেই তরল পদার্থ অন্ধকারে জলজল করে। মানুষ অনেক সময় পেত্নীর প্রস্রাব ব'লে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ওঠে। সরোখেল এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায় ডাল ধ'রে ধ'রে। তাতে ডালে ঝাকুনি লাগে। যারা না বোঝে তারা বলে ভুতুড়ে কাণ্ড।

বাতাস থেকে গন্ধ নেবার ক্ষমতা সরোখেলের খুব বেশি। তাই সে বুঝতে পারে কোথায় গাছে কাঁঠাল পেকে রয়েছে, আম পেকে রয়েছে, পেয়ারা পেকে রয়েছে। সাধারণতঃ গাছ-পাকা মিষ্টি ফলই তার খাদ্য, অন্য কিছু সে খায় না। কাঁটাওয়ালা গাছে সে ওঠে না। যে ফলে তার নখ বা দাঁত বেঁধাতে না পারে, তার ধারেও সে ঘেষে না—যেমন নারকেল, বেল ইত্যাদি। সরোখেল কিন্তু অধিক খায় না। পেট ভরে গেলে খাওয়া ছেড়ে দেয়। বাগানে পাকা ফলের অভাব হলে মানুষের ক্ষেতে ঢুকে শশা খায়, ফুটি খায়, তরমুজ খায়, কাঁকুড় খায়, আক্ চিবিয়ে রস খায়। খেজুর গাছে চ'ড়ে রস চেটে চেটে খায়। গেরস্তের বাড়িতে গিয়ে হাস-মুরগী চুরি করে। ঘরে যদি যেতে পারে তবে গন্ধ শুঁকে শুঁকে গুড় খায়, পাকা কলা খায়, কড়া থেকে দুধ খায়, পিঠে খায়।

সরোখেলরা কিন্তু খিদের সময় খাবার না জোটাতে পারলে গাছের ডালে ব'সে মানুষের স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। পেত্নীর কান্না ব'লে অনেক মা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভয় দেখান। শব্দ লক্ষ্য করে ঢিল মারলে কান্না থামিয়ে সে চলে যায়।

মন খুশি থাকলে সরোখেল বাঁশগাছে চ'ড়ে দোল খায়। বাঁশগাছতলা দিয়ে যাবার সময় মানুষ বাঁশের চাপে ভূতের কাণ্ড মনে করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে এমনও দেখা গেছে।

মেঘ ডাকার সময় বা দারুণ ঝড়জলের মধ্যে সরোখেল বাসা থেকে বের হয় না। তখন সে তার খিদে সহ্য করবার শক্তি পায়।

এই জানোয়ার আকারে বন-বেড়ালের মত সারা গাটা সাদা লোমে ঢাকা। এর মধ্যে কালো কালো ডোরা আছে। লোমে কিন্তু তেল জাতীয় পদার্থ নেই। সে কারণ জলে ভিজলে তার কষ্ট হয়। এদের দাঁত খুব ধারালো তবে ছোট। পায়ের নখও বেড়ালের মত। ইচ্ছা মত বের করে আবার ভেতরে ঢোকায়। লেজের লোমগুলি খাটো খাটো। রাতের আঁধারে এর চোখও জ্বলে।

এখন গ্রামাঞ্চলের বাগান পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে। সরোখেলরাও দূরে সরে যাচ্ছে। সে জন্য ভূত-পেত্নীর ভয়ও ক'মে যাচ্ছে।

সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিরা সরোখেলের মাংস খায়। দিনের বেলায় বনে-জঙ্গলে বাগানে ঘুরে তারা এই জানোয়ার শিকার করে।

আজকাল সরোখেলের চামড়ায় ব্যাগ হচ্ছে, জুতো হচ্ছে। বসবার আসনও হচ্ছে। হাড়ে হচ্ছে ছুরির বাঁট, বোতাম প্রভৃতি।

বিচিত্র-সংবাদ

.........সন্ধানী

চাষার ছেলে থেকে রাজা

বহুকাল পূর্বে জার্মানীর হামবুর্গ অঞ্চলে প্রথা ছিল যে, পরিবারের বড় ছেলে জোত-জমির অধিকারী হবে আর ছোট ছেলে নাবিক হয়ে সমুদ্রযাত্রা করবে। সেই রীতি অনুসারে মেয়ার পরিবারের বড় ছেলে থাইস বাপের জোতজমির অধিকারী হ'ল আর ছোট ছেলে হিনরিষ মাত্র পনের বছর বয়সে নাবিক হিসেবে জাহাজে যোগ দিল।

কিছুদিন বাদেই খবর এলো দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজ ডুবে হিনরিষ সমেত সব নাবিক মারা গেছে। এই ঘটনার অনেক বছর বাদে কোন এক জার্মান মানোয়ারি জাহাজের কয়েকজন নাবিক দক্ষিণ সমুদ্রের "ক্রওশিপ" দ্বীপে নেমে দেখে যে কয়েকটি ছেলে বালিতে "মেয়ার" এই নাম লিখছে। অবাক হয়ে তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই সাড়ে ছ' ফুট দীর্ঘ এক সাদা মানুষ বেরিয়ে এসে জার্মান ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা শুরু করলে। পরে জানা গেলো সেই লোকটিই হিনরিষ মেয়ার। প্রাণে বেঁচে সে এই দ্বীপে এসে ওঠে এবং তার সুন্দর চেহারা দেখে গ্রামের মোড়ল তার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়। মোড়লের মৃত্যুর পর সে প্রথম জর্জ নাম নিয়ে দ্বীপের রাজা হয়ে বসে। কাছাকাছি দ্বীপগুলিকেও সে জয় করে নেয়। এইসব দ্বীপগুলিকে একত্রে বলা হয় টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ। কয়েক সপ্তাহ আগে প্রথম জর্জের প্রপৌত্র তৌফা আহাউস তুবো চতুর্থ এই নামে টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিল।

চোর থেকে সাহিত্যিক

কার্ল-হাইঞ্জ ইয়েগার ও তার গুণ্ডার দল পোস্ট অফিস থেকে যখন আশি হাজার মার্ক চুরি করে, তখন তার বয়স প্রায় সাতাশ। ইয়েগার ধরা পড়ে ও আদালতের বিচারে তার বারো বছর জেল হয়। ঘটনাটি ঘটে জার্মানীতে।

জেলে বসে বসে সে টয়লেট পেপারে "দি ফোরটরেস" নামে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলে এবং জেলের একজন যাজক সেই পাণ্ডুলিপিটি বাইরে নিয়ে এসে ছাপিয়ে ফেলেন। ১৯৬৩ সালে ইয়েগার জেল থেকে মুক্তি পাবার আগেই বাজারে বইটার খুব নামডাক হয়।

মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে ইয়েগার ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজ নেয় ও জজসাহেবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেলে। এরপর ইয়েগার আরও অনেক বই লিখেছে ও তা থেকে প্রচুর পয়সা রোজগার করেছে।

ইতিমধ্যে ইয়েগার বই লেখার পয়সা দিয়ে পোস্ট অফিসের আশি হাজার মার্ক দেনার বেশিরভাগ শোধ করেছে, কিন্তু ডাকবিভাগ বলছে যে, তাকে সুদে-আসলে একলক্ষ দশহাজার মার্ক দিতে হবে। ইয়েগার অবশ্য সুদটা মকুব করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। সরকার তাকে রেহাই দেবেন কিনা সন্দেহ। যাই হোক চুরির বদনামের জন্যে লেখক হিসেবে ইয়েগারের খ্যাতি এতোটুকু ক্ষুন্ন হয়নি।

ঘোড়ার আস্তানা

শিল্পসমৃদ্ধ রুর জেলায় ডিউক অফ ক্রয়ের জমিদারিতে পাঁচ হাজার একর বিস্তৃত এক বনাঞ্চলে বুনো ঘোড়াদের নিজস্ব একটি রাজ্য আছে। প্রতি বছর এই ঘোড়ার পাল
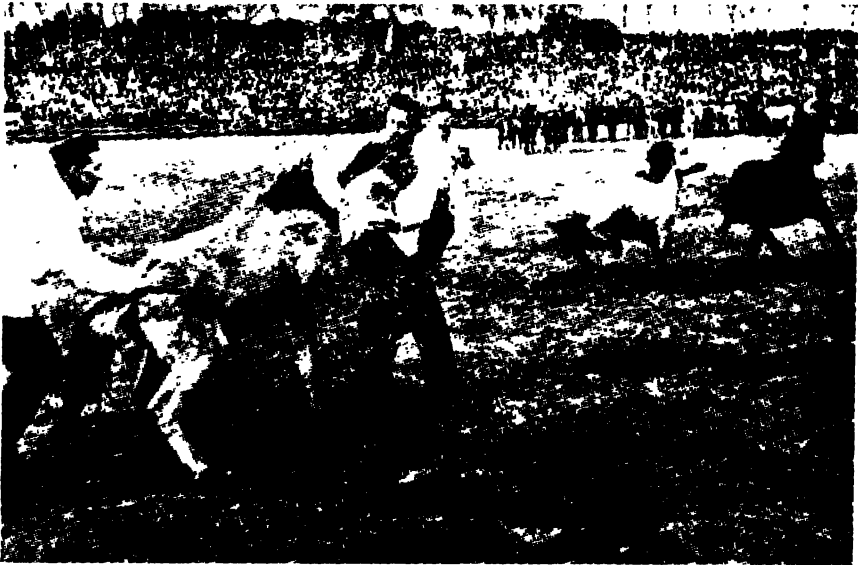
থেকে বাচ্চাগুলোকে ধ'রে ডিউকের ছাপ মেরে বিক্রি করা হয়। এক একটা ঘোড়া থেকে ডিউকের আয় হয় প্রায় ৬০০ মার্ক (১ মার্ক=২ টাকা)। শোনা যায় এই ঘোড়াগুলো বংশপরম্পরায় এখানে ৮০০ বছর ধ'রে রয়েছে।

"রূপকথার রাজার" স্মৃতিস্তম্ভ

এগারো বছর ধ'রে আর্থিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বহু বাধাবিপত্তি কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত "রূপকথার রাজা" দ্বিতীয় লুর্ডভিকের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। শক্তিশালী রাজা বলেই নয়, একজন অবাস্তব কল্পনাবিলাসী ও শিল্পানুরাগী হিসেবেই তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন। ইউরোপের সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে মিউনিখের যে নাম, এ কেবল তার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। মস্তিষ্ক বিকৃতির দরুন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। এর কিছুদিন পরেই এক রহস্যপূর্ণ অবস্থায় ৪১ বছর বয়সে স্টার্ণবের্গ হ্রদের জলে ডুবে তিনি মারা যান।

গুঁড়ো করার অদ্ভুত যন্ত্র

সম্প্রতি আমেরিকায় এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেটি ঘণ্টায় ১০০টি পুরনো মোটর গাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে, তা থেকে স্ক্রেফ্ লোহার অংশগুলিকে পৃথক করে ফেলতে পারে।

মেঠুড়ে
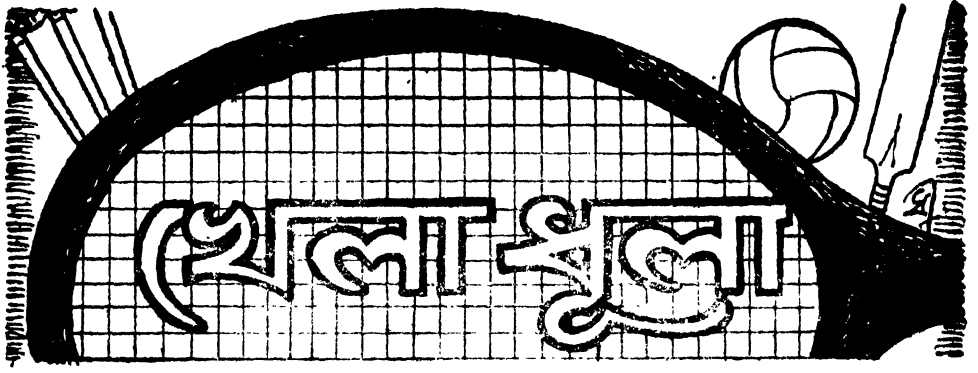
বিশ্ব ফ্রিস্টাইল কুস্তি প্রতিযোগিতায়—প্রতিযোগী আলেকজাণ্ডার মেডভিড (রাশিয়া)

স্বপ্না মিত্র

সম্প্রতি দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বিশ্ব মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। উদ্বোধনের দিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক উদয়চাঁদ সপ্তদশ বিশ্ব কুস্তির আমন্ত্রক দেশ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিশ্বের কুড়িটা প্রতিযোগী দেশের পক্ষে শপথ গ্রহণ করেন।

কুস্তি সর্বঅঙ্গের সুচারু কলাকৌশলের লড়াই। অন্য দেশের মতন কুস্তিতে ভারতও ঐতিহ্যের অধিকারী। ভারতের বর্তমানকালের মল্লরা রাশিয়ান গেমস বা অন্যান্য কুস্তির আসর থেকে কিছু কিছু পদক পেলেও একথা অনস্বীকার্য যে, কুস্তিতে ভারতের গৌরব প্রায় অস্তমিত। দিল্লিতে সদ্য শেষ হওয়া বিশ্ব প্রতিযোগিতাতে সে-কথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আটটা বিভাগের ভেতর ভারতীয় মল্লরা একটা স্বর্ণ পদকও পাননি। শুধু ব্যাণ্টম ওয়েটে বিশ্বম্ভর পেয়েছেন একটা রৌপ্য পদক।

এই প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ও জাপান দল সবচেয়ে সুনাম পেয়েছে। রাশিয়ান দলের তিনজন স্বর্ণ ও চারজন রৌপ্য পদক এবং জাপান দলের ছ'-জন স্বর্ণ পদক ও একজন ব্রোঞ্জ পদক পান। প্রথম তিনটে স্থানাধিকারী দেশের পয়েন্ট সংখ্যা: রাশিয়া ৪১, জাপান ২২ ও ইরান ১৭।

স্বপ্না মিত্রের। প্রথম অভিযানেই 'পথিকৃৎ' সংস্থার মহিলারা জয় করেছেন উনিশ হাজার আটশো তিরানব্বুই ফুট উঁচু রোন্টি গিরিশিখর, কিন্তু শীর্ষে আরোহণের কৃতিত্ব একা স্বপ্না মিত্রের, অবশ্য দু'জন শেরপার সঙ্গে। এই অভিযান প্রসঙ্গে স্বপ্না মিত্র যা বলেছেন তারই কয়েকটা লাইন তোমাদের কাছে বলছি:

"তারপর অতি সন্তর্পণে একটু একটু করে পথ চলা। প্রতি মুহূর্তে পা ফসকে পড়ে যাবার আশঙ্কা। প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হবার ভয়। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও ভাবতে পারছি না শিখরে পৌঁছতে পারব। আবার এই বলে মনে বল আনছি, পৌঁছতে না পারলে ফিরেও আসব না। হঠাৎ পাসাং-এর বাজখাঁই গলার আওয়াজ 'পুকেয়ো, পুকেয়ো'; অর্থাৎ পৌঁছে গেছি, পৌঁছে গেছি। তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

বললাম, পাসাং সত্যি? হ্যাঁ দিদি, এই তো পীক—ও বলল। দা তেনজিং নাচতে আরম্ভ করল। আমার চোখ দিয়েও দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল সাফল্যের আনন্দে।"

ফুটবল

দিল্লির মাঠে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সেরা স্কুল ফুটবল দলগুলো জড়ো হয়েছিল সুব্রত কাপ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। প্রায় পনেরো দিন প্রতিযোগিতা চলার পর শেষে পারদর্শিতার নিকষে অপরাজিত থেকে কার নিকোবর স্কুলের ছাত্ররা সুব্রত কাপ তাদের ঘরে নিয়ে যায়। কার নিকোবর স্কুল দল এবার নিয়ে পরপর দু'বার সুব্রত কাপ বিজয়ী হ'ল।

কার নিকোবর স্কুল শেষ পর্যায়ের খেলায় কোহিমা গভর্ণমেণ্ট স্কুল দলকে ৩—১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দেয়। সেমি-ফাইনাল ধাপে কোহিমা গভর্ণমেণ্ট স্কুল দল গত বছরের রাণার্স আপ জলন্ধরের স্টেট স্পোর্টস স্কুলকে ৩—০ গোলে হারিয়ে দেয়। অন্য দিকে সেমি-ফাইনালে মাত্র এক গোলের ব্যবধানে কালিম্পং স্কটিশ ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট স্কুল দলকে হারিয়ে কার নিকোবর স্কুল দল ফাইনালে ওঠে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের ক্রিকেট টিম

অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেষ্ট খেলতে ভারতীয় টিম যে অষ্ট্রেলিয়ায় গেছে তা তোমরা সকলেই জান। তার সঙ্গে এ কথাও সম্ভবতঃ তোমাদের জানতে বাকী নেই যে, টেষ্ট ছাড়া অন্য যে দু'তিনটি খেলা হয়েছে, তাতে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শোচনীয়ভাবে ইনিংস পরাজয়ে পরাজিত হতে হয়েছে। ক্রিকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বা অষ্ট্রেলিয়ার খেলার মান যে খুবই উচ্চ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ খেলাগুলিতে ভারতের এ ধরণের পরাজয় দেখে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং টেষ্ট খেলার ফলাফলও অত্যন্ত শোচনীয় হবে বলে অনুমান করছেন। এ পর্যন্ত ভারতীয় দলের একটি মাত্র খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে নিদারুণ বৃষ্টির জন্য। সে খেলাটি হয় অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া দলের সঙ্গে। কথা আছে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হবে ২৩শে ডিসেম্বর এবং অপরটি হবে ৩০শে ডিসেম্বর।
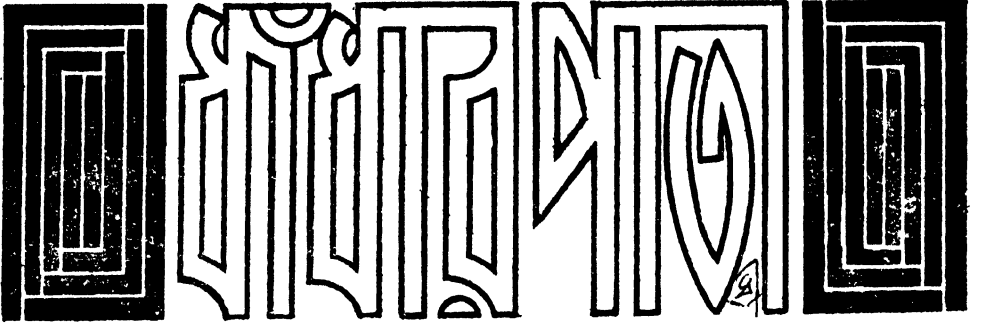
বাজিকর

বড়-ছোটো

একই পোষাক পরা তিনজন লোক এক লাইনে দাড়িয়ে আছে। ওর মধ্যে কোন্ জন সব চেয়ে বেশি লম্বা বলত ?

কটি ফোঁটা
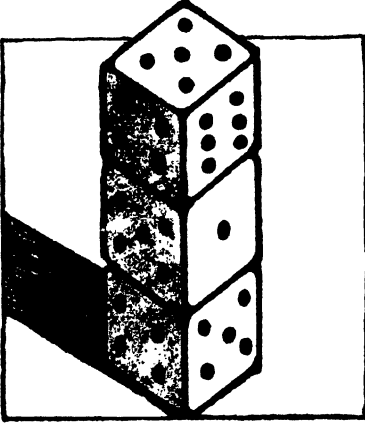
তিনখানি চৌকা ছক্কা বা ব্লক পর পর সাজানো আছে। প্রত্যেকটি ছক্কার উপর-নীচে ও চারধারে মোট ছ'টি অংশ। সকলের উপরের ছক্কাটির তিনটি অংশ এবং নীচের দু'খানির প্রত্যেকখানির দু'টি করে অংশ দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ছক্কার যে যে অংশ দেখা যাচ্ছে না—তাতে ক'টি ক'রে ফোঁটা আছে বলতে পার ?

(উত্তরটা আগামীবার পাবে)

(কার্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর)

১। (ক)	শশক	(খ)	বসতি	(গ)	রাখাল
	শমন		সকাল		খাইব
	কনক		তিলক		লবণ

২। কাজল—জল ঝরে চোখে, চোখে পাতা শোভা পায়। কিছু বাদে, অর্থাৎ 'কা' বাদে জল থাকে।

৩। উড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ উড়িষ্যাবাসী কোন ব্যক্তি যাচ্ছে ।
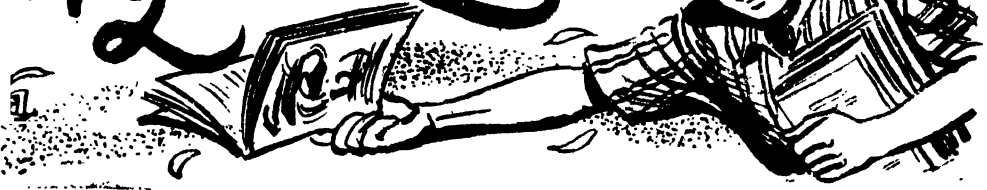
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

মাটি ছেড়ে মহাকাশে—শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ। বিচিত্রা প্রকাশন, ১৮, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীযোগেশ চন্দ্র সাহা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০

ছোটদের জন্যে গল্প করে বিজ্ঞানের বই লেখা সকলের সাধ্যে কুলোয় না। ব্যাপারটা শক্তও আছে। কিন্তু 'মাটি ছেড়ে মহাকাশে' বইয়ের লেখক শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ এ সম্বন্ধে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর এই বইখানি পড়লেই বোঝা যায়।

চোদ্দটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে, অসংখ্য ছবির সাহায্যে, মাটি থেকে মানুষ কি ক'রে আকাশে ওড়ার কল্পনা করল, তারপর সেই কল্পনা ক্রমান্বয়ে তাকে কত রকমের আকাশযান তৈরি করার কৌশল শেখাল, আকাশ-পথে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার পথ দেখাল, নভোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত স্পুটনিক, লুনা, ভেনাস, জেমিনি, মেরিনার প্রভৃতি মহাকাশ অভিযানের কাহিনীর মধ্যে সুন্দরভাবে তা ব্যক্ত করেছেন গ্রন্থকার।

বইখানি পড়ে ছোট-বড়ো সকলেই এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উচ্চাঙ্গের এবং প্রচ্ছদপটটি সুন্দর।

গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা—শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী। শিশু-সাহিত্য সংঘ, ১৮।বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০

সিসিল ডে লুইস-এর একটি ইংরেজী উপন্যাসের কাহিনী থেকে 'গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা' উপন্যাসটি বাংলায় লেখা এবং চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি সবই একেবারে বাংলা করে ফেলা। কাহিনীটি একদিকে যেমন মজাদার অপর দিকে তেমনি রোমাঞ্চকর। ভোঁদড়, মদন, নেপো, পঞ্চা, বিস্কুট প্রভৃতিদের নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করা, স্কুলে বদ ছেলেদের হামলা, আবার এই ছেলেদের সাহায্যেই কালোবাজারিদের ধরার ঘটনাগুলি খুবই উপভোগ্য। তবে স্কুলের হেড-স্যারের উপদেশগুলিও বর্তমান সময়ে এই কাহিনীর সঙ্গে খুবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ছাত্রদের বলেছেন, "তোমরা অনেক বে-আইনি কাজও করেছো। তোমাদের মতলব খারাপ ছিলো, এ কথা বলছি না। তবে বে-আইনি কাজ বে-আইনিই। আর সবচেয়ে বড় কথা: পুলিসের কাজ পুলিসকেই করতে দেওয়া উচিত। তাকে ডিঙিয়ে কাজ করাটা সব সময় নিরাপদ নয়, উচিতও নয়।" মলাটটি আকর্ষণীয়।

তোমাদের কাছে লিখতে বসে মনে হচ্ছে—এখন তোমাদের পরীক্ষার শেষ। পূজোর আনন্দোৎসবের পরেই পরীক্ষা-ভীতি বিহ্বল করে তোলে। সবচেয়ে বড় রকমের উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতে—তখনি বই খুলে মুখস্ত করা খুবই মর্মান্তিক মনে হয়—আর ইচ্ছাও হয় না, মনকে যতই প্রস্তুত করো। কিন্তু এই অগ্নি-পরীক্ষা আর পরীক্ষা-ভিতীও মন থেকে দূর করে উৎসাহের সঙ্গে পরীক্ষা শেষ করতে যাবার মুখে রাজনৈতিক কারণে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে এবার কোথাও পরীক্ষা কোন রকমে শেষ হয়েছে, কোথাও তা হতে পারেনি। প্রচণ্ড উৎসাহ পরিশ্রম বাধা পেয়েছে নিদারুণ ভাবে। তবু পরীক্ষা দিয়ে হাসিমুখে ফিরে এসে যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদের বাহাদুরি আছে বলতেই হয়!

আশাকরি তোমরা আমায় শুভ-সংবাদ দেবে ইংরাজী নববর্ষে

বড়মা ঃ হেমলতা ঠাকুর—

নিজের জন্য কিছুই নেই, নিজের যা কিছু সবই অন্যের সুখ-আনন্দের জন্য যেন সমর্পণ করা—সেই আনন্দে নিজেও মগ্ন থাকা—এটি কি কম কথা? এই রকম ছিল তাঁর চরিত্র—যিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সেই প্রাতঃস্মরণীয়া, সকলের শ্রদ্ধেয়া, পরহিতব্রতিনী শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর। সকলের কাছে এঁর পরিচয় ছিল 'বড় মা' নামে।

রাজা রামমোহন রয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বড় মা ১২৮০ সালের ২৯শে পৌষ—একটি শীতার্ত কুহেলী দিনে—কৃষ্ণনগরে। পরম ধার্মিক বংশে জন্মেছিলেন বলেই হয়তো—বড়ই ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। ইনি রামমোহনের পৌত্রীর পৌত্রী—অর্থাৎ নাতনীর নাতনী।

বিয়ে হয়েছিল যখন, তখন বয়স বছর ষোলো—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। শ্বশুর বাড়ী এসে সকলেরই আদর পেলেন—আর পেলেন দু'টি মা-হারা ছেলেমেয়ে দিনেন্দ্রনাথ ও নলিনীকে—সপত্নীর পুত্রকন্যাকে এত সস্নেহে লালন করেছিলেন যে সে দৃষ্টান্ত সকলেরই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল।

তাঁর বিদ্যানুরাগ সাহিত্য-প্রীতি দেখে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে ইংরাজী শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছিলেন, কারণ তখন মহিলাদের স্কুল-কলেজী শিক্ষা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সে যুগের মহিলা কবি ও লেখিকাদের মধ্যে তিনিও যশস্বিনী হয়েছিলেন। তার রচনা অনেক বই-এর মধ্যে জ্যোতি, আলোর পাখী প্রভৃতি নামকরা। 'দেহালি' নামেও তাঁর একটি বই ছিল যার নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য শান্তিনিকেতনে যে বাড়ীতে তিনি থাকতেন সেই বাড়ীর নামও ছিল 'দেহালি'।

বড়মা'কে ভুলতে পারবে না বাংলার মেয়েরা—কারণ তাঁর সেবা, তাঁর দান বাংলার মেয়েদের ঘিরে—বিশেষ করে দুঃস্থা মেয়েদের জন্য তাঁর ছিল সেবাব্রত-মন—তাদের জন্যই তৈরী হয়েছিল পুরীর 'বসন্তকুমারী আশ্রম'—আর সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকারূপেও তিনি এইসব মেয়েদের হিতব্রতে বহু কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুযোগ পেলেই সব সময় তা সার্থকভাবে রূপায়িত করার ইচ্ছা বা উৎসাহ অনেকেরই থাকে না। এই সেবাপরায়ণা নারীজাতির প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী এইজন্যই 'বড়মা'র আসন পেয়েছিলেন। নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এদেরই কল্যাণ কামনায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি যেন ছিলেন কল্যাণময়ী ও আনন্দের মূর্ত প্রতীক। 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে পত্রিকার সুষ্ঠু সম্পাদনার কাজও তাঁকে মনে করিয়ে দেয়।

পরিণত বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন পুরীতে। তার গুণমুগ্ধ পরিচিত ও অসংখ্য অনুরাগী স্ত্রি-পুরুষনির্বিশেষে শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করলেও—প্রিয়জন বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করেছে সকলেই।

তোমরা বড় হয়ে শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে—বাংলা দেশের স্বনামধন্যা মহীয়সী মহিলাকে জানতে পারবে।

তাঁর লেখা—

বিশ্বে যিনি রসবীর
অন্তরে অমৃত সার—
উদ্ভাসিত সবে যাঁর
    দীপ্ত মহিমায়
    সেই জ্যোতি প্রতিমায়
মম অন্তর আজি নির্মল হয়ে
বন্দিতে তাঁরে চায়॥

আমরাও তাঁকে পরমশ্রদ্ধায় স্মরণ করি—প্রণাম করি।

নূপুর মিত্র জামির লেন, কোলকাতা—যা প্রশ্ন করেছ তার জবাব দিচ্ছি—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ কোনটি? ক্যাস্পিয়ান হ্রদ। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা জাতের গাছ 'কোস্ট রেডউড' (COAST RED WOOD). এই গাছ কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর কালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ ওরগন অঞ্চলে দেখা যায়। মোটামুটি উচ্চতা ৩৮৫ ফুট।

সুতারা দাসগুপ্ত, কাশী—বেশ ভালো লাগলো তোমার চিঠি! নিমন্ত্রণও পেলাম। হ্যাঁ, গিয়েছি বৈকি! তীর্থস্থান ছাড়াও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে অনেক কিছু দেখবার ও জানবার আছে যে!

ফুলের রঙ সুন্দর আর মিষ্টি গন্ধ হয় কেন? না সব ফুলেই মিষ্টি গন্ধ হয় না, তবে বহু বর্ণের ফুল হয়। আর ফুলের কাজই তো কীট অর্থাৎ পোকামাকড়দের ডেকে আনা—কারণ তা না হলে ফুলের বংশ বৃদ্ধি হয় না। প্রাকৃতির অনেক নিয়ম—এও একটি।

হীরক ও মোহর চক্রবর্তী, কোলকাতা—পঞ্চবটীর পাঁচটা গাছের নাম? অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকি।

কুহু সেন, টালিগঞ্জ—নিশ্চয় ধাঁধা পাঠাতে পারো—তবে সেগুলি যেন মাথা খাটিয়ে বার করা হয়, আর বেশ ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে হয়।

সৌরী মিত্র, ইছাপুর—পুজো-সংখ্যা কোন বইটি ভালো লেগেছে এর উত্তর কি এক কথায় দেওয়া যায়—? বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন বিষয়ের কত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে—তুমি নিশ্চয় ছোটদের পত্রিকার কথাই জানতে চেয়েছ? আমার তোমার চেয়ে 'মৌচাক'কেই ভাল লাগে ছোট্ট বেলা থেকে।

মালা পলা, কোলকাতা; কৌশিক, কুণাল, শান্তিনিকেতন; রণু, রীতা, তেজপুর; রাধা দত্ত, কোলকাতা; দময়ন্তী চক্রবর্তী, লেক রোড; অরুণীতা ও রুপো মজুমদার, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কোলকাতা; মিণ্টু ঘটক, কোলকাতা—চিঠি পেয়েছি। সকলের জন্য ভালবাসা রইল।

তোমাদের

মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০·৫০ পয়সা
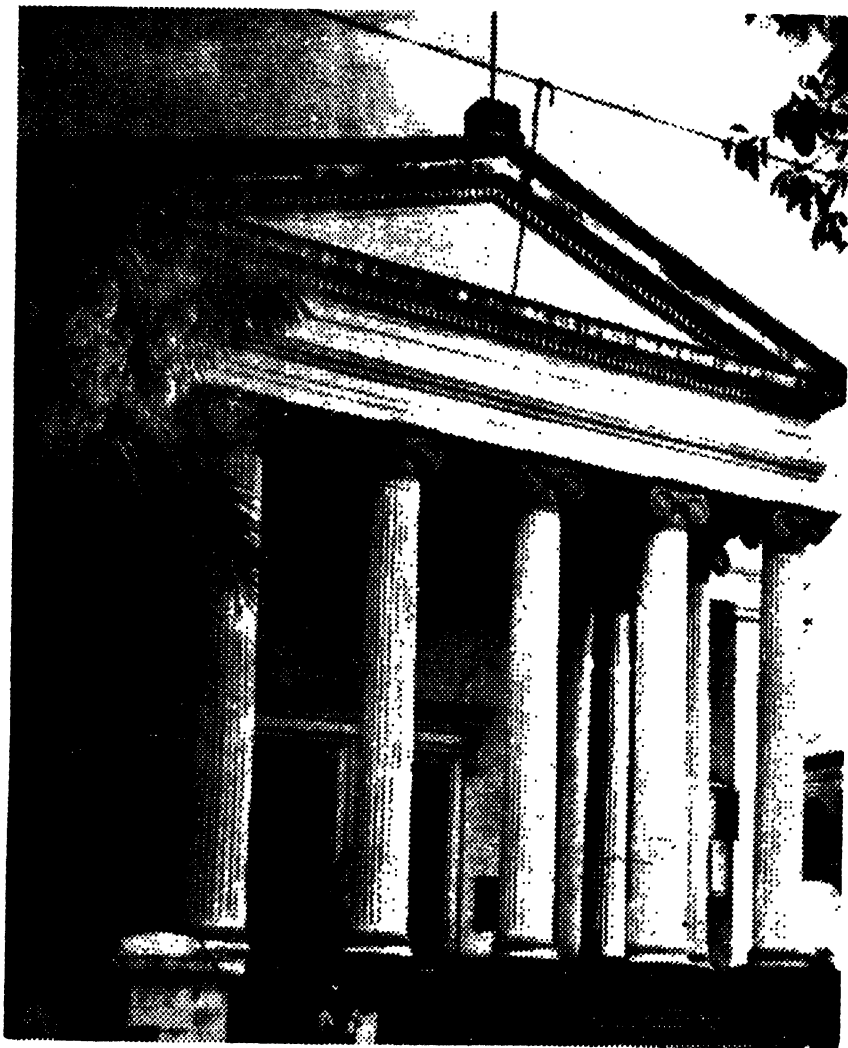
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখভাগ

(অতীতের চিত্র)

✻ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✻
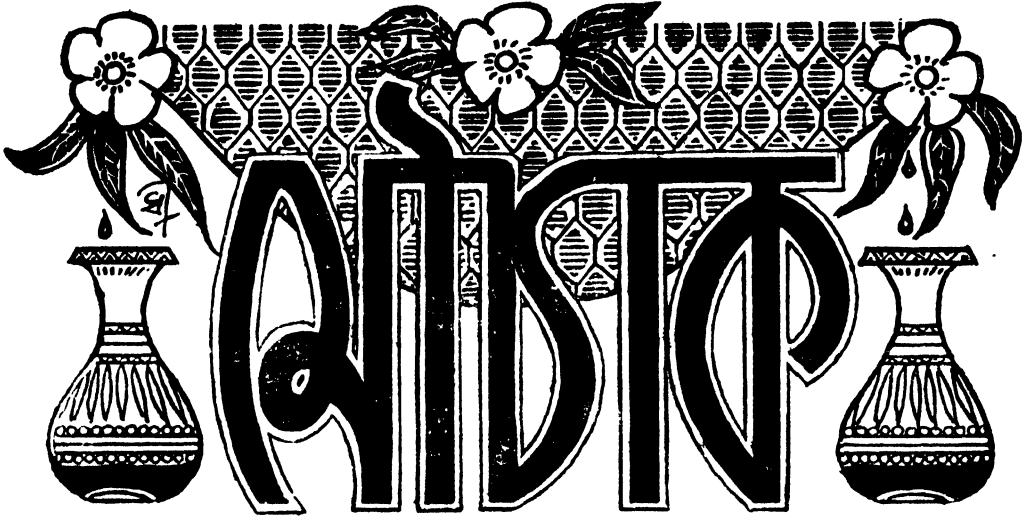
৪৮শ বর্ষ] মাঘ : ১৩৭৪ [১০ম সংখ্যা

UTTARPARA
...A PUBLIC LIBRARY

ভালো লাগে শী

শ্রীনবগোপাল সিংহ

দেরি করে ওঠে আর তাড়াতাড়ি ডোবে
লম্বা ঘুমোয় রবি পৌষের নভে।
দিন ছোট রাত বড় মুস্কিল ভারি
আধ-পেটা খেয়ে কাক ফেরে তাড়াতাড়ি।
প্যাঁচাদের বড় মজা,—চরে সারারাত,
আষাঢ়েতে ওলটায় এদের বরাত।

লোকে বলে এবছর অদ্ভুত শীত,
কেউ বলে ভালো, কেউ বলে কুৎসিত।

আলসেরা লেপ ছেড়ে উঠতে না চায়
বাবুদের ঘুম ভাঙে চায়ের ছ্যাঁকায়।
শিশুদের স্নান করা যেন মহাপাপ,
নারকেল তেলটাও জমে হয় চাপ।

মেয়েদের হাতে হাতে ফেরে কাঁটা উল,
কেহ 'হাফ-সোয়েটার, কেহ বোনে 'ফুল'
উনানের চারপাশে ঘরোয়া আসর
গনগনে আগুনের দারুণ কদর।
ঘাম নেই, উৎপাত নেই ঘামাচির
ঠোঁট গাল পা ফেটে হয় চৌচির।

ঠাণ্ডায় প্রাণ যায় শীতকালে ঠিক
কিন্তু কি ভাবি মোরা আর একটা দিক?
ফুলকপি বাঁধাকপি টমেটো পালং
সব্জির বাহারেতে রামধনু রং।
বেগুনের বেগুনি ও টমেটোর লাল
মাঝখানে হলদে ও সবুজে মিশাল—

গাজর কড়াইশুঁটি সিম শালগম,
শীতকালে সব্জির কি যে সমাগম!
উঠোনে রঙিন গাঁদা, গাছে টোপাকুল
ছেলেমেয়ে এ দুটোরই লোভে মশগুল।
নলেন গুড়ের স্বাদ, পিঠে পায়েসেতে
কে না ভালোবাসে এরই সন্দেশ খেতে?
সুশ্রীই বলো আর বলো কুৎসিত,
খেতে পাই, ভালো তাই ভালো লাগে শীত।

রাজকন্যার হাসি

শ্রীরূপলেখা বসু

অনেকদিন আগের কথা। এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিনটি ছেলে ছিল।

বড় রাজকুমারকে সবাই খুব পছন্দ করত। তার চেহারাটি বেশ সুন্দর ছিল, আর মজার মজার কথা বলে লোককে মাতিয়ে রাখতে তার জুড়ি মিলত না। সবাই তার শাণিত বুদ্ধির তারিফ করত, আর সেই জন্য বড় রাজকুমারের গর্বের অন্ত ছিল না।

দাদার মত বুদ্ধি না থাকলেও মেজ রাজকুমারের বুদ্ধিও কিছু কম ছিল না। সারাদিন ধরে চিন্তা করে সে নানারকম উদ্ভট ধাঁধা আর তার উত্তর তৈরি করত। তারপর রাজসভায় সে যখন সেই ধাঁধাগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করত, আর হাজার মাথা খাটিয়েও কেউ যখন সেগুলোর উত্তর দিতে পারত না, তখন সে উত্তরগুলো বলে দিত। উত্তরগুলো এত মজার যে শুনে সবাই জব্দ হয়েও হেসে লুটিয়ে পড়ত।

ছোট রাজকুমার ছিল একেবারে অন্যরকমের। তার চেহারা ছিল খুবই সাধারণ, আর তার কথাবার্তাতেও বুদ্ধির কোন ছাপই থাকত না। অবশ্য তার একটি বড় গুণও ছিল—সে গরীব-দুঃখীদের যথাসাধ্য সাহায্য করত।

একদিন রাজা তাঁর তিন ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, "শোন ছেলেরা। কোকিল-দ্বীপের নাম তোমরা নিশ্চই শুনেছ। সেখানকার রাজা যেমন ধনী, তেমনি প্রতাপশালী ; তাঁর একটিই মোটে মেয়ে—সে কিছুদিন ধরে কেমন যেন হয়ে গেছে। সে ভাল করে কারো সঙ্গে কথা বলছে না, আর হাজার চেষ্টা করেও তার মুখের হাসি ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। তাই রাজা ঠিক করেছেন যে, তার মেয়েকে হাসাতে পারবে, তার সঙ্গে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পার।"

রাজার কথা শুনে তিন ভাই-ই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। কোকিল দ্বীপের ঐশ্বর্যের কথা আর সে রাজ্যের রাজকন্যার রূপের কথা কারো অজানা ছিল না।

বড় রাজকুমার বলল, "আমি যে জিতবই, এ তো জানা কথা। আমার সুন্দর চেহারা দেখে আর মজার মজার কথা শুনে রাজকন্যা নিশ্চয়ই আনন্দে হেসে উঠবে।"

মেজ রাজকুমার অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, "কি যে বল! জিতব তো আমি। রাজকন্যা সুন্দর চেহারা অনেক দেখেছে, তুমি আর নতুন দেখাবে কি? আর মজার মজার কথা বলার জন্য কোকিল দ্বীপের রাজার সভায় ভাঁড়ও রয়েছে, তার চাইতে বেশী মজার কথা তুমি আর কি শোনাবে? কিন্তু আমার মত অদ্ভুত ধাঁধা বানাবার লোক আর দুনিয়ায় একটিও নেই। এমন মজার ধাঁধা আর এমন মজার উত্তর রাজকন্যা আর

কখনো শোনেনি। আমার মুখে আমার মজার মজার ধাঁধা শুনে রাজকন্যা প্রাণ খুলে হেসে উঠবে।"

ছোট রাজকুমার বলল, "আমি মজার কথাও জানি না, ধাঁধাও জানি না। আমি রাজকন্যাকে গিয়ে বলব যে, আমি একজন সাধারণ মানুষ। তবে আমি তাকে সারাজীবন এমন ভালবাসব, যেভাবে কেউ কোনদিন তাকে ভালবাসেনি। সত্যি ভালবাসতে জানে, এমন মানুষ পেয়ে রাজকন্যা নিশ্চয় আনন্দে হেসে উঠবে।"

বড় দুই রাজকুমার তো ছোট রাজকুমারের কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, "তাতেও যদি রাজকন্যা না হাসে?"

ছোট রাজকুমার একটু ভেবে বলল, "তাহলে তখন ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠিক করা যাবে।"

তিন ভাই অবশেষে কোকিল দ্বীপে গিয়ে হাজির হ'ল। বড় আর মেজ রাজকুমারের পরনে জরি বসানো ঝকমকে লালনীল পোশাক, আর ছোট রাজকুমার পরেছিল অতি সাধারণ পোশাক, কারণ আর সবই সে গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়েছে।

সোনার পালঙ্কে বিষণ্নমুখে কোকিল দ্বীপের রাজকন্যা বসে রয়েছে। সবার বড় বলে বড় রাজকুমার আগে রাজকন্যার ঘরে ঢুকলো। প্রহরী দরজা ভেজিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে গম্ভীরমুখে বড় রাজকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভাইদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "নাঃ। কোন ফলই হ'ল না। বেছে বেছে সবচেয়ে মজার কথাগুলো একের পর এক রাজকন্যাকে শুনিয়ে গেলাম—সে সব শুনে পৃথিবীর সব লোক হেসে গড়িয়ে পড়ত, কিন্তু রাজকন্যার মুখে হাসির রেশও দেখা গেল না।" এই বলে বড় রাজকুমার এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"তোমার মজার কথা শুনে যে রাজকন্যা হাসবে না তা তো আমি আগেই বলেছিলাম। এবার দেখ আমার ধাঁধা শুনে রাজকন্যা কেমন হাসে।" এই বলে বুক ফুলিয়ে মেজ রাজকুমার রাজকন্যার ঘরে ঢুকে গেল।

কয়েক মিনিট পরে সে-ও গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল। তার নানারকম উদ্ভট ধাঁধা আর তাদের মজার মজার উত্তর শুনেও রাজকন্যা একটুও হাসেনি।

বড় দুই রাজকুমার তখন ছোট রাজকুমারকে বলল, "চল্ এবার বাড়ী ফেরা যাক। আমরা দু'জন যখন রাজকন্যাকে হাসাতে পারিনি, তখন তুই পারবি কি করে?"

"চেষ্টা করতে দোষ কি?" বলে ছোট রাজকুমার আস্তে আস্তে রাজকন্যার ঘরে ঢুকে গেল। প্রহরী দরজা ভেজিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলী গলায়

'দেখল রাজকন্যা তখনো হাসছে'...

হাসির শব্দে অবাক হয়ে দুই রাজকুমার দরজা খুলে ঘরের ভেতরে উঁকি দিল—দেখল রাজকন্যা তখনো হাসছে, আর তার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট রাজকুমার।

ধুমধাম করে কোকিল দ্বীপের রাজকন্যার সঙ্গে ছোট রাজকুমারের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর ছোট রাজকুমারের সামনে বড় রাজকুমার মেজ রাজকুমারকে বলল, "দেখ ভালবাসা কি জিনিস। ভালবাসার কথা বলে ছোট রাজকন্যাকে কেমন হাসিয়ে দিল!"

ছোট রাজকুমার বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মুখে ভালবাসার কথা শুনে রাজকন্যা আমার দিকে তো শুধু তাকিয়ে ছিল—হাসেনি তো একটুও!"

"সে কি?" বড় দুই ভাই প্রশ্ন করল, "আমরা যে দেখলাম রাজকন্যা খুব হাসছে?"

ছোট রাজকুমার বলল, "আমার কথা শুনে হাসল না দেখে আমি রাজকন্যাকে সুড়্‌সুড়ি দিয়েছিলাম।"

দুই রাজকুমার হাঁ করে ছোট রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে রইল। এর পর থেকে ছোট ভাইয়ের সামনে তারা আর কখনো নিজেদের বুদ্ধির বড়াই করেনি।

মরুভূমির বাসিন্দা

শ্রীরাণা বসু

ওপরে আকাশ আর নীচে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর বালি। অন্তহীন বালি আর বালির প্রসারিত অঞ্চলকে আমরা বলি মরুভূমি। এই মরুরাজ্যের কথা আজ তোমাদের শোনাব।

মরুভূমি বালির রাজ্য হলেও সেখানে মানুষ বাস করে। দিগন্তপ্রসারী সাহারা আর আরবের মরুভূমিপ্রধান অঞ্চলই হ'ল আরব-বেদুইনদের বাসভূমি। বাইবেলের আব্রাহামের কাল থেকে আজকের বেদুইনেরও প্রধান উপজীবিকা হ'ল পশুপালন, অর্থাৎ ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট প্রভৃতি পশুই হল আরব-বেদুইনদের সম্পদস্বরূপ।

ছাগল ও উটের দুধ এবং সেই দুধ থেকে পনীর প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্য বেদুইনদের প্রধান আহার্য। এ ছাড়া মরুভূমিতে এক রকমের খেজুর জন্মায়। এই খেজুরও বেদুইনদের অন্যতম খাদ্য। বেদুইনরা মাংস খায় তবে মনে মাংস খাবার ইচ্ছা জাগলেই তারা মাংস খেতে পায় না। ইচ্ছে গেলেই বেদুইনরা পশুহত্যা করতে পারে না, তাই বেদুইনদের পশুর মাংস সংগ্রহ করা খুব কঠিন।

আরবরা উটকে মালবহনের কাজে ও পথচলার বাহন হিসেবে ব্যবহার করে। মরুভূমিতে মাঝে মাঝে সামান্য গাছপালা, কিছু কিছু তৃণভূমি ও জলাশয় দেখা যায়। মরুভূমির এ রকম অঞ্চলকে আমরা বলি মরুদ্যান। আরব-বেদুইনরা মরুভূমির মরুদ্যানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করে। মরুদ্যানের যে তৃণভূমির কথা তোমাদের বললুম, সে তৃণভূমির তৃণ যেই শুকুতে বা ফুরিয়ে আসতে আরম্ভ করে, অমনি বেদুইনরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে অপর কোনো মরুদ্যানের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এইভাবে এক মরুদ্যান থেকে আরেক মরুদ্যানে তাঁবু ফেলে এবং তাঁবু গুটিয়ে আরব-বেদুইনরা জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে দেয়।

ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর দেহের চামড়াই হ'ল আরব-বেদুইনদের পোশাক। আবার এইসব পশুর চামড়া দিয়েই বেদুইনরা বাসস্থানের তাঁবু এবং পশুর লোম ও পশমের গায়ে দেবার কম্বল, বসবার আসন প্রভৃতি তৈরি করে। মরুভূমিতে দিনের বেলায় যেমনি গরম আবার রাত্রির বেলায় তেমনি ঠাণ্ডা। মরুভূমিতে দিনের বেলা তাপমাত্রা প্রায় ১০০ ডিগ্রী ফারেনহিট-এ ওঠে। সূর্যাস্তের পর তাপমাত্রা নামতে নামতে ৪০ ডিগ্রী ফারেনহিট-এ গিয়ে পৌছয়। প্রখর সূর্যতাপ ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে জীবনকে রক্ষা করতে পশুর চামড়ায় তৈরি পোশাকই বেদুইনদের বিশেষ সাহায্য করে।

মরুভূমির বাসিন্দা নারী-পুরুষ বেদুইনরা আলখাল্লার মতন এক জাতীয় ঢিলে সুতীর

পোশাক ব্যবহার করে। পুরুষরা সাদা ও মহিলারা নীল রঙের পোশাক পরে। তাদের সুতীর পোশাকের ওপর থাকে ভেড়ার চামড়ার পোশাক। ওদের এ-জাতীয় পোশাকের নাম হ'ল 'আববা'। বেদুইনরা মাথার ওপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত নামানো পশমের তৈরি বেশ বড়ো চারকোণা একটা আচ্ছাদন ব্যবহার করে। মাথার ওপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত নামানো এই আচ্ছাদনই সূর্যের তাপ থেকে বেদুইনদের উন্মুক্ত ঘাড়, গলা রক্ষা করে। মরুভূমিতে প্রায়ই বালির ঝড় ওঠে। মরুভূমির এই ঝড় বড়ো মারাত্মক। মরুভূমিতে একবার ঝড় উঠলে সে-ঝড় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে। বালির ঝড় উঠলে বেদুইনরা মাথার আচ্ছাদনটাকে মুখের ওপর টেনে নামিয়ে ঝড়ের হাত থেকে মুখ-চোখ রক্ষা করে।

তোমাদের আগেই বলেছি, মরুবাসী যাযাবর বেদুইনরা ছাগল ও উটের চামড়ায় তৈরী তাঁবুতে বাস করে। তাঁবুর সামনের অংশে পুরুষ ও ভেতরের অংশে পর্দার আড়ালে মহিলারা বাস করেন। তাঁবুর ভেতর এদিক-ওদিক নজর করলে চোখে পড়বে: কাঠের বেঞ্চির ওপর উটের চামড়া দিয়ে ঢাকা বসবার আসন, ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি জলাধার, তামার তৈরি বাসনপত্র, কফি পানের পাত্র—এইরকম টুকিটাকি আরো কত কী।

বেদুইন মেয়েরা আমাদের ঘরের মেয়েদের মতোই পরিবারের যা-কিছু সেলাইয়ের কাজ করেন। এ ছাড়া মেয়েরা দুধ দোন, রান্না করেন এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে যাবার সময় জিনিসপত্র গোছানোর কাজে পুরুষদের সাহায্য করেন। বেদুইন পুরুষ ও ছেলেরা আমাদের দেশের রাখালদের মতন সকালে ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চরাতে বেরোয় ও সন্ধ্যে নামার আগে পশুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসে।

বেদুইনরা অত্যন্ত অতিথিসেবাপরায়ণ। বেদুইনদের তাঁবুর ভেতর অতিথির বাসের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। তাঁবুতে কোনো অতিথি এলে বেদুইনরা রাজসম্মানে অতিথিকে আপ্যায়ন করে। অতিথিকে তারা ভালো ভালো খাদ্য খাওয়ায় এবং তামার পাত্রে চা অথবা কফি দিয়ে আপ্যায়িত করে। কিন্তু আগন্তুক অতিথির সামনে বেদুইন রমণীরা কখনো বের হন না। অতিথির কাছে কোন কিছু গ্রহণকে বেদুইনরা অত্যন্ত অন্যায় ও অসম্মানের বলে বিবেচনা করে।

বেদুইনরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ভবঘুরে বেদুইনদের ঘুরে বেড়ানো সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের প্রিয় পশুগুলোর খাদ্য পাওয়ার ওপর অর্থাৎ তাদের সঙ্গী পশুর খাদ্য ঘাস ও তৃষ্ণা নিবারণের জল যেখানে মেলে তারা সেখানেই তাঁবু ফেলে। বলতে গেলে গ্রীষ্মের দু-তিন মাস বাদ দিয়ে বছরের বাকী মাসগুলো বেদুইনরা উটের পিঠে মাল চাপিয়ে এক

জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বেদুইনরা যখন এক জায়গার বাস উঠিয়ে আরেক জায়গায় যায়, সে-দৃশ্য বড়ো চমৎকার। প্রথমে দেখা যায় পিঠে মাল নিয়ে একের পর এক উটের সারি চলেছে। উটের সারির পেছনে আছে ঘোড়ার পিঠে মেয়েরা ও ছোট ছোট বেদুইন ছেলেমেয়ে, আর সবার পেছনে চলেছে সারবেঁধে বেদুইনদের অতি-প্রিয় পালিত ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি।

বেদুইনরা শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে বন্দুক ব্যবহার করে। বেদুইনদের ভেতর যে চোর নেই তা নয়। বেদুইন চোর গৃহপালিত পশু এবং খাদ্যই চুরি করে বেশি।

পৃথিবীর দিকে দিকে যাযাবর বেদুইনদের মতন কতো বিচিত্র মানুষই না ছড়িয়ে আছে। এই বিচিত্র মানুষদের জীবন-কথা যখন আমরা পড়ি, তখন সত্যিই আশ্চর্য বোধ করি, কিন্তু মনে আনন্দও কম হয় না—নতুন কিছু জানলুম এ জন্তে।

কোন্ দুটি এক রকমের
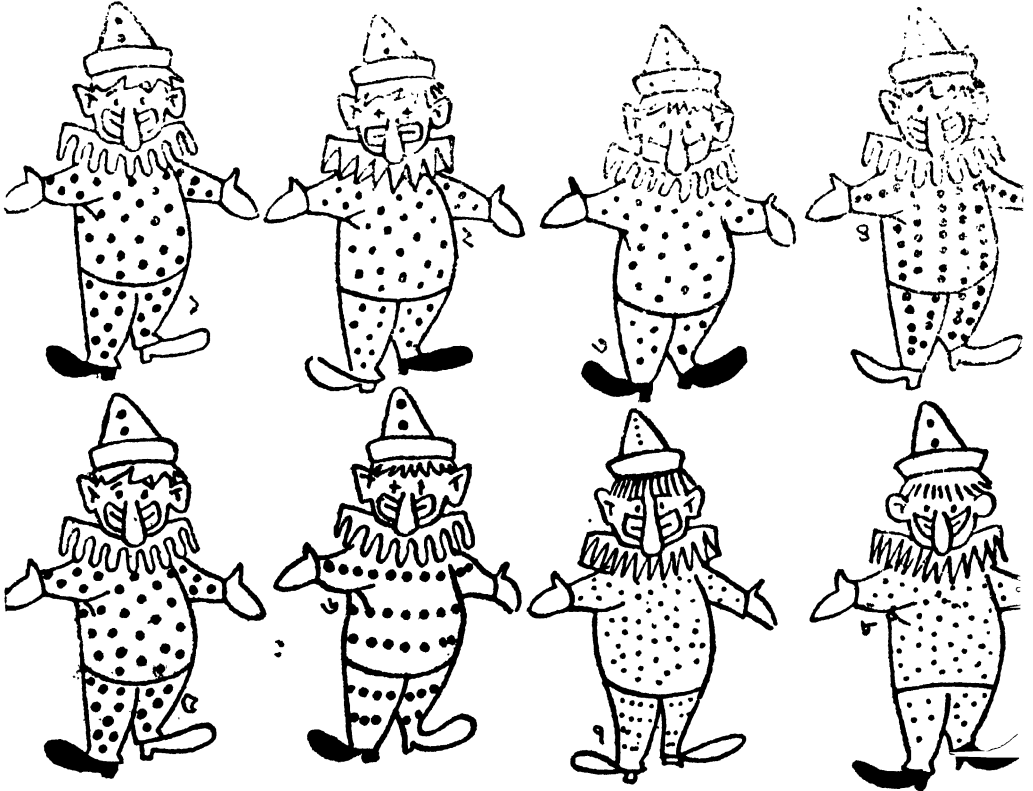
উপরে আটটি ক্লাউনের ছবি দেওয়া আছে, এদের মধ্যে দুটি হুবহু এক রকমের—কোন দুটি তোমরা বলতে পারো?

রানী রত্নাবতী

শ্রীআরতি সেন

তোমরা চিতোরের ভক্তিমতী রানী মীরাবাঈর নাম শুনেছ, তাঁর ভজনও শুনেছ এবং গেয়েছ। আজ তোমাদের আর এক রানীর কথা শোনাব, যিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হয়ে সব পার্থিব বস্তুকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন। ইনি অম্বরের মহারাজা মানসিংহের ভাই রাজা মাধো সিংহের স্ত্রী ছিলেন। অপরূপ রূপবতী রানীর স্বভাবও খুব মধুর ও পবিত্র ছিল, এজন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

এই রানী রত্নাবতীর মহলে একজন দাসী থাকতেন যিনি কৃষ্ণনাম-গান করে ভক্তি ভাবে আকুল হতেন। রানী এই দাসীর লোকোত্তর ভাব ও প্রেমের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন এবং বললেন—'তোমার মুখের হে নন্দ নন্দন, হে ব্রজচন্দ্র নাম-গান শুনে আমি সব কিছু ভুলে যাই আমিও আকুল অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানের নাম করি। যাঁর নামে, যাঁর চিন্তায় এত মধুর আকর্ষণ তাঁকে কী ভাবে দেখতে পাব, কী ভাবে তাঁর কৃপা পাব বলে দাও।'

রানীর ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে দাসী তাঁকে বললেন—'তাঁকে পাওয়ার পথ অতি দুর্গম, রক্তাক্ত কণ্টকিত চরণে এই পথে যেতে যেতে তাঁর কৃপা হলে তবে সেই অলৌকিক আনন্দের স্পর্শ পাওয়া যায়। তুমি রাজরানী—ভোগ-বিলাস-ব্যসনে তুমি লালিতা-পালিতা, তুমি এপথে এসো না। বিষয়-বৈরাগীদের জন্যই শুধু এই পথ '

দাসীর কথা রানী শুনেলন না, কেঁদে বললেন—

কছুক উপায় কীজে,
মোহন দিখায় দীজে,
তব হী তো জী হৈ বে তো
আনি ভর অরে হৈ।

অর্থাৎ, যা হয় কিছু উপায় করো, আমাকে মোহনকে দেখাও, তবেই তো এ জীবন থাকবে। তবে তিনি আমার মনেই আছেন।

দাসী বললেন —

দরসন দুর রাজ ছোড়ে
লৌটে ধুর পৈ ন
পাব ছবি পুর এক প্রেম
বস করে হৈ।

অর্থাৎ, রাজ্য ছেড়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়লে তাঁর দর্শন হয়। আর তুমি তাঁকে পেতে পার প্রেমের দ্বারা।

দাসী এর পর রানীর গুরু হয়ে গেলেন। রানীর বৈরাগ্য ও আকুলতা দেখে তাঁকে উপদেশ দান করলেন। রানী অনন্তচিত্তে ভোগবিলাস ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এক মন্দিরে স্থাপন করে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। সাধু মহাত্মারা এইখানে মাঝে মাঝে সমবেত হতে লাগলেন। একবার এক সাধু মহাত্মা তাঁর মন্দিরে এলে তিনি নিজে রানীর ভাব ত্যাগ করে তাঁকে দর্শন দেন ও তাঁর সেবা করে নিজেও ধন্য হন। কিন্তু রক্ষনশীল রাজ পরিবারে এই নিয়ে অশান্তি ও আলোচনা হতে লাগল। রাজা মধো সিংহের কানে রানীর নামে নানা প্রকার কুৎসা গেলে তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে রানীর প্রাণনাশের সংকল্প করলেন। বটে রাজা অন্দরে এসে ক্ষুধার্ত সিংহকে খাঁচা থেকে খুলে রানীর সামনে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু রানী সিংহকেও ভগবানের নৃসিংহ অবতার হিসাবে পূজা করলেন। আশ্চর্যের বিষয় সিংহও শান্তভাবে সে পূজা গ্রহণ করল। তারপর বাইরে এসে খাঁচা নিয়ে যে সব ষড়যন্ত্রকারীরা উপস্থিত ছিল, তাদের হত্যা করল। এই অভূতপূর্ব ঘটনার কথা রাজার কানে গেলে তিনি দৌড়ে এসে দেখেন রানী তদ্‌গত চিত্তে ভগবানের ভজন করছেন। রাজার সংশয়ী মন এবার বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভগবানের চরণে লুটিয়ে পড়ল।

এই রানী রত্নাবতীর ছেলে প্রেম সিংহও মায়ের মত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন।

শোনা যায় একবার মহারাজা মানসিংহ ও রাজা মাধো সিংহ প্রবল দুর্যোগের মধ্যে নদী পার হবার সময় শুধুমাত্র ভক্তিমতী রানী রত্নাবতীর কথা স্মরণ করেই বিপদোত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

ভগবান ভক্তের বোঝা বহন করেন। ভক্তকে শুধু নয়, ভক্তের পরিজনকেও সর্ব-প্রকারে রক্ষা করেন। সর্বকালে সর্বসময়ে ভক্তের জয় হয়।

একটুখানি হাসো

দিদিমণি—সুমিতা, তুমি পড়ছ না ?
সুমিতা—হাঁ, পড়ছি তো।
দিদিমণি—তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন ?
সুমিতা—কেন, একটু আগেই তো আপনি পড়ার সময় চেঁচাতে বারণ করেছেন।

—শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ব্যাঙমা ব্যঙ্গ করে বলল, "হাঁদা রাজার গাধামী দেখ ব্যাঙমী। মানুষ প্রজা হারিয়ে এখন পোকামাকড় প্রজার গোমর! আরে এই গোমরের জন্য মাথায় গোবর ঢেলে প্রজারা রাজাদের টেনে নাবিয়েছে।"

ব্যাঙমী জিজ্ঞেস করে, "রাজা, প্রজা, আর মানুষ কি গো?" ব্যাঙমা বলে, "মানের হুঁস যাদের আছে, তারা হ'ল গিয়ে মানুষ। অনেক বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সবার বড় করে ভগবান তাদের বানিয়েছিলেন। কিন্তু হুঁস হারিয়ে তার কতক হ'ল গিয়ে অমানুষ। আর গদীতে বসে, রাজা সেজে খাজা গজা খেতে লাগল। অপরকে প্রজা করে সব কেড়েকুড়ে নিল।"

ব্যাঙমী বলে, "এমন!"

ব্যাঙমা বলে, "তাই আজ পাপের সাজা পাচ্ছে। এখন প্রজাদের সঙ্গে তাদের খেটে খেতে হবে। কিন্তু সেই খেটে খাওয়া হচ্ছে রাজার চেয়েও সম্মানের। জানলে ব্যাঙমী, ভগবানের কি সুন্দর ব্যবস্থা! ছেলেবেলায় বাঁচার জন্য আছে মায়ের কোল আর দুধ। বড় হয়ে বাঁচার জন্য আছে আরেক মা। তার নাম মাটি। তারও বুকে ভরা আছে ফল আর ফসল। একটু খেটেখুটে তা ফলাও। নিজে খাও আর বিলাও।

তাতে সবার কাছে রাজার চেয়েও ইজ্জত বাড়বে। দিকে দিকে এই সম্মান পাওয়া হ'ল গিয়ে দিগ্বিজয়!"

মহারাজা অবাক হয়ে শোনে।

ব্যাঙমী বলে, "রাজা দেখতে কেমন?"

ব্যাঙমা বলে, "কেমন আবার? মানুষের মতই। তবে ভেতরটা অন্য রকম। ঐ তো নিচে এসে আছে।"

ব্যাঙমী ঘাড় কাত করে দেখে। তারপর বলে, "ঐ যে হোৎকা চেহারার নেড়া মাথায় টিকিওয়ালা লোকটা? বোকা বোকা হাবাগোবাকে প্রজারা এদ্দিন রাজা বলে কাঁধে করেছিল! আর রামছাগলের দাড়ি, গাব্বাবাজ (সিঁদেল চোর) চেহারার ঐ লোকটা কে?"

ব্যাঙমা বলে, "ওটা হ'ল ওর মহামন্ত্রী।"

ব্যাঙমী বলে, "তা আবার কি?"

ব্যাঙমা বলে, "সে রাজাকে মন্ত্রণা দেয়, সলা-পরামর্শ দেয়।"

ব্যাঙমী বলে, "কি করে প্রজাদের যন্ত্রণা দেবে, শাল দেবে,—তার? যেমন রাজা তার তেমন মন্ত্রী! তাই তো আজ এই হাল। দুটো গরু চোরের মত বসে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে দেখ না!

মহারাজা মুখ লুকায়। পাখীও তাকে বোকা, হাঁদা, গাধা, গরু চোর বলে! মহারাজা মহামন্ত্রীকে ওদের কথা জানায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, "ওরা কোন পাঠশালায় পড়েছে মহামন্ত্রী?"

এখন ব্যাঙমাও মানুষের কথা বোঝে। সে ছড়া শোনায়,—

"চোখ থাকতে কানা কেন, মানে কেন মানা?
ভালমন্দের ধান্ধা কেন? সব পাঠই তো জানা।
রাজার চেয়ে প্রজা বড়, প্রজার বড় চাষা,
ফসল দিয়ে মানুষ বাঁচায়, সে যে সবার খাসা।
খায় না খাজা, খায় না গজা, সবার প্রাণের রাজা,
ক্ষেত-খামারে রাজ্য পাতা, মুকুট পাতায় সাজা।—"

মহারাজা হঠাৎ লাফ দিল। মহামন্ত্রী বলল, "কি হ'ল মহারাজ?" মহারাজা বলে, "কি না হ'ল মহামন্ত্রী? মহামন্ত্র শিখে গেলাম। ব্যাঙমা শিখিয়ে দিল। চুরি, চামারি, জোচ্চুরি নয়। প্রজাদের গলা ধরে ফসল বানাও,—ফসল দিয়ে মানুষ বাঁচাও,—সবার প্রাণের রাজা হও। ক্ষেত-খামারে রাজ্য পাতা আছে। পাতার মুকুট তৈরী আছে—রাজা সাজার জন্য! তা সবচেয়ে সেরা।"

এবার ব্যাঙমা বলল,—

"কথার মত কথা এবার কইলে মহারাজা,
ভয়-ভাবনা চুকে গেল, হলে মহাপ্রজা।
কার ঘাড়ে আর ক'টা মাথা কাড়ে রাজ্যপাট ?
ভড়কে যাবে দেখবে যখন হাতে জগন্নাথ।"

মহারাজা বলে, "আর ভয় নেই মহামন্ত্রী। ব্যাঙমা বলল, মহাপ্রজা হয়ে গেলাম। আর কারুর সাধ্য নেই—রাজপাট কেড়ে নেয়। আপন হাত জগন্নাথ বানিয়ে খেটে খাচ্ছি দেখে সবাই ভড়কে যাবে।" তখন হাঁক দেয়, "হুঁকো বরদার!" তারপর মনে পড়ায় নিজ হাতে তামাক সেজে খায়। আর ফুঁ করে ধোঁয়া ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর দিকে দেয়!

মহামন্ত্রী পুরো বিশ্বাস করে না। বলে, "মহারাজ, বেজায় গরম, আর কড়া তামাক খাচ্ছেন। মাথায় আথাল-পাথাল চিন্তা। ব্যাঙমা-ব্যাঙমী কিস্‌স্যু নয়। বোধ করি আপনি খোয়াব (স্বপ্ন) দেখেছেন।"

ব্যাঙমা শুনল। মহামন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল,—

"ভোঁতা বুদ্ধি ঘষে ঘষে এটুকুর ধার,
গোঁত্তা মারা ছেঁদো-কথায় নেইক রং বাহার।
কম কথা আর বেশী কাজে অনেক আছে ভার,
রাজা মন্ত্রী হাঁদা চলন ছাড় তো এবার!"

ভাল কথা কইতে কইতে ব্যাঙমা-ব্যাঙমী কম গালাগাল দিল না। হঠাৎ মহারাজা ক্ষেপে লাল হ'ল, তার মাথা গরম হ'ল। বলল, "মহামন্ত্রী জল।"

পানিপাড়ে নেই। কোথায় জল পাওয়া যায় ? গোঁদা বানরের খাওয়া নারকেলের মালা এক কোণায় পড়েছিল। আর ছিল বৃষ্টি-জমা জল। মহামন্ত্রী মালায় করে তার খানিক নিয়ে এল।

তেষ্টা নয়, মহারাজা মাথা দেখায়। মহামন্ত্রী সেখানে উপুড় করে ঢালে। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি। জমা জলে ছিল কতগুলো কুচো ব্যাঙ্। মহারাজার মাথার গরম পেয়ে সেগুলোর নাচ শুরু হয়!

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "মহামন্ত্রী, মাথায় কে নাচে ?" এতক্ষণে মহামন্ত্রী দেখতে পায়।

ওরা ভাল জাতের ব্যাঙ্। মহারাজা মহামন্ত্রীর ফারাক করে না। ক'টা মহারাজার মাথা ছেড়ে মহামন্ত্রীর মাথায় নাচা শুরু করে। দেখাদেখি মহারাজা আর মহামন্ত্রী নাচতে বাইরে ছোটে!…

লাঞ্ছনা কম নয়। প্রজার হাতে, ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর হাতে,—অবশেষে ব্যাঙের হাতে। তাও গোদা ব্যাঙ নয়,—কুচো ব্যাঙ! বাড়ী ফিরে মহারাজা খেতে বসে খায় না, কথা কয় না।

মহারাণী বলে,—'ভাত কেন নাড় চাড়, মুখে দাও না,
মুখ কেন নাড় চাড়, কথা কও না।"

কি কথাই বা কইবে। কিন্তু মহারাণী মাথার দিব্যি দিয়ে বলে, "মাথা খাও। ভাত খাও, কথা কও।"

মহারাজা মহারাণীর মাথার দিকে চায়। মস্ত বড় মাথা। পাতা কাটা চুলে খোঁপা বাঁধা। কপালে সিঁদুরের টিপ। অত বড় মাথা তো খাওয়া যায় না। তাই ভাত খায়, আর কথা বলে। ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর কথা, ব্যাঙের কথা কয়। অনেক কথা বলতে গিয়ে কম খায়। আর পাতের খাবার আহ্লাদী ও জল্লাদী নিয়ে যায়। আজ মহারাণীর ব্রতের উপোস তাই খাবে না।

ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর বচন, আর মাথায় ব্যাঙের নাচন নাকি সুলক্ষণ। মহারাণী শাঁখ বাজায়। হাত জুড়ে বলে, "হে মা, মঙ্গলচণ্ডী!" তার হাতের সোনার শাঁখা ঝকমক করে। ব্রতের দরুন মহারাণী গুচ্ছের খাবার করেছিল। মহারাজা খায়নি। তার ভাগ নিয়ে আহ্লাদী আর জল্লাদীর বিষম রাগারাগি শুরু হ'ল। অন্দরের নিরালা ঘর। কেউ কোথায় নেই। তাই তাদের ঝগড়ার রাখ-ঢাক রইল না। এঁটো হাতে তারা গাছ-কোমর হ'ল। তারপর এ-ওর নাক কান ধ'রে কুমড়ো গড়ান! আচড়-কামড়, চুল ছেঁড়াছেঁড়ি,—তারপর বেড়ালের মত ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ!

মহারাণী এসে তবে ছাড়ায়। কোথায় কাপড় আর কোথায় চোপড়। খাবারের ঝগড়ায় ওরা যেন বেড়াল হয়ে গিয়েছিল! মহারাণী শাসিয়ে বলে, "তিনদিন উপোস দিতে হবে।" তখন তাদের আপোস হয়ে যায়। ছিটানো খাবার কুড়িয়ে এক পাতে বসে খায়। খেতে খেতে কথা কয়, গল্প করে, ফিক্ ফিক্ হাসে!

জল্লাদী বলে, "রাগের নাম লক্ষ্মী। না রে? মহারাজ রাগ করে খায়নি। তাই খেলাম।"

আহ্লাদী বলে, "উপোসের নাম বালাই। না রে? মহারানী উপোস করে খায়নি। তাই খেলাম।"

তখন দু'জনে হাত জুড়ে বলে, "হে মা মঙ্গলচণ্ডী,—মহারাজা যেন রোজ রাগ করে, আর মহারাণী রোজ যেন উপোস দেয়।"

কিন্তু ওরা খাবার রাখে না,: রাজসিক খাবার বন্ধ হবার দিন ঘনিয়ে আসছে।

রাজপাট ভেঙে গেছে, প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছে। ডুগডুগি বাজান আর চলবে না।

রাজা ছেলেমানুষ। কোনকিছুর ধার ধারে না। লেখাপড়ার উল্টো পাড় ধরে চলে। মন্ত্রী আবদার বেড়েই চলেছে। ভাগ্যিস সারাদিন বাইরে খেলাধুলো করে। তাই আহলাদী আর জলাদী হাঁফ ছাড়ে।

মহাসেনাপতি তুখোড় লোক। শহরে ব্যবসা ফাঁদে। তলোয়ারে মানুষ কেটে পোক্ত হাত। এবার মানুষ ছেড়ে তার পকেট কাটায় মন দেয়। সত্যি আর পকেটমারের মত কাঁচি, ব্লেড দিয়ে পকেট কাটা নয়। কমদামের রদ্দি মাল বেশী দামে বিক্রীর ঠকানো ব্যবসা! খালি মুখে এট্টুখানি আদর-আপ্যায়ন দেখিয়ে গাহেকদের বলা, "নমস্কার দাদু। সস্তায় দি। আবার আসবেন।"

তারা সস্তায়, কিন্তু মুখের মিষ্টিতে বোঝে না। এ ভাবে সেনাপতির ব্যবসা ফেঁপে উঠতে থাকে।

মহাকোটালের শক্তপোক্ত কাঠামো। কোন্ দূরে লোহালক্করের কারখানায় কাজ জুটিয়ে চলে গেল।

মহাসেনাপতি শহরে বাড়ী পত্তন দেয়নি। তার অনেক খরচ। ব্যবসা আরও ফাঁপলে দেখা যাবে।

এ গাঁয়ে বাড়ী ঘর। শহরের দোকানদারি শেখাতে ছেলেকে নিয়েছিল। হালে সে ফিরেছে। সঙ্গে এসেছে ঢোল, আর শহুরে ঢোলা বোলচাল। সেই বোলে রাজার ঢালা আসর ভাঙার মত হ'ল।

সেনাপতি, কোটাল নেই। এক মন্ত্রীকে নিয়ে খেলা চলে না। তাই মোড়লের ছেলেদের ডেকে নিয়েছিল। কিন্তু তারা রাজা-প্রজা খেলতে রাজী নয়। তাই তারা গোল্লাছুট, কুস্তি, হাডুডু, আর চাষবাস খেলে। রাজাকে চিৎপাত করে। সেই খেলার আসরে সেনাপতি হেলেদুলে ঢোল বাজিয়ে বলল, "এ সব গেঁয়ো খেলা নয়। শহুরে খেলা শেখ, তা কি মজার!" সে ফট্‌ফটিয়ে বলে, "ফুটবল, হকি, ক্রিকেট দেখনি তো। দেখে ছট্‌ফটি লাগে।

সে হাত মুখ ঘুরিয়ে তা বোঝায়, আর তাক লাগান নানা তামাসার কথা জানায়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, থিয়েটার, সিনেমা, যাদুঘর, সার্কাস, মনুমেণ্ট, এস্‌প্লানেড, আরও কত কি! বাস্ রে,—দেখা দূরে থাক, এসব নাম জিভে উচ্চারণ করাই শক্ত!

সেনাপতি ফলাও করে বলে, "গাঁয়ে ডোবা, কাদা, পোক-জোঁকে কাঁদতে হয়। আর শহরে—লেক, ফুট্‌পাথ, পার্কে হাসি বেরোয়। এখানে খায় চিড়ে, মুড়ি, খৈ, গুড়, দৈ,

আর ওখানে টোষ্ট, কেক, চপ, রোষ্ট, ফ্রাই।" হোটেল, রেঁস্তোরায় বসে লোকে খাই খাই করে।" ওরা সবাই হাঁ করে শোনে। রূপকথার আজব গল্প নয়। সেনাপতির নিজ চোখে দেখা চটকদার সত্য। এট্টুখানি মিথ্যা নাই!—রাজার খেলাধূলা ভাল লাগে না। ও সব না দেখে জীবন মিথ্যা মনে হয়। সে খাওয়া ছাড়ে, নাওয়া ছাড়ে। তখন মহারাণী ধরে মহারাজাকে। কিন্তু বিদেশে যেতে পাঁজি দেখা দরকার। মহারাজা পুরুতকে খবর দেয়।

পুরুত এসে পৈতা তুলে বলে, "কল্যাণ হ'ক মহারাজ। কি সংবাদ?"

মহারাজা বলে, "রাজা শহর দেখতে যাবে। একটা জবরদস্ত দিন দেখে দিন।" পুরুত পাঁজি ওল্টায়, তারপর হে হে করে ওঠে। মহারাজার কপাল চোখ পাকিয়ে দেখে।

মহারাজ জিজ্ঞেস করে, "কি লেখা আছে?" পুরুত অং বং করে যা বলে তা কাকের ঠ্যাঙ বকের ঠ্যাঙের মত। মহারাজা তা বোঝে না। তখন পুরুত বুঝিয়ে বলে, "আপনি গজকপাল মহারাজ। ভাগ্য গজগজ করে। এতদিন এল, এতদিন গেল, কিন্তু রাজাকে অমন বায়নায় পেল না। যাই গঙ্গাচান আর সেই পুণ্যে সগগ্‌লাভের সিঁড়ি এল, অম্নি তার কান্না। এই চানযোগে শসরীলে সগ্‌গ লাভ!"

মহারাজা বলে, "সশরীরে সগগ্‌লাভ!"

পুরুত বলে, "হাঁ, মহারাজ তাই। রাবণরাজা সগ্‌গের সিঁড়ি বানাতে চেয়েছিল তো। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের হাতে আগেই মরে গেল। এখন শ্রীরামচন্দ্র হলেন স্বয়ং ভগবান। আর তাঁর হাতে মরা মানে সগ্‌গপ্রাপ্তি। সেখানে বসে রাবণরাজা সগ্‌গের সিঁড়ি বানিয়েছে। তাই নাবাবে সবার ওঠার জন্য।''

শুনে মহারাজার মন নেচে ওঠে। গঙ্গায় ক'টা ডুব দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে যাওয়া। এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে? এ যে ভুড়ুক করে তামাক খাওয়া! মহারাণী এসে পুরুতকে প্রণাম করে। পুরুত মাথায় হাত দিয়ে বলে, "মহারাণীর জয় হোক। আহা হা রাজা আপনার রত্ন ছেলে। তাকে নিয়ে এক ঢিলে দুই পাখী মেরে আসুন।"

মহারাণী বোঝে না। অবাক হয়ে চায়।

পুরুত বলে, "অর্থাৎ, রথ দেখে কলা বেচে আসুন।"

মহারাণী জিজ্ঞেস করে, "এখন রথ কোথায়?"

পুরুত বলে, "আহা রথের কথা নয়। গঙ্গা চানের কথা। তাতে সশরীরে সগ্‌গে গমন। রাজা শহর দেখতে চায়, আর দিন খুঁজে দেখি কিনা সামনে গঙ্গা চান। আপনারা তাকে নিয়ে যান। এক যাত্রায় দু'কাজ হয়ে যাবে'খন।"

এবার তারা এক ঢিলে দু'পাখী মারার, আর রথ দেখা কলা বেচার অর্থ বোঝে। অর্থাৎ এককাজে দু'কাজ করা। পুরুত প্রণামী নিয়ে বিদায় হয়। কিন্তু মহারাজা বিদায় নিতে পারে না। এবার রাজার আবদারের সঙ্গে মহারাণীর আবদার জোড় খায়। এড়ানোর জো নেই। কিন্তু মহারাজা কখনো শহরে যায়নি। সাঙ্গপাঙ্গ চাই। অথচ, এমন দিনে মহাসেনাপতি নেই, মহাকোটাল নেই। আবার এাদককার তদারকের জন্ম মহামন্ত্রীর থাকা চাই।

আহ্লাদী আর জল্লাদী মহারাণীকে বলে, "আমরা আছি কি জন্তি? ভয় কি? আমরা যাব। স্বগগ্ দেখব নি?" অগত্যা তাদের নিতে হবে।

সেনাপতি ছোট্ট ছেলে হলে কি হয়? শহুরে হয়েছে। তার অনেক সাহস। বলে, "কুছ পরোয়া নেই। আমি একলা পথ দেখিয়ে নোব।"

গোছ-গাছ করা হয়। আহ্লাদী বলে, "রথ দেখা আর কলা বেচা—এক কাঁদি কলা সঙ্গে নিলে হয়।"

জল্লাদী বলে, "এক ঢিলে দু'পাখী মারা। একশো ঢিল লিয়ে (নিয়ে) গেলে দুশো পাখী মেরে আল্‌ব (আনব)।"

মহারাণী বলে, "বোঝা বাড়াস নি। শহরে যাওয়া সোজা ঝামেলা নয়। ছেড়ে দে, সব ছেড়ে দে। মাথা গুঁজে চল।"... (ক্রমশঃ)

॥ তিন চড়ুই-এর ছড়া ॥

আবদুল মজিদ

তিনটে চড়ুই যুক্তি করে
তিন তলাটার ছাদে,
চড়ুইভাতি করতে যাবে
মঙ্গলে না চাঁদে?
কিল্‌বিল্ বিল্ পোকার মত
মানুষ চারিদিক,
ছোট্ট চড়ুই আমরা করি
কোন্‌খানে পিক্‌নিক্?
চালও আগুন, ডালও আগুন
মিল্‌ছে শুধু হিং;

কালোবাজার করছে তাড়া
উঁচিয়ে জোড়া শিং।
হবু রাজার মন্ত্রী গবু
নিত্য নতুন আইন,
খিদে পেলেই পুলিশ ছোটে
চোদ্দ টাকা ফাইন।
গোঁফ জোড়াটি বাগিয়ে হঠাৎ
হাজির হ'লো হুলো,
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ পালিয়ে গেল
ছোট্ট চড়ুইগুলো।

টাকা-পয়সার জন্মবৃত্তান্ত

শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার পাল

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তোমাদের অনেকেই আজ যতটা স্বাধীনতা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা পাও তার এক-দশমাংশ আমাদের জীবনে আমরা মা-বাবার কাছে পাইনি। সেটা প্রায় তিরিশ বছর পূর্বের কথা। কিন্তু, সেদিনের সঙ্গে আজকের অনেক তফাত। আজ তোমরা টিফিন খেতে নগদ কিছু পয়সা হাতে পাচ্ছ, কেউ বা মাঠে খেলা দেখতে টাকা পাচ্ছ, আবার কেউ বা পয়সা খরচ করে সিনেমা দেখতে যাচ্ছ। সুতরাং, এই টাকা পয়সা হচ্ছে তোমাদের এইসব আনন্দের প্রধান সহায়।

আবার দেখ, লেখাপড়া শিখে, মানুষ হয়ে, বড় চাকরি বা ভাল ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করা হয় সকলের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব, মানুষের জীবনে অর্থ বা টাকা-পয়সা অপরিহার্য বস্তু।

কিন্তু, যার জন্য এত সাধ্যসাধনা তার সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি! টাঁকশাল টাকা-পয়সা তৈরী করে, আর সেই টাকা আমরা রোজগার করে খরচ করি। ব্যস, এইটুকুই আমাদের সঙ্গে টাকার পরিচয়। তাই নয় কি?

টাকার ইতিহাস আছে, যেমন আছে সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের সৃষ্ট অন্য বিষয়। সে সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু লিখতে গেলে সেটা হবে তথ্যমূলক একটা বিরাট নিবন্ধ। সুতরাং মুদ্রার ব্যবহার মানুষ কি ভাবে সমাজে প্রবর্তন করল তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমাদের দিচ্ছি।
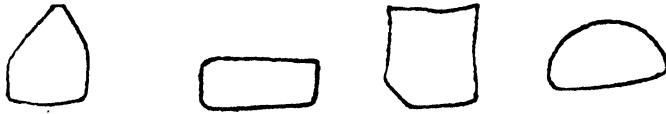
বিভিন্ন আকৃতির প্রাচীন মুদ্রা

প্রস্তর:যুগের পর মানুষ যখন ধাতুর ব্যবহার শিখল, তখন মানুষ ব্যবহারিক দ্রব্য-সামগ্রী ধাতুর পরিবর্তে বিনিময় করত (barter system), যাকে বলা যেতে পারে প্রচলিত মুদ্রা (currency); এই প্রচলিত মুদ্রাকে একটা ওজনে নির্ধারিত করা হোল, তখন একে আখ্যা দেওয়া হোল অর্থ (moneny) বা মুদ্রা; আবার এই অর্থে যখন বিশেষ ছাপ অঙ্কনের প্রবর্তন হোল, সেটা হোল সিক্কা বা টাকা-পয়সা। সুতরাং মানুষ টাকা-পয়সা তৈরী করতে ক্রমশঃ ধাতুর মূল্য নিরূপণ করল, তারপর সেই ধাতুর দ্বারা তৈরী টাকা পয়সার আকৃতি ও ওজন এবং অবশেষে তার ওপর বিনিময় মূল্য ও ছাপ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা শিখল।

প্রাচীনকালে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী ইউরোপের ভূখণ্ডে রোমান সভ্যতায় এবং গ্রীক সভ্যতায় ধাতু নির্মিত এবং ছাপ অঙ্কিত মুদ্রার বিশেষ প্রচলন ছিল। তারও আগে (খৃঃ পূঃ ২০০০) মধ্য প্রাচ্য অঞ্চলের মিশরে ফ্যারাওদের আমলে মুদ্রার বিশেষ প্রচলন ছিল। এই প্রকার মুদ্রিত অর্থ ভারতে প্রবর্তন হয় আনুমানিক বুদ্ধদেবের সময়ের কিছু পূর্বে।
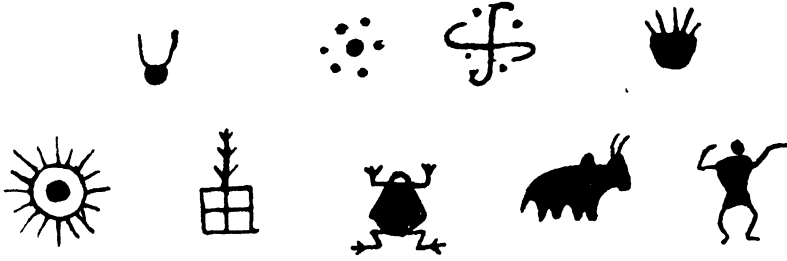
প্রাচীন মুদ্রার বিভিন্ন ছাপের নমুনা

এইভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে মুদ্রার প্রবর্তন হয়েছে এবং শাসক, তিনি সম্রাটই হোন বা রাজা বা আর কিছু হোন, তাঁর রাজত্বে তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রায় বিভিন্ন আকৃতি এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করে গেছেন। সব ক্ষেত্রেই যে মুদ্রার আকৃতি গোল হয়েছে তা নয়, কেউ বা লম্বা ধরণের কিংবা চতুষ্কোণ, আবার কেউ ত্রিভুজাকৃতি ক'রে গেছেন। মুদ্রার আকৃতি এবং ওজন যাই হোক না কেন, মুদ্রা যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারক ছিল তাই নয়, এর মাধ্যমে সেই রাজত্বের শাসকের সভ্যতা ও সংস্কৃতিক-প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

মুদ্রার ক্রমোন্নতি

Barter system বা বিনিময় পদ্ধতির পর মুদ্রা যখন প্রবর্তিত হোল, সেটা punch system বা হাতুড়ি জাতীয় ভারী ওজনের জিনিসের দ্বারা চাপ দিয়ে বা আঘাত করে ছাঁচের ছাপ চাকতিতে লাগান হোত। এ ছাড়া আরও দু'রকম পদ্ধতিতে মুদ্রা তৈরী করা হোত। ধাতুকে গালিয়ে ছাঁচে ঢেলে যে মুদ্রা তৈরী হোত, তাকে বলা হোত ঢালাই মুদ্রা এবং আর

একটি হচ্ছে, কোন শক্ত বা কড়া ধাতুতে মুদ্রার প্রতিকৃতির উল্টো ছাপ দিয়ে, তার ওপর চাকতি বসিয়ে, পুনরায় ভারী ওজনের সাহায্যে ছাপ দিয়ে মুদ্রা তৈরী হোত। খৃঃ পূঃ ৩০০ শতক থেকে ১৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে মুদ্রা তৈরীর নজির পাওয়া যায়। মুদ্রা তৈরীর আধুনিক পদ্ধতি, উপরের ঐ শেষোক্ত প্রক্রিয়ার উন্নত পদ্ধতি মাত্র, যা যান্ত্রিক উন্নতির জন্যে আজ সাধিত হয়েছে।

মুচি (১নং চিত্র

(২নং চিত্র)

(পরবর্তী পাতায় এই চিত্রগুলির উল্লেখ আছে।)

চুল্লী ও ছাঁচ (১নং চিত্র)

ভারতের ইতিহাসে যে সব জাতির উল্লেখযোগ্য উত্থান হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকরই নিজস্ব প্রচলিত মুদ্রা ছিল। আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে যে মুদ্রা প্রচলন করেন, সেটা 'আলেকজনড্রয়' নামে পরিচিত। তারপর পাওয়া যায় সাকা-পল্লভ বংশের মুদ্রা। এর পর পাওয়া যায় কৌশাম্বী, পাঞ্চালা, মথুরা প্রভৃতি স্বাধীন উপজাতীয় নৃপতিদের মুদ্রা।

এরপর কুশান বংশের রাজারা যে সব মুদ্রা তৈরী করেন, মুদ্রার ইতিহাসে সেগুলি উল্লেখযোগ্য; কারণ এইসব মুদ্রা সোনা, রূপা এবং তামার তৈরী। কুশানদের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানে মুদ্রার সম্প্রসারণ খুব ব্যাপক হয়। এরপর মধ্যযুগীয় হিন্দু বংশে হূনদের মুদ্রা উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে কাশ্মীরের নাগা রাজাদের মুদ্রায় কুশান বংশের মুদ্রার প্রভাব

দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় রাজাদের প্রবর্তিত মুদ্রার মধ্যে চোল রাজাদের মুদ্রায় তাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

দিল্লীর সুলতান বংশের আমলে যে সব মুদ্রা প্রবর্তিত হয়, তাইতে কোন মূর্তির প্রতিকৃতি সাধারণতঃ থাকত না। পরিবর্তে সুলতানদের নাম, খেতাব এবং পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ থাকত। তবে কালীমার প্রতিকৃতি বিশিষ্ট কিছু মুদ্রাও সেই সময় তৈরী হয়েছিল।

ইনগট্ ([illegible]নং চিত্র)
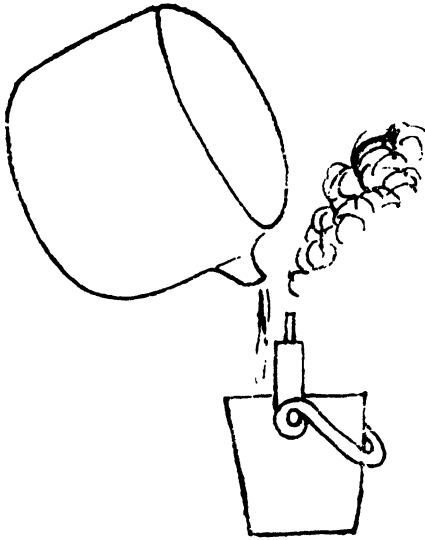
চুল্লী (৩নং চিত্র)

(পরের পৃষ্ঠায় এই ছবির উল্লেখ আছে।)
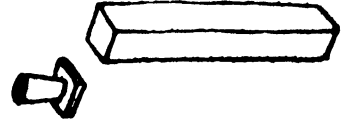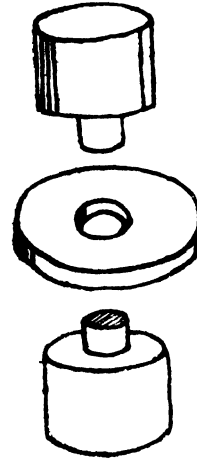
মুদ্রার ছাঁচ (৭নং চিত্র)

সুলতানদের পতনের পর ভারতে মোঘল বংশের পত্তন করেন বাবর। বাবরের প্রবর্তিত মুদ্রায় ভারতে উর্দূ ভাষার প্রথম প্রচার হয়। ঔরঙ্গজেবের শিল্পরস বোধ ছিল না; তাই তাঁর আমলে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার সূক্ষ্মতার অবনতি হয় এবং ক্রমশঃ অতি মামুলি ধরণের মুদ্রা তৈরী হয়।

ইতিমধ্যে মুদ্রার ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তনসাধন করেন পাঠান বীর শের সাহ। তিনিই প্রথম ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন প্রচলিত টঙ্কার নামকরণ করেন 'রুপাইয়া' এবং ওজন নির্ধারিত করেন ১৭৯ গ্রেণ।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তন করে, অবশ্য ভারতীয় ধরণে বা রীতিতে। সেই সময়ে ভারতের বুকে ফ্রান্স, ওলন্দাজ এবং পর্তুগীজরা কোন কোন অঞ্চল দখল করে রাজত্ব করেছে এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব মুদ্রাও প্রবর্তন করেছিল।

ভারতের ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে ক্রমশঃ ইংরাজরা প্রায় গোটা দেশটায় প্রভুত্ব বিস্তার করল। কোম্পানীর রাজত্বকালে প্রথমে তিনটি টাঁকশাল স্থাপিত হয় বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ইংরাজ সরকার কর্তৃক মাদ্রাজের টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইংরাজ শাসনকালে অবশ্য কয়েকটি দেশীয় নৃপতি নিজস্ব টাঁকশালে নিজেদের মুদ্রা ছাপতে থাকেন। এদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজামের নিজস্ব টাঁকশালই প্রধান এবং এইটি বর্তমান ভারতের তৃতীয় টাঁকশাল।

মুদ্রা প্রবর্তন এবং টাঁকশালের এটাই হোল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আজকের যুগে ভারতের তিনটি টাঁকশালে যে পদ্ধতিতে যাবতীয় মুদ্রা এবং বিভিন্ন মেডেল বা পদক তৈরী হয়, সেটা গত দু-হাজার বছর পুরানো পদ্ধতিরই অনুকরণ। তবে, অনেক উন্নত ধরণের এবং যান্ত্রিক উপায়ে সেগুলি তৈরী করা হয়। সুতরাং, আমরা এবার পুরাণ এবং ইতিহাসকে ছেড়ে আজকের যুগে চলে আসি।

কলিকাতায় প্রথমে গঙ্গার ধারে যে টাঁকশাল ছিল, সেটা স্থাপিত হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। ইংরাজরা নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কাছে যে বাণিজ্যিক সনদ পায়, এটা সেই সনদের অন্যতম সর্ত। গত মহাযুদ্ধের পর মাঝেরহাট পুলের পাশে নব-নির্মিত টাঁকশালটির ১৯৫২ সালে দ্বার উন্মোচন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ।

আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে টাকা পয়সা তৈরী হয় সেটা জানতে হ'লে আমাদের এই টাঁকশালে যাওয়া দরকার।

টাঁকশালের প্রথম বিভাগের নাম ১নং গালাই ঘর। এখানে দু'সারিতে অনেকগুলো চুল্লী বা ফার্ণেস আছে। এইসব চুল্লী তেলের সাহায্যে জ্বলে। চুল্লীর মধ্যে আছে মুচি (crucible) ১নং চিত্র, মুচির মধ্যে ধাতুকে গলান হয়। এইসব চুল্লীতে নিকেল এবং ঐ রকম কঠিন ধাতু ছাড়া আর সব ধাতুকে গলান যায়, যার জন্য ১২০০° সেঃ গ্রেডের চেয়ে বেশী উত্তাপ দরকার হয় না। ধাতু গলে গেলে তাকে ঢালা হয় লম্বা এবং চ্যাপ্টা ধরণের ছাঁচে (mould) ২নং চিত্র; এই ছাঁচ ঠাণ্ডা হবার পর ধারগুলো মেশিনে চেঁচে বা ছিলে ওজন করে পাঠান হয় বেলন ঘর বা রোলিং বিভাগে।

২নং গালাই ঘরে আছে বাটির মত বড় বড় চুল্লী, ৩নং চিত্র। এই সব চুল্লী বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে এবং প্রায় ১৪০০° সেঃ গ্রেড উত্তাপ উৎপাদন করা হয়। এই সব চুল্লীতে নিকেল বা ঐ রকম কঠিন ধাতুকে গলান হয়। গলিত নিকেলকে বিশেষ ধরণের বালতিতে (ladle) ঢেলে ৪"×৪" চৌক এবং প্রায় আড়াই ফুট লম্বা ছাঁচে ঢালা হয়। এই জাতিয় ছাঁচকে বলা হয় ইন্‌গট্ (ingot), ৪নং চিত্র। ইন্‌গট্ ঠাণ্ডা হ'লে
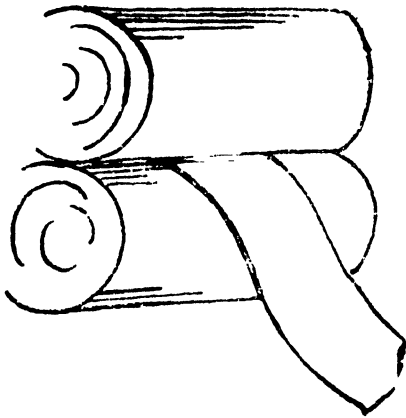
বেলন (৫ নং চিত্র)

মাথার এবড়ো-খেবড়ো অংশটুকু কেটে বাকি অংশ বেলন ঘরে পাঠান হয়। অবশ্য ওজন করে মালের হিসাব রাখা হয়।

এবার বেলন ঘর দেখা যাক। তুটো ঢালাই ঘরের মাল এসেছে বেলন ঘরে। প্রডিউসার গ্যাস প্লাণ্টে (producer gas plant) কোক্ কয়লা থেকে মনক্সাইড্ গ্যাস তৈরী করে পাঠান হচ্ছে ধাতুকে নম্র করার চুল্লীতে (annealing furnace)। এই রকম তুটি বড় চুল্লী আছে এখানে, যার একটিতে নিকেল ইন্‌গট্‌কে ৭০০° সেঃ গ্রেড উত্তাপ দিয়ে নম্র করা হয়। তারপর সেই তপ্ত লাল ইন্‌গট্‌কে গরম বেলন কলে (hot rolling mill) ক্রমাগত চালিয়ে সওয়া এক ইঞ্চি চৌক এবং লম্বায় ছ'ফুটের জায়গায় প্রায় বিশ ফুট করা হয়। আবার এইগুলি ঠাণ্ডা হ'লে ছোট ছোট টুকরো করে ঐ জাতীয় দ্বিতীয় চুল্লীতে নম্র করে গরম অবস্থায় বেলন কলের সাহায্যে লম্বা লম্বা পাতে পরিবর্তিত করা হয়।
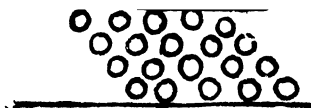
মুদ্রা তৈরীর পর ধাতুর পাত

এইবার এই সব পাত এবং ১নং গালাই ঘরের পাত জাতীয় ছাঁচ ঠাণ্ডা বেলন কলে চলে এলো। ১৮" ব্যাস থেকে ১০" ব্যাস যুক্ত বেলনে পাতগুলিকে প্রয়োজন মত পাতলা করা হয় এবং পাতগুলি লম্বায় বিস্তৃতিলাভ করে, ৫নং চিত্র। এর পর প্রতিটি পাত থেকে নির্দিষ্ট মুদ্রার মাপ অনুযায়ী একটি করে চাকতি কেটে ওজন এবং মাপ পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। পাতগুলি যদি ঠিক থাকে তবে পাঠান হয় চাকতি তৈরীর যন্ত্রে (blanking press)। কয়েকটি সারিতে এই যন্ত্রগুলি চলছে। প্রতিটি যন্ত্র আঘাতের দ্বারা পাত থেকে চাকতি কেটে কেটে ফেলছে। মিনিটে ১৫০ বার পর্যন্ত আঘাত করতে পারে এবং প্রতি আঘাতে তিন থেকে আটটি পর্যন্ত চাকতি কাটতে পারে এই যন্ত্র।

Coining process বা মুদ্রা তৈরীর প্রক্রিয়ার এটাকে ধরা যেতে পারে মাঝামাঝি অবস্থা।

এইবার চাকতিগুলিকে বেছে নেওয়া হোল। কাটা বা নষ্ট চাকতি সমেত পাতের অবশিষ্ট অংশ (scissal) ফেরত চলে যায় ১নং বা ২নং গালাই ঘরে পুনরায় ব্যবহারের জন্য। আর বাছাই করা ভাল চাকতিগুলিকে এবার দেওয়া হবে পাশের ঘরের উজ্জ্বল ও নম্র করার চুল্লীতে (bright annealing furnace)। কারণ, ছাপাই ঘরে যাওয়ার পূর্বে চাকতিগুলিকে নম্র অথচ চক্‌চকে করে নেওয়া দরকার।

চাকতিগুলি নম্র হবার পর সাবান জলে ধুয়ে তেলমুক্ত করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর ওজন করে এদের পাঠান হয় stamping department বা ছাপাই ঘরে। এখানে সমস্ত ছাপাই মেশিনগুলি স্বয়ংক্রিয় নয় এবং এক ধরণের নয়। অতি আধুনিকতম অটোমেটিক মেশিনগুলি প্রতি মিনিটে ১৫০টি পর্যন্ত চাকতি ছাপতে পারে। পুরানোগুলি ১২০টি পর্যন্ত ছাপতে পারে। এইসব মেশিনে মুদ্রার die বা ছাঁচ লাগান হয়। যেহেতু টাকা বা পয়সার দু-পিঠেই ছাপ আছে, সেইজন্য প্রতি ক্ষেত্রে একজোড়া ছাঁচ দরকার এবং এদের বলা হয় top die ও bottom die। এই দুই ছাঁচের মাঝে চাকতিতে যখন ছাপ পড়ে, সেটা তখন যাতে চাপের চোটে ছিটকে না যায় বা বড় না হয়, সেই জন্য একটা বলয় (color) দেওয়া হয়; ৭নং চিত্র। কেবলমাত্র কলিকাতার টাঁকশালেই দৈনিক গড়ে প্রায় তিরিশ লক্ষ মুদ্রা ছাপা হয় এবং তিনটি টাঁকশালের মিলিত উৎপাদন অন্যূন ষাট লক্ষ।

তৈরী টাকা-পয়সা এবার চলে যাবে পরীক্ষকদের কাছে। শেষবারের এই পরীক্ষায় পাশ হবার পর, ওজনের দ্বারা হিসাব করে থলে ভর্তি করা হয় এবং রিসার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠান হয়। আবার রিসার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র ও ট্রেজারী থেকে মুদ্রাকে ছেড়ে দেওয়া হয় জনসাধারণের হাতে—দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

টাকা-পয়সা ছাড়া সরকারী বা বেসরকারী পদক তৈরীর জন্যও টাঁকশালের প্রসিদ্ধি আছে। ভারত-রত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, বিশিষ্ট সেবা পদক, মহাবীর চক্র, পরম বীর চক্র, বীরচক্র প্রভৃতি আরও অনেক বিখ্যাত পদক এই টাঁকশালেই তৈরী হয়।

জাতির সেবায় এবং আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও, দেশের অপরিহার্য বস্তু সেই মুদ্রা তৈরীর কাজে ভারতের তিনটি টাঁকশাল নিয়মিত ভাবে যুগপৎ দেশের সেবায় মুদ্রা তৈরী করে আপন কর্তব্য সম্পাদন করেছে।*

---

* মুদ্রা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং ভারতীয় নিউমিসমেটিক সোসাইটির অন্যতম সদস্য শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচনাটি সংশোধিত ও সমর্থিত।

কাঁদুনে বৌ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

এক ছিল ভিখিরী। ভিক্ষা করাই তার ব্যবসা। ভিক্ষা করতে বের হয়ে যায় সকালবেলা ফেরে সন্ধ্যে হলে।

ভিখিরী লোকটি খুব ফুর্তিবাজ। হাসিখুশি আর আমুদে। গান গেয়ে গেয়ে সে ভিক্ষে করে বেড়ায়। তার মুখে সারাক্ষণ গান লেগেই আছে।

কিন্তু ওর বৌয়ের স্বভাবটা আবার বিপরীত। ও হাসতে জানে না ; সন্তুষ্টি নেই কোনো কিছুতে। আর, সে কেবলই কাঁদে, কখনো নিঃশব্দে, কখনো বা হাউ হাউ করে। রাতদিন কেবল কান্না আর কান্না।

বেচারা ভিখিরী ! কি করে বৌয়ের কান্না থামবে বুঝতে পারে না। কি বলে তাকে শান্ত করবে জানে না। শুধু বলে, লক্ষ্মীটি আর কেঁদো না, থামো।

সকালবেলা বাড়ি থেকে বের হবার সময়ে একবার বলে,—লক্ষ্মীটি কেঁদো না, চুপ কর, দোহাই তোমার। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেও বলে, লক্ষ্মীটি কেঁদো না, চুপ কর, দোহাই তোমার।

শেষ পর্যন্ত এই দুটি কথা বলা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কী রকম ? বলছি।

এই সেদিন সকালবেলা ভিখিরী গেছে পাড়ার দোকানে নুন কিনতে। দোকানে তখন দোকানী ছিল না, ছিল দোকানীর বৌ। ভিখিরী তো অভ্যাস মত ওকেই বলে ফেলল, লক্ষ্মীটি কেঁদো না, চুপ কর, দোহাই তোমার।

আর যায় কোথা ? দোকানী-বৌ তেড়েমেড়ে এল, গালাগাল দিতে লাগল। বেগতিক দেখে ভিখিরী পালাল ওখান থেকে। নুন কেনা আর হ'ল না।

বাড়ি ফিরে এসে দেখে বৌ কাঁদছে। বলল, কেঁদো না লক্ষ্মীটি, চুপ কর দোহাই তোমার। বলেই নুনের পয়সাটা ওর সামনে ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়ল।

যেতে যেতে শুনতে পেলো বৌ গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

গান গেয়ে গেয়ে চলল ভিখিরী।

সে একটা গানই গাইত ঘুরে-ফিরে। গানের শেষ কলিটা খুশি মতো বদলে নিত।

দিনটা ছিল ভাল। সোনালী রোদ, ঝিরঝিরে হাওয়া।

যেতে যেতে পথে দেখা হ'ল এক চাষার ছেলের সঙ্গে। সে পাঁচটা ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে ছাগল নিয়ে ?—ভিখিরী জিজ্ঞেস করল।

—যাব চৌরাস্তার মোড়ে।

—বেশ, বেশ। আমিও যাচ্ছি চৌরাস্তার মোড়ে।

ভিখিরী জুটে গেল ওর সঙ্গে। দড়ি হাতে করে ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চলল। খুব ফুর্তি।

চাষার ছেলেকে বলল, তুই গান জানিস ?

ও বলল, না।

—তাহলে আমার গান শোন। আমি একটা গানই সাত রকম সুরে গাইতে পারি। শুনে বল দেখি, কোনটা তোর ভাল লাগল।

এই বলে ভিখিরী শুরু করল গান। কিন্তু তিন রকমে গেয়েই সে থেমে গেল।

ঐ পথেই চলেছে এতটুকু এক ফুটফুটে মেয়ে। যেন একটি পরী। গায়ে ফুলকাটা রংবেরঙের জামা। একটা বাচ্চা ছেলে ওর মাথার উপরে মেলে ধরেছে এক রঙিন ছাতা।

ভিখিরী এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ খুকুমণি ?

ফুটফুটে মেয়েটি বলল, ইস্কুলে ; সে-ই চৌরাস্তার মোড়ে।

—বাঃ। আমরাও তো সেই চৌরাস্তার মোড়েই যাচ্ছি ? চমৎকার !

ছাগলগুলো দেখে খুকুমণির খুব আনন্দ। দড়ি ধরে সেও একটা ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

হৈ হৈ করে সবাই মিলে চলছে।

গান গাইছে ভিখিরী। কিন্তু এবারেও গানটা তিন বারের বেশি গাওয়া হ'ল না।

দেখা হয়ে গেল একটা গোঁফওলা লোকের সঙ্গে। ওর কাঁধে ঝুলছে পাঁচটা পাখির খাঁচা, পাঁচটা খাঁচায় পাঁচটা তোতাপাখি।

ওদের দেখে ঐ গুঁফো লোকটা বলল, আচ্ছা, এই পথ ধরে চৌরাস্তার মোড়ে যেতে পারব ?

ভিখিরী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হাঁ, হাঁ, পারবে বৈকি ? চল, আমরাও তো সেখানেই যাচ্ছি।

—তাহলে তো ভালই হ'ল, বলে পাখির খাঁচাওলাও চলল ওদের সঙ্গে।

সবাই মিলে হৈ হৈ করে ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

ভিখিরী আবার গান ধরেছে। কিন্তু এ যাত্রাও মাত্র তিন রকমে গেয়েই হঠাৎ সে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

'তাড়াতাড়ি ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়ল।' পৃঃ—৪৭৭

সঙ্গীরা সকলেই অবাক হয়ে বলে উঠল: কী হ'ল, কী হ'ল, থামলে কেন?

ছাগলগুলোও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল।

ভিখিরী বলল, ঐ যাঃ! ভুল রাস্তায় এসে পড়েছি। ঐ যে দেখছ একটা তাল-গাছ আর তার তলায় একটা কুঁড়ে ঘর? ও দেখেই বুঝতে পারছি। এক ডাইনি বুড়ি থাকে ঐ কুঁড়ে ঘরটায়। আজ আবার বিষ্যুদবার। আমারই ভুল হয়েছে। বিষ্যুদবারে কখনও আমি এই পথে আসিনে। এখন আবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে নতুন করে যাত্রা করব। বাড়ি থেকে বার হবার সময়ে আমার বৌ কান্না শুরু করে দিল কিনা, তাই সব গোলমাল হয়ে গেল।

এই কথায় ওরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠল: এ্যাঁ, এ্যা বল কি? তোমার বৌ কাঁদে? আহা বেচারি!

তারপর সেই ভিখিরী আর চাষার ছেলে, আর ফুটফুটে পরীর মত মেয়েটি ও তার বাচ্চা চাকরটা, আর তোতাপাখির খাঁচাগুলা—সকলেই ফিরে চলল। ছাগলগুলো তাড়িয়ে নিয়ে চলল—গিয়ে উপস্থিত হ'ল ভিখিরীর বাড়িতে।

ভিখিরী বলল, তোমরা একটু দাঁড়াও; দেখেনি এটাই আমার বাড়ি কিনা।

মাঝে মাঝে আবার ভুল হয়ে যায় আমার। এই বলে সে ঢুকে গেল ভেতরে, চার দিকে নজর করে দেখল আসলে ওটা তার বাড়ি কিনা। তার বৌ-ই বা কোথায়? হাঁ, তার বাড়িই তো এটা! এই যে তার বৌ বসে বসে কাঁদছে, নুনের পয়সাটা তার হাতে। বলল, লক্ষীটি, কেঁদো না থামো, দোহাই তোমার!

তারপরে একে একে পাঁচটা ছাগল ঘরে ঢুকে পড়ল; আর পেছন পেছন চাষার ছেলে ফুটফুটে মেয়েটি ও তার বাচ্চা চাকরটা, আর তোতাপাখির খাঁচা কাঁধে গুঁফো লোকটা।

সকলেই একসঙ্গে বলে উঠল, লক্ষীটি কেঁদো না, থামো, দোহাই তোমার।

তোতাপাখিগুলো বলতে লাগল, লক্ষীটি, কেঁদো না, থামো, দোহাই তোমার।

ছাগলগুলোও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল।

ভিখিরীর বৌ তো ব্যাপার দেখেশুনে অবাক। থেমে গেল তার কান্না।

তখন চাষার ছেলে একটা ছাগল দিল তাকে। ফুটফুটে পরীর মতো মেয়েটি ওকে দিল তার রঙিন ছাতাটা, আর ঐ পাখিওলা দিল একটা তোতাপাখি ও একটা খাঁচা।

এত সব পেয়ে কাঁদুনে বৌ তো খুব খুশি। ওদের কাছে প্রতিজ্ঞা করল আর কখনও সে কাঁদবে না।

পেটুকের সাজা

শ্রীকরুণাময় বসু

নন্দী বুড়ো মোতির খুড়ো সেবার গেল রাইগঞ্জে,
এটা কিনছে, কিনছে সেটা, কেবল খাই খাই মন যে।
খাস্তা গজা, সর ভাজা যে, গণ্ডা দশেক চন্দ্রপুলি,
একটি কড়া রসবড়া তাও, আম কিনেছে পেয়ারাফুলি।
মুড়ির মোয়া, কাঁঠাল কোয়া, দিস্তে কয়েক পাঁপরভাজা,
মণ্ডা কেনে ঠাণ্ডা হয়ে, আনারসের দশটি তাজা।
আমড়া কেনে ধামায় করে, হরেক রকম জিনিস কিনে,
ফিরছে বুড়ো হনহনিয়ে বৃষ্টি ভেজা মেঘলা দিনে।
পিছল পথে হিজল বনে পা হড়কে পড়ল সে যেই,
খাবার গেল কাবার হয়ে ছড়ছড়িয়ে সেই পথেতেই:
কপাল ছিঁড়ে রক্ত পড়ে, পেটুক হবার যেটুক সাজা,
গামছা ছিঁড়ে আমড়া গেল, কাপড় ছিঁড়ে পাঁপরভাজা।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'সমস্যা' কথাটা কানে যেতে-না-যেতে চোরামাণিক্য 'গণিতজ্ঞ' মার্কা মুখোস মুখে আঁটলো।

ডাক্তার বললে, "ব্যাপার তো অত্যন্ত সঙ্গীন দেখছি। এই বিশাল আশ্চর্য নগরে এমন কেউ নেই যে বলতে পারে, আগে প্ল্যান না আগে ইমারৎ!"

গুগলি ঝিনুক এবার বলে উঠলো, "মাথা ব্যথা!" পরচুলওলারা চেঁচাতে লাগল, "ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা।"

রকম-সকম দেখে কাক এতক্ষণ চশমা খুঁজছিল। পাচ্ছিল না বলে কিছু বলতে পারেনি। কাক আবার চশমা চোখে না দিলে শুনতে পায় না। এবার চশমা খুঁজে চোখে লাগিয়ে বললে, "মাথা ব্যথা, হেড্‌ডেচি।"

এতক্ষণে সারস সার্জেণ্ট কাকীবুড়ীকে সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলের উপর বসিয়ে হাজির করলো।

চোরামাণিক্যের পিঠে এতক্ষণে বহু মাছের কাঁটা বিঁধেছিল। মূর্খ লোকেরা তার পিঠ তাক করে এই দুষ্কর্ম করছিল। সারস সার্জেণ্ট এসে একে একে সেগুলো তুলে পরিষ্কার করে দিতে লাগল।

ইতিমধ্যে জেলখানার ভ্রমণে—আর তার ধাক্কায় আহত লোকেরা আসতে লাগল চিকিৎসার জন্যে।

খুড়ো আশ্চর্য হয়ে দেখলে আহতদের মধ্যে বেশীরভাগই ইঁদুর। এদের কাজ ছিল আখ গাছে জল দেওয়া। এদের অনেকের একটা পা অপরটার দেড়া বড়, বা একটা হাত অন্য হাতের চেয়ে দেড়া লম্বা—কারো নাকটা সাত হাত লম্বা কারো বা লেজ দশ বারো চোদ্দ হাত।

একজন পরচুলওলা খুড়োর কানে কানে বলে উঠল, "ওরা নিশ্চয় গরম সায়াবীনের চাট্‌নি পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেছিল।"

খুড়ো বললে, "সে আবার কি?"

পরচুলওলাটার নাম ওলট্ কম্বল। এর মাথাটা ঢাউস পরচুলে ঢাকা। এর হাতে একটা কেট্‌লী। এ কথা বলে আর কেট্‌লী থেকে এক ঢোক করে জল খায়।

এ বলতে লাগল:

"কয়েদীকে জানো তো। ঐ যে যার নাম 'য র ল ব'—ওর মাথায় বেজায় বুদ্ধি। ওর মতলব ছিল সকলকে পঙ্গু করে দেওয়া। নিশ্চয়ই তুমি দেশলাই দেখেছ—সেই যে ফোঁস্ করে আগুন জ্বলে।—আচ্ছা, জেলখানা তো দৌড়ে আসছিল—যেই জেলখানা পার হ'ল অমনি গুগলি ঝিনুক দৌড়ুল প্ল্যানগুলো বাঁচাবার জন্যে। সে জেলখানাকে তাড়া করে পিছনে পিছনে দৌড়ল—থামো—থামো—

কয়েদী য র ল ব তো তাকে থোড়াই কেয়ার করে। সে বললে, "বয়ে গেছে তোর কথা শুনতে।"

ইঁদুররা আপত্তি করে বললে, "উঁহু, উঁহু—ও রকম কিছু হয়নি।"

ওলট্ কম্বল বক্তৃতায় বাধা পেয়ে চট করে এক ঢোক জল খেয়ে তাদের তেড়ে গেল, "তুমি কি বলতে চাও কয়েদী ওদের একটা দেশলাইয়ের বাক্স দেখায় নি?"

ইঁদুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "নিশ্চয়ই না।"

খুড়ো ইঁদুরটাকে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, তবে কয়েদী সত্যি সত্যি কি করেছিল তুমিই বলো—"

ইঁদুর বললে, "য র ল ব দেশলাইয়ের কাঠি বাক্সে ঘ'ষে জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে আখের মধ্যে দিয়ে গুগলি ঝিনুকের দিকে এগিয়ে দিলে। তাই না দেখে গুগলি ঝিনুক ভয়ের চোটে ভোঁ-দৌড় আর দৌড়তে গিয়ে তার পা ভেঙে গেল।"

ওলট্ কম্বল বলে উঠল, "একজ্যাক্‌ট্‌লি, আমারই ভুল হয়েছে।"

ইঁদুরটা বললে, "গুগলি ঝিনুক জানত যদি দেশলাইয়ের কাঠি চাট্‌নিতে পড়ে তবে সব কিছু বাড়তে থাকবে—সেই জন্যেই সেই চাটনি লেগে দেখো আমাদের হাত, পা, নাক আর লেজের অবস্থা !"

এতক্ষণে খুড়ো কিছুটা বুঝলে। বুঝলে, কেন ইঁদুরদের পায়ে গামবুট, কেন কেউ কেউ গেলে কাঠের ঠেকনো দিয়ে হাঁটে—একটা পা বড় বলেই তো ! এদেশে চাট্‌নি বড় দরকারী। চাটনি দিয়ে সবকিছু বাড়ায়। মাছি যেমন এদের চেটে খেয়ে ফেলে—তেমনি চাট্‌নি লাগলে এরা বাড়তে থাকে।

ডাক্তার এবার চিকিৎসা শুরু করে দিলে। একজন করে রোগী ধ'রে তার মুখে ফানেল লাগিয়ে, মস্ত মোটা বোতলের ওষুধ ঢালে বগ্‌ বগ্‌ করে—আর ওষুধ খেয়ে ইঁদুররা অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ডাক্তার তখন গজ ফিঁতে দিয়ে তাদের দু'হাত, দু পা মেপে নিয়ে বাড়তি অংশ করাত দিয়ে কেটে গালা আর গঁদ দিয়ে জুড়ে ঠিক করে দেয়।

চিকিৎসা বিদ্যুৎগতিতে চলতে থাকায় অতি অল্পক্ষণেই কাজ শেষ হয়ে গেল।

ডাক্তার কম্পাউণ্ডার জিনিসপত্র নিয়ে গাধায় টানা চেয়ারে করে চলে গেল।

কাছেই একটা গোলটেবিল পাতা ছিল। সেরে উঠে ইঁদুরটা একটা গোল বেঞ্চিতে সারি দিয়ে বসলো। তারপর ব্যাঞ্জো, বেহালা, তাণপুরা, গীটার, এস্রাজ, ঢোলক ইত্যাদি এলো—সেগুলো নিয়ে সকলে কঁ্যা কোঁ পিড়িং পিড়িং সুর তুলতে লাগল। হঠাৎ জোরে একটা রামশিঙা বেজে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেট এবং সানাই। সুরের সুরধুনী বইতে লাগল সেখানে।

যখন এদেশে কোন মহামারী বা বড় রকমের রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং তা থেকে সবাই আরোগ্যলাভ করে, তখন এই রকম গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়।

কনসার্টের পর রোগীদের আনন্দ দেবার জন্যে কয়েকটি সুন্দরী বালিকা সেজেগুজে নাচতে এল। তারা কিছুক্ষণ নানা ভঙ্গীতে নাচ দেখাবার পর ইঁদুরদের কয়েক জন ওদের টেনিস্ খেলতে অনুরোধ করলে।

তখন আটজন খেলোয়াড় দু' দলে ভাগ হয়ে মাঠে নামল।

মাঠের চারকোণে দুটো করে চায়ের কাপ বসানো হ'ল—এর মধ্যে বল এসে পড়বে। সবশুদ্ধ আটটা কাপ রাখা হ'ল।

গোলাপী একটা ফিঁতে মাপ বরাবর টাঙিয়ে কোর্ট ভাগ করা হ'ল। ফিঁতের দু'দিকে

চারজন করে খেলোয়াড় দাঁড়ালো। একজনের পিছে একজন, তার পিছে একজন—এইভাবে দাঁড়ালো তারা।

দু'দলের দু'জন করে ক্যাপ্টেন লজেন্সের সুতোর র‍্যাকেট হাতে নিলে, আর বাকী দু'জন নিলে পার্চমেন্ট কাগজের র‍্যাকেট।

দু'টো গাড়ীতে করে একরকম স্বচ্ছ আঠালো পদার্থ আনা হ'ল। একজন নর্তকী লম্বা ফাঁপা নলে ফুঁ দিয়ে সাবানের বলের মত বুদ্বুদ ওড়াতে লাগলো। র‍্যাকেট করে খেলোয়াড়রা সেই বুদ্বুদগুলোকে মারতে লাগল আর তারা ফেটে শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল।

এইভাবে কয়েকটা বল মিলিয়ে গেল।

তারপর একটা সোনালী চুড়িদার নীল বুদ্বুদ র‍্যাকেটে লেগে র‍্যাকেট ভেদ করে স্থির হয়ে শূন্যে দাঁড়িয়ে রইল। তখন পার্চমেন্ট কাগজের র‍্যাকেটধারিণী দু'জন টস্ করলে। একজন ফর্সা মেয়ের জিত হ'ল টসে—সে এগিয়ে এলো নেচে নেচে; তারপর টুক করে ব্যাট দিয়ে মেরে বলটাকে একটা চায়ের কাপের দিকে এগিয়ে দিল। বলটা ধীরে ধীরে কাপের মধ্যে চলে গেল।

এই রকম খেলা চলতে লাগল—আটটা কাপে আটটা বল এইভাবে এসে পড়ল। তখন খেলা শেষ হ'ল। সব খেলুড়ে পরস্পর আলিঙ্গন করে যে পথে এসেছিল সেই পথে নাচতে নাচতে চলে গেল।

তারা যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন খুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, "এদের জিত হ'ল?"

আশ্চর্য নগরের সবাই কথাটা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল—কথাটার অর্থ যেন তারা বুঝতে পারলো না।

টেবিলের তলায় সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলের মধ্যে বসে কাকীবুড়ী বললে, "বুঝলে না কথাটা! খেলা মানে খেলা—আনন্দ আর খুশি। এতে আবার হার-জিত কি? একি যুদ্ধবিগ্রহ? যে এক পক্ষকে হারতে হবে!" (ক্রমশঃ)

॥ জেনে রেখো ॥

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী

শরীরের দশগুণ
বোঝা টানে পিঁপড়ে,
কাজে তা'র জুড়ি নেই
হিপ্ হিপ্ হিপ্ রে।

সকলের অগোচরে
মাটি তোলে কেঁচো,
কত সে যে উপকারী
জানে না তা' পেঁচো।

ফেলে আসা দিনগুলি

শ্রীসমর দে

এবার, রাজশেখর বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষাতের কথা—বলতে ইচ্ছে করছে।

কেন না, শেষের সাক্ষাতের দিনগুলো আর প্রথম সাক্ষাতে যে আশ্চর্য যোগাযোগ ও আপনজনের মত স্নেহের টান, একমাত্র যাঁর কৃপা হলে তা পাওয়া যায়! তিনিই বা কেন বিগ্রহরূপে, সাক্ষীর মত উপস্থিত থাকবেন সেদিন?

তবে দ্বিতীয় সাক্ষাতে, হতাশা না আশা নিয়ে ফিরছি—সে দৃশ্য যিনি দেখলেন, তিনিই যে অলক্ষ্যে থেকে উদ্যমীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই বা আমার ঐ দুঃসময়ে মনে বিশ্বাস জন্মাবে কি করে?

পরে উপলব্ধি করেছি, আলো ও ছায়া ছাড়া যেমন ছবি ফোটে না, তেমনি একটু আঘাত আর আশীর্বাদ ছাড়া আত্মনির্ভরতা আপনা থেকেই জাগে না!

আবার দেখেছি, ছোট থাকতে যারা ভাল খেয়ালে নিজেকে মাতিয়ে রাখে—তাদের সামনে একটির পর একটি সুযোগ, ভাগ্যবিধাতা যেন আগে এনে ধরেন।

নইলে 'মৌচাক' 'খোকাখুকু' পড়ার বয়সে—'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী' দেখার ইচ্ছে জাগবে কেন? এমন কি, তার বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত দেখতে ভাল লাগবে কেন!

হয়ত, তারই কল্যাণে "রদোফেন টুথপেষ্ট"-এর এক বিজ্ঞাপন এঁকে—কলেজ ষ্ট্রীটের এলবার্ট হলে, বেঙ্গল কেমিকেলের সিটি অফিসে যাবার সাহস জেগেছিল।

সেখানে, এক ভদ্রলোককে ছবিটা দেখাতে—তিনি খুশি হয়ে বললেন, "এইটুকু বয়সে বিজ্ঞাপনের ছবি তুমি আঁকতে পার?"

যদিও তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো। কিন্তু দেখে মনে হ'ত বয়স অনেক কম। সুতরাং স্নেহভরে তিনি বললেন, "পারবে এই দুপুরে হেঁটে যেতে সেই কাঁকুড়গাছিতে? ওখানে আমাদের হেড অফিসে পাবে, রাজশেখর বাবুকে। তাঁকে দেখালে তবে হবে।"

সেটা ১৯২৪ সাল। ওদিকটায় জন-বসতি বিরল। দীর্ঘ পথ। বলতে গেলে, মানিকতলা খালের পর থেকে কিছু বস্তি আর ছোটখাটো বাড়ী পার হলেই পথটা প্রায় ধুধু।

এছাড়া, পকেটে আমার দুটো পয়সাও নেই! থাকলে, খিদে পেলে এক চিনে-বাদাম কিনে খাওয়া ছাড়া, সে পয়সা ভিখারীকে দান করা চলে মাত্র।

তবুও সে পথের নির্দেশ জেনে, যখন মানিকতলা মেইন রোডের উপর রেলওয়ে ব্রীজের নীচে পৌঁচেছি, তখন আমার পায়ের এক পাটি স্যাণ্ডেল গেল ছিঁড়ে!

দুঃখে চোখে জল এল। তাই বলে, কিছুতেই পিছটান দিলে চলবে না। দেশের বাড়ীর কাছ দিয়ে প্রবাহিত হওয়া—ব্রহ্মপুত্র নদ যদি ছেলেবেলায় হেসে-খেলে সাঁতরে পার হতে পারি, তবে এ দুর্দশাতেও আমাকে কাঁকুড়গাছি দেখতে হবে।

মনের যখন এই অবস্থা, তখন একটি গরীব ঘরের মা, তার মেয়েকে কেঁদে কেঁদে খুঁজছিল। কিন্তু সে করুণ "অতসী, অতসী" কান্নার ডাকে—কেবলই আমার নিজের মা'র কথা মনে পড়ছিল।

তবে সে, সুদূর দুশো মাইল দূরে থেকে; তিনিও ঠিক এমনি করেই তাঁর সন্তানের প্রতি মন ও দৃষ্টি রেখে—খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আর ভাবছেন, মহানগরীর নির্দয় পাষাণ-পথে—অনাহারে ও বিফলতায় সে ভেঙ্গে পড়ল কিনা!

যাই হোক, এক হাতে সেই কাজ আর অন্য হাতে এই স্যাণ্ডেল জোড়া ধরে, যখন বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসের উঁচু গোলাকার লোহার ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন আমার চেহারার যা শ্রী, তা দেখে দরোয়ান যে সেখানে ঢুকতে দেবে না সে ধারণা নিশ্চিত।

দেখলাম, রাস্তার পাশেই জলের কল। তাই আগে আমার হাত-পা-মুখ জলে ধুয়ে—তবে দারোয়ানকে গিয়ে বললাম, "আমি এসেছি রাজশেখর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।"

তারপর যথারীতি, আমার নাম ও সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য লিখে দিতে—বেয়ারা জেনে এসে, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল।

অমনি নমস্কার দিয়ে, ছবিটা তাঁর হাতে দিলাম। একটু দেখেই—এবার তিনি আমার মুখ থেকে পা আর পা থেকে মুখ দেখে নিয়ে, প্রশ্ন করলেন, "বিজ্ঞাপনের ছবি যে এভাবে আঁকে, তা তুমি জানলে কি করে?"

প্রায় মাথা নীচু করে উত্তর দিলাম, "মাসিক কাগজে ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলো দেখি বলে।"

—আচ্ছা! "পেন এণ্ড ইঙ্কি যে লাইনগুলো টানে, তাই বা তুমি শিখলে কি করে?"

বললাম, "আর্ট হোষ্টেলে এসে।"

—"তবে কি তুমি আর্টস্কুলের ছাত্র?"

আবার বললাম, "হ্যাঁ, কিন্তু পেন এণ্ড ইঙ্কে আঁকা ছবি আমাকে অভ্যাস করতে বলেছিলেন, ফিফথ্ ইয়ারে পড়েন, হোষ্টেলের ফণীবাবু। যে ফণী গুপ্ত, 'শিশুসাথী'তে গল্পের ছবি আঁকেন।"

তিনি একদিন আমার ঘরে এসে, দু'খানা "পাঞ্চ" ম্যাগাজিন আর সেই সঙ্গে তাঁরই

ব্যবহার করা কালি আর কলম আমার হাতে দিয়ে বললেন, "সমর, আর্ট হোষ্টেল বড় ভয়ানক জায়গা! একবার কেউ দলে ভেড়াতে পারলে, তোমাকে 'ভ্যাগাবণ্ড' বানিয়ে ছাড়বে। কাজেই যতক্ষণ হোষ্টেলে থাকবে, ততক্ষণ পাঞ্চের ছবিগুলো—ডাইরেক্ট কলমে প্র্যাকটিস্ করে যাবে।"

এতক্ষণ, যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম—তিনি তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ছবিটার উল্টো পিঠে, আমার নাম ঠিকানা লিখে রাখলেন।

শেষে তিনি তাঁর ঘর ছেড়ে আমাকে নিয়ে বাইরের দোরগোড়া পর্যন্ত এসে বললেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

ফেরার পথে, দু'ধারের সুন্দর করে ছাঁটা মেহেদি কাঁটার বেড়ার ভেতরকার লাল সুরকির রাস্তা ধরে—কখন যে ফটকের বাইরে এলাম! আবার কি ভাবে যে এতদূরের পথ পায়ে হেঁটে—করপোরেশন ষ্ট্রীটের আর্ট হোষ্টেলে ফিরলাম, তার কিছুই মনে নেই!

তবে বারবার যে কথাটি সেদিন আমার মনে হচ্ছিল, তা জুলিয়াস সীজারের ইংলণ্ড বিজয়ের উল্লাস!—"আমি এলাম, দেখলাম, আর জয় করলাম।"

তারপর সপ্তাহখানেক পরে, এক শনিবারের স্কুল-ছুটির দুপুরে—আমার নামে মনি-অর্ডার এল। ফরমটায় সই করে দিতে, নোট দু'খানা আমার হাতে দিয়ে ডাকপিয়ন যেই তার কুপনটি ছিঁড়েছে—অমনি তাসের আড্ডা থেকে লাফিয়ে উঠে, এক রুমমেট তা ছিনিয়ে নিয়ে হো হো করে হেসে বললে, "যাক্, এবার সমরের মিল স্টপের লিষ্টে নাম উঠবায় ভয় নেই!"

কিন্তু সে কুপনে যখন দেখা গেল, (ওদেরই নাম দেওয়া জ্যেঠামশাইয়ের স্টাইফেন) ১২ টাকা নয়! এসেছে, বেঙ্গল কেমিকেলের রবার স্ট্যাম্পের ছাপ দেওয়া রদোফেন টুথপেষ্ট বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার জন্যে ২০ টাকা! হঠাৎ তাসের আড্ডাটি ভেঙ্গে গেল। আর কুপনটা, এক হাত থেকে অন্য হাতে পাচার হয়ে—চলে গেল পাশের ঘরে।

আবার যেদিন "ভারতবর্ষ" কাগজখানা বেরুলো, সেদিন খাবার ঘরে, ঐ ছবি বের হওয়া নিয়ে কি আলোচনা। ভাগ্যিস! তার রঙিন ছবিগুলোর মধ্যে একটি আমাদের হোষ্টেলের পূর্ণ চক্রবর্তীর, একটি উপেন ঘোষ দস্তিদারের এবং অপরটি তৎকালীন আর্টস্কুলের প্রত্যেক ছাত্রদের প্রিয় ও হিরো শিল্পী দেবীপ্রসাদের ছিল, তাই আলোচনার মোড় ঘুরে গেল তাঁদেরই দিকে।

নব উদ্যমে, "স্ট্র্যাণ্ড" ম্যাগাজিনে দেখা কুইব টুথপেষ্টের সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে নিয়ে

আঁকা বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, রবোফেনের আর একটি বিজ্ঞাপন এঁকে—নিয়ে গেলাম রাজশেখর বাবুর কাছে, এবার এলবার্ট হলে।

নমস্কার করে ঘরে ঢুকতেই, "দাঁড়িয়ে নয়, বসো।" বলেই হাত বাড়িয়ে তিনি ছবিটা দেখলেন। তখনই আবার তা আমাকে ফিরিয়ে বললেন, "এবারকার ছবিটা আরও ভাল। তবে নেব না।...আচ্ছা! কয়েকদিন আগে যে এক ঝাঁক ছেলে এসেছিল, তোমাদের আর্ট হোষ্টেল থেকে—তাদের বুঝি তুমিই ক্ষেপিয়েছিলে?"

শুনে খানিকক্ষণ থ হয়ে বসে রইলাম। বলতে পারলাম না কিছুই।

—তিনিই বললেন, "তুমি তো জানো, এখানে যতীন সেন মশাই আঁকেন। কাজেই কাঁচা হাতের আঁকা ছবি, যদি আমরা বারবার ছাপি—তবে এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হবে। ধীরে ধীরে আমাদের প্রডাক্টসগুলোকেও লোকে খেলো ভাববে।"

একটু থেমে বললেন, "তোমার উদ্যম আছে। চোখে কল্পনা আছে। আর আছে সুন্দর স্বাস্থ্য। তুমি উঠে পড়ে লাগো, নতুন পার্টি তৈরী করতে।"

এক নিমিশে আশার আলো নিভে গেল! শেষে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে—নীচে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল; একদা ১৯২১ সনে, বাবা ও আমার ছোট ভাই বীরেনের কালাজ্বর চিকিৎসা করাতে এসে—যে এলবার্ট হলের নীচেকার ফাঁকা মাঠটায় খেলেছি, ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখানো বাজীকরের কত খেলা দেখেছি, আবার সময় সময় মনের আনন্দে এক কোণের যে তিনটে খাটো পাম গাছ, যার পাতা ধরে ঝুলেছি—আজ সেই বাড়ীটার সিঁড়ি দিয়ে আমি কি পাতালে নামছি!

শীতের সকালটুকু

শ্রীমতী শান্তি বসু

কুয়াশার জাল ছিঁড়ে
সোনা রোদ হাসে,
চারিদিক আমোদিত
গোলাপের বাসে।
পাখীগুলি উড়ে গেল
দখিনের বনে,
নীলাকাশ, একা একা
কি যে ভাবে মনে।

ধান কাটে রাশি রাশি
আজ চাষী ভাই,
নবান্নের উৎসব
আর দেরি নাই।
খোকাখুকু আঙিনায়
বসে খায় পিঠে,
শীতের সকালটুকু
লাগে বড় মিঠে।

আগুন

শ্রীঅমরনাথ রায়

আদিকালের মানুষের কথা বলছি। সেকালের মানুষ তখনও সভ্য হয়ে উঠেনি। শেখেনি কৃষীকাজ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। সেই আদিম মানুষ বনে দাবানল জ্বলতে দেখতো। দেখতো আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগিরণ। দেখতো আকাশের মেঘ ধরাপৃষ্ঠে নেমে এসে কতো কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আদিম মানুষ প্রকৃতিতে আগুনের এই সব অস্তিত্বই শুধু লক্ষ্য করেনি। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখেছে আগুন জ্বললেই আলো পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় উত্তাপ। আগুনের ভয়াবহ সংহার রূপ দেখে আদিম মানুষ ভেবেছিল—এ বুঝি এক দানব—জীবন্ত দানব। জীবনের লক্ষণ নড়াচড়া করে বেড়ান এবং আহার করা। আদিম মানুষ আগুনের মধ্যেও জীবনের এইসব লক্ষণ লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য করেছিল যে, আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার করে এক স্থান হতে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। চলার পথে যাবতীয় বস্তুকে গ্রাস করে ভস্মে পরিণত করে দেয়। আগুনের এই দুই ধর্ম দেখেই আদিম মানুষ তাকে জীবন্ত বলে মনে করেছিল। পরবর্তীকালে আগুনকে ঈশ্বররূপে পূজাও করেছিল।

মানুষের বড় ইচ্ছা হলো আগুনকে বশে আনার। অনেক চিন্তা করে সে একদিন প্রাকৃতিক আগুনের একটুখানি চুরি করলো। দাবানলের একটুখানি ধরিয়ে নিলো শুকনো একটুকরো কাঠে। কাঠের সেই আগুনকে সযতনে জ্বালিয়ে রাখলো। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার সময়েও জ্বলন্ত কাঠের টুকরোটিকে সঙ্গে নিতে ভুললো না। ঐ আগুন নিভে যাবার আগেই নতুন কাঠ এনে তাতে আগুন ধরিয়ে নিলো। এমনিভাবে ঐ চুরি করা আগুনকে মানুষ জিইয়ে রাখলো দীর্ঘকাল।

আদিম মানুষ লক্ষ্য করেছিল যে, দাবানল বিস্তারলাভ করে আগুনের স্ফুলিঙ্গের দ্বারা। দাউ দাউ করে যখন আগুন জ্বলে বনে, তখন সেখানে গরম বাতাস বয়। বাতাসকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছুটে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ আরও লক্ষ্য করে যে—এক শ্রেণীর শিলা (ফ্লিণ্ট শিলা) কাটবার বা ফাটাবার সময় ঐ রকমেরই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি খেলে গেল আদিম মানুষের মাথায়—পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে হবে।

সফল হলো তার প্রচেষ্টা। পাথরে পাথর ঠুকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হলো, মানুষ তা ফেললো শুকনো পাতা ও কাঠের কুচির স্তূপে। দপ্ করে জ্বলে উঠলো আগুন। আনন্দে ভরে উঠলো মানুষের মন।

ঠিক কবে যে মানুষ এমনিভাবে আগুন জ্বালাতে শিখল তা কেউ বলতে পারে না। তবে বিজ্ঞানীদের অনুমান যে মানুষের ইতিহাসের শুরুতেই কোনও এক সময়ে সে আগুন জ্বালাতে শেখে। আজ থেকে আড়াই লক্ষ বছর আগে প্লিওসিন যুগে বাস করতো পিকিং মানবেরা। গার্হস্থ্য জীবনে তারা যে আগুনকে ব্যবহার করতো তার নিদর্শন একালের বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। কাজেই এই আড়াই লক্ষ বছরের আগে কোনও এক সময়ে মানুষ যে আগুন জ্বালাতে শিখেছিল—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।
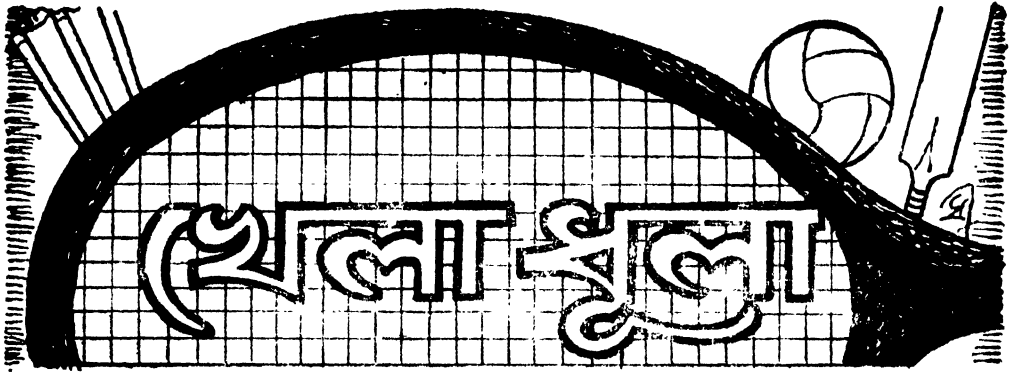
মেঠুড়ে

ফুটবল

পশ্চিম ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার রোভার্স কাপ আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে। কাপটা গতবারের বিজয়ী মোহনবাগানের দখলে ছিল। চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকেই ফাইন্যালে ২-০ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল রোভার্স কাপ নিয়ে ঘরে ফিরেছে। প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলায় কোনো পক্ষই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালে প্রতি অর্ধে একটা করে ইস্টবেঙ্গল যোগ্য দল হিসেবে রোভার্স বিজয়ী হয়।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রথম ডিভিসন লীগ ও আই. এফ. এ. শীল্ডের সঙ্গে সর্বপ্রথম রোভার্স জয় করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভ করে। দ্বিতীয়বার রোভার্স কাপ লাভ করে ১৯৬২ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিসের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী হিসেবে। এবার ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় রোভার্স জয়। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং তিন-তিনবার এবং মোহনবাগান দু'বার রোভার্স পেলেও রেকর্ডের দিক দিয়ে মোহনবাগানের ইতিহাস খুব উজ্জ্বল। এবার নিয়ে মোহনবাগান ন-বার রোভার্স ফাইন্যাল খেলল। রোভার্স ফাইন্যালে এবার ছিল মোহনবাগানের উপর্যুপরি চতুর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল অনেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, এর আগে কোনোবার রোভার্স ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। সেইজন্যে এবার ফাইন্যাল খেলার আকর্ষণ যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। মোহনবাগান তাদের প্রথম খেলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দলকে ১-১ ও ২-০ গোলে হারিয়ে দিলেও পরের খেলা অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইন্যালে বর্ডার সিকিউরিটি পুলিস দলকে ৪-১ গোলে এবং সেমি ফাইন্যালে কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে ওঠে। অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

ফাইন্যালে উঠতে একে একে পরাজিত করে—বোম্বাই লীগ চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্র পুলিসকে ৫-১ গোলে, কোয়াটার ফাইন্যালে মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাবকে ৪-১ গোলে এবং সেমি-ফাইন্যালে জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে। প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যাল খেলাতে মোহনবাগান ২-০ গোলে হেরে গেলেও প্রতিপক্ষের তুলনায় ভালই খেলে।

ক্রিকেট

এডিলেডে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টে ভারত ১৪৬ রানে পরাজিত হয়েছে। সফরের সূচনায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন, হেরে গেলেও প্রথম টেস্টে তার চেয়ে অনেক ভালো খেলেছেন। দলের অধিনায়ক ছাড়া এই টেস্টে খেলতে নেমে চোট-আঘাতের ফলে ভারতকে বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছে এবং পরাজয়ের ক্ষেত্রেও কিছুটা দুর্ভাগ্য আছে।

অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায়, তবু প্রথম ইনিংসে ভারতের রানের চেয়ে তারা খুব বেশি রানে এগিয়ে থাকতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ৩৩৫ রাণে, ভারতের ৩০৭ রানে। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া মাত্র ২৮ রানে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে যাঁদের দ্বারা অস্ট্রেলিয়ার সহজ জয়, সেই ববি সিম্পসন ও বব কাউপারকে ভারত অউট করার সুযোগ পেয়েও আউট করতে পারেনি। একটা রান নিতে গিয়ে ববি ও বব যখন মাঝ ক্রিজে তখন বোরদের নিক্ষিপ্ত বল দুর্বলভাবে ও উইকেট কিপারের নাগালের বাইরে দিয়ে চলে যাওয়ায় সিম্পসন রান আউটের হাত থেকে বেঁচে যান। কিছু পরে কাউপারের অতি সহজ ক্যাচ হাত থেকে ফেলে দেন কুল-কানীর পরিবর্তে বদলী ফিল্ডসম্যান রমেশ সাক্সেনা। কাউপারের রান তখন ৪১। পরে তিনি এই খেলায় ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি ১০৮ রনে করে আউট হন। রান আউট থেকে বেঁচে গিয়ে সিম্পসনও সেঞ্চুরী করেন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ইঞ্জিনিয়ার এবং সুব্রহ্মনিয়ামের রান আউট অবশ্যই দুর্ভাগ্যের। বাউণ্ডারী লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে পল শীহানের নিক্ষিপ্ত বলে উইকেট ভাঙায় ইঞ্জিনিয়ার আউট হন। সুব্রহ্মনিয়াম রান আউট হন একইভাবে রেনেবার্গের নিক্ষিপ্ত বলে উইকেট ভেঙে। জয়ের জন্যে যখন ৩৯৮ রানের দরকার, তখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভের পর ২৪ রানের ভেতর দুটো উইকেট পড়ে গেলে ৪৬ রানের মাথায় পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ইঞ্জিনিয়ার ওইভাবে রান আউট হন, আর সুব্রহ্মনিয়াম রান আউট হন অতি চমৎকারভাবে এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলে ৭৫ রান করার পর।

প্রথম টেস্টে বব কাউপার মাত্র আট রানের জন্যে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। অধিনায়ক ববি সিম্পসনের ৫৫ ও ১০৩ রানও উল্লেখ্য। ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার ও রুসি সুর্তির খেলা। রুসি সুর্তি ৭০ ও ৫৩ রান করা ছাড়াও খুব ভালো বল করে ৭৫ রানে পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের পাঁচটা উইকেট।

এডিলেডে তিনজন জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেছেন। ভারতের আবিদ আলী ও কুলকার্নী আর অস্ট্রেলিয়ার পল শীহান। শীহান করেন ৮১ রান, আবিদ আলী পান তিনটে উইকেট। আবিদ আলী শেষ পর্যন্ত ৫৫ রানে ছটা উইকেট নিয়েছেন এবং প্রথম ইনিংসে ৩৩, দ্বিতীয় ইনিংসেও ৩৩ রান করেছেন।

প্রথম টেস্ট শেষ হতে পুরো পাঁচ দিন সময় লাগেনি। চতুর্থ দিনের শেষে ভারত মাত্র ১ উইকেট হাতে নিয়ে ১৬১ রানে পিছিয়ে থাকায় পঞ্চম দিনের খেলা প্রায় নিয়ম রক্ষার খেলায় পরিণত হয়। পঞ্চম দিনের খেলা চলে মাত্র বারো মিনিট।

(২)

ববি সিম্পসন : ভারতের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে সেঞ্চুরি করেন।

এডিলেডের প্রথম টেস্টে হারার পর মেলবোর্ণ মাঠের দ্বিতীয় টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত এক ইনিংস ও ৪ রানে হার স্বীকার করেছে। কিন্তু ভারতের খেলোয়াড়রা যেমন চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলে এবং সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দিয়ে এই টেস্টে হার স্বীকার করেছেন তাতে কারোর দুঃখ পাবার কারণ নেই। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের অধিনায়ক পতৌদির নবাব খেলেছেন এবং নবাবী সৌন্দর্যেই অবিস্মরণীয় দুটো ইনিংস খেলেছেন।

দুটো টেস্টের কোনো টেস্টই শেষ হতে পুরো পাঁচদিন সময় লাগে নি। দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয় চতুর্থ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের এক ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ প্রায় দেড়দিন সময় হাতে থাকতে। দ্বিতীয় টেস্টে টসে জিতলেও প্রথমে ব্যাট অথবা ফিল্ড নেওয়ার প্রশ্নে পতৌদি এক সংকটে পড়েন। মেলবোর্ণে নাকি এবার এমন খরা চলছিল বহু বছরের

কাউপার

আবিদ আলি

ভেতর যা দেখা যায়নি, মাঠ ও পিচ ছিল রুক্ষ। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভের আগের দিন রাত্তিরে বৃষ্টি হয় এবং জলে ভিজে পিচ নরম হয়ে পড়ে। বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে ভারতের বেশীর ভাগ ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতাই মেলবোর্ণে শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ। কে ভাবতে পেরেছিল পঁচিশ রানের ভেতরই ভারতের পাঁচটা উইকেট পড়ে যাবে? আবার ২৫ রানে ৫টা উইকেট পড়ার পর বা কে ভেবেছিল দিনের শেষে ভারতের ৮ উইকেটে ১৫৬ রান উঠবে এবং তার মধ্যে পতৌদি অসাধারণ খেলে ৭০ রানে নট-আউট থাকবেন? প্রথম দিন সুর্তির খেলাতেও অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। সুর্তি অবশ্য ৩০ রান করে আউট হয়ে যান।

দ্বিতীয় দিন ১৭৩ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে ৩২৯ রান করে। এইদিন ববির সঙ্গে সেঞ্চুরি করেন বিল। বিল লরি ও ববি সিম্পসনের প্রথম উইকেটেই ১৯১ রান যোগ হয়। তৃতীয় দিন ইয়ান চ্যাপেল জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করার পর আরো অর্ধ সেঞ্চুরি করে ১৫১ রানের মাথায় আউট হয়ে যান। অস্ট্রেলিয়া ৫২৯ রানে ইনিংস শেষ করে প্রথম ইনিংসের খেলাতেই ৩৫৬ রানে এগিয়ে থাকে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৬ রানের মাথায় নিজস্ব ৪২ রানে ইঞ্জিনীয়ার আউট হবার পর

চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলেন ওয়াদেকার ও সুতি। সুতি ৪৩ রান করে আউট হন। ওয়াদেকারের চমৎকার ইনিংস তৃতীয় দিনের শেষে ৯৭ রানের মাথায় থেমে থাকে। অনেকে আশা করেছিলেন ওয়াদেকার যেভাবে খেলছেন তাতে তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পরের দিন অবশ্যই পূর্ণ হবে, কিন্তু ওয়াদেকার জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। মাত্র এক রান কম থাকতে ৯৯ রানের মাথায় তিনি আউট হন।

চতুর্থ দিন সূচনায় বিপর্যয়। প্রসন্ন, বোরদে, আবিদ আলি, সুব্রহ্মনিয়াম সবাই অল্প অল্প ব্যবধানে একে একে বিদায় নেন। মাঠে নামেন পতৌদি। হার অনিবার্য জেনেও কাপুরুষের মত তিনি হারতে চাননি। বীরের মতন শৌর্যে এবং শিহরণ-জাগানো সৌন্দর্যে খেলে ৮৫ রান করে তিনি যখন আউট হয়ে প্যাভেলিয়নের দিকে এগতে থাকেন, তখন দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাঁকে অন্তরের অভিনন্দন জানান।

চারটে টেস্ট সিরিজের সফরে অস্ট্রেলিয়া এখন ২-০ খেলায় এগিয়ে রইল। সুতরাং ভারতের 'রাবার' জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ডেভিস কাপ

ব্রিসবেনে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় স্পেনের বিরুদ্ধে ৪-১ ম্যাচে বিজয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া আবার ডেভিস কাপ দখলে রেখেছে। এ বছর নিয়ে যুদ্ধোত্তর ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়া প্রতি বছরই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে পনেরো বার ডেভিস কাপ জয় করল।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে স্পেনের ছিল এবার দ্বিতয় খেলার সুযোগ। ১৯৬৫ সালে একই ফলাফলে অর্থাৎ ৪-১ ম্যাচে স্পেন অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার স্বীকার করে। প্রথম দিনের খেলায় ১৯৬৪ ও '৬৫ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রয় এমার্সনের কাছে ১৯৬৬ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানার স্ট্রেট সেটে হার স্বীকার অপ্রত্যাশিত। আবার শেষ দিনের খেলায় সান্তানার কাছে বর্তমান উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জন নিউকোম্বের স্ট্রেট সেটে পরাজয়ও কম অপ্রত্যাশিত নয়।
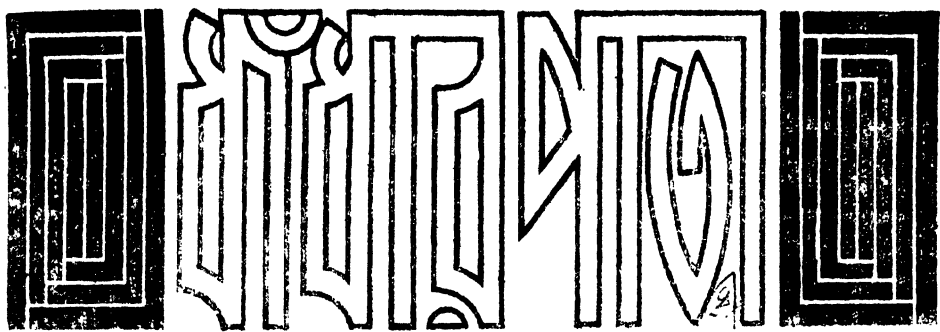
বাজিকর

কি রকম হবে ?
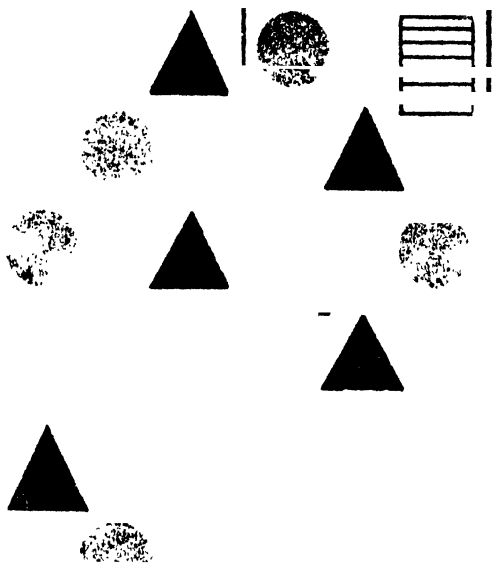
১। ক্ষেত্রটির মধ্যে ছ'টি ঘর করা আছে। তার পাঁচটির প্রত্যেকটিতে সাজানো আছে—একটি ক'রে আয়তক্ষেত্র, একটি করে ত্রিভুজ ও একটি করে বৃত্ত। শেষের ৬ষ্ঠ ঘরটিতে ঐ অনুসারে কোথায় কি বসানো হবে বলত ?

খুঁজতে হবে

২ পাশের ছবিটির মধ্যে কি কি এবং ক'টি করে দেখতে পাচ্ছ বলত ?

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

'কটি ফোঁটা'র উত্তর—উপরের ছকার অদৃশ্য ফোঁটা ১, ২, ৩; ২য় ছকার ২, ৩, ৬; ৩য় ছকার ৩, ২, ১।

'বড়-ছোট'র উত্তর—সবাই সমান লম্বা।

ইংরাজী নববর্ষ সুরু হয়ে প্রায় মাঝামাঝি এসে গেল। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, নানা অভাব-অভিযোগের মাঝে তোমাদের বলবো এবার এই অনিশ্চয়তা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে এসো। লেখাপড়ায় একেবারে মনোনিবেশ না করলে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়তে হবে। কারণ, স্কুল-কলেজের ব্যাপারে এই ছন্নছাড়া ভাব এ যেন আর ভালো লাগে না। "পরীক্ষা আসন্ন জেনে দিনরাত পরিশ্রম করে প্রস্তুত হয়ে দিন গুনছি, এমন সময় জানা গেল পরীক্ষা হবে না"—একথাও তোমরা আমায় লেখো। আমারও ব্যক্তব্য তাই—যে কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাক, ফল তোমাদেরই ভোগ করতে হয়—ক্ষতি তোমাদেরই সব। বছরের পরীক্ষাগুলি পেছিয়ে পড়ে, দিনগুলি অযথা নষ্ট হয়। ছাত্র অবস্থায় লেখাপড়াকে তপস্যার মত গ্রহণ করতে হয়। শহরের নানা চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয় ব্যাপারে মন টানে; তাতে পড়াশুনার খুব ব্যাঘাত হয়—তা ছাড়া আছে নিত্য নতুন পরিস্থিতি—তাতেও মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এইসব কারণেও শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ক্ষতি হয়। এসব কথা ভেবে দেখো। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কোনও মতেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।

নতুন বছরে তোমাদের সঙ্গে প্রথম দেখার সময়ে একথাই বলি—শিক্ষাদীক্ষায় তোমরা এগিয়ে চলো। যা পিছনে পড়ে আছে তা থাক—যাত্রা হোক সম্মুখে।

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দু'টি-একটি পরিবারের কাহিনী অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে নেহরু পরিবারের নাম সবার আগে। এই পরিবারের মেয়ে কৃষ্ণা হাতী সিং। লণ্ডনে কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ১৯০৭ সালে যখন তাঁর জন্ম, তখন ভারতবর্ষে নতুন রাজনীতির আলোড়ন চলেছে। ক্রমে সে আলোড়নের ঢেউ লাগলো নেহরু পরিবারে। তেরো বছরের মেয়ে কৃষ্ণা সেদিন ইয়োরোপীয়ানদের স্কুল ছেড়ে স্কুল-জীবনে টানলেন ছেদ। পরে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে

পরিবারের অন্যান্যদের মত কৃষ্ণা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তার স্থান নির্দিষ্ট হলো কারাগারে। এইখানে তাঁর জীবনে ঘটলো এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বন্দীদের সঙ্গে মিলেমিশে তিনি আবিষ্কার করলেন নতুন অজানা এক জগৎ। বন্দীদের জীবন নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন বইয়ে। তারপর দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু কৃষ্ণার কাজের বিরতি ঘটলো না। সক্রিয় রাজনীতির পুরোভাগে তাঁকে দেখা যায়নি; কিন্তু তিনি গ্রহণ করেছিলেন সমাজ-সেবিকার ভূমিকা। প্রথম জীবনে স্কুল আর গভর্নেস-এর কাছে পড়াশুনা শুরু হয়েছিল, পরে নিজের চেষ্টায় আর বিদেশ ভ্রমণের কালে তিনি যা শিখেছিলেন, জেনেছিলেন—দেশের মানুষের সেবায় তা কাজে লাগাতে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। বেশীরভাগ সময়ই তাঁকে নেপথ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। পরিবারের অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমিত হলেও, শিক্ষা ও সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মনে রাখার মত। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা ধনীর দুলালী—এলাহাবাদে মন্তেসরী স্কুলে শিক্ষিকার কাজ বেছে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে এটি একটি না ভোলার মত ঘটনা।

মতিলাল নেহরু যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন, তখন তাঁকে এবং পরিবারের অন্যান্য সবাইকে দাঁড়াতে হলো এক অনিশ্চিত অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে। চোদ্দ বছরের মেয়ে কৃষ্ণা অতি সহজে তা মেনে নিলেন। তখনও মতিলালের কাছে নানা ধরনের প্রস্তাব আসতো—আদালতে একবার গিয়ে শুধু দাঁড়ালে বহু অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করতেন মতিলাল, তুই কি বলিস, রাজী হবো? মেয়ে বলতো, না বাবা, কাজ নেই। ছোট মেয়ের কথাগুলো মতিলালের মনে যোগাতো প্রেরণা।

দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা একদিন যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ দেশবাসীর কাছে পুরস্কৃত হলেন। কেউ পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় এসে রাজনীতিতে জড় হলেন। দিল্লীতে তখন প্রাক্‌বন্দীদের পরিচিত মুখের ভিড়। কিন্তু সে দু'একটি মুখকে সেদিন দিল্লীর দরবারে গর হাজির দেখা গেল—তাঁদের একজন কৃষ্ণা হাতী সিং।

কোলাহল-মুখরিত রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সমাজ-সেবার যে আদর্শ রূপায়ণে শ্রীমতী কৃষ্ণা নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শিক্ষাবৃত্তির প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ। মন্তেসরী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যে ব্রত একদিন উত্তর প্রদেশে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ব্রতকে তিনি গুজরাট মহারাষ্ট্রে ব্যাপকতর রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ প্রণতি।

চিঠির উত্তর—

তোমরা যারা লেখা বা ঠিকানা পরিবর্তনের কথা জানিয়েছ—তা সবই আমি সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা করে দিয়েছি বা দিয়ে থাকি। আশা করি সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো অভিযোগ নেই।

অদিতি ও অর্চনা সেনগুপ্ত, বেলেঘাটা—তোমাদের সাফাল্যে খুসী হলাম।

সুনন্দা সামন্ত, দেবযানী বসু, কোলকাতা; রীণা লাহিড়ী, শ্রীরামপুর; জয়দীপ রায়, খড়গপুর—বড় হয়ে খেলোয়াড় হবে লিখেছ, কোন খেলা ভাল লাগে তাতো লেখনি?

সঞ্চয়িতা কর, আসানসোল; তরুলতা মিত্র মজুমদার, নবদ্বীপ—যেটাই তোমরা বেশী পছন্দ করো তা ছবি আঁকা হোক, গান বাজনা হোক, সাঁতার খেলাধূলো—সেটাই বেছে নিও।

লিলিয়ান রায়, অরুণীতা মজুমদার, রত্না ভৌমিক, কোলকাতা, হীরক ও মোহর চক্রবর্তী, কোলকাতা; শ্রাবণী ও মৌসুমী, বেলগাছিয়া; নূপুর দত্ত, কোলকাতা; শ্রীরূপা লাহিড়ী, তেজপুর—সকলের চিঠি পেয়েছি। শুভেচ্ছা নাও। তোমাদের

মধুদি

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০·৫০ পয়সা

সুধীরচন্দ্র সরকার

জন্ম : ১৮৯২ (মৌচাকের জন্মকালীন ছবি) ।। মৃত্যু : ১৯৬৮

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋
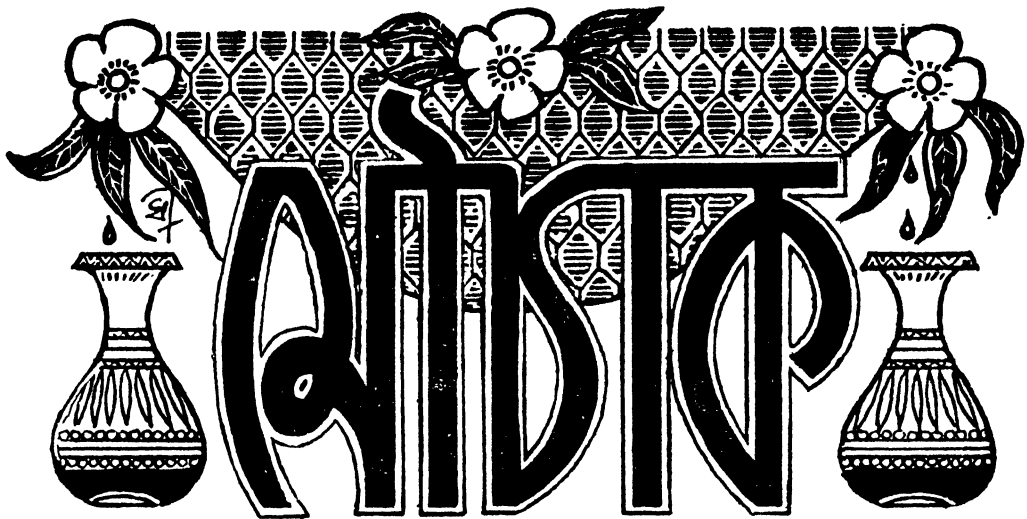
৪৮শ বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৭৪ [১১শ সংখ্যা

বিদায়-অর্ঘ্য

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

❋

ফাল্গুন-বেলা না আসিতে একি নিদারুণ বাণী শুনি !
আনন্দমেলা ভেঙে চলে গেছে আমাদের ফাল্গুনি।
ভাষা-জননীর যে রথসারথি দীর্ঘ জীবন ধরে
প্রেরণা দিয়েছে সারা বাংলার শৈশবে কৈশোরে,—
মন্দিরে পূজা যে এনেছে নিতি নব ফুলে ভরি' সাজি,—
বালগোপালের লীলাসহচর— কোথা সে লুকাল আজি?
বেতসের বনে রচি মৌচাক মনের মাধুরী দিয়া
লাখো শিশুমুখে হাসি যে ফুটাল মধুবাণী পিয়াইয়া,
হাজারো অনুজ বাণী-পূজারীর সহায়, সচিব, আশা,—
ঘরে ঘরে কলি বিকশিল যার অনাবিল ভালবাসা,

শিরে সিত কেশ, সদা স্মিত মুখ, বুকে স্নেহপারাবার—
সৌম্য সুধীর সে রস-তাপসে দেখিতে পাব না আর !

চোখের দেখায় না-দেখায় আজি কিছু আসে যায়নাকো,
আমাদের প্রীতি সাথী হবে তব যেখানেই তুমি থাকো।
জীবনে যাদের প্রিয় ছিলে তুমি—মরণেও রবে প্রিয়,
রবে বাঙালীর ঘরে ঘরে হয়ে আত্মার আত্মীয়।
যারা পেল তব স্নেহের পরশ শৈশবে কৈশোরে,—
মধুচক্রের মধুতে যাদের মর্ম দিয়েছ ভরে,—
যারা আজি যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—কেহ পিতা কেহ মাতা,—
যাদের লক্ষ বক্ষে তোমার অটল আসন পাতা।
পরমাত্মীয়-বিয়োগব্যথায় কাঁদে তারা অনুরাগী,
মিনতি জানায় দেবতায় তব আত্মার শুভ-মাগি'।

হে শিশুবন্ধু, হে রসসিন্ধু, হে গুরু অগ্রগামী,
আমরা তোমারে প্রণাম জানাই—অনুজ আশিস-কামী।
যে পতাকা তুমি বহিয়া চলেছ নিজ ক্ষয়ক্ষতি ভুলি—
বল দাও তারে জনকল্যাণে ঊর্ধ্বে রাখিতে তুলি'।
তব প্রেরণায় চালায়ে যেন গো বালগোপালের রথ
জ্ঞানে আনন্দে দিতে পারি ভরি ভারত-ভবিষ্যৎ।

পরলোকে মৌচাক-সম্পাদক

তোমাদের পরমপ্রিয় মৌচাক-সম্পাদক মহাশয় হঠাৎ পরলোকগমন করায় এবারকার পত্রিকা প্রকাশে অনেক দেরি হয়ে গেল। আশা করি তাঁর প্রতি তোমাদের যে শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল, সে কথা মনে করে আমাদের এই মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে তোমরাও দুঃখ অনুভব করছ। যে আদর্শ নিয়ে এই পত্রিকার মাধ্যমে সুদীর্ঘ আটচল্লিশ বছর তিনি তোমাদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছেন, আমরাও বর্তমানে তাঁর সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করব এবং আশা করব, তাঁর সময়েও মৌচাককে তোমরা যেমন তোমাদের আদরের সামগ্রী মনে করতে, এখনও তেমনি করবে। এই সংখ্যাটিতে আমরা দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক তাঁর পরলোকগমনে তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে কিছু কিছু অংশ মুদ্রিত করে দিলাম।

দুই বন্ধু : শিল্পী শ্রীচারু রায় ও স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার

স্বর্গত সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৯২ সালে বহরমপুরে সুধীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার ইংরেজ সরকারের আমলে মহকুমা হাকিম হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল মনোমোহিনী দেবী। বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করলেও সুধীরচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ছিল পাবনা জেলার মালঞ্চী গ্রামে। তাঁরা ভাই-বোনে ছিলেন বারোজন এবং ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সুধীরচন্দ্রের বড় বৌদি ছিলেন লেখিকা স্বর্গত সরলাবালা সরকার। তাঁর দিদি কাদম্বিনী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়-পাত্রী। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত কবির 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালার ৭ম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত আইন পুস্তক প্রণেতা সুবোধচন্দ্র সরকার ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

১৯১০ সালে সুধীরচন্দ্র যখন কলিকাতার সিটি কলেজের ছাত্র, তখন তাঁর পিতা মহিমচন্দ্র বাংলা দেশের বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশন সংস্থা মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩-১৪ সালে সুধীরচন্দ্র যখন আইন কলেজের ছাত্র, তখনই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, স্যার যদুনাথ সরকার প্রভৃতি বাংলা দেশের বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরিচিত হন এবং প্রায় সমূহ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশের সুযোগলাভ করেন।

সুধীরচন্দ্রের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায়। সেকালের 'সুপ্রভাত', 'যমুনা', 'জাহ্নবী' এবং 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁর রচনা প্রকাশিত হ'ত। কিছুকাল তিনি 'জাহ্নবী' নামক পত্রিকাটির সম্পাদনা কার্যও করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক 'নাচঘর' পত্রিকার আরম্ভের সময় তিনিই ছিলেন উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক। 'হসন্তিকা' নামক একটি পত্রিকাও তিনি ও তাঁর কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সহায়তায় প্রকাশ করেন।

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে তাঁর সম্পাদিত কিশোরদের মাসিক পত্রিকা এই 'মৌচাক' প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে এই পত্রিকাখানি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাংলা দেশের শিশু ও কিশোর সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। এর মধ্যে তিনি ছেলেদের শিক্ষা ও আনন্দ-দানের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, যে সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ মৌচাকের জন্য কলম ধরেছিলেন, তা অন্য কোন শিশু-পত্রিকার ভাগ্যে খুব কমই ঘটেছে। এ ছাড়া বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক যাঁরা বড়দের জন্যই কেবলমাত্র লিখতেন, তাঁদের তিনি শিশু-সাহিত্যিক করে তুলেছিলেন এই মৌচাকের মাধ্যমে। শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকদের জন্য প্রতি বছর ৫০০৲ টাকার 'মৌচাক পুরস্কার' নামে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থাও তিনি করে যান। তাঁর সম্পাদিত আর একখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ইংরেজী বর্ষপঞ্জী হ'ল 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক'। ছত্রিশ বছর ধরে এই বার্ষিক বইখানি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজেই নয়, ভারতের বাইরেও এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে সমাদৃত।

তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ইংরেজীতে 'নোটেবেল ইণ্ডিয়ান ট্রায়ালস্', 'জেনারেল নলেজ', 'জেনারেল নলেজ জিওগ্রাফি' এবং বাংলায় 'পৌরাণিক অভিধান,' 'বিবিধার্থ অভিধান' ও 'জীবনী অভিধান' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁকে অভিধানকার হিসাবে খ্যাতি করেছে।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত' নামক পত্রিকায় তাঁর আত্মস্মৃতি 'আমার কাল আমার দেশ' নামক রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এইটিই তাঁর জীবনের শেষ রচনা। এছাড়া কয়েক বৎসর ধরে তিনি বাংলায় কিশোরদের জন্যে একটি নতুন ধরণের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুধীরচন্দ্র সরকার

কর্মজীবনে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের সদস্য, অল ইণ্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্সের কোষাধ্যক্ষ এবং পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল, ফেডারেশন অব বুক সেলার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স অব ইণ্ডিয়া ও শিশু-সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন। এ ছাড়া দীর্ঘ চার বছর তিনি পি. ই. এন-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদকরূপেও এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে বহুবিধ উন্নতিসাধন করেন।

শিশু-সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫২ এবং ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে পাটনায় ও কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতির পদ তিনি অলঙ্কৃত করেন।

ভ্রমণ ছিল সুধীরচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহের বিষয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করেছিলেন এবং ১৯৬৩ সালে তিনি একবার ইউরোপ ভ্রমণেও যান।

১৯৫৮ সালে তাঁর সহধর্মিণী সুলেখা সরকার পরলোকগমণ করেন।

রচন্দ্র

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

লেখক কুলের বন্ধু অনেক শত্রু, স্তাবক, সমালোচক।
কেউ বা শুধু হুল-ই ফোটায়, কারুর স্তুতি মুখরোচক।
ভিন্ন মানুষ ছিলে তুমি, মৌন প্রীতির মৌ-ভাঁড়ারী,
মধু তোমার নীরব সঙ্গ, অন্যেরা তায় আলাপচারী।
সহজ সরল নিরভিমান, যেমন মনে তেমনি বেশে,
সেধে গেছ জীবন-মন্ত্র সাহিত্যকে ভালবেসে।

-❋-

সুধীরচন্দ্র সম্পর্কে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সুধীবর্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি

যশ খ্যাতি মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠা সবই পূর্ণ ক'রে পেয়ে পূর্ণ বয়সে চলে গলে, দুঃখ করবার কিছু নেই।

ছাপ্পান্ন বৎসরের বন্ধুত্ব, শুধু বন্ধু নও তুমি, তুমি আমার পরমাত্মীয়—সেইখানে আজ ছেদ পড়লো। এই ছেদে বিচ্ছেদের ব্যথা নেই, শুধু অনুভূতি—তুমি নেই, আমি আছি, আর কিছু নয়।

তোমার অবর্তমানে তোমারই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভা তোমার স্মৃতিকে চির-সঞ্জীবিত করে রাখবে, প্রতি বৎসরের নব-নব নববর্ষের সভা-আমন্ত্রণে।

তৃপ্ত থাক, প্রীত থাক,—শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ—হরি ওঁঃ।

—চারু রায়

* * *

শুধু পুস্তক-প্রকাশক নন, সাহিত্যরসিক, সাহিত্যিকের দরদী বন্ধু, এবং সাহিত্য-সম্পৃক্ত বিবিধ শুভকর্মের অনুষ্ঠাতা—এমনি একটি মানুষ ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার। তাঁকে আমি প্রথম জেনেছিলুম কৈশোরে, 'মৌচাক'-এর সম্পাদক রূপে, আজ প্রৌঢ়ত্বে তাঁর সম্পাদিত 'পৌরাণিক অভিধান' ও 'বিবিধার্থ অভিধান' দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। এবং অন্তবর্তী সুদীর্ঘকাল ধরে আমি বহুবার মুগ্ধ হয়েছি তাঁর সৌহার্দ্যে, তাঁর স্বভাবের পরিশীলিত নির্মলতায়। তাই, আজ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, তা একদিকে যেমন বেদনাহত, অন্য দিকে তেমনি স্বতস্ফূর্ত ও স্মৃতিবিধুর।

—বুদ্ধদেব বসু

* * *

সুধীরবাবু সেই দুর্লভ শ্রেণীর মানুষদের একজন ছিলেন—যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে মানুষের উপকার করেন, সদুপদেশ দেন, সহজে কারও অনিষ্টচিন্তা করতে চান না। সুধীর-বাবুর মৃত্যুসংবাদ শুনে পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের কথাই মনে পড়ছে, বহু স্মৃতি ভিড় করে আসছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই সংযতবাক ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের মানুষটি—যাঁকে গত ত্রিশ বছর ধরে একই রকম দেখে এসেছি, সময়-অসময়ে যাঁর পাশে বসে বহু সমস্যার নিরসন করে এসেছি। তাঁকে ভুলিনি, ভুলবও না। আমাদের স্মৃতিতে তিনি তেমনিই অম্লান থাকবেন, জীবিতকালে যেমন ছিলেন।

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
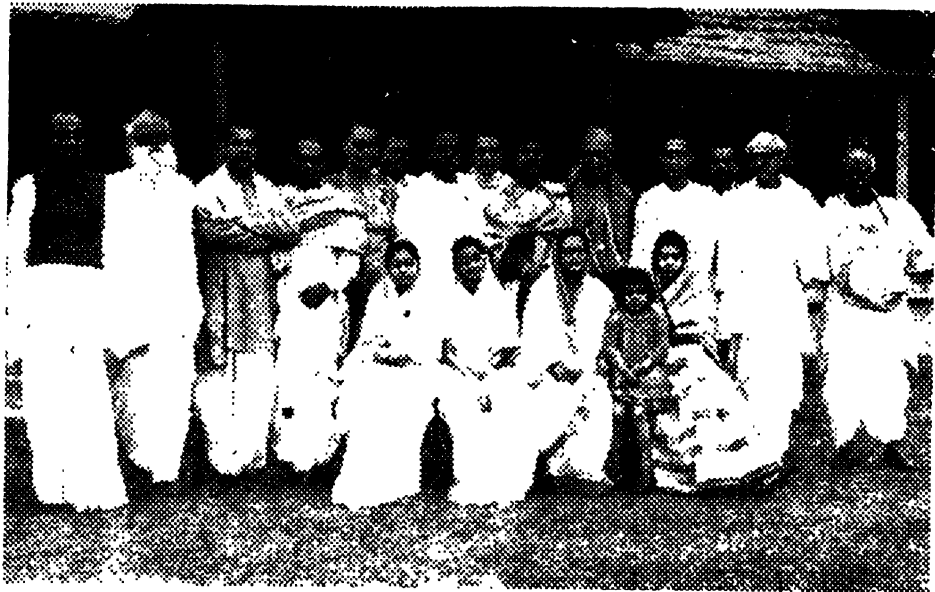
বারাসাতে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের বাগানে একটি প্রীতি-সম্মেলনে উপস্থিত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও তাঁদের আত্মীয়বর্গ। বাঁ দিক থেকে : সুধীরচন্দ্র সরকার, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, উদয়চাঁদ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, হিতেন্দ্রমোহন বসু, নরেন্দ্র দেব, সুপ্রিয় সরকার, সজনীকান্ত দাস, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। নীচে বসে আছেন বাঁদিক থেকে : তুষারকান্তি ঘোষের পুত্রবধূ ও পৌত্রী, রাধারাণী দেবী এবং সুধীরচন্দ্র সরকারের দুই পুত্রবধূ।

সুধীর সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে সাহিত্যের একটি আড্ডা শূন্য হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যের দুই জন্মকালের সঙ্গে সুধীরবাবুর পরিচয়। তিনি সত্যেন্দ্র দত্ত, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বন্ধু, আবার হাল আমলের সাহিত্যিকগণও তাঁর স্নেহভাজন।

বাংলা সাহিত্য-প্রকাশনার ইতিহাসে সুধীরবাবুর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবে আজ সে সব কথা আলোচনার সময় নয়। বই-পাড়ায় নিত্য যাতায়াতের পথে একটি শূন্যস্থান চোখে পড়তে থাকবে, সেই শূন্যস্থানের প্রীতিপূর্ণ স্মৃতির উল্লেখ করেই আজ আমার শ্রদ্ধা-নিবেদন সমাপ্ত করলাম।

—প্রমথনাথ বিশী

আমাদের দেশে 'ইন্দ্রপাত' বলে একটা কথার প্রচলন ছিল। 'ইন্দ্র' মানে একজন অসাধারণ মহিমান্বিত মানুষ। তাঁর অনেক গৌরব অনেক ঐশ্বর্য। বহুজনের দ্বারা পরিবৃত ব্যক্তি। বহুজন যাঁকে কেন্দ্রে রেখে চারিপাশে বসে প্রসন্নতা অনুভব করেন, আনন্দ উপভোগ করেন। সেই মানুষ যখন অকস্মাৎ একদা আমাদের মধ্য থেকে চলে যান—একটি মহিমার দীপ্তি বা সমারোহ যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আমরা বলি—ইন্দ্রপাত হয়ে গেল। একটি জলসার সমারোহের আসরের মধ্যে আলো নিভে গেল, বীণাযন্ত্রের তার কেটে গেল। মানুষ চমকে উঠে বলে ওঠে—ওঃ ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

শ্রদ্ধেয় সুধীর দা—সুধীরচন্দ্র সরকারের মৃত্যু—ঠিক তাই। বাংলা দেশের সাহিত্যের আসরে—এক ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

কিছুদিন আগে আমার আত্মকথা—"আমার কথায়" সুধীরদা সম্পর্কে যা লিখেছিলাম —তারই পুনরুল্লেখ করে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি—জ্যেষ্ঠতর্পণ শেষ করি।

"সাহিত্য ক্ষেত্রে এই একটি মানুষ। জ্যেষ্ঠের উদারতা অগ্রজের স্নেহ নিয়ে বসে আছেন এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্সের দোকানের সেই কোণের দিকে। মোটা পুরু লেন্সের চশমা চোখে মোটা মানুষটি—নিবাত নিষ্কম্প একটি প্রাণময় প্রদীপের মত জ্বলছেন। কালী নেই—প্রসন্ন আলো আছে, স্নেহের উত্তাপ আছে। অথবা গিরিশৃঙ্গের মত ধ্যানমগ্ন। তার এদিকে মানে পশ্চিম দিকে আছেন অচিন্ত্য প্রেমেন্দ্র প্রবোধ অথবা অন্নদাশংকর শৈলজা অথবা প্রমথ গজেন্দ্র বিমল অথবা আরও নূতন কালের দীপক সুধীরঞ্জন বা আরও আধুনিক কেউ। ওদিকে সামনে উত্তর দিকে খান দুয়েক কি তিনখানা চেয়ার। তার একখানাতে আগে বসতেন কেদারদা (চট্টোপাধ্যায়), প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, মাখন সেনকেও দেখেছি। কখনও মধ্যে মধ্যে পেয়েছি শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে। তার সঙ্গে হঠাৎ পেয়েছি অন্য কোন প্রবীণকে। ওই সৌরীন দা'র মত ভেটারনকে। একটু দূরে থাকত বিশু মুখুজ্যে। নানান কথাবার্তা ও হাস্য-পরিহাসের মধ্য থেকে বাকবিধাতাদের বাক-চাতুর্যের ছটা ছিটকে-ছিটকে পড়ে। এর মধ্যে সুধীরদা নীরবে বসে থাকতেন সেই প্রসন্ন স্থির হাস্যমুখে। এরই মধ্যে ফুটে উঠত তাঁর ইন্দ্রের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের ও জ্যেষ্ঠের মহিমা।"

এই সুধীরদা চলে গেলেন।

সাহিত্যের একটি আসরের বাতি নিভিল।

একটি ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পরবর্তী অংশ ৫৪২ পৃষ্ঠায়)

মহাপুরুষ ও রাব্বি

(তালমুদের গল্প)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে একটা পুরানো গল্প আছে, নারদ ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—দুই ব্রাহ্মণ সেজে। কৃষ্ণ এক গরিবের বাড়ীতে খুব যত্ন পেয়ে তার ক্ষতি করলেন, এক কৃপণের বাড়ীতে অপমানিত হয়ে তাকে সোনার থালা দান করলেন; এক ভক্তের বাড়ী অতিথি হয়ে তার একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কারণ হলেন। কেন যে তিনি এসব করলেন তার কারণ কৃষ্ণ নারদকে পরে বুঝিয়েছিলেন। ঠিক এই ধরণের একটি গল্প ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদে' আছে। হাজার হাজার বছর ধরে বাণিজ্য-সূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের যোগাযোগ আছে, গল্পটির সৃষ্টি আগে কোন্ দেশে হয়েছিল বলা শক্ত। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ' থেকে গল্পটি বলছি।

ইহুদীদের ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষি এলিজা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না, মাঝে মাঝে পৃথিবীতে নেমে এসে ছদ্মবেশে মানুষের সমাজে ঘুরে বেড়াতেন। খবরটা হঠাৎ কেমন ক'রে যেন জোখানন নামক একজন 'রাব্বি' বা পুরোহিতের কানে পৌছোল। তিনি নিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন—এলিজার দর্শনলাভের জন্য। দিনের পর দিন উপবাস এবং প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের দয়া হ'ল, এলিজা জোখাননের বাড়ীতে সশরীরে উপস্থিত হলেন।

জোখানন বললেন, "প্রভু, আপনি নিশ্চয় পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়েছেন, আমাকে আপনার সঙ্গে নিন। আপনার কথা শুনে এবং কাজ দেখে আমার জ্ঞান বাড়বে, দৃষ্টি প্রসারিত হবে।"

এলিজা বললেন, "না, আমার কাজের অর্থ তুমি বুঝতে পারবে না, বৃথা কষ্ট পাবে এবং দেবে।" রাব্বি নাছোড়বান্দা, বললেন, "আমি আপনাকে কষ্ট দেব না, কোনো প্রশ্ন করব না, শুধু সঙ্গে থাকব।"

এলিজা বললেন, "বেশ, তা হ'লে চলো, কিন্তু নিঃশব্দে থাকবে। আমার কাজে সন্দেহ প্রকাশ করলে এবং প্রশ্ন করলে চলবে না। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।"

রাব্বি জোখানন সেই শর্তে রাজি হয়ে এলিজার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। দু'জনে ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যাবেলা এক গরিব গৃহস্থের বাড়ী এসে পৌছোলেন। গৃহস্থের সম্বলের মধ্যে একটি ভালো গরু, তার দুধ বেচেই বেচারি কায়ক্লেশে সংসার চালায়। কিন্তু লোকটি বড়ো সজ্জন, তার দরজা থেকে কেউ কখনও ফেরে না। নিজের অন্নের ভাগ দিয়ে সে

অতিথিদের খাওয়ালে, তাঁদের যত্ন করতে বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। ভোর না হতেই এলিজা উঠে প্রার্থনা করলেন, তাঁর প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে—রোগ নেই, আঘাত নেই—গৃহস্থের গরুটি পড়ল আর মরল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এলিজা জোখাননকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কুটির থেকে, পথ চলতে আরম্ভ করলেন আবার।

জোখানন তো ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, এলিজাই গরুটির মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলে রাব্বি আর থাকতে পারলেন না, "গরিবকে অতিথি-সৎকারের জন্য কিছু পুরস্কার তো দিলেনই না, তাছাড়া তার জীবন ধারণের একমাত্র উপায় গরুটিকেও মেরে এলেন? কেন বলুন তো?"

এলিজা বললেন, "চুপ। প্রশ্নের উত্তর পাবার পর আমাকে আর তুমি দেখতে পাবে না। যা করছি, যা করব, "দেখে যাও, শুনে যাও, কথা বোলো না।"

আবার চললেন দু'জনে। চলতে চলতে সন্ধ্যার দিকে এক বিরাট প্রাসাদের দরজায় এসে হাজির হলেন তাঁরা, রাত্রের মতো আশ্রয় চাইলেন। বাড়ীর কর্তা অতিথি দেখে অপ্রসন্ন হলেন, চাকর দিয়ে একটু রুটি আর এক পাত্র জল পাঠিয়ে দিলেন, একটা কথাও বললেন না। খাওয়ার পর তাঁরা কোথায় শুলেন, শুতে পেলেন কিনা খোঁজও নিলেন না। সকালে প্রার্থনা সেরে এলিজা দেখলেন যে, এঁদোপড়া ঘরটায় তাঁরা রাত্রে ছিলেন, তার একটা দেয়াল খুব জখম হয়েছে, কোনদিন ভেঙে পড়বে। এলিজা মিস্ত্রি ডেকে আনলেন, সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে নিজের খরচে দেয়ালটা মেরামত করালেন। গৃহকর্তা একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করায় বললেন, "আপনি রাত্রে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমাদের সাধ্যমতো তার প্রতিদান দিলাম। কিছু মনে করবেন না।"

রাব্বি দেখে-শুনে অবাক। তিনি অশ্রদ্ধায় যা দিয়েছে, এ যে তার শতগুণ প্রতিদান হয়ে গেল! যাই হোক তিনি প্রশ্ন না ক'রে নিঃশব্দে এলিজাকে অনুসরণ করলেন। কিছু পথ চ'লে সন্ধ্যাবেলা তাঁরা এক নতুন শহরে গিয়ে ঢুকলেন। শহরের মধ্যে একটি সুন্দর 'সিনাগগ্' বা ইহুদীদের ধর্মমন্দির ছিল। সান্ধ্য-উপাসনার সময় হয়ে এসেছে দেখে তাঁরা দু'জনে সিনাগগে ঢুকলেন। বাড়ীর ভিতরটা সোনা দিয়ে মোড়া, তাতে নানা কারুকার্য। যারা প্রার্থনায় যোগ দেবে তাদের প্রত্যেকের চেয়ারে মখমলের গদি আঁটা। উপাসনার শেষে যখন সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন এলিজা চেঁচিয়ে বললেন, "আপনারা কেউ দয়া করে দু'জন দরিদ্র পথিককে রাত্রের মতো আশ্রয় দেবেন?" কেউ কোনো উত্তর দিলে না, যে যার বাড়ী চলে গেলেন। এলিজা এবং জোখানন সে রাত্রে পথের ধারেই শুয়ে রইলেন।

'আপনার লীলা আমাকে বুঝিয়ে বলুন'

সকালে যখন উপাসনা আরম্ভ হ'ল তখন এলিজা ধর্মমন্দিরে ঢুকে উপাসকদের প্রত্যেকের হাত ধরে আশীর্বাদ করলেন, আপনি এই মন্দিরের পরিচালক হবেন।

পরদিন দু'জন হাঁটতে হাঁটতে আর এক শহরে উপস্থিত হলেন সন্ধ্যাবেলা। সেখানকার ধর্মমন্দিরের যিনি প্রধান (শামাশ) তিনি নিজে এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন এবং উপাসকদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। উপাসনার পর তাঁদের শহরের সেরা হোটেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল, তাঁদের যত্নের যাতে কোনো ত্রুটি না হয় তার জন্য সর্বদা সকলে তটস্থ হয়ে রইল। সকালে বিদায়ের সময় এলিজা তাদের আশীর্বাদ করলেন, "ঈশ্বর আপনাদের যেন একজন মাত্র যোগ্য পরিচালক দেন।"

জোখানন আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। কিছুদূর গিয়েই প্রশ্ন করলেন, "আপনার লীলা আমাকে বুঝিয়ে বলুন। যারা আমাদের অপমান করেছে, অগ্রাহ্য করেছে, আপনি তাদের মঙ্গল করেছেন, যারা উপকার করেছে, সেবা করেছে, আপনি তাদের পুরস্কার না দিয়ে ক্ষতি করেছেন,—এর কারণ কি? আমি জানি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পর আপনি আমাকে ত্যাগ করে যাবেন, তবু আমার কৌতূহল নিবৃত্তি না করলে চলছে না।"

এলিজা বললেন, "তবে শোনো: ঈশ্বরের লীলা সব সময়ে বোঝা যায় না, তবু তাঁর উপর বিশ্বাস রেখো। তুমি জানো না, যে গরিব লোকটি যেদিন আমাদের যত্ন করেছিল তার স্ত্রীর সেদিন রাত্রিশেষে মরবার কথা। আমি ঈশ্বরের বিধান আগেই জানতে পারি, তাই সেদিন তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি যেন তিনি গরুটির জীবনের বিনিময়ে গরিবের স্ত্রীর জীবন রক্ষা করেন। বেঁচে থাকলে ওরা দু'জন অন্য উপায়ে জীবিকা চালাবে, স্ত্রী মারা গেলে লোকটি বড়ো কষ্ট পেত। যে ধনীর বাড়ী আমরা অনাদর পেয়েছিলাম, তাঁর সেই ভাঙা দেয়ালের তলায় তার পূর্বপুরুষের পোঁতা গুপ্তধন ছিল। লোকটি যদি নিজে ভিত পর্যন্ত খুঁড়ে নিজে দেয়াল তুলত, তাহলে সেই গুপ্তধনের

সন্ধান পেত। আমি উপর-উপর কাজ-চলা-গোছের মেরামত করিয়ে দেওয়ায় সে সেই বিপুল ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হ'ল। প্রথম যে ধর্মমন্দিরে আমি প্রত্যেক উপাসককে 'পরিচালক হও' বলে আশীর্বাদ করেছি, সেখানে আশীর্বাদের ফলে বহু পরিচালক হবে, মতান্তর এবং দলাদলিতে মন্দিরের ক্ষতি হবে, উপাসকদের চরম অশান্তি হবে। অপর পক্ষে যে ধর্মমন্দিরে একজন যোগ্য পরিচালক থাকবেন তার কাজে কোনো বাধা হবে না, উপাসকদের মধ্যে শান্তি থাকবে, দিন দিন উন্নতি হবে। মন্দলোকের সুখ-সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা কোরো না, ভালো লোকের দুঃখকষ্ট দেখে ঈশ্বরের বিচারে সন্দেহ কোরো না। ঈশ্বর সকলের সব কাজ লক্ষ্য করছেন, তাঁর সুবিচারে সন্দেহ প্রকাশ করা ঠিক নয়।"

এই কথা বলতে বলতে এলিজা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাব্বি জোখানন দেখলেন, তিনি পথের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে আছেন।

দোষ ও গুণ

শ্রীবিনয় বাগচী

দেখেছ খেজুর কাঁটা, দেখেছ কি রস ?
কাঁটা তরে অপবাদ, রসে তার যশ।
তেমনি তোমার বহু গুণ রাশি মাঝে,
দোষও নিশ্চয় কিছু আছে ভাই আছে।
যদি কেহ নিন্দা করে তোমার সে দোষ,
হয়ো না কাতর তায় করোনাক রোষ।
মানুষ দেবতা নয় দোষ তাই থাকে,
তাই বলে যেন তাহা গুণেরে না ঢাকে।
গুণের চর্চায় সদা গুণ বৃদ্ধি হয়,
দোষের দমনে দোষ কমিবে নিশ্চয়।
গুণের আবাদ করে গুণেরে বাড়াও,
দোষকে আগাছা সম সমূলে তাড়াও।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রেল ষ্টেশন অনেক দূরে। গরুর গাড়ীতে ক্যাচর্ ক্যাচর্ করে যেতে হয়। আহ্লাদী আর জল্লাদী কোঁচড় ভরে চিঁড়ে, মুড়ি, বাতাসা নিয়ে নেয়। সারা পথ কচর্ কচর্ করে খাবে।

চারটা গরুর গাড়ী আসে। গাড়ীতে খড় বিছিয়ে বিছানা পাতা হয়। রাজা আর সেনাপতি আলাদা এক গাড়ীতে ওঠে। সেনাপতির মুখে খৈ ফোটে। সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়োয়ান আর গরুকে বলে, "এদিকে নয়, ওদিকে চল।" মাঝে মাঝে চলায় গোল হয়ে যায়। তা যেমন-তেমন, সেনাপতি ভয় দেখায়, চমকানো কথা কয়। ছেলেধরার কথা।

সে বলে, "জানুন ষ্টেশনের নাম শেয়ালদ' কেন? আগে ছিল বনজঙ্গল,—রাজ্যের শেয়ালের বাস। তাই তার নাম ছিল শেয়ালদ'। তারা ছেলে চুরি করত। তারপর বন-জঙ্গল কেটে হ'ল রেল ষ্টেশন। শেয়ালরা রাগ করে চলে গেল। ওরা শেয়ানা তো। লোক রেখে গেল। তারা ষ্টেশনে লুকিয়ে থাকে, আর ছেলে চুরি করে।—" রাজা চোখ বড় করে বলে, "অ্যাঁ। তা' হলে ফিরে যাই।" সেনাপতি বলে, "উঁহু, ওদের এড়াবার কায়দা আছে।" রাজা বলে, "কি কায়দা?"

সেনাপতি বলে, "গাঁটছড়া বাঁধা থাকলে ওরা সরে পড়ে। অত লোক তো আর একবারে ধরতে পারে না। ভয় নেই। আমি খেংরাপটির ছেলে। ওদের জারিজুরি জানি। আমি থাকব আগে। তুমি থেক মাঝখানে। ব্যস্।" রাজা নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে, সেনাপতি খেংরা মেরে ছেলেধরাকে নেংড়া করবে। সন্ধ্যায় তারা গরুর গাড়ী থেকে রেল ষ্টেশনে নাবে। গঙ্গাস্নানে পুণ্যি করতে চলেছে। মেয়েরা নেবে গরুর গাড়ীতে প্রণাম করে উলু দেয়।

গরুরা গাড়ী টানে। কিন্তু ওদের কানে এমন শব্দ আগে আসেনি। ওরা ভড়্কে যেয়ে গাড়ী নিয়ে ছোটে, আহ্লাদী আর জল্লাদী সবে গাড়ীতে মাথা ঠেকিয়েছিল। তারা উপুড় হয়ে পড়ে, আর মুখ কাদায় মাখামাখি হয়। খালি কাঁদা বাকি থাকে। তারপর এ ওর আঁচলে মুখ মুছে মুখোমুখি হয়ে দেখে। ষ্টেশনে যাত্রীর ভিড়। অনেক কষ্টে তারা টিকিট কাটে। সিটি বাজিয়ে ঝম্ঝম্ শব্দে গাড়ী আসে। দত্তিদানা ভেবে আহ্লাদী জল্লাদী লুকোতে চায়, কিন্তু ট্রেনে ওঠার হুড়োহুড়ি। যেখানে যায় জায়গা নেই। তখন বাধ্য হয়ে তারা একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে পড়ে। হুইশিল বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ে। এবার তারা মেঝেয় বসে উবু হয়ে উলু দেয়। উলু আর প্রণাম এক সঙ্গে সেরে নেওয়া। গাড়ী নড়েচড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মোট বহরের নটর-পটর, আর গাড়ীর হটর হটর! ওরা ভাবে ভূমিকম্প! মুখে উলুধ্বনি আটকে যায়। ওরা গড়াগড়ি খায়। তারপর বোঝে আসলে ভূমিকম্প নয়, ট্রেনের নড়বড়ে কাণ্ড! ট্রেন ছুটে চলে। বাইরে জ্যোৎস্না। তারা অবাক হয়ে দেখে, বাইরে গাছপালা, বাড়ীঘর, মাঠ ক্ষেতের গোল্লাছুট খেলা চলেছে।

কোনও গতিকে ওরা একটু বসার জায়গা পেয়েছিল। সে অবস্থায় ঝিমুতে লাগল।

অনেক রাতে পোষাক পরা চেকার উঠল। দিশি সাহেব। ভাঙ্গা বাংলা কথা কট্মট করে কয়। মহারাজাকে ঠেলে বলে, "টিকেট প্লিজ—"

মহারাজা জেগে ওঠে। ভাবে তার টিকিট দেখতে চায়। তখন রেগে যায়। তা দেখার জন্য ঠেলে জাগান! কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে, চলতি ট্রেনে কি আর করা! টিকি তুলে দেখায়।

চেকার বোঝে না। অপর যাত্রীর টিকেট দেখিয়ে বলে, "দিস্ লাইক—(এ রকম)।"

মহারাজা ভাবে দেশলাই চাচ্ছে। সিগারেট খাবে। পকেট হাতড়ে দেশলাই বার করে দেয়।

চেকার বলে, "গুড্ গড্ (হে ঈশ্বর)! টিকেট, টিকেট।" এবার মহারাজা টিকেট দেখায়।

চেকার মুখ খিঁচিয়ে বলে, "সেকেণ্ড ক্লাস,—আউর থার্ড ক্লাস টিকেট ! যাস্তি ফেয়ার (বেশী ভাড়া) লাগে গা। রূপায়া নিকালও। টাকা বার কর)।"

মহারাজা বলে, "একবার কিনেছি। দোকর দেব কেন ? ও টিকেট ধোঁকর (মিছে) ?"

চেকার বলে, "কুলি লোকরকা ই গাড়ী নেহি। বড়া আদমীকা কামরা। সেকেণ্ড ক্লাস কোচ। ইস্‌মে গদী ফিট হ্যায়,—দেখটা নেহি ?" সে বেঞ্চির গদী দেখায়। তখন মহারাজা টানাটানি করে বেঞ্চির গদী নাবাতে চায়। চেকার বলে, "ক্যা হোটা হ্যায় ?" (কি হচ্ছে ?) মহারাজা বলে, "ভারী গদীর গোমর! নাবিয়ে কাঠে বস্‌ব। টিকিট ফিরিয়ে দাও।"

চেকার বলে, "নেহি মিলে গা। রূপায়া নিকালও। (পাবে না। টাকা বার কর)।"

মহারাজার রাজরক্ত টগবগ করে। সে রেগে গিয়ে হিন্দীতে বলে, "ইয়ার্কী পায়া হ্যায় ? নগদ পয়সা দেকে কেনা হ্যায়।" টিকেট চেকার বলে, "বুরবক্‌কা মাফিক মাৎ চিল্লাও।" মহারাজা বলে, "কি বোলতা হ্যায়। হাম বুরবক রাজ্য কি মহারাজ হ্যায়। হামারা টিকিট মার !" সে "পকেটমার" বলে চেঁচায়।

যাত্রীরা জেগে যায়। ট্রেনে চোর, জোচ্চোর, পকেটমার ছড়িয়ে থাকে। তারা বলে, "পকেটমার ! কোথায় ? ধর ধর—।" মহারাজা বলে, "ইধার।" তখন চেকার ভড়্‌কে যায়। সে সবাইকে বোঝাতে চায়। যাত্রীরা বলে, "মশাই, যাত্রীর ভিড়। বেশী করে কামরা দেননি, আবার বেশী ভাড়া নিতে চান ! গদীতে সে বসতে চায় না। ছেড়ে দিন। মিছে কামড়া-কামড়ি করবেন না।" কি আর করা ? টিকেট ফিরিয়ে দিয়ে চেকার খসে পড়ে।

এবার রাজা মহারাজাকে ছেলেধরার কথা জানায়। বলে, "গাঁটছড়া বাঁধতে হবে। নৈলে কাকে নিয়ে যাবে কে জানে ?"

মানুষ চুরি হয়, এমন চোরের শহর ! আহ্লাদী আর জল্লাদী যাত্রীদের দিকে জুলুজুলু চোখে চায় ! তারা আঙুল দিয়ে একে দেখায়, ওকে দেখায়,—আর বলে, "উই।"

আগে হুঁশিয়ার হয়নি। হঠাৎ জল্লাদী দেখে, বসন্তের ফুটো দাগ ভরা এক গুঁফো লোকের পাশে সে বসে আছে। নিশ্চয় সে ছেলেধরা ! সে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা রে, ছেলেধরা ধরল রে।" তারপর হুড়মুড়িয়ে পড়ল আহ্লাদীর গায়। আহ্লাদীর পাশে বসেছিল একটি লিক্‌লিকে টেরা লোক। সে পড়ল তার গায়, আর তাকে ছেলেধরা ভেবে হাউমাউ করে উঠল !—তাদের মনে হ'ল, তারা নিজেরা ছাড়া আর সবাই ছেলেধরা। তাদের ধরার জন্যে সব ওত পেতে আছে। চোখ চাইলে ভয়, চোখ বুজলে নয়। তারা

চোখ বুজে থাকে। এবার আর ছেলেধরা তাদের খুঁজে পাবে না।…

ভোর ভোর সময় ট্রেন শেয়ালদ' ষ্টেশনে পৌছাল। কোট-প্যাণ্ট পরা দুটি লোক কুকুর নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসেছিল। তা দেখে আহ্লাদী আর জল্লাদী ট্রেন থেকে নাবে না! বলে, "শয়াল। শেয়াল হ'ল ছেলেধরা।" সবাই নেবেছে। মহারাণী বলে "নেবে আয়।" মহারাজা বলে, "নেবে আয়।"

আহ্লাদী জল্লাদীকে বলে, "নাব না, ভয় কি?" জল্লাদী আহ্লাদীকে বলে, "তুই আগে লাব। ভয় লেই।" ওরা ক'পা এগোয়। মাল নেবার জন্ম কুলি এসে কিল্‌বিল করে। আর "ছেলেধরা" বলে ওরা পিছোয়।

অবশেষে ওরা নাবে। বেজায় ভিড়। মহারাজা বলে, "হুঁশিয়ার, সার বেঁধে দাঁড়াও। গুণে দেখি ক'জন আছ।"

মহারাজা রাম এক দুই তিন করে গোনে। কিন্তু একজন কম হয়ে যায়। তখন খালি কামরায় ডাকাডাকি,—"কে আছো গো,—নেবে এসো।" আবার গোনে, আবার একজন কম। কি হ'ল? নাবার আগে ছেলেধরায় ছোঁ মেরে নিল! অবশেষে দেখা গেল, মহারাজা নিজেকে বাদ দিয়েই গুণেছে। নিজেকে রাম ধরে স্রেফ্‌ বাদ দিয়েছে! তারপর এক দুই তিন!

তখন কথা কয় হয় কুলি নেবে, কি নেবে না। তাদের নীল রঙের কোর্তা গায়। কর্তা মশায়ের চেহারা নয়। এদিকে চায়, ওদিকে চায়, তড়্‌বড়্‌ করে। কেমন যেন লুচোপনা ভাব! ছেলেধরার সঙ্গে সাট আছে কিনা কে জানে? দূর ছাই! কটাই বা মাল? সবাই মিলে মাথায় আর বগলে নিলে চুকে গেল। পয়সাও লাগে না, ঝামেলাও হয় না। তার আগে গাঁঠছড়া বেঁধে 'ছেলেধরা খেদানো। নিজে বেঁচে বাপের নাম পাথরে খোদানো।

এখন কে আগে, কে পিছে। কে মাঝে থাকবে? রাজা আহ্লাদী, জল্লাদী তিনজনেই মাঝে থাকতে চায়। কারণ ছেলেধরা হয়ত আগায় বা পেছনে ছোঁ মারবে। যা হ'ক কোনও রকমে মীমাংসা হয়।

সেনাপতি বলে, "আমি খেংরাপটির ছেলে। আমার সঙ্গে চালাকী নয়। ছেলেধরার আমি পরোয়া করি না। আগে থাক্‌ব।"

সে আগে। তার কাছার সঙ্গে মহারাজা নিজের কোঁচা গিট দেয়। তার কাছার সঙ্গে মহারাণীর আঁচলের এক কোণা। আর এক কোণার সঙ্গে রাজার কোঁচা। রাজার কাছার সঙ্গে আহ্লাদীর আঁচল। তারপর জল্লাদী। সবশেষে থাকে বুড়ো চাকর

তাল ফড়িং। টিঙটিঙে চেহারা, খেংরাকাটির মত হাত পা। গোঁফ নেই, দাড়ি নেই। মুখ দেখে বয়স বোঝা যায় না। সে হাফ-টিকিটে এসেছে। অন্যের তুলনায় তার অর্ধেক ওজন, আর তার চেয়েও কম জায়গা নেয়। গাঁয়ের ষ্টেশনে সে কথা সে মহারাজাকে মনে করিয়ে দেয়। শেয়ালদ' নেবে বাহাদুরী করে বলে, "বলেছিনু। হুঁ।"

মহারাজা মালপত্র সবাইকে ভাগ করে দেয়। কেউ নেয় মাথায়, কেউ বগলে। সবাই গাঁটছড়ার গিঁট টাইট করে বাঁধে, তারপর সার বেঁধে হাঁটে। মহারাজা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, "এবার চোখ বুজে চল দিকি।"

সেনাপতি খেংরাপটির ছেলে। সে চোখ বোজে না। আর সব বুরবক রাজ্যের বাসিন্দা। তারা চোখ বুজে হাঁটে। তাদের গাঁটরিতে রান্নাবান্নার সরঞ্জাম আছে,—বঁটি, দা, খুন্তি, হাতা, কাঁটা, সাঁড়াশী,—আর তার খানিক বেরিয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে বিষম ভিড়। তারা চোখ বুজে হাঁটতে হোঁচট খায়। আর বঁটি, দা, খুন্তি, হাতা, কাঁটার খোঁচা খচ্ করে অন্যের গায়ে লাগে। তারা মুখ খিঁচিয়ে গাল মন্দ দেয়।

আর মহারাজা তাদের ব্যাঙমার মুখের ছড়া শোনায়,—

"দাত ডুবেও গঙ্গাচানের হয়নাকো পুণ্যি,
রেগে মেগে থাক যদি, লাভের ঘরে শূন্যি।—"

তারা এখন বলে, "না রাগিনি তো। লেগেছে কিনা, ভাই—"

তাল ফড়িং ইড়িং বিড়িং করে বলে, "গিলে গিলে গেঁদো হলে লাগবে নি? গা কুঁচকে চললে তবে তো চান। হুঁ।" সে মুখ ছুঁচলো করে নিজেকে দেখায়।

তারা লোকের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দাঁড়ায়। কেউ এর আগে শহর দেখেনি। ট্রাম, বাস, লরি দেখে আর ঘর্ঘর শব্দ শুনে ভড়কায়। গরু নেই, ঘোড়া নেই,—অথচ চলছে! এ যেন কল্কে নেই, হুঁকো-নল্চে নেই তবু ধোঁয়া বেরুচ্ছে!

আহ্লাদী বলে, "কিসে টানছে লা?"

জল্লাদী বলে, "কিসে আর? ভূতে লয় (নয়), শাকচুন্নিতে (শাকচুন্নিতে)।"

"ওরে মা রে—" আহ্লাদী ভয় পেয়ে মহারাণীর আড়ালে লুকোয়। রাজাও অবাক হয়। জুলুজুলু চোখে চেয়ে সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করে। সেনাপতি এক কথায় জবাব দেয়—

"ট্রেন দেখেনি, ট্রাম দেখেনি, বাস্ দেখেনি যে,
নাক টেনে সেই কুণোটাকে বাইরে এনে দে।"

সেনাপতিকে নিয়ে মহারাজা ট্যাক্সি খোঁজে। কিন্তু তার অনেক ট্যাক্স। ট্যাক থেকে অত টাকা ঝাড়তে মহারাজা নারাজ। তখন ঘোড়ার গাড়ী দেখে। হেঁকে ডাকে—

"গাড়ী-বরদার !" কিন্তু তার টেক্‌টেকি তো আর জানে না ! এক গাড়োয়ান এগিয়ে এসে বলে, "আসুন বড়োবাবু।" রাজা তাকে সমঝে বলে, "বড়বাবু নয়। মহারাজ,—বুরবক রাজ্যের মহারাজ। মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, কোটাল আছে। গন্ধাচান এসেছে কিনা, সঙ্গে আনেনি।—" গাড়োয়ান দাঁত বার করে বলে, "সে আমি বুঝে লিয়েছি। লেকিন (কিন্তু) পহেলা (প্রথম) ঠাওরাতে পারিনি। গল্‌তি (গলদ) হোয়ে গেছে। কসুর (দোষ) মাপ কিজিয়ে (করুন)। থার্ড্ কেলাসে ঘোড়াকা মাফিক (ঘোড়ার মত) দাঁড়িয়ে এয়েছেন। জেল্লা চেক্‌নাই নেই। চিন্‌তে কোষ্ট হোয়েছে মহারাজ, গাড়ী লিয়ে বান্দা (চাকর) হাজির।" গাড়োয়ান ভাঙা গলায় মধু মাখিয়ে বলল। তাই মহারাজা মাপ করল। বলল, "ভাড়া যাবে ?"

গাড়োয়ান গ'লে গিয়ে জানাল, "আপনার কেড়েয়া (ভাড়া) খাটব বলেই তো এলাম মাহ্‌রাজ। কিধার যাবেন ? মুর্গিহাটা না খেংরাপটি ?"

মহারাজা হে হে করে বলে, "চানে এলাম, আর মুর্গিহাটা যাব ? কি যে বল ? যাব খেংরাপটি। কত নেবে ?"

গাড়োয়ান বলে, "কত আর লেব মহারাজ। তাঁবেদার আদমী (লোক)। ছো রুপায়া (ছ' টাকা) দেবেন।"

মহারাজা বলে, "দু'গাড়ীর ভাড়া ছ' টাকা !"

গাড়োয়ান বলে, "দো'গাড়ী লেবেন ?" সে চাবুক দিয়ে ইশারা করে। আর এক গাড়োয়ান এসে ভেড়ে। গাড়োয়ানরা কানে কানে কথা বলে। তারপর দ্বিতীয় গাড়োয়ান বলে, "আদাব মহারাজ। আপনার কেড়েয়া নিতে এলাম। আমীর আদমী (রাজা মানুষ)। ছো রুপায়া দেবেন। দো গাড়ী বারো রুপায়া।" মহারাজা অবাক হয়ে বলে, "বারো টাকা ! বুরবক্ রাজ্যি থেকে শেয়ালদ' এলাম তার ভাড়া হ'ল গিয়ে—"

প্রথম গাড়োয়ান বলে, "মাহরাজ, থার্ড্ কেলাসে কাঠে বোসে এলেন। আর এ গাড়ী হোল ফাষ্ট কেলাস। এদিকে ভি নোজর দেন (চেয়ে দেখুন)। লৌতুন (নতুন) গদী, রাবোট (রবার) চাকা। হাওয়াকি রোথ (রথ)। আউর (আর) ঘোড়া কি পঙ্খিরাজ ! মাক্ষণকা মাফিক গদ্দি (মাখনের মত গদী)। বোসে খাবি খাবেন !" দ্বিতীয় গাড়োয়ান বলে, "আউর উড়িয়ে লেবে। ঝোকড়-বোকড় নেই, চেল্লা-চেল্লি (চেঁচামেচি) লেই। সাপের মাফিক (মত) পিছলে যাবেন। লাট-বেলাট হোয়ে টৌম্‌টোম্ (টমটম) চেপে যাবেন !"

টমটম চেপে যাবে কি, ভাড়া শুনে মহারাজার মাথা টনটন করে। মহারাজ দর কষে বলে, "যাও। দু'গাড়ী এক টাকা করে দু'টাকা পাবে।"

ভাড়া শুনে দু'গাড়োয়ান গলা ধরে হি হি করে হাসে। হাসি আর থামে না। ঠোঁট ঠেলে মূলোর মত দাঁত বেরিয়ে আসে। মহারাজা বলে, "হাস্‌ছ যে?"

প্রথম গাড়োয়ান বলে, "হাসার কথা বোললেন মহারাজ, কি কোরে কাঁদি? লেকিন (কিন্তু) হেসে হেসে চোখে পানি (জল) বেরোল। দেখেন, ঘোড়াভি হাসছে!"

দ্বিতীয় গাড়োয়ান বলে, "মহারাজ, ইমানদার আদমী। বহুৎ এলেম (জ্ঞানবুদ্ধি)। গরীবকে দরিয়ায় ডাল্‌বেন (নদীতে ফেলবেন) না। যাস্তি লোব না (বেশী নোব না)। দোনো গাড়ী ভাড়া ছো রূপায়া (ছ' টাকা) দেবেন।"

তবু মহারাজা দর কষে। প্রথম গাড়োয়ান বলে, "খিচ্‌খিচ্‌ করে গাড়ী কেড়েয়া হয় না বড়বাবু। কোম্‌ ভাড়ায় লিয়ে যাবো। লেকিন চাক্কায় বোসে যাবেন।"

দ্বিতীয় গাড়োয়ান প্রথমকে বলে, "লে, লে, মুরোদ লেই (ক্ষমতা নেই)। দেখে বুঝে লিয়েছি। ছুঁচুপানা (ছুঁচো পনা) মুখখানা, ও ছুঁকতে গাড়ী চড়ে না।"

এর মধ্যে কেড়েয়া নিয়ে সব গাড়ী চলে গেছে। ধারে কাছে আর গাড়ী নেই। অগত্যা মহারাজা চার টাকায় দু'গাড়ী ভাড়া করে। রবারের চাকা বটে। কিন্তু পুরানো হয়ে তা কয়েক জায়গায় ক্ষয়ে গেছে। সেখানে ধাক্কা লেগে গাড়ী নেচে নেচে চলে। আর আহ্লাদী পড়ে জল্লাদীর গায়, জল্লাদী পড়ে মহারাণীর গায়!

খানিক এগিয়ে গাড়ী থেমে যায়। মহারাজা বলে, "গাড়ী থামালে কেন?"

প্রথম গাড়োয়ান বলে, "থামাই নি মাহরাজ। ঘোড়া রুখে গেল।"

মহারাজা বলে, "চাবুক মার।"

গাড়োয়ান বলে, "মারলে ভি যাবে না, মাহরাজ। লাথি লাগাবে। চা পানি খাবার টাইম। চা দোকান দেখে রুখেছে (থেমেছে)। তুরন্ত্‌ (তাড়াতাড়ি) একঠো রূপায়া নিক্‌লান (বার করেন)। চা খিলাকে (খাইয়ে) সমঝাই (বোঝাই)। নেহি তো (নইলে) ফিন্‌ (আবার) শেলদ' লৌট যাবে (ফিরে যাবে)।"

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। কি আর করা? মহারাজা এক টাকা বার করে দেয়। আক্কেল সেলামী!

দু'গাড়োয়ান দোকানে ঢুকে হাসাহাসি করে চা ফুলুরি খায়। তারপর ঘোড়াকে দানাপানি খাওয়ায়। মহারাজা বলে, "ঘোড়া চা খেল?"

গাড়োয়ান বলে, "খেল মাহরাজ। লেকিন রূপায়া ফুরাল। সিগ্রেট খেতে পারল না। মেজাজ খোশ্‌ (খুসী) হোল না।" মহারাজা বলে, "ঘোড়া সিগ্রেট খায়?"

গাড়োয়ান বলে, "খায় মাহরাজ। কোল্‌কাত্তাই ঘোড়া। সিনেমা ভি দেখ্‌নে মাঙে (চায়)।"

এবার গাড়োয়ান চাবুক কষে। হাড়গোড় বার করা পক্ষিরাজ ঘোড়া লেংচাতে লেংচাতে ছোটে। গাড়ীর চাকার আর ঘোড়ার ক্ষুরের জোড়বাঁধা শব্দ হয়,—গড়্‌ গড়াট্‌ —টক্‌ টকর!

(ক্রমশঃ)

মুক্তোর মালা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বন-কন্যা অম্বালিকা। জন্ম থেকেই বনেই পালিত। কবে কোথায় তার জন্ম হয়েছিল, কেমন করেই বা এসে পড়ল এই হিংস্র পশুদের মাঝখানে—কেউ জানে না সে সব কথা। ছোট থেকে তাকে পালন করেছে বনেরই একটি নেকড়ে বাঘ। ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁচিয়েছে, ফলমূল এনে খাইয়েছে, বিপদের সময় অন্য পশুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য লড়াই করেছে।

অম্বালিকাও এই বনকেই ভালবেসেছে। পশুদের ভাষা শিখে তাদের নিজেদেরই একজন হয়ে গিয়েছে সে এখন। কাঁচা মাংস খেয়েছে, হালকা পায়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে বেড়িয়েছে। এইভাবেই কাটিয়েছে এতগুলো বছর।

কিন্তু সময় তো কারও জন্য বসে থাকে না—দিনে দিনে বুড়ো হয়ে যেতে লাগলো নেকড়েটা। তার শরীর অথর্ব হয়ে পড়ল। থাবার জোর কমে গেল। তারপর যেদিন নখের কোণগুলো গেল ভোঁতা হয়ে, সেদিন সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে আর বেশীদিন নয়। তার মৃত্যুর পর অম্বালিকার কি হবে এ কথা ভেবে সে অস্থির হয়ে পড়ল।

মনের কথা খুলে বলতেই অম্বালিকা বললে—তুমি মিছি মিছি আমার জন্য চিন্তা করছো—এত বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, আর তা ছাড়া তোমারই বা বয়স কি এমন!

নেকড়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না। কিন্তু মনে মনে বললে, ভাবনা করি কি সাধে! এরা হাজার হোক পশু তো আমারই মতন, পেতুম একটি মানুষের দেখা—

নেকড়ের দুঃখ ভগবান কান পেতে শুনলেন। পরের দিনই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক মুনি এসে পড়লেন সেখানে।

মুনির বয়স হয়েছে বিস্তর, মাথায় কাকের বাসা। চিমটি কাটলে গা থেকে ধুলো উঠে আসে। তবু মুনিকে দেখে নেকড়ের প্রাণে আশা হ'ল। অম্বালিকাকে নিয়ে সে এগিয়ে এলো তাঁর সামনে।

মুনি তো অম্বালিকাকে দেখে অবাক। সব কথা শুনে তিনি রাজী হলেন তাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে আসতে। কিন্তু মুশকিল হোল অম্বালিকাকে নিয়ে। বন ছেড়ে যেতে তার মন ওঠে না, বিশেষ করে নেকড়েকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না। শেষকালে অনেক কষ্টে নেকড়ে তো তাকে বোঝাল। অবশ্য অম্বালিকা চলে যাবার সময় তার নিজের চোখ দুটোও ছল ছল করে উঠলো।

এদিকে অম্বাকে নিয়ে চিন্তায় পড়লেন মুনি। একে ভদ্র সভ্য করে তুলে সভ্য সমাজে

না দিয়ে এলে তাঁর দায়িত্ব শেষ হবে না। এই সব চিন্তা করে শহর থেকে পোষাক-আসাক এনে তাকে পরিয়ে, আশ্রমে রেখে তিনি শিক্ষা দিতে লাগলেন। এমনি করে কেটে গেল একে একে দশটি বছর।

অম্বাকে দেখে এখন আর চেনা যায় না। দুধে-আলতা পায়ের রং, একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল। সমস্ত দিন ফুল তোলে, ফল কুড়োয়। মালা গেঁথে পূজো করে। মুনিকে শ্রদ্ধা করে প্রাণ-ভরে।

মুনি ভাবলেন, এতদিনে আমার শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ওকে একবার পরীক্ষা করতে হবে।

এই কথা মনে করে মুনি একদিন ডাকলেন অম্বাকে, বললেন—এতদিন তোমাকে আমি সন্তান-স্নেহে মানুষ করেছি। কিন্তু আর নয়, এবার আমায় গুহায় গিয়ে তপস্যা করতে হবে।

অম্বালিকার মন খারাপ হয়ে গেল, বললে—আপনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন? কিন্তু আপনাকে ছেড়ে—

মুনি বললেন—না অম্বা, তাড়িয়ে তোমাকে আমি দিইনি। এখন সংসারী হওয়াই তোমার কর্তব্য। কিন্তু তোমায় যে এতদিন শিক্ষা দিলাম তা সফল হয়েছে কিনা সেটা জানবার জন্য একটা পরীক্ষা তোমাকে দিতে হবে।

অম্বালিকা হাত জোড় করে বললে, বলুন।

মুনি উঠে গিয়ে গাছের কোটর থেকে বের করে আনলেন একটি মুক্তোর মালা। সেটি অম্বার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—এই মালাটি তোমাকে দিলুম, যাকে তুমি সবচেয়ে যোগ্য মনে করবে তাকেই এ মালাটি পরিয়ে দিয়ে আসবে। পারবে তো? মুনিকে প্রণাম করে অম্বালিকা বললে—আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই পারবো।

বললো তো পারবে, কিন্তু হার নিয়ে অম্বা পড়লো মহা মুশকিলে। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে ফিরে এল তার পুরনো বনে।

নেকড়ে তখনও বেঁচে ছিল, কিন্তু তার অবস্থা তখন খুব খারাপ। চোখে আর মোটে দেখতে পায় না, গায়ের চামড়া গুটিয়ে এতটুকু, প্রাণটা শুধু ধুক ধুক করছে।

অম্বাকে তো প্রথমে চিনতেই পারেনি নেকড়ে। চোখে তো আর দেখে না, পরে চিনতে পেরে গায়ে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলো—তাই তো কত বড় হয়ে গেছিস, আমার সে অম্বা আর নেই। বোস বোস, কেমন আছিস বল।

অম্বার সব কথা শুনে নেকড়ে অনেক ভেবে বলল—ভাখ, যার মনে কোন ভয় নেই

সেই হচ্ছে সবচেয়ে যোগ্য। তুই তারই খোঁজ কর। ছোট বলে কাউকে হেনস্থা করতে নেই—ওই ওদিকের জামরুল গাছটাতে যে ছোট্ট ফুটফুটে চড়াই পাখীটা থাকে, তুই প্রথমে তারই কাছে যা।

মুক্তোর মালা গলায় দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে অম্বা গাছের নীচে গেল। ডাকাডাকি করতে চড়াই গিন্নী বেরিয়ে এসে বললে—কাকে খুঁজছো ভাই? অম্বা বললে, খুঁজছি আমার চড়াই ভাইকে, সে বাড়ী নেই?

আছে বৈকি, দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি—এই বলে চড়াই-গিন্নী ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই কর্তার দেখা পাওয়া গেল।

অম্বা বললে, নীচে এসো, কথা আছে।

চড়াই বললে—কি কথা বল তো?

অম্বা বলল, তুমি তো দেখি বেশ মনের আনন্দে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও। একটা কথা কিন্তু জানতে ভারী ইচ্ছে হয়—তুমি কাউকে কি ভয় করো? বলো?

চড়াই পাখী গোল গোল চোখ আরও গোল করে বললে—শোন কথা, ভয় আবার করি না! সব সময়েই তো ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে থাকে। বিশেষ করে রাত্তির বেলা তো কথাই নেই।

অম্বা ভুরু কুঁচকে বলল, এত তোমার কিসের ভয়?

এধার-ওধার দেখে নিয়ে, চড়াই পাখী ফিসফিস করে বললে—ওই যে গো, ওই ম্যানামুখো বেড়ালটা—কি বলবো বোন, দিনরাত তক্কে তক্কে থাকে, কি যে করি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে!

অম্বালিকা বললে, আহা তাতো বটেই—আচ্ছা, আজ আমি যাই।

বেড়ালকে বেশী খুঁজতে হ'ল না, সে কাছেই ছিল—ডাকাডাকি করতে বেরিয়ে এসে বলল—কি গো, সাত-সকালে চেঁচামেচি সুরু করলে কেন?

—না মাসী, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, তাই!

—বেশ, বেশ, এসো।

—আচ্ছা মাসী, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছি—ঠিক ঠিক জবাব দেবে তো?

—বলোই তো আগে!

—তোমার তো খুব দাপট এখানে, সমস্ত পাখী ভয়ে জুজু হয়ে থাকে একেবারে, কিন্তু তুমি নিজে কাউকে ভয় করো না তো?

—কি যে বলো বাপু—মাসীর চোখের মণি ঘুরতে লাগলো, সব সময়েই তো ভয়ে ভয়ে থাকি, বুনো কুকুর শেয়াল কত কি রয়েছে!

মুক্তোর মালায় হাত বুলিয়ে অম্বা বললে—আচ্ছা, বলো তো মাসী—কে কাউকেই ভয় করে না?

মাসী গোঁফ ফুলিয়ে বললে—সে যদি বলো তবে আমার বোনপোরা। ভয় কাকে বলে তাই ওরা জানে না।

নাচতে নাচতে অম্বালিকা এলো ভেতর বনে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললে—বাঘ ভাই বাড়ী আছো নাকি?

গোঁফ চাটতে চাটতে বাঘ হাঁক দিল, কে রে?

অম্বালিকা বললে,আমি তোমার বোন অম্বা, চিনতে পারছো না?

—বেশ বেশ—বাঘ হাই তুলে বলল, কি ব্যাপার বলো দেখি। অম্বা বলল—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। আচ্ছা বাঘ ভাই, তোমাকে তো সব্বাই ভয় করে, করে না?

বাঘ গর্জন করে বললে -করে না আবার, আমিই হলুম কিনা বনের রাজা—

অম্বা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—তা হলে তুমি নিশ্চয়ই কাউকে ভয় করো না, কি বলো?

একটু থেমে চোখ পিটপিট করে বাঘ বললে—তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না বোন—ভালই ছিলাম, এই কিছুদিন থেকে এক উৎপাত সুরু হয়েছে।

কি বলো তো?

বাঘ বললে—কয়েকদিন হোল একটা ব্যাধ এসে ভয়ানক জালাতন সুরু করে দিয়েছে। যেমন তার চেহারা তেমনি হাতের টিপ। তার হাতের বিষ-মাখানো তীর খেলে আর কাউকে বাঁচতে হবে না।

অম্বা বলতে যাচ্ছিল, সে থাকে কোথায়। কিন্তু তার আগেই বাঘ ফিসফিস করে বললে—ওই ত্যাখো, নাম করতে করতেই হাজির হয়েছে, আমি পালাই।

সামনের দিকে চেয়ে একটু পরেই অম্বালিকা ব্যাধকে দেখতে পেল। বাঘ মিথ্যে বলেনি—কি তার চেহারা, যেন একখানা কালো পাথর খুঁদে কেউ তৈরী করেছে। চোখ দুটো ভাঁটার মত গোল আর লাল। তাড়াতাড়ি মুক্তোর মালাটা হাতে খুলে নিয়ে অম্বা বললে—এই যে দেখছো মুক্তোর মালা, এ মালা তোমার হতে পারে যদি একটা কথার সত্যি জবাব দাও।

মালা দেখেই তো লোভে ব্যাধের চোখ চকচক করে উঠেছে, সে বললে—বলো না চটপট কি জানতে চাও।

অম্বা বলল, আমি ঠিক করেছি যার সাহস সবচেয়ে বেশী তাকেই এ মালা দেব। তোমার তো খুব সাহস তাই না?

—নিশ্চয়ই। বনের বড় বড় পশুরা আমার নামে ভয়ে কাঁপে।

—তাহলে তুমি নিশ্চয়ই কাউকে ভয় করো না?

বুক ফুলিয়ে ব্যাধ বললে, ভয় আবার করবো কাকে? যমরাজ ছাড়া কাউকে ভয় করি না আমি। দাও দেখি মালাটা—

—রোসো রোসো—অম্বা বললে, তুমি বললে যমরাজাকে তুমি ভয় করো। তাহলে তো বাপু মালা তোমাকে আমি দিতে পারবো না।

ব্যাধ চটে উঠে বললে—মালাটা দেবে না সে কথা আগে বললেই হতো, যমরাজকে ভয় করে না এমন লোক আছে নাকি?

—সেইটেই তো খুঁজছি—এই বলে নাচতে নাচতে অম্বা চলে এল তার কাছ থেকে।

এইবারই আরম্ভ হ'ল সত্যিকারের কঠিন কাজ। মুনিকে একবার স্মরণ করে অম্বা বসে গেল যমরাজের তপস্যায়।

কঠিন তপস্যা। দিন যায়, মাস যায়—বছরও ঘুরে এল ক্রমশঃ। অম্বার অমন সোনার রূপ ধূলোয় মলিন হয়ে উঠল। দেবতারা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। শেষকালে যমরাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না। দেখা দিলেন অম্বাকে।

মাথায় হাত রাখলেন যমরাজ—অম্বার সমস্ত মালিন্য দূর হয়ে গেল। তখন জিজ্ঞেস করলেন—কি চাও বলো আমার কাছে?

অম্বা বললে—ধর্মরাজ, একটা কথার জবাব দিতে হবে।

—বলো।

—আপনার ভয়ে সমস্ত বিশ্ব-সংসার তো কাঁপে। কিন্তু আপনাকেও ভয় করে না এমন কেউ আছে কি কোথাও?

যমরাজ বললেন—হ্যাঁ অম্বা, আছে। পৃথিবীতে কেবল একটি প্রাণীই আমাকে ভয় করে না।

—কে সে প্রভু?

ধর্মরাজ বললেন—সোজা উত্তরমুখে তিনদিন হাঁটলে একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ দেখতে পাবে। তারই ডালে বসে গান গায় আর দোল খায় একটি টুনটুনি পাখী। কাউকে ভয় করে না সে।

অম্বা বললে—তাকেই আমি চাই ধর্মরাজ, আশীর্বাদ করুন যেন খুঁজে পাই। যমরাজ হাত তুলে বললেন, তথাস্তু।

হাটতে সুরু করল অম্বালিকা। তিনদিন তিন রাত্রি পরে দেখা পাওয়া গেল টুনটুনি পাখীর। সে তখন মজা করে শিষ দিয়ে গান করছিল, অম্বা গিয়ে বলল—নীচে এসো, একটা কথা বলবো তোমায়।

টুনটুনি নীচে নেমে এলে অম্বা বললে—সত্যি করে বল তো, তুমি কাউকে ভয় করো না?

টুনটুনি বললে—বাঃ, ভয় আবার করব কাকে?

অম্বা বলল, কেন, বনে এত হিংস্র পশুপাখী রয়েছে—তারা যে-কোন সময়ে তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

টুনটুনি বললে—ছাখো, ভয় করে শুধু বোকারা। মরতে তো একদিন হবেই, মিছিমিছি ভয় করে কি লাভ?

অম্বা বললে—যমরাজকেও তুমি ভয় করো না?

"যেই না দেওয়া—অবাক কাণ্ড, টুনটুনিটা দেখতে দেখতে এক সুন্দর রাজপুত্র হয়ে গেল।"

টুনটুনি হেসে বলল—তিনি হচ্ছেন ধর্মরাজ, আমার যদি আয়ু থাকে তো তিনি আমার কি করতে পারেন, বলো?

অম্বা আর কথা না বলে মুক্তোর মালাটা গলা থেকে খুলে পরিয়ে দিল টুনটুনির গলায়। আর যেই না দেওয়া—অবাক কাণ্ড, টুনটুনিটা দেখতে দেখতে এক সুন্দর রাজপুত্র হয়ে গেল। অম্বালিকা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। রাজপুত্র বললে—অবাক হচ্ছো অম্বা, আমি কিরণগড়ের রাজপুত্র, এক মুনির শাপে পাখী হয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন, যদি তাঁর দেওয়া মুক্তোর মালা কেউ আমার গলায় পরিয়ে দেয়, তবেই আমি মুক্তি পাবো। তুমি আমাকে মুক্তি দিলে।

রাজপুত্রের কথা শেষ হবার আগেই কমণ্ডলুর শব্দ শোনা গেল। মুনি সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন—তোমাকে আমি আরও একটা কথা বলেছিলাম রাজপুত্র, যে তোমায় মালা দেবে সে হবে কিরণগড়ের কুলবধূ।

রাজপুত্র কোন কথা না বলে অম্বালিকার একখানা হাত ধরল। লজ্জায় রাঙা হয়ে অম্বা মাথা নীচু করল।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কাকীবুড়ী এবার জিগ্যেস করলে, "কিন্তু বাছারা, তোমরা এদেশে কেন ?"

খুড়োখুড়ী হাত জোড় করে বলে উঠল :

এসেছি এই আজব দেশে
তিনটি মেয়ের সন্ধানে—
খুঁজে পেতে দিলে পরেই
চলে যাবো ঘর পানে—"

কাকীবুড়ী বললে, "কিন্তু রান্নাঘরে এসে বসে আছ কেন ?"

খুড়ো বললে, "সূয্যিঠাকুর ডোবার অপেক্ষায় আছি।"

কাকীবুড়ী বললে, "সে অনেক সময়সাপেক্ষ—। তার মধ্যে আমাকে একটা বিরাট, মস্ত, পেল্লায় গল্প বলো তো !"

খুড়ো বললে, "আপনার মত জ্ঞানী মহিলাকে আমি কি গল্প বলতে পারি ? আপনি তো গল্পের জাহাজ—কত গল্প জানেন !"

কাকীবুড়ী বললে, "জানিই তো ! একশ হাজার গল্প জানি আমি।"

খুড়ো বললে, "তবে ঐ কয়েদী য র ল ব'র ইতিহাসটা নিশ্চয়ই আপনি পুরোপুরি জানেন !"

কাকীবুড়ী বললে, "ও বাবা! ও তো ঐতিহাসিকের খাশ এলাকা। ঐতিহাসিক সব জানে আর রাতদিন লিখে রাখছে। তবে হ্যাঁ, এখানে আসার আগের ইতিহাসটুকু বলতে পারি।"

খুড়ী বললে, "আমরা শুনেছি যে ওর মাথা কেটে নেওয়া হয়েছিল।"

কাকীবুড়ী বললে, "ঠিক, একজ্যাক্‌ট্‌লি--তবে শোন—

যরলব'র কাহিনী

সেদিন ছিল শনিবার তার উপরে হাট-বার। সব রাস্তায় লোক ভর্তি পিল্‌পিল্‌, গিজ্‌গিজ্‌ করছে। জহ্লাদের পাশে যরলব বসেছিল গাড়ীতে। এত ভিড় যে গাড়ীটা মোটে এগুতেই পারে না। যত রাজ্যের ফালতু লোক কয়েদীর গাড়ী দেখতে জমেছে।

গাড়ী পাল্কী ছেড়ে বড় বড় ঘরের মেয়েরা পায়ে হেঁটেই এসেছে।

ফাঁসিকাঠের কাছে কয়েদীর গাড়ী পৌছতে যরলব বসে পড়ল। তার মুখটা ছাইয়ের মত শাদা। জহ্লাদ পরল তার রক্তের মত লাল পোষাক, তারপর একটা বিরাট কাঁচি নিয়ে শান দেওয়ার পাথরে ঘষে ঘষে ধার করতে লাগল। এই কাঁচি দিয়ে যরলব'র মাথা কাটা হবে।

যরলব হাঁ করে বসে আছে। তার বন্ধুরা তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে। তার যেন কোন দিকেই হুঁশ নেই।

ফাঁসির সময় হয়ে এল। জহ্লাদ যরলব'র চোখ বেঁধে দিল। তারপর জনতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—

"আমি যেভাবে কাঁচি চালাতে উদ্যত এতে যদি কারো আপত্তি থাকে তো বলুন—

পুলিশের বড়কর্ত্তা হেঁইওমারি সর্দার জিগ্যেস করলে, "কাঁচি-টা কি ঠিক মত ধার দেওয়া হয়েছে?"

জনতা জিজ্ঞাসা করলে, "ওতে কি ঠিক মত কাটা যাবে?"

জহ্লাদ বললে, "যে কেউ এসে তার মাথার বিনিময়ে কাঁচির ধার পরীক্ষা করতে পারেন।"

কেউই এগুলো না। তখন জহ্লাদ কতকগুলো পুরোনো খবরের কাগজ কাঁচি দিয়ে কচকচ করে কেটে চতুর্দিকে উড়িয়ে দিলে। তারপর কিছু জুতার বাক্স কাঁচি দিয়ে কট্‌কট করে কেটে ফেললে। তারপর কাঠের বাক্সের ডালা কতকগুলো ঘ্যাঁসো ঘ্যাঁসো করে কাঁচি দিয়ে কেটে জহ্লাদ সকলকে কাঁচির ধার দেখিয়ে দিলে।

জনতা স্তব্ধ। কেউ কোন কথা বলে না। বোঝা গেল কাঁচির ধার সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ নেই।

এবার হেঁইওমারি সর্দার জহ্লাদের কানে কানে জিগ্যেস করলে: কিন্তু স্বরটা তার এমন বাজখাঁইয়ে যে প্রশ্নগুলো সবাই শুনতে পেলে—

—"আজ সকালে তিনটে ডিমসিদ্ধ খেয়েছ কি?"

জহ্লাদ বললে, "জী, হাঁ।"

—"তারপর তিনটে মোটা শুয়োরের মেট্‌লি খেয়েছ তো?"

জহ্লাদ বললে, "জী, হাঁ।"

—"তারপর বিশ মিনিট ফুটবল খেলেছ তো?"

জহ্লাদ বললে, "জী, হাঁ।"

হেঁইওমারি সর্দার তখন বলে উঠলো—"তবে এবার কাজ সারো।"

জহ্লাদ কাঁচির ফলা দুটো ফাঁক করে সকলকে সেটা ঘুরে ঘুরে দেখাতে দেখাতে কয়েদীর গলায় দিলে এক কোপ ঘ্যাচ করে, আর ঘরলব'র মুণ্ডুটা দুম্ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

এই পর্যন্ত শুনে খুড়োখুড়ী বললে, "কয়েদীর ঘাড়ে তবে ওটা কার মুণ্ডু?"

কাকীবুড়ী চটে উঠলো—"কোথাকার বেল্লিক, বোকা সব—গল্পটা আগে শেষ পর্যন্ত শোনো তো!"

খুড়ী বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বলো বাপু—"

কাকীবুড়ী বলতে লাগলো—ঘরলব'র স্মৃতিশক্তি ছিল ভারী প্রখর। যখন তার মাথাটা কাঁধ থেকে খ'সে পড়ছে, তখুনি তার মনে পড়ে গেল যে, সে যেন কোন্ কেতাবে পড়েছে, যখন কারো মাথা কাটা হয়, তক্ষুনি সে মরে যায় না। ভাগ্যে তার একথা মনে হয়েছিল, তাই রক্ষে! সে গাড়ী থেকে এক লাফে নীচে পড়ে কাটা মুণ্ডুটা হাতে করে খপ্ করে তুলে নিলে।

জনতা তো এই না দেখে ভয়ে ভোঁ দৌড়। যে যেদিকে পারলে চোঁচা দৌড়ে পালাতে লাগল। পার্ক দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল।

এদিকে ঘরলব-ও মুণ্ডু হাতে কন্ধকাটার মত দৌড় দিল। দৌড়তে দৌড়তে সে এসে উপস্থিত হ'ল তার পরিচিত এক জাদুকরের বাড়ী।

জাদুকর "চক্ষুদান চৌধুরী" তখন জাপানে জাদুবিদ্যা দেখাতে গেছেন। বাড়ীতে ছিল তার ছেলে "অকালকুষ্মাণ্ড চৌধুরী"—একেবারে অজ, গবেট। সে তো মুণ্ডুকাটা ঘরলবকে দেখে দরজা বন্ধ করবার যোগাড়।

ব্যাপার বুঝে যরলব জিগ্যেস করলে, "সবজান্তা খরগোশকে জিগ্যেস করে এসো এখন আমি কি করব।"

অকালকুষ্মাণ্ড চৌধুরী সবজান্তা খরগোশের বাক্সের কাছে গিয়ে ডাকলে, "সবজান্তা, সবজান্তা—এ লোকটা পরামর্শ চাইছে—"

সবজান্তা বাক্সের ডালা খুলে একটা রুপোর সেতারে একটা যুদ্ধের বাজনা বাজালে। তারপর বাক্সের মধ্যে ঢুকে একটা স্লিপ কাগজ নিয়ে এসে অকালকুষ্মাণ্ডের হাতে দিলে।

সে পড়তে লাগল—

"তিন

তিন

তিন।"

তারপরেই জাদুকরের ছেলে দৌড়ল তেতলায় যেখানে তিনটে সেল্‌ফ ছিল—তিন নম্বরের সেলফের তিনের তাকে ৩নং বোতলের ওষুধটা নিয়ে সে মুহূর্তে নীচে নেমে এল।

সে সব জান্তাকে জিজ্ঞেস করলে, "এটা দিয়ে কি হবে?"

বাক্সের মধ্যে থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। যরলব'র কাটা মুণ্ড বললে, "ওটা আমি খাবো।"

অকালকুষ্মাণ্ড জিগ্যেস করলে "কিন্তু মুণ্ডুর নীচে পেট কই?"

যরলব বললে, "মুখ্যু! ঘাড়ের ওপর মুণ্ডুটা বসিয়ে দাও, তা হলেই মুণ্ডুর নীচে পেট এসে যাবে।"

জাদুকরের ছেলে তখুনি এক হাতে মুণ্ডুটা ঠিক জায়গায় লাগিয়ে, অন্য হাতে বোতলের ছিপি খুলে ওষুধটা যরলব'র মুখে ঢেলে দিলে।

ওষুধ পেটে পৌঁছবা মাত্র যরলব সুস্থ হয়ে উঠল। আর তখুনি সে আর জাদুকরের ছেলে ঘরের মধ্যে 'লিপ ফ্রগ' ব্যাঙ-লাফালাফি খেলা খেলতে লাগল।

খানিক খেলে যরলব চাঙ্গা হয়ে গান ধরলে—

'যাদের কিছু রয়না মনে
কথায়-কথায় ভোলে,
কাটলে মাথা কচাং করে
তারাই পটল তোলে।—'

গান শেষ হতেই জাদুকরের ছেলে কোণের কাছে রাখা একটা কলসীর কাছে গিয়ে নীচু হয়ে ডাকলে, "ব্যাঙ মহারাজ!"

কলসীর মুখ দিয়ে থপাস্ করে বেরিয়ে এলো কোলা ব্যাঙ—তার গা-ময় ঝোলা-গুড়…

জাদুকরের ছেলে বললে, "ইনি ত্রিকালজ্ঞ—এঁকে কিছু প্রশ্ন করুন।"

যরলব বললে, "এখন আমার পক্ষে কোন্ দেশে যাওয়া উচিত ?"

ব্যাঙ বললে, "তবে শোনো—একটা দেশ আছে যেখানে লোকেরা নাচতে নাচতে রুটি সেঁকে—আর এক দেশের লোকেরা কেবল প্রজাপতি ধরে পোষে—আরেক দেশে পাখীরা কনসার্ট বাজায় আর ভাল্লুক রামশিঙ্গা ফোঁকে—"

যরলব বললে, "ওসব ভাল দেশ নয়, আমি চাই—"

ব্যাঙ বললে, "চাইলেই বুঝি পাওয়া যায় ? ভাল যদি চাও এই ফাঁপা কাঁচের নলের মধ্যে সেঁধোও—"

নলটা কলমের চেয়ে মোটা নয়, তবুও যরলব অক্লেশে তার মধ্যে ঢুকে গেল।

তখন ব্যাঙ মহারাজ নলের একটা মুখে ফুঁ দিয়ে সারা পেট ফুলিয়ে ফুৎকার ছাড়লে—ব্যাস্, কামানের গোলার মত ঘুরতে ঘুরতে যরলব এসে পড়ল আমাদের দেশে—"

খুড়ো বললে, "এ কী ইতিহাস—আগাগোড়া ভেঁস্তানো—কোনটা আগে, কোনটা পরে তার নেই ঠিক।"

তখন খুড়ী বললে, "ঐ দেখ !"

ওরা দেখলে ঐতিহাসিক তার লম্বা বোগা হাত মাছ ঢোকবার গর্ত দিয়ে বার করে আঙুল উঁচিয়ে শাসাচ্ছে।

কাকী বুড়ী বললে, "এখন বোঝো ঠ্যালা! এসব হ'ল ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য। এর সর্বস্বত্ব ঐতিহাসিকের দ্বারা সংরক্ষিত—। এখন হয়ত আমার নামে নালিশ করবে।" বলে কাকীবুড়ী চুপ করলে। (ক্রমশঃ)

"তোমার যা টাকাকড়ি, তা তোমার নিজের মনে করো না, আপনাকে ভগবানের ভাণ্ডারী বলে মনে করো। তার প্রতি আসক্তি রেখো না। নাম যশ, টাকাকড়ি, এ সব তো ভয়ানক বন্ধনস্বরূপ।"

"সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে নিজেকে দুর্বল ভাবা।"

"আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দা করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

হুরতনের ডাক

(ডিটেকটিভ গল্প)

ডাঃ নির্মল সরকার

ট্রেনটা যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ বিশেষ ঝামেলা ছিল না; ঝোড়ো হাওয়া চলছিল সমানে। কিন্তু বন্ধ ষ্টেশনের মধ্যে ট্রেনটা যখন গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল, তখনই কামরার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। না, যাত্রীর ভিড়ের জন্যে নয়, এমনকি গরমের জন্যেও নয়। যাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল দুর্গন্ধের জন্যে। একটা পচা অস্বাভাবিক গন্ধ প্রত্যেক লোককেই ব্যস্ত করে তুলছিল। সকলেই বিব্রত হয়ে খুঁজতে শুরু করল দুর্গন্ধের কারণটা। প্রত্যেক ষ্টেশনে জমাদারকে এনে বাথরুম পরিষ্কার করা হয়েছে বকশিশ্ কবুল করে; কিন্তু তাকে কি হয়? নাক চাপা দিয়ে কামরার লোকেরা কোনগতিকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছুল। তারপর যে যার মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পাড়ি দিল আস্তানার দিকে। একটু পরেই ফাঁকা হয়ে গেল ১০ নম্বর প্লাটফর্ম।

এত ভিড়, এত কোলাহল নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ভোজবাজির মত। কিন্তু একটা জিনিস রয়ে গেল। লম্বা কালো রং-এর একটা চাবি-বন্ধ ট্রাঙ্ক। সাধারণতঃ ট্রেনের যাত্রীরাই এ ধরণের টিনের ট্রাঙ্ক নিয়ে যায় ভ্রমণ উপলক্ষ্যে। প্লাটফর্মের উপর কালো ট্রাঙ্কটা রাখতে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বেওয়ারিস মাল হিসেবে নয়, ট্রাঙ্কটা থেকে একটা পচা দুর্গন্ধ বার হচ্ছিল বলে সেই দিকে দৃষ্টি পড়েছিল সকলের। অনেক রকম মন্তব্য শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে ট্রাঙ্কটার ভার নিল।

অরিন্দম মুখার্জীকে দেখতে একেবারেই সাধারণ। চেহারার জলুস নেই। প্রথমেই নজরে পড়ে তার মাথার লম্বা কোঁচকানো ব্যাক-ব্রাস করা ঘন চুল আর চোখে পুরু লেন্সের চশমার দিকে। অরিন্দম বেশীরভাগ বসে থাকতে বা পড়াশুনা করতে ভালবাসে। ছোট দুটো ঘর নিয়ে অরিন্দম থাকে। আপনার লোকের মধ্যে তার কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড পরেশ আর দাঁড়ে রাখা একটা প্রকাণ্ড কাকাতুয়া, মিঠু। এই দু'জনকে নিয়েই অরিন্দমের ফ্যামেলি। অরিন্দমের বিছানার পাশেই টেলিফোন। একটা বই নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বেশ মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল অরিন্দম। হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিরক্ত হ'ল অরিন্দম, ভ্রূকুঞ্চিত করে রিসিভারটা কানে লাগাল সে।

—হ্যালো, হ্যাঁ, আমি কথা বলছি···এখুনি যেতে হবে···ট্রাঙ্কে ?···বেশ যাচ্ছি। উঠে দাঁড়াল অরিন্দম, তারপর একটা প্যাণ্ট আর সার্ট পরে যখন যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তখন একটা ট্রেতে করে খাবার নিয়ে পরেশ এসে ঘরে ঢুকল।

—কি রে, এত খাবার কি হবে সকাল বেলায়?

—খাবেন, আবার কি হবে, ফিরতে তো দেরি হবে।

—কেন দেরি হবে কেন! অরিন্দম তাকাল পরেশের দিকে।

—হেড অফিস থেকে ফোন এলে আপনার দেরি হবেই। টেবিলের ওপর ট্রেটা রাখল পরেশ।

—কে বলে, হেড অফিস থেকে টেলিফোন এসেছিল?

—তা না হলে কি এত তাড়াতাড়ি বইটা ছাড়তেন, তাছাড়া বেওয়ারিস মাল পড়ে আছে যখন···।

—তুই কি করে জানলি? চায়ের কাপে একটু চুমুক দিল অরিন্দম।

—ও আর শক্ত কি, ট্রাঙ্ক যখন বলেছেন তখনি বুঝেছি।

—বেশ করেছ, সবই জানো দেখছি, তাহলে ট্রাঙ্কের ভিতর কি আছে সেটাও বলে ফেল। ওমলেটটা শেষ করল অরিন্দম।

—গেলেই দেখতে পাবেন। খালি ডিস আর পেয়ালা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল পরেশ।

—মিঠু অনেকক্ষণ থেকে চীৎকার করছে খাবার জন্যে।

থানায় গিয়ে অরিন্দম বেওয়ারিস ট্রাঙ্কের জিনিসটা দেখতে পেল। একটা মৃতদেহ রয়েছে লম্বা কালো ট্রাঙ্কের ভেতরে, কিন্তু মুণ্ডুটা বাদ। গলা থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ট্রাঙ্কের ভেতর দেহটা ভরা হয়েছিল। দেহটা একটা জোয়ান লোকের বলেই মনে হলো অরিন্দমের। পরনে একটা ডোরাকাটা রঙীন পায়জামা আর গায়ে হাত-কাটা একটা গেঞ্জি। ডান হাতে একটা লোহার বালা আর বাজুতে একটা ছোট হরতন আঁকা উল্কী।

—কি ভাবছ অরিন্দম? নরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, ও ভাববার কিছু নেই। বডিটা একটা পাঞ্জাবী বা শিখের। ঝগড়াঝাটির ব্যাপারে ওরা তো দু'একটা ওরকম খুন-জখম করেই থাকে।

—হ্যাঁ, হতে পারে, কিন্তু শিখ বলছেন কেন?

—কি মুস্কিল, হাতে লোহার বালা, পরনে ডোরাকাটা পায়জামা—তাহলে আর সন্দেহ কি?

আজকাল পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য লোকেরাও এ ধরণের বালা বা পায়জামা পরে থাকে।

এই তোমার দোষ অরিন্দম। নরেনবাবু বললেন, তোমার চোখে সাধারণ জিনিসগুলো পড়ে না, উল্টোপাল্টা ভাবতে পারলে তুমি আর কিছু চাও না।

কোন জবাব দিল না অরিন্দম। শুধু জিজ্ঞেস করল, কোন ট্রেনে এসেছে?

'হাতের উল্কিটা দেখছি'...

'ফুন' এক্সপ্রেসে। লম্বা চুলের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিল অরিন্দম।

কি ভাবছ? নরেন-বাবুর ভারী গলার স্বরে চমকে উঠেছে অরিন্দম। হাতের উল্কীটা দেখছি, উত্তর দিল সে।

ও আর কি দেখবে, ও শ্রেণীর লোকের হাতে উল্কী আঁকা থাকে। ওতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? বললেন নরেন-বাবু, একটা গোলাপ ফুল কিংবা বাঘের মুখও আঁকা থাকতে পারত। তুমি সামান্য জিনিস নিয়ে বড় মাথা ঘামাও অরিন্দম। সোজা রাস্তায় চলো সহজেই কাজ হাঁসিল হবে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ট্রাঙ্কটা এলাহাবাদ থেকে উঠেছে। তুমি সটান ওখানে চলে গিয়ে খোঁজ নাও। পুলিস সুপার তেওয়ারীকে তো চেন, তার কাছে গেলেই সব সন্ধান পেয়ে যাবে।

বাড়ী ফিরে এল অরিন্দম। কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে কাকাতুয়ার ডানা ঝাড়ার আওয়াজ শুনতে পেল সে। তারপরেই মিঠু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠল, পরেশ, এই পরেশ কালা হয়ে গেছিস? দরজাটা খুলে গেল। অরিন্দম পরেশকে দেখতে পেল, সে গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কি হ'ল রে? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

হবে আর কি, সেই সকাল থেকেই গালাগাল শুনছি, কাকাতুয়া যে এত গালাগাল দেয় এ তো কখনও শুনিনি! ঘুমুচ্ছি যখন তখন চীৎকার—এই পরেশ ওঠ, ওঠ না, মরে গেছিস? তাও কি একবার—কতবার তার ঠিক নেই! একটু পরেই আবার, এই চা দে

শীগ্‌গির, ব্যাটা কুড়ে—আপনি যা যা বলেন—সবই হতচ্ছাড়া পাখীটা শিখেছে। কোথায় সকাল বেলায় হরিনাম করবে তা নয়, কেবল গালাগাল!

—ওকে খেতে দিয়েছিস? হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

—তা আবার বলতে, না হলে কি এতক্ষণ চুপ করে থাকত হতচ্ছাড়া।

পরেশ অরিন্দমকে মায়ের মত যত্ন করে। তাকে ছাড়া অরিন্দমের এক মুহূর্তও চলে না। শুধু ঘরের কাজ নয় অনেক বিষয়ে অরিন্দমকে সে উপদেশ দিতেও ছাড়ে না।

—পরেশ, খাবারের ব্যবস্থা কর, চান করে খেয়ে নিয়েই আবার ছুটতে হবে।

—টেবিলে খাবার রাখা আছে। উত্তর দিল পরেশ।

—আর একটা সুটকেশ···। কথাটা শেষ করতে না দিয়ে পরেশ বলল, তাও ঠিক করে রেখেছি।

—তুই কি করে জানলি?

—ও আর বেশী কথা কি! ট্রাঙ্ক কি আর শ্যামবাজার বা ভবানীপুর থেকে এসেছে, ও নির্ঘাৎ বিদেশ থেকে এসেছে, আর চোরাই মালের ব্যাপারে তো আপনার ডাক পড়ে না, নিশ্চয় খুন-জখমের কাণ্ড, তাই আপনাকে যে বাইরে ছুটতে হবে তা আমি বুঝেই নিয়েছিলুম।

—তুই যে একেবারে শার্লক হোমস্ হয়ে গেলি রে?

—সে আবার কে?

—তার গল্প একদিন তোকে বলব, যা বাথরুমে আমার কাপড় দিয়ে আয়। পরেশ গজগজ করতে করতে চলে গেল। তার প্রধান আপত্তি, যে বাবুর জন্যে কিছু করতে পারবে না আর সারাদিন হতচ্ছাড়া পাখীটার গালাগাল শুনতে হবে।

ধীরে ধীরে স্নান সেরে খাবার টেবিলে এসে বসল অরিন্দম। এবার তার মগজে কেসটার কথা চেপে বসল। লোকটা পাঞ্জাবের অধিবাসী হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। নরেনবাবু বলেছেন, এলাহাবাদ থেকে লাসটা এসেছে, কিন্তু ওখানে সম্প্রতি কোন ডাকাতি বা ঐ ধরণের ঘটনার কথা তার কানে আসেনি বা সে কাগজে পড়েনি। ভেবে কোনই হদিস করতে পারল না অরিন্দম। খাওয়া শেষ করে উঠতে যাবে এমন সময় পরেশ তার টেবিলের ওপর একটা চৌকো ধরণের খাম রেখে বললে, একজন বাবু দিয়ে গেল, বললে বিশেষ জরুরী। খামটা খুলে অবাক হয়ে গেল অরিন্দম, খামের মধ্যে একটি মাত্র তাস হরতনের টেক্কা। দৌড়ে বাইরে গেল অরিন্দম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। ফিরে এসে পরেশকে লোকটার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে।

পরেশের 'পাওয়ার অব অবজারভেশন' ভাল। সে বললে, লোকটার বয়স ৩০।৩৫, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, দাঁড়ি-গোঁফ কামানো এবং ডান চোখের পাশে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে।

অরিন্দম সব শুনে তাসটা উল্টেপাল্টে ভালভাবে একবার দেখলে। সাধারণ সস্তা তাসের প্যাকেট থেকে নেওয়া হয়েছে, কোথাও কোন চিহ্ন বা লেখা নেই। অরিন্দম একবার ভাবল থানায় নরেবাবুকে ফোনে খবরটা জানায়, কিন্তু নরেনবাবু এ সব নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবেন, উপহাস করবেন নানাভাবে, তাই নরেনবাবুকে আর টেলিফোন করল না অরিন্দম।

ছুটো স্টকেস আর ছোট বেডিংটা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে, পরেশ অরিন্দমের পাশে এসে চুপি চুপি বলল, বাবু, একটু সাবধানে থাকবেন, আমার মন ভাল বলছে না। তার কথা শুনে হাসল অরিন্দম। কোটের নীচে বাঁদিকের কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝোলানো অটোমেটিক রিভলভারটায় একবার হাত ঠেকিয়ে নিল অরিন্দম। তারপর ট্যাক্সিতে উঠে বসল। মিঠুর চীৎকার তখনও কানে আসছে—'পরেশ, তুই কি কালা হয়েছিস?' পরেশ সেদিকে কান দিল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল চলতি ট্যাক্সির দিকে। পরেশ ভয় পেয়েছে।

ট্রেনে উঠে জিনিসগুলো গুছিয়ে বসল অরিন্দম। ট্রেন ছাড়তে কয়েক সেকেণ্ড বাকি, ঘণ্টা পড়ে গেছে। এমন সময় একটা লোক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল তাদের কামরায়। লোকটার পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবী, হাতে একটা ছোট স্টকেস। অরিন্দম লক্ষ্য করল লোকটাকে। লম্বা চওড়া চেহারা, ডান চোখের কোণে একটা তির্যক কাটার দাগ। অরিন্দমের স্নায়ু শক্ত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। বিপদের সঙ্কেত সে অস্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে। গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার পর অরিন্দম তার জায়গায় বসে লোকটাকে লক্ষ্য করতে লাগল। লোকটা স্টকেস থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে পড়তে শুরু করল। অরিন্দম বুঝল কাগজটা একটা আড়াল মাত্র। তার পাশ থেকে লোকটা লাল বড় বড় চোখ দিয়ে তাকে দেখছে বার বার। ইতিমধ্যে অরিন্দমের একটু ঘুমের আমেজ এসেছিল, কিন্তু ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হঠাৎ তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। সে তাকিয়ে দেখল, লোকটা যেখানে বসেছিল সেখানে আর নেই। ভাল করে আবার কামরার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল অরিন্দম—না কোথাও নেই! হয়ত বাথরুমে গেছে ভেবে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল লোকটা ঠিক তার উল্টো দিকের বেঞ্চেই বসে রয়েছে। অরিন্দম তার দিকে লক্ষ্য রাখল। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোকটা অরিন্দকে বলল, আপনার কাছে দেশলাই আছে? দেশলাইটা এগিয়ে দিল অরিন্দম। সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা নিজের পকেটেই বেমালুম রেখে দিল লোকটা। তারপর হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে সেটা বার করে অরিন্দমকে ফেরত দিয়ে বলল, 'সরি' ভুলে গেছলুম।

ট্রেনের গতি কমে এল। একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ীটা দাঁড়াতে, লোকটা অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ব্যাগটা নিয়ে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। লোকটার

অদ্ভুত ব্যবহারে অরিন্দম একটু অবাক হ'ল। সে আশা করেছিল লোকটা নিশ্চয়ই তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে নেমে পড়ল কেন তার কোন হদিস করতে পারল না সে। মন থেকে ওসব চিন্তা দূর করে অরিন্দম একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে শুরু করল। ট্রেন চলছে একটানা আওয়াজ করতে করতে। সিগারেট খেতে ইচ্ছে হ'ল অরিন্দমের। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাইটা খুলতেই চমকে উঠল অরিন্দম। দেশলাইটা তার নয়। কারণ দেশলাইয়ের ভেতর ছোট পাট করা একটা কাগজ দেখতে পেল সে। ছোট চিঠি, আঁকা-বাঁকা অক্ষরে কেবল একটি কথা লেখা রয়েছে—'সাবধান! ভুল করছ!' লেখার তলায় কালি দিয়ে একটা ছোট 'হরতন' আঁকা।

একটা খুনের তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের সাবধান-বাণী অরিন্দম আর পায়নি। সে বুঝতে পারল একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে এর পেছনে। সঙ্ঘবদ্ধ একটা জোরালো দল হত্যার পেছনে নিশ্চয়ই রয়েছে।

খুশী হ'ল অরিন্দম।

এতদিন শুধু কোলকাতার অলিতে-গলিতে ছিঁচকে চোর আর গুণ্ডা শায়েস্তা করে তার অরুচি ধরে গিয়েছে। অনেক দিন ধরেই সে আশা করছিল শক্ত একটা দলের বিরুদ্ধে তার অভিযান চালাবে, তার হাত নিশপিশ করছিল এতদিন।

অরিন্দম দেখতে যদিও সাধারণ, কিন্তু তার ক্ষমতা অনেক। ছোটবেলা থেকেই সে নানা রকমের ব্যায়ামে নিজের শরীরকে শক্ত করে নিয়েছে। সাধারণ কুস্তি, বক্সিং ছাড়াও সে আরও কয়েকটা জিনিস আয়ত্ত করেছে। জাপানী যুযুৎসু, জুডো সে ভালো লোকের কাছেই শিক্ষা করেছে। চোখের নিমিষে সে আততায়ীর ছুরিকে খালি হাতেই ছিনিয়ে নিতে পারে। যে কোন বলশালী লোককে এক মুহূর্তে কাবু করে ফেলা তার কাছে কিছুই নয়। আর একটা জিনিস অরিন্দম আয়ত্ত করেছে। সেটা তার অদম্য মনোবল। যে কোন শারীরিক কষ্টকে অগ্রাহ্য করতে পারে সে। অবশ্য এর জন্য অনেক সাধনা করতে হয়েছে তাকে। নানা ধরণের যোগ-ব্যায়ামে তার মাংসপেশী আর মনকে সে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে শিখেছে। কোলকাতার বিশ্রী আবহাওয়া থেকে আর তার বৃত্তিগুলোকে কাজে লাগাতে না পেরে সে ইদানীং বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এতদিন পরে মনোমত কল পেয়ে অরিন্দমের মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে।

(আগামীবার সমাপ্য)

দানু মামার নাচ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

দীনু খুড়ো বরাবরই রোগা ; কিন্তু দানু মামা এককালে এখনকার চাইতে অনেক বেশী মোটাসোটা ছিলেন—ভারী শরীর নিয়ে চলাফেরা করতে তাঁর একটু কষ্টই হতো, আর একবার কোথাও বসে পড়লে সহজে উঠতে পারতেন না।

সে সময়ে রবীন্দ্র-সংগীতে পাড়ায় বেশ নাম ছিল দানু মামার। গলাটি তাঁর ছিল যেমন ভরাট, তেমনি সুরেলা আর দরদ-মাখানো। শুধু আমাদের পাড়ায় নয়, আরো নানা পাড়ায় নানা আসরে তিনি রবীন্দ্র-সংগীত গাইতেন: ওহে সুন্দর মরি মরি, খরবায়ু বয় বেগে, আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে ·· আরো অনেক গান।

আর রবীন্দ্র-নৃত্যে তখন ভীষণ নাম করেছেন মঞ্জু মুস্তফী ; আমাদের এম-এ পড়ুয়া মঞ্জুদি। রবীন্দ্র-সংগীতের ভাব আর ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে অমন চমৎকার নাচতে আর কেউ পারতেন না।

অনেক অনুষ্ঠানে দানু মামার রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে মঞ্জুদির রবীন্দ্র-নৃত্য এমন চমৎকার জমত যে সবাই বলতেন, "একেই বলে সোনায় সোহাগা।" শেষকালে দানু মামার গানের সঙ্গে মঞ্জুদির নাচ (অথবা মঞ্জুদির নাচের সঙ্গে দানু মামার গান) সব 'ফাংশন'-এর প্রধান আকর্ষণ হয়ে পড়ল। মঞ্জুদির নাচের সঙ্গে যেমন দানু মামার গান না হলে তেমন জমত না, মঞ্জুদির নাচ সঙ্গে না থাকলেও তেমনি দানু মামার গান তেমন জমত না।

একবার হ'ল কি, ভবতারিণী বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ভজগোপালবাবু দীনু খুড়োকে এসে বললেন, বিদ্যালয়ের ঘরগুলো অনেক বছরের পুরোনো হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি ভালোরকম মেরামত করা দরকার, তার জন্যে কয়েক শ' টাকা লাগবে, দীনু খুড়ো যেন টাকা তুলবার কিছু ব্যবস্থা করে দেন।

দীনু খুড়ো একটু ভেবে বললেন, "আজকাল চাঁদা তুলে টাকা যোগাড় করা বড় শক্ত। আমি বলি কি, আজকাল তো জলসা, বিচিত্র অনুষ্ঠান, ফাংশন কত কি সব হচ্ছে টিকেট বিক্রি করে। সেই রকম পাঁচমিশেলী কিছু একটা করলে টিকেট বিক্রি করে কিছু টাকার ব্যবস্থা হতে পারে।"

শুনে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললাম, "আমরা পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা বিচিত্র অনুষ্ঠান করব। সেই ফাংশনে কিন্তু আপনাকে সভাপতি হতে হবে, খুড়ো।"

দীনু খুড়ো বললেন, "আমি তো তোমাদের ভেতর এমনিতেই আছি। সভাপতি হবার জন্যে আমি একজন জবরদস্ত লোক ঠিক করে দেব—জেলা হাকিম সিংহবিক্রম চৌধুরী।"

অর্থাৎ মিস্টার এস. ডি. চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। নাম শুনে তাঁকে যে রকম জাঁদরেল মানুষ মনে হয়, তিনি ছিলেনও ঠিক তাই। যাঁদের দাপটে বাঘ আর ছাগল এক ঘাটে জল খায় বলে শোনা যায়, তিনি তাঁদেরই একজন। যেমন তাঁর বিশাল দেহ, তেমনি গায়ের জোর, গলার জোর, মনের জোর।

হাকিম সাহেবের বাবা দীনু খুড়োকে ছোট ভায়ের মতোই স্নেহ করেন, তাই পিতৃভক্ত জেলা হাকিম দীনু খুড়োকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন, ডাকেনও দীনু খুড়ো বলেই।

দীনু খুড়োর কথামতো আমরা একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। ভবতারিণী বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে আমরা যে বিচিত্রানুষ্ঠান করব, তাতে তাঁকে সভাপতি হতে হবে, একথা তাঁকে ফোনে বলে দিয়েছিলেন দীনু খুড়ো, তাই আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। একজন বুড়ো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো ভেবে আমরা নরহরি দাদুকে সঙ্গে নিলাম; তিনি খুশী হয়েই গেলেন আমাদের সঙ্গে।

আমারা গিয়ে কথাটা পাড়তেই হাকিম সাহেব বেশ খুশী হয়েই বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমরা তরুণ দল একটা মহৎ কাজ করতে যাচ্ছ, তাতে সভাপতিত্ব করব বই কি! বিশেষ করে দীনু খুড়ো যখন তোমাদের পাঠিয়েছেন।

অমরা তাঁর পাকা কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে খুশী হয়ে গেলাম, কারণ তখন বুঝতে পারিনি কি ফ্যাসাদে পা দিলাম।

আমরা বললাম, "আমরা জানতাম আমাদের তরুণ প্রাণের আবেদন মঞ্জুর না করে আপনি পারবেন না।"

তিনি বললেন, "পারব কি করে? তোমাদের, মানে তরুণদের, আমি বড্ড ভালোবাসি যে। কিন্তু বাজে ফাজ্‌লামি আমি একদম বরদাস্ত করতে পারিনে। তোমাদের বিচিত্র অনুষ্ঠানের পুরো প্রোগ্রামটা আমি আগে দেখে ঠিক করে দেবো, তোমাদের খেয়ালখুশী মতো যা-তা ওর ভেতরে ঢুকয়ে দেবে, তা চলবে না। তা হলে আমি সভাপতিত্ব করতে পারব না।"

রুচি বলল, "না না, পুরো প্রোগ্রামটাই আপনাকে দেখিয়ে নেবো। আমরা বাইরের থেকে কোনো আর্টিস্ট আনছি না। আমাদের পাড়ার আর্টিস্ট দিয়েই পুরো প্রোগ্রামটা ম্যানেজ করব।"

"কি রকম?"

"আমাদের হরবোলা ভোম্বল নানারকম জানোয়ার আর পাখির ডাক আর রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনাবে। পাপু পুতুল নাচ দেখাবে। রুচি

দেখাবে 'মাস্‌ল্ কন্‌ট্রোল', পেশী সঞ্চালন। সঞ্জয় শোনাবে কৌতুক নক্‌শা—শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে সব্বার।" বলে কচি আরো বলবার জন্য দম নিতে লাগল।

ভীষ্ম বলল, "তুই আসল জিনিসটাই বলতে ভুলে গেলি, কচি। দাশু মামার গানের সঙ্গে মঞ্জুদির নাচ।"

'হুঙ্কার ছাড়লেন জবরদস্ত হাকিম সিংহবিক্রম চৌধুরী।'

'নাচ' শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে হুঙ্কার ছাড়লেন জবরদস্ত হাকিম সিংহবিক্রম চৌধুরী। চীৎকার করে বলে উঠলেন, "নাচ-টাচ আমি একদম পছন্দ করিনে। ওটা বাদ দিতে হবে।"

হুঙ্কার শুনে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলাম, এঁকে সভাপতি না করলেই ভালো ছিল। কিন্তু একবার তাঁকে সভাপতি করে ফেলা গেছে, তিনিও সভাপতি হতে রাজি হয়ে কথা পাকা করে ফেলেছেন, এখন আর সে ব্যবস্থা বদলানো যায় না।

ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, "মঞ্জুদির নাচের সঙ্গে দাশু মামার গান বাদ পড়লে যে সেরা জিনিসটাই বাদ পড়বে।" কিন্তু সিংহবিক্রমী হুঙ্কার শুনে সে সাহস হ'ল না। কচি, পাপু লডি, ভীষ্ম, সঞ্জয়—ওদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওরা সবাই মুষড়ে পড়েছে, সবাই যেন ভাবছে, "তা আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন মঞ্জুদির নাচটা বাদই থাক।" কিন্তু সবারই মনে যেন এই দুঃখ, তাদের এত সাধের প্রোগ্রামের সেরা অঙ্গটাই বাদ পড়ল।

দাদু মামা রবীন্দ্র-সংগীত একাও মন্দ গাইবেন না, কিন্তু তাঁর গানের সঙ্গে মঞ্জুদির নাচ থাকলে যেমন সোনায় সোহাগা হ'ত, তেমনটি হবে না। তাছাড়া মঞ্জুদির নাচ বাদ থাকলে টিকেট বিক্রিও অনেক কম হবে।

এই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করলেন আমাদের পাড়ার বৃদ্ধ নরহরি দাদু। দীনু খুড়ো আর দাদু মামা, যেমন আমাদের সব্বারই দীনু খুড়ো আর দাদু মামা, নরহরি দাদুও তেমনি আমাদের সব্বার নরহরি দাদু। দীনু খুড়োই নরহরি দাদুকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দাদু অমায়িক হাসি হেসে জেলা হাকিম সাহেবের রাগটাকে জল করে বললেন, "আজ্ঞে, আপনি যে রকম বাজে নাচ ভাবছেন, আমাদের মঞ্জু-মায়ের নাচ সে রকম নয়। স্বয়ং গুরুদেবের উপস্থিতিতে তাঁর গীতিনাট্যের অভিনয়ে তাঁরই গানের সঙ্গে তাঁরই নির্দেশ মতো যে নাচ হতো, এদের প্রোগ্রামে মঞ্জু নাচবে সেই নাচ। রবীন্দ্র-নৃত্য ছাড়া অন্য কোনোরকম নাচ তো মঞ্জু নাচেই না।"

হাকিম সিংহবিক্রম চৌধুরী এই ব্যাখ্যা শুনে গলে জল হয়ে গেলেন। বললেন, "ও। তাহলে আমার আপত্তি নেই। আমি ভাবছিলুম বুঝি—"

"না না, ভাবনার কিচ্ছু কারণ নেই।" বললেন নরহরি দাদু। "দাদুর ক'টা গানের সঙ্গে মঞ্জুর নাচ হবে, কচি? সেইটে বুঝিয়ে বল্ হাকিম সাহেবকে। নইলে আন্দাজে উনি প্রোগ্রাম মঞ্জুর করবেন কি করে?"

"হ্যাঁ, সেইটে একটু খুলে বলো, কচি। কোথাও কাঁচা কাজের ফাঁক আমি রাখতে চাইনে।" বললেন হাকিম সাহেব।

হাকিম সাহেবের মুখোমুখি তাকাবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে না পেরে নরহরি দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে কচি বলল:

"প্রোগ্রামের মাঝখানে দশ মিনিটের ইন্টারভ্যাল থাকবে। ইণ্টারভালের আগে দাদু মামা গাইবেন: আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমায় স্মরি হে নিরুপম, নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে, বা-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-জে।"

"এটা হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে আরতি করতে করতে নটীর গান। কবি-গুরুর 'নটীর পূজা' গীতিনাট্য থেকে নেয়া।" বুঝিয়ে বললেন নরহরি দাদু। "আরতির নাচ নাচতে নাচতে এ গানটা গাইবার কথা সেই পূজারিণীর। কিন্তু নাচতে নাচতে তো আর গান গাওয়া চলে না, তা ছাড়া মঞ্জু একদম গাইতেও পারে না। তাই গানটা নাচের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গাইবে আমাদের দাদু। খাসা গায়।" ওর গান শুনলে মনে এমন ভাব এসে পড়ে, যে অশ্রু-সংবরণ করা যায় না।

হাকিম সাহেবের মন ভিজল। তিনি বললেন, "এটা তো হ'ল ইণ্টারভ্যালের আগে। ইণ্টারভ্যালের পরে?"

কচি বলল, "ইণ্টারভ্যালের পরের গানটা হবে গুরুদেবের গান : ঝর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে নাওখানি বাইও। ভারী জমাট গান, এর সঙ্গে নাচটাও চমৎকার!"

নরহরি দাদু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "চমৎকার কি যে সে চমৎকার? যেখানটায় আছে : হাই মারো মারো টান, হাঁইয়ো, হাঁইয়ো, হাইয়ো, সেখানটায় ঐ নাচ দেখতে দেখতে আর গান শুনতে শুনতে গায়ে একেবারে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

নরহরি দাদুর গায়েও কাঁটা দিয়ে ওঠে শুনে, হাকিম সাহেবের মনে আর কোনো রকম আপত্তি বা সংশয় রইল না। তিনি কচিকে বললেন, "আমি তোমাদের বন্ধুদিকেও চিনিনে, দাদু মামাকেও চিনিনে, ওদের দেখিও নি কখনো। কিন্তু দাদু যখন সায় দিচ্ছেন, আর দাদুকে তোমাদের সঙ্গে দীনু খুড়োই পাঠিয়েছেন, তখন আর কথা নেই। বৃদ্ধের বচন আমি গ্রাহ্য করলাম। তাছাড়া গুরুদেবের নিজের গান, আর নিজের শেখানো নাচ যখন। তোমাদের ফাংশানটা হবে কোথায়?"

সেইটেই এক সমস্যা। মাঠে প্যাণ্ডেল করতে গেলে যেমন অনেক খরচা, তেমনি বড় হল ভাড়া করবার খরচাও কম নয়।

হঠাৎ হাকিম সাহেবের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন, "চিত্রবাণী ছবিঘর কেমন হবে? ওতে তো অনেক লোক ধরে?"

কচি বললে, "তা হলে ভাড়াতেই যে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে।"

হাকিম সাহেব হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "চিত্রবাণীর ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে তোমাদের কাছ থেকে ভাড়া দাবি করবে? একটি আধলা ভাড়া লাগবে না। সব ঠিক করে দেব আমি। অবিশ্যি তোমাদের ফাংশানটা করতে হবে সকালের দিকে। ওদের সিনেমা শো-র যাতে ব্যাঘাত না ঘটে।"

শুনে আমরা যেন হাতে চাঁদ পেলাম। হল ভাড়া দিতে না হলে আরো বেশী টাকা আমরা দিতে পারব ভবতারিণী বিদ্যালয়ের সাহায্য তহবিলে। আমরা বললাম, "হ্যাঁ, আমরা তো ফাংশন সকালের দিকেই করব ঠিক করেছি—সাড়ে নটা থেকে শুরু করে আড়াই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, সাড়ে তিন ঘণ্টা—যতক্ষণ চলে।"

"নন্‌সেন্স্!" বলে চীৎকার করে উঠলেন হাকিম সাহেব রুস্তম চৌধুরী। "যত ক্ষণ চলে—ওসব ইয়ারকি চলবে না। ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় মতো শুরু করতে

হবে, সময় মতো শেষ করতে হবে। কোন্ জিনিস ঠিক কতক্ষণ হবে, তা পরিষ্কার দেওয়া থাকবে ছাপা প্রোগ্রামে; সেই ছাপা প্রোগ্রামের একচুল এদিক-ওদিক হলে আমি চাবকে লাল করে দেব। প্রোগ্রাম মেনে চলতে হবে একেবারে কাঁটায় কাঁটায়, বিলিতী কায়দায়। নইলে আমার বিদেশী বন্ধুদের কাছে মান থাকবে কেন?"

"তাঁরা কি আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে আসবেন?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল ভীম।

"না এলে চাবকে লাল করে দেবো না? আমি নিজে টিকেট দিয়ে টাকা নিয়ে আসব যে।" বললেন হাকিম সাহেব। "আমাদের দেশ দেখতে আসবে, আর আমাদের একটা মহৎ কাজে সাহায্য তহবিলে চাঁদা দেবে না, একি আবদার পেয়েছে?"

শুনে আমরা খুব খুশী। বিনা ভাড়ায় হাকিম সাহেব হল ঠিক করে দেবেন, নিজে কিছু টিকেটও বিক্রী করে দেবেন; তাছাড়া এমন বাঘা হাকিম সভাপতি থাকতে কেউ কোনো রকম গোলমাল করতে সাহস পাবে না। এত সুবিধা যার দৌলতে মিলবে, না হয় তাঁর মেজাজ খানিকটা মেনেই চলা গেল, তাতে আর ক্ষতিটা কি?

"সব কিছুই আগে বেশ ভালো করে রিহার্শাল দিয়ে নাও।" বললেন হাকিম সাহেব। "স্টেজেই মেরে দেবো—ওসব পাকামো চলবে না। বিদেশীর কাছে ইজ্জত বাঁচাতে হবে, ওদের দেখিয়ে দিতে হবে ভারতবাসীরাও জানে সময়নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা, সুশৃঙ্খলা বজায় রাখতে, অর্থাৎ কিনা যাকে বলে পাংচুয়্যালিটি আর ডিসিপ্লিন। এক সেকেণ্ড সময় বাজে নষ্ট করা চলবে না।"

এ ব্যাপারে হাকিম সাহেব এত উৎসাহী হলেন, যে আমাদের সঙ্গে বসে রুলটানা ফুলস্‌ক্যাপ কাগজে পুরো প্রোগ্রামটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ছকে দিলেন।

"প্রথমে 'বন্দেমাতরম্' গান তিন মিনিট, তারপর সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ দু'মিনিট—"

সময়গুলোও জায়গা মতো লিখে দিতে লাগলেন হাকিম সাহেব। প্রথমে 'বন্দেমাতরম্' আর শেষে 'জন-গণ-মন' গাইবে 'ভীম এবং সম্প্রদায়'। এই দুটি গানই ভীম প্রাণ ঢেলে আর বেশ সময় নিয়ে গায়। সে মুখ কাচুমাচু করে বললে: "বন্দেমাতরম্ মাত্র তিন মিনিটে হবে কি?"

"হতেই হবে। ওর একটি সেকেণ্ড বেশী হলে চাবকে লাল করে দেবো।" বললেন হাকিম সাহেব। "তিন মিনিটে গ্রামোফোন রেকর্ডের এক পিঠ বাজানো হয় না?"

ধমকের ধাক্কায় দমে গেল ভীম। তাছাড়া নরহরি দাদুও বললেন: "তা তো বটেই। আর গ্রামোফোন রেকর্ডের চাইতে ভালো তো আর তোমরা গাইবে না, ভীম?"

হাকিম সাহেব খুশী হয়ে বললেন, "তবে?"

নরহরি দাদু বললেন, "কিন্তু সভাপতির জন্যে, মানেই আপনার জন্যে, মাত্র দু'মিনিট বরাদ্দ করলেন, ওতে হবে কি করে? একজন আপনাকে সভাপতি পদে বরণ করবার প্রস্তাব করবে, আরেকজন সেই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে, তারপর আপনার গলায় মাল্যদান হবে, সেই সময়ে আপনার ফোটো তোলা হবে. আমরা সবাই হাততালি দেব, এতেই তো দু'মিনিটের বেশী কেটে যাবে।"

"ও সব বাজে ফ্যাচাং-এর কোনো দরকার নেই।" বললেন জেলা হাকিম সিংহ-বিক্রম চৌধুরী। "বন্দেমাতরম্ গানের পর সভাপতির ভাষণ আমি এক মিনিটের ভেতর সেরে দিয়ে বলব, এইবার বিচিত্র অনুষ্ঠান শুরু হবে। বাকি এক মিনিট আপনারা হাততালি দিতে চান দেবেন—তাই মোট দু'মিনিট রেখেছি সভাপতির জন্যে।"

যাদুকর 'রয় দি মিস্টিক'-এর জন্য দশ মিনিট দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না হাকিম সাহেব। বললেন, "বুড়ো মানুষ এই বয়সেও ম্যাজিক দেখাতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে দশ মিনিট তাঁকে খাটানো উচিত হবে না, সাত মিনিটই যথেষ্ট।"

নরহরি দাদু বললেন, "দশ মিনিট কমিয়ে একেবারে সাত মিনিট কোরো না. সিংহ, অন্তত: আট মিনিট করো।"

কিন্তু সাতই রইল। সাড়ে সাতও করতে রাজি হলেন না হাকিম সাহেব। প্রোগ্রামের খসড়ায় লিখলেন : 'রয় দি মিস্টিক' ম্যাজিক সাত মিনিট।

(আগামীবার সমাপ্য)

গুরু-প্রণাম

শ্রীপ্রশান্ত মিত্র

আমার ভোরের যাত্রা শেষ হ'ত
　　এই দরোজায়—
তোমার পায়ের কাছে শুরু হ'ত
　　সেদিনের কাজ ;
মনে হ'ত বনস্পতি ছেয়ে আছে
　　বরাভয় দিয়ে,
ঝড় ও স্নিগ্ধতা কত বয়ে গেছে
　　মাথার উপর !

সে বিরাট স্পর্শ থেকে মুক্তি আমি
　　চাই না জীবনে—
তোমার আরব্ধ কাজ হয়ে থাক
　　সাধনা আমার ;
তোমার মন্দিরে এসে তোমারি
　　রচিত বেদীতলে—
আজও পাই আশীর্বাদ স্মৃতিপূত
　　এ চোখের জলে !

সুধীরচন্দ্র সম্পর্কে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সুধীবর্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি

(৫০৬ পৃষ্ঠার পর)

আমার জীবনে অত্যন্ত অভাবের সময় তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার এই ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার হেতু নয়। প্রকাশক সাহিত্যের পুরোহিত—প্রকাশক উচ্চহৃদয়ের এবং সুবিবেচক না হইলে কোনও দেশে সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে না। লেখকদের একটা দোষ ও ক্ষুদ্রতা আছে, তাহারা প্রকাশকের কাছে নিজেদের ঋণ স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু লেখক হিসাবে আমি বরাবরই স্বীকার করিয়া আসিয়াছি যে, প্রকাশক ভিন্ন সাহিত্যিকের উদ্ভব সম্ভব নয়। সুধীরবাবুর কাছে, বাংলার লেখক সমাজের ঋণ অনেক। এইজন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান থাকিবে।

—নীরদচন্দ্র চৌধুরী

* * *

জীবনের পূর্বদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে পশ্চিমদ্বার দিয়ে প্রস্থান করতে হয়। এই দেবালয়ের প্রাঙ্গণে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের আগে পত্রে ও পত্রিকায় পরিচয়। তিনিই আমার প্রথম গ্রন্থের প্রকাশক। সম্পাদক হিসাবে প্রথম না হলেও পুরাতনতম জীবিত সম্পাদক। প্রায় চল্লিশ বছরের চেনাশোনা বন্ধুতায় পর্যবসিত হয়। পরে আত্মীয়তার পর্যায়ে উন্নীত হয়। কেবল আমার বেলা নয়, আমাদের দু'জনের বেলা। আমাদের পি. ই. এন. মণ্ডলীতে তাঁকে পেয়েছি। তাঁর নববর্ষ সম্মেলনে প্রতিবার তাঁর সাদর আহ্বান পেয়েছি। সাহিত্যিক ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত ছিল তাঁর অকৃত্রিম সাহিত্য-প্রীতির তুলনা নেই। বহু নবীন লেখককে তিনি সাহিত্যের আসরে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা যাঁরা এখন প্রবীণ হয়েছি তাঁরা সবাই তাঁর কাছে ঋণী।

—অন্নদাশংকর রায়

* * *

শুধু ব্যক্তি নন, সুধীরচন্দ্র সরকার একটি প্রতিষ্ঠান। শুধু দোকানের নয়, জীবনের একটি বিশেষ কোণে তিনি আসন পেতে এবং সেই আসনে স্থির থেকে এক বিশাল সাম্রাজ বিস্তার করেছেন—শুধু সাহিত্যের নয়, সৌহার্দ্যের সাম্রাজ্য। আর সৌহার্দ্যই তে সাহিত্যের রৌদ্রবৃষ্টি।

ঋণ না করে বাঁচি এমন আমাদের সাধ্য কী। আমাদের এই জীবনই তো ধারে পাওনা। একটা দিন যে অতিরিক্ত বাঁচি তার মানেই তো ধার বাড়ানো। পরিশো আর হয় না কিছুতেই। সুধীরদার কাছেও আমাদের কত ঋণ এমনি অপরিশোধ্য থাকবে

যখনই সুধীরদার কাছ থেকে বিদায় নিতাম তখনই তিনি বলতেন, 'ঠিক আছে সংসারে কিছুই থাকে না এই তো বরাবর শুনে এসেছি। কিন্তু কিছুই যায় না—সুধীরদা মৃত্যুতে এই যেন অনুভব করলাম—সব ঠিক আছে, সব ঠিক থাকবে।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ফুলে আপনার গন্ধের জোরে খ্যাতি অর্জন করে। নইলে এমন তো কত ফুলই আছে যার নাম কেউ জানে না। জানবার দরকারই হয় না। মানুষের বেলাতেও ঠিক তেমনি!

সুধীরদা এমনই একজন মানুষ।

সারাজীবনে অনেক মানুষের সঙ্গেই আমাকে মিশতে হয়েছে। অনেক মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কও পাতিয়েছি। কিন্তু সুধীরদার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সুধীরদার আড্ডা-প্রীতির খ্যাতি সেই ছোটবেলাতেই আমার কানে পৌছেছিল। আর যখন শেষকালে সত্যিই একদিন তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হলো তখন দেখলাম তাঁর খ্যাতির মধ্যে এতটুকু খাদ নেই।

মনে আছে সুধীরদা একদিন বলেছিলেন—আপনারা আর কতটুকু আড্ডাবাজ, আমাদের মত আড্ডা দিতে পারবেন? বলে নিজের জীবন থেকে যে-সব কাহিনী শুনেয়েছিলেন তা শুনে মনে বেশ জোর পেয়েছিলাম। বরাবর আড্ডাবাজ বলে অভিভাবক মহলে আমার বদনাম শুনে এসেছি। বন্ধুমহলও আমার আড্ডার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজে কখনও কাজ করিনি, তাদেরও কাজ করতে দিইনি। কিন্তু মনে আছে সেই সুধীরদার কাছেই সর্বপ্রথম নিজের স্বভাবের সমর্থন পেয়ে গেলাম। সেইদিনই প্রথম জানতে পারলাম যে বাঙলা-সাহিত্যেও একজন স্যামুয়েল জনসন্ আছেন।

সংসারে কাজের লোকের অভাব নেই, বাণী দেবার লোকেরও বড় অভাব দেখতে পাইনে। সুধীরদা'ই কি সারাজীবন কিছু কম কাজ করেছেন? আড্ডাবাজ হয়েও যে কাজের লোক হতে বাধা নেই তা এ-যুগে সুধীরদাই প্রথম প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন।

আজ আমাদের আড্ডা ছেড়ে আবার কোথায় কোন্ লোকে তিনি আড্ডা দিতে গেলেন কে জানে!

আমি বস্‌ওয়েল নই, নইলে বাঙলা-সাহিত্যের এই স্যামুয়েল জনসনের কাহিনী লিখে ধন্য হবার একটা চেষ্টা অন্ততঃ করতাম।

—বিমল মিত্র

* * *

সুধীরচন্দ্র সরকারের মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন প্রখ্যাত প্রকাশক, লেখক ও সাহিত্যিককে হারাল। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব নিবিড় ছিল না, তথাপি দূর থেকে তাঁর সাহিত্যকর্ম ও প্রকাশনকর্মের জন্য আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত

ছিলাম। লেখক হিসাবে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং 'মৌচাক' সম্পাদনা ও পরিচালনা করে তিনি শিশু-সাহিত্য জগতে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তথ্য সংবলিত এমন বহু পুস্তক রচনা করেছেন, যেগুলি কেবল পরিশ্রমসাধ্যই নয়, যার জন্য যথেষ্ট পাণ্ডিত্যেরও প্রয়োজন। এগুলি ছাড়া 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক' ও অন্যান্য গ্রন্থ সম্পাদনা করেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রকাশক হিসাবে তিনি বাঙলা দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর প্রকাশনাগুলি বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক ছিল। সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় তিনি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যে সমস্ত স্মৃতিকথা লিখেছেন (তাঁর জীবনের ওইগুলিই শেষ রচনা বলে প্রকাশ), সে সমস্ত কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমি পড়েছিলাম। তিনি সহৃদয়, অমায়িক এবং সদালাপী মানুষ ছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

* * *

বাঙালী চরিত্রের দুটি দ্রুত বিলীয়মান সদগুণ সৌজন্য ও শিষ্টাচারের বিরল প্রতিনিধি ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার। সাহিত্য জগতের ছোটো, বড়ো ও মাঝারি সব শ্রেণীর লেখকের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। সুধীরচন্দ্রের মৃত্যু তাই সাহিত্যিক সমাজে পরমাত্মীয় বিয়োগের বেদনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, আমাদের সুধীর-দা, চিরবিদায় নিলেন। আভিজাত্যময় অপাপবিদ্ধ সৎপুরুষ। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স বইয়ের কারবারি বটে, কিন্তু পরিচয় দেবার আরও এক বস্তু আছে—সেখানকার অপরাহ্নিক বৈঠক। নানা ক্ষেত্রের দিকপালরা আসতেন—লেখক-শিল্পী তো বটেই, এসবের বাইরেও অনেকজন। বৈদগ্ধ্যময় মূল্যবান কথাবার্তা না হ'ত এমন নয়, কিন্তু লঘু হাস্যপরিহাসই অজস্র। জ্ঞানী-গুণীরা এখানে এসে সহজ হয়ে একঘণ্টা দু'ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে যেতেন। শহরের দূর প্রান্ত থেকেও আসতেন, শহর-সীমার বাইরে থেকেও। অথচ যে মানুষটির আকর্ষণে আসা, কথাবার্তা তিনি যৎসামান্য বলতেন, আলাপ-আলোচনায় কদাচিৎ যোগ দিতেন। তা সত্ত্বেও কি দুর্নিবার আকর্ষণ, কয়েকটা মিনিট অন্তত ঐখানে গিয়ে কাটিয়ে আসা চাই-ই।

পৌরাণিক অভিধান, হিন্দুস্থান ইয়ার বুক ইত্যাদি সুধীর-দার স্মরণীয় কীর্তি। বৃহৎ আয়োজন ও বহু পণ্ডিতের সমাবেশ ছাড়া এ সমস্ত হতে পারে, কারো প্রত্যয়ে আসবে না।

শিশু-সাহিত্যের যাদুকর

শিবরাম চক্রবর্তী

রূপকাহিনীর রুপোরকাঠির ছোঁয়া ঘুমঘুম দেশটাকে…
ছিলো যতো শিশু—স্বপ্নমায়ায় কল্পপুরীর মই ধরে…
শিশু-সাহিত্য হতবিহ্বল শৈশবসুখে সেই-তাকে
জাগিয়েছ তুমি ডেকেছো যে তুমি
নিয়ে এসেছো যে ঐ ভোরে
সুধীরচন্দ্র! তোমার মিষ্টি মৌচাকে।

শিশু-সাহিত্য এবং শিশুরা রাতারাতি বুঝি সেই ডাকে
শৈশবমায়া পেরিয়ে সহসা পা দিয়েছে এসে কৈশোরে…
সাহিত্য-রাজপথেই এসেছে সেদিন কি হৈ হৈ করে!
সুধীরচন্দ্র! তোমার মিষ্টি মৌচাকে।

শিশু-সাহিত্য-সারথি তুমি, হে সুধীর সরকার!
বাণীগঙ্গার ভগীরথ তুমি, তোমারে নমস্কার !!

সুধীর-দা একক চেষ্টায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিরলস অধ্যবসয়ে অসাধ্যসাধন করে গেছেন। অতিশয় নিঃশব্দে—তাঁর কাজে বিন্দুমাত্র ঢাক-পেটানো ছিল না। অথচ বৃহৎ এক প্রকাশনালয়ের মালিক, সংবাদপত্র-জগতেও প্রভাব-প্রতিপত্তি নগণ্য নয়—ইঙ্গিত মাত্রেই শত ঢাক শত দিকে বেজে উঠতে পারত। তিনি তা হতে দেননি। খ্যাতি বা পুরস্কারের লোভ করেননি কখনো। এমন নিষ্কাম অধ্যবসায় এ যুগে বিরল।

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স দোকানের সামনে দিয়ে, না জানি, আরও কতদিন কত শতবার যাতায়াত করতে হবে। নিশ্বাস পড়বে তখন কোণের চেয়ারখানিতে সেই মানুষটি নেই। মুখর আহ্বান নয়, নিঃশব্দ ইঙ্গিতও নয়, আপন ইচ্ছায় পায়ে পায়ে গিয়ে একটা ঠাঁই নিয়ে বসে পড়তাম। কিসের অমন টান, নিজেকে আজ প্রশ্ন করছি। সত্যিকার সৎ মানুষ বড় দুর্লভ আজকের দুনিয়ায়, সেই দুর্লভ মানবিকতায় চুম্বকের মতন আমাদের টেনে নিয়ে কাছে বসাত।

—মনোজ বসু

সপ্তাহে দু'দিন মঙ্গল আর শুক্রবার তিনি দোকানে আসতেন। এ দু'দিন শত কাজ সত্ত্বেও হাজির হয়েছি সেখানে। তাঁর এই দুর্নিবার আকর্ষণ আমরা এড়াতে পারিনি কোন মতেই।

অনেক আলোচনা শুনতে পেতাম। সাহিত্য, রাজনীতি, খেলাধুলা, বৈঠকী গল্প—কিছুই বাদ যেত না। শেষ কয়েক বছর তাঁর সান্নিধ্য আর সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। মৃত্যুকে জয় করার অর্থ বুঝি না, কিন্তু মৃত্যুকে নির্ভয়ে মেনে নিতে শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্রকে দেখলাম।

সরল, দরদী, বন্ধুবৎসল, নিরহংকার, মধুর স্বভাবের একান্ত আপনার জনকে হারালাম আমরা।

—নির্মল সরকার

লেখার আগেই চোখ ভারী হয়ে আসছে। আমি আত্মীয় না হয়েও তাঁর ছিলাম আত্মীয়ের মত, পরম স্নেহের ; বয়সের বেশ কিছুটা তারতম্য থাকলেও ছিলাম বন্ধু, সমবয়সীর মত। বয়সের এই ব্যবধানকে কখনই তিনি মনে স্থান দেননি। বিশেষ করে সাহিত্যিক হলে তো আর কথাই থাকত না। এমনও দেখেছি, ছোট্ট বাচ্চা ছেলে 'মৌচাক'-এর গ্রাহক, একটু লিখতে পারে, তাকে তিনি সাদরে ভাবী সাহিত্যিক বলে কাছে টেনে নিয়েছেন, উৎসাহিত করছেন। এইভাবে আজকের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিককে এই মৌচাকের মাধ্যমেই গড়েছিলেন তিনি।

অনেক কিছু শিখেছি তাঁর পাশে বসে দীর্ঘ দু'যুগের অধিককাল। তাঁকে কেন্দ্র করে যে গুণী প্রবীণ রসিকজনের সমারোহ হ'ত এম. সি সরকারের দোকানের আসরে, কালক্রমে তাঁদের অনেকে চলে গেলেও, অপেক্ষাকৃত নবীন আমাদের মত কয়েকজনকে নিয়েও তিনি মধ্যমণি হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরও অনুপস্থিতি ঘটল।

ব্যক্তিগত ভাবে এ ফাঁক আমার জীবনে অকৃতী, একান্ত নির্ভরশীল অনুজের কাছে অগ্রজের অবিদ্যমানতার ফাঁক—এ ফাঁক অপূরণীয়।

—বিশু মুখোপাধ্যায়

(কতকগুলি রচনার অংশবিশেষ গৃহীত)

পড়ার বাধা

আম গাছের ঐ ডালের প'রে
শালিখ পাখীর জটলা বসে
পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে
কিচির-মিচির কানে আসে।

মনটা ওরা নেয় যে কেড়ে
ওদের দিকেই তাকাই খালি,
পড়তে বসেও হয় না পড়া
সব যে গেল জলাঞ্জলি।

যায় না উড়ে এখান থেকে
দুষ্টু ভীষণ ঐ যে ওরা
বোঝে না তো পড়ার সময়
যায় না এখন নষ্ট করা।

শ্রীসাম্য গুপ্ত

হাঁচি-বিভ্রাট

সোমবারেতে হাঁচলে পরে
পড়বে মারা থানায়
মঙ্গলেতে হাঁচলে বাপু
নিয়ে যাবে থানায়।

বুধবারেতে হাঁচলে নাকি
ভূতের বাড়ে রাগ
বিষ্যুৎবারে হাঁচলে আবার
মট্‌কায় ঘাড় বাঘ।

শুক্রবারে হাঁচলে শুনি
পরীক্ষাতে ফেল,
শনিবারে হাঁচলে দাদা
শনি দেখায় খেল।

রবিবারের জন্যে হাঁচি
রাখো করে জমা,
মনের সুখে ঐ দিনেতে
হাঁচলে পাবে ক্ষমা

শ্রীখুকু ব্যানার্জী

রূপোদের টিয়াপাখী

রূপোদের টিয়াপাখী
ভারী ভাল ভাই,
আম খেতে এ জগতে
জুড়ি তার নাই।

ছোট মুখে আম খাওয়া
দেখে হাসি পায়,
আম খেতে পেলে টিয়া
সব ভুলে যায়।

শশা, কলা, পেয়ারাতে
মুখ ভার করে,
আম যদি দাও তারে
হাসি নাহি ধরে।

তাকে দেখে মনে হয়
হই যদি পাখী,
সারাদিন আমি শুধু
আম খেয়ে থাকি।

শ্রীঅমিতা মুখোপাধ্যায়

মেঠুড়ে
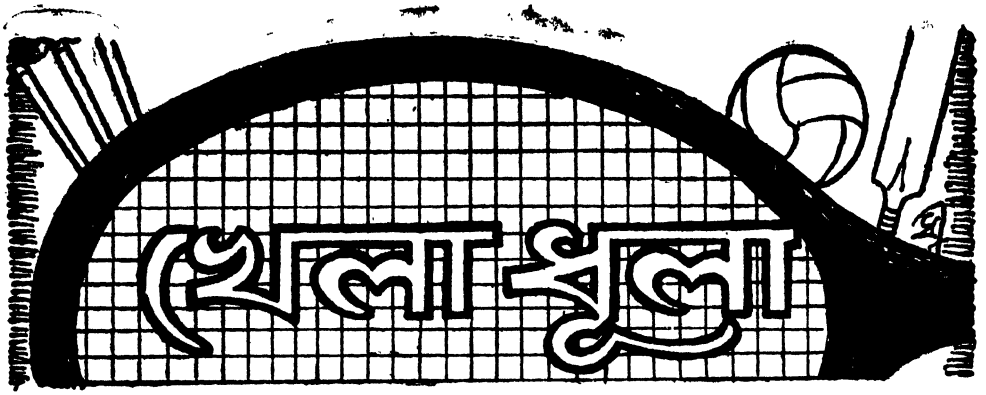
ক্রিকেট ঃ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

এডিলেডের প্রথম টেস্ট খেলায় ১৪৬ রানে এবং মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ৪ রানে ভারতকে হারাবার পর ব্রিসবেনের তৃতীয় টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া ৩৯ রানে বিজয়ী হয়ে পর পর তিনটে টেস্টেই ভারতকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দুটো টেস্টে পরাজয়ের জন্তে আমাদের দুঃখ নেই। কারণ ভারতের খেলোয়াড়রা বিপর্যয়ের মধ্যে চিত্তাকর্ষক এবং প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলেই পরাজয় স্বীকার করেছে এবং হারের মধ্যে দেখিয়েছে সাহসী সৌন্দর্য। কিন্তু তৃতীয় টেস্টে পরাজয়ের জন্তে আমাদের দুঃখের কারণ আছে। দুঃখ এই: বিদেশের মাটিতে সর্বপ্রথম টেস্ট জয়ের সুযোগ আমাদের হাতের কাছে এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৭৯ রানের উত্তরে মাত্র ৯ রানের ভেতর ভারতের তিনটে উইকেট পড়ে যায়, কিন্তু সুর্তিও পতৌদিকে ধন্যবাদ, কারণ তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ শিল্পীর সৌন্দর্যে ব্যাট করে চতুর্থ উইকেটে ১২৮ রান যোগ করেন। পরে জয়সীমা শেষ ৭৫ মিনিট অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১২ রানে নট আউট থাকেন। পরের দিন ৭৪ রান করে আউট হন। ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২৭৯ রানে।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ঠিক ১০০ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং আরম্ভ করে তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করে ৩ উইকেটে ১৬২ রান। চতুর্থ দিন ২৯৪ রানে যখন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়, তখন জয়ের জন্তে ভারতের দরকার ৩৯৫ রানের। সুতরাং খেলা সম্পূর্ণভাবে অস্ট্রেলিয়ার অনুকূল ছিল। ভারতের প্রতিকূল অবস্থা আরো প্রতিকূল হয়ে ওঠে দ্বিতীয় ইনিংসের প্রাথমিক ব্যর্থতায়। ফারুক ইঞ্জিনিয়ার কোনো রান না করে এবং ওয়াদেকার মাত্র ১১ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু আবিদ আলী,

পতৌদি এবং সুর্তির দৃঢ়তায় ভারতের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। চতুর্থ দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৭৭ রান ওঠে। আগের দিন ৫৫ রানে নট আউট সুর্তি ৬৪ রান করে পঞ্চম দিনের প্রথমে আউট হয়ে গেলেও জয়সীমা ও বোরদে অসাধারণ ভালো ব্যাটিং করে রান করতে থাকেন এবং ৫ উইকেটে ভারতের রানকে টেনে নিয়ে যান ৩১০ রানের মাথায়। কেউই আশা করেন নি অস্ট্রেলিয়া এই খেলায় জিতবে। জয়-পরাজয়ের আশা-নিরাশার দোলার মধ্যে ভারতের শেষ পাঁচটা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৪৫ রানের ভেতর। অস্ট্রেলিয়া খেলায় জেতে ৩৯ রানে।

ভারত হেরে গেলেও বাহাদুরী দেখান এম. এল. জয়সীমা প্রথম ইনিংসে ৭৪ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে এই টেস্ট খেলার একমাত্র সেঞ্চুরী করে। ভারত অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজে ভারতীয় খেলোয়াড়ের একমাত্র টেস্ট সেঞ্চুরী বটে।

॥ ২ ॥

চতুর্থ টেস্টে ভারত অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ সাতটা উইকেট মাত্র ৭০ রানে ফেলে দিয়েও ৩৪২ রান করে খেলায় জয়ী হতে পারেনি। এ টেস্টেও সূচনা ভালো হয়েছিল, দু'উইকেটে উঠেছিল ১২৫ রান। কিন্তু তারপরই বিপর্যয় শুরু এবং চরম বিপর্যয় শেষ দিনের সূচনায়। মাত্র চার রানে ভারতের শেষ চারটে উইকেটের পতন এবং আটাশ মিনিটের ভেতর খেলা শেষ।

সিডনী টেস্টের স্কোর বোর্ড থেকে দেখা যায় ভারতের পক্ষে আবিদ আলী খুব ভালো ব্যাট করে ৭৮ ও ৮১ রান করেছেন, একটা সেঞ্চুরী করেছেন বব কাউপার। ডগ ওয়াল্টার্স নট আউট থেকে ৬ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। বোলার হিসেবে কৃতিত্ব ভারতের প্রসন্ন ও অস্ট্রেলিয়ার সিম্পসনের। প্রসন্ন এই খেলায় ১৫৮ রানে পেয়েছেন সাতটা উইকেট এবং সিরিজে মোট পঁচিশটা। সিম্পসন পেয়েছেন ৯৭ রানে আটটা উইকেট। তাছাড়া এই খেলায় ক্যাচ ধরেছেন পাঁচটা। অস্ট্রেলিয়ার বিদায়ী অধিনায়ক ববি সিম্পসন আর টেস্ট খেলবেন না। এই খেলাই তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের শেষ খেলা। ব্যাটিংয়ে ভালো করতে না পারলেও টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে সিম্পসন স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করলেন।

ক্রিকেট : ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে পোর্ট অব স্পেনে শেষ হয়েছে। ইংলণ্ডের সামনে জয়ের যে অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসেছিল, তা সফল না

হওয়ার একমাত্র কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একাদশের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য নয়—ম্যাচ বাঁচানোর সম্মান গ্যারি সোবার্সের।

পোর্ট অব স্পেনের প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড যে রান তুলেছে, সেটা তাদের নতুন নজির। এর আগে ১৯৫৪ সালে এই মাঠে লেন হাটনের দলের সর্বোচ্চ রান ছিল ৫৩৭। কিন্তু এবারে তা অতিক্রম করে দাঁড়ায় ৫৬৮। ইংলণ্ড দলের এই রান সংখ্যায় এককভাবে যাঁদের বড় দান, তাঁরা হলেন—ব্যারিংটন, গ্রেভনী, বয়কট, পার্কস, ডলিভেরা ও অধিনায়ক কলিন কাউড্রে।

ইংলণ্ডের ৫৬৮ রানের উত্তরে ৩৬৩ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস শেষ করে এবং ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮০ রানের মধ্যে আটটা উইকেট হারায়। পরাজয়ের সম্ভাবনার মধ্যে ইংলণ্ডের বোলারদের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতন দাঁড়ান অধিনায়ক সোবার্স ও ওয়েসলী হল। ৮ উইকেটে ২৪৩ রান উঠলে খেলার ওপর যবনিকা পড়ে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এটা ছিল ইংলণ্ডের ষষ্ঠ সফর এবং দু'দেশের টেস্ট খেলার হিসেবে একান্নতম টেস্ট। আগের পঞ্চাশটা টেস্টের ভেতর ইংলণ্ডের জয়ের সংখ্যা সতেরো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ষোলো এবং সতেরোটা খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

ফুটবল : বর্মা বনাম আই. এফ. এ. একাদশ

বর্মা ফুটবল দল ভারত সফরে এসে শেষ খেলাতে কলকাতার আই. এফ. এ. একাদশের কাছে ১—০ গোলে হেরে যায় ও অপরাজিত-র গৌরব খোয়ায়। আই. এফ. এ-র সঙ্গে খেলার আগে বর্মা দল নিখিল ভারত একাদশের সঙ্গে চারটে কেন্দ্রে প্রতিযোগিতা করে। আসামে ৩—০ গোলে বিজয়ী হয়। কালিকটে ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে এবং দিল্লিতে ৪—২ গোলে ও পাটনাতে ১—০ গোলে জয়লাভ করে।

১৯৬৬ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন এবং গত বছরের জারভেকা ফুটবল বিজয়ী বর্মা দল কলকাতায় তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। তবে তাঁদের খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বলবেন : এদের খেলার পেছনে অনুশীলন আছে, সাধনা আছে, শিক্ষা আছে। দলের খেলোয়াড়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সুন্দর, বল আয়ত্তে রাখার কৌশলও প্রশংসনীয়, আর মাটির ওপর দিয়ে বল পাস করার কায়দাটি দেখবার মতন। দলের প্রায় সকলেই উঠতি খেলোয়াড়।

ফুটবল : ডুরাণ্ড কাপ

এ বছর রোভার্স কাপ জয় করার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল পাঁচবার ডুরাণ্ড বিজয়ী হ'ল। ডুরাণ্ডের ইতিহাসে মোহনবাগানের রেকর্ড সবচেয়ে ভালো। মোহনবাগান ছ-বার ডুরাণ্ড জয় করেছে এবং দু'বার রাণার্স হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং, বি. এন. আর ও ইষ্টার্ণ রেল কলকাতার এই পাঁচটা দল এবার ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বি. এন. আর একদিক দিয়ে আমেদাবাদ ইলেকট্রিসিটি ক্লাবকে ১২—০ গোলে, শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ১—০ গোলে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১—০ গোলে এবং জলন্ধরের লীডাস ক্লাবকে ১—১ ও ৩—২ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে ওঠে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ফাইন্যালে উঠতে একে একে পরাজিত করে দিল্লি মডার্ণাইটসকে ৩—২ গোলে, ইণ্ডিয়ান নেভিকে ২—০ গোলে, মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ২—১ গোলে এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিসকে ০—০ ও ১—০ গোলে।

ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলে এবং যোগ্য দল হিসেবে ডুরাণ্ড বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলেও বি. এন. আর শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে মরণপণ প্রতিযোগিতা করেছে, কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের দুর্ভেদ্য রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের বারো মিনিটের সময় ইস্টবেঙ্গলের রাইট-ইন হাবিবের একমাত্র গোলে খেলার জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমাদের যে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা, তাঁদের অভিভাবক, লেখক-লেখিকা ও বন্ধুবান্ধব সম্পাদকের পরলোকগমনে মর্মান্তিক দুঃখ, বেদনা ও শোক প্রকাশ করে আমাদের চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের আমরা এই পত্রিকার মারফত আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, পরম বন্ধু, একান্ত আপনজন সম্পাদক মশাই (সুধীরচন্দ্র সরকার) আর ইহলোকে নেই—তোমাদের কাছে এ-খবর জানাতে যে মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করছি তা জানাবার সামর্থ্যও খুঁজে পাচ্ছি না। আজকের চিঠি কালোয় কালোয় ভরা—মসীলিপ্ত। দীর্ঘদিন যে মানুষটি সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন, তিনি সকলের মাঝেই হারিয়ে গেলেন। তোমরা এ-খবর হয়তো আগেই পেয়েছ কিংবা সংবাদপত্র মারফৎ দেখে বা জেনে থাকবে। আসল মানুষটিকে কিন্তু জানবার বেশী সুযোগ তোমরা অনেকেই পাওনি। 'মৌচাক'-এর সম্পাদক ছাড়া তাঁর আরো অনেক পরিচয় ছিল—নিজে জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখার সঙ্গে তোমরা পরিচিত হবে আরো বড় হলে। তাছাড়া তিনি ছিলেন নবীন ও প্রবীণ লেখক, সাহিত্যিকদের মধ্যমণি—যাঁর যা দরকার তাঁরাই 'শ্রদ্ধেয় সুধীরদা'র কাছে ছুটে এসেছে—একযোগে সকলেই তাঁকে আপনজন ভেবে ভালবেসেছে, নিঃসঙ্কোচে সব বলতে পেরেছে, এবং তিনিও একান্ত দরদপূর্ণ মনে নিয়ে কথা সকলের শুনতেন, সকলের ভালো করতে চাইতেন। সেইজন্যই সকলে তাঁর কাছে ছুটে যেতো, ভালবাসতো, আপন ভাবতো, বিশ্বাস করতো ! সকলের মনে তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রদ্ধার আসন ছিল।

'মৌচাক' দীর্ঘদিন ধরে তিনি প্রকাশ করেছেন। তোমরা শুনলে অবাক হবে, এখানকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক এই 'মৌচাকে' লিখে হাত পাকিয়ে এসেছেন—তাঁরা এখন সাহিত্য-জগতের মহারথী। তাঁদের কাছেই এসব গল্প শুনে এসেছি। তাই বলতে হয় তিনি লেখকও সৃজন করেছেন, আর একথা শ্রদ্ধেয় সেই সাহিত্যিকরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। 'মৌচাকে'র বয়স নিতান্ত কম নয়। একটি শিশু-কিশোর পাঠ্য মাসিককে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এই দীর্ঘদিন পরম যত্নে তিনি লালন করেছেন, বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে, মনের রসদ যোগাড় করে দিয়ে। ছোটদের তিনি এমনই ভালবাসতেন।

পরিণত বয়সে তিনি চলে গেলেন সত্যি কথাই। কিন্তু এত আপন হয়ে এত কাজের মধ্যে তিনি ছিলেন যে, সকলেই আজ তাঁর অভাব একান্তভাবে বোধ করছে, অনুভব করছে একান্ত একজন আত্মীয়বিয়োগ।

আমি নিজে বহুদিন থেকে তাঁদের পরিবার ও তাঁর সঙ্গে কাজেকর্মে যুক্ত ছিলাম। বহুভাবে তাঁর সাহায্যলাভ করে তাঁর মহান্ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলাম। আজ তাই মনে হচ্ছে—অতি পরিচিত, অতি নিকট, অতি শ্রদ্ধেয় একজন আপনজনকে হারিয়েছি। তাঁর কথা লিখতে বসে একথাই মনে হয়, এমন একটি মানুষ কি আর দু'টি হবে বা হয়? আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা, প্রাণের প্রণাম তাঁর উদ্দেশে জানাচ্ছি—জানি না তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে কিনা। তাঁর আত্মা যেন শান্তিলাভ করে চিরশান্তি-লোকে।

নন্দিতা কৃপালনী—

নতুন জানা মেয়েটিকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'বৃদ্ধা'—আদর করে ডাকতেন বুড়ী। কবির এই বুড়ী 'নন্দিতা কৃপালনী'। কবির মেয়ে মীরা দেবী তাঁর মা, বাবা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ছোট বেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আর প্রভাবে মানুষ হয়েছিলেন। লেখাপড়া দিল্লী, কোলকাতা আর শান্তিনিকেতন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাব চরিত্রে ছিল বৈ কি! কিন্তু সবচেয়ে তাঁকে যা প্রভাবিত করেছিল সেটি হলো দাদামশায়ের আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচিবোধ।

কবি তখন রোগশয্যায়—ডাক পড়লো বুড়ীর। কবির মনে হলো তিনি শুনতে পেলেন অন্তিমের আহ্বান। মর্ত্যলোক থেকে অপর লোকে যাবার জন্য প্রস্তুত করছিলেন নিজের মনকে। রোগজীর্ণ দেহ। জন্ম-মৃত্যুর আলো-আঁধারী পথে তাঁর মনের বিচিত্র আনাগোনা। বুড়ীর সদাসতর্ক দৃষ্টি তাঁর দিকে। রোগপাণ্ডুর মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর নিজের চোখ দু'টি ছল ছল করে ওঠে—কিন্তু তবু মনের সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অতন্দ্র চোখে সমস্তক্ষণ জেগে থাকে তাঁর পাশে। দৈহিক ক্লান্তির সামান্যতম রেখাটিও দৃষ্টি এড়াতে পারে না। শুধু কি কবির অসুস্থ দেহের দিকেই তাঁর দৃষ্টি—কবির মনের খবরটুকুও অত ভালো করে আর কেউ জানে না—তাই তাঁর রুচিবোধ যাতে এত-টুকু ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও বুড়ীর সদাজাগ্রত দৃষ্টি। কবি আরোগ্যলাভ করলেন। তখন পিছনে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়লো 'শেষ পারানীর খেয়ায় দিন শেষের নেয়ে'—নতুন করে জানা এই মেয়েটিকে।

তারপর একদিন কবি চলে গেলেন লোকান্তরে। ছোট মেয়ে বুড়ীকে তখন নতুন করে দেখা গেল নতুন ভূমিকায়, তিনি তখন বধূ। ঘর-সংসারে এসেও তার পুরোনো দিনের

কাজের ধারা স্তিমিত হয়ে যায়নি। শান্তিনিকেতনে নাচে, গানে, অভিনয়ে ভরিয়ে তুলে-ছিলেন সেখানকার জীবন। রবীন্দ্রনাথের বহু নৃত্যনাট্যে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কবি তখন নৃত্যনাট্যের আয়োজনে ব্যস্ত। ভারতবর্ষের বহু জায়গা ঘুরে দিল্লীতে এসেছেন—সেখানে 'নন্দিতা'র উপরেই প্রায় সব চেয়ে বেশী ভরসা। তাঁর অভিনয় দেখে সকলেই মুগ্ধ। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের অভাব অনেকখানি দূর হয়ে গেলে, কবি আশ্বস্ত হলেন। গান্ধীজী কথা দিলেন কবিকে অর্থের জন্য আর দুশ্চিন্তা বোধ করতে দেবেন না। শান্তিনিকেতনকে এই দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করতে দেশের মানুষ সেদিন এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু কবি নিজের অন্তরে জানতেন তাঁর আদরের নাতনীটি এ ব্যাপারে তাঁকে যতখানি সাহায্য করেছিল ততখানি আশ্রমিকদের মধ্যে আর কেউ করেনি।

নন্দিতা এজন্য হয়তো মনে মনে অনেকখানি খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাইরের কথাবার্তা চালচলনে তাঁকে ছাড়া চলে না এমনি ভাব প্রকাশ করেন নি। খুব সহজে অনাড়ম্বরে কাজ করে যেতেন। দিল্লীতে আসবার পর সেখানকার সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে ঘটলো তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তিনি ছিলেন স্বভাব শিল্পী, কি গানে, কি অভিনয়ে। আল্পনায় বাটিকের কাজ বা নানা শিল্পকর্মে তাঁর জুড়ি পাওয়া ছিল ভার। শুধু নিজের কাজ করে যাওয়া নয়, অপরকেও গড়ে তোলার কাজেও তাঁর ছিল অসাধারণ মমত্ববোধ। সবাইকে কাছে টেনে নিতে পারতেন অসঙ্কোচে। যে রুচিবোধ কবির কাছ থেকে পেয়েছিলেন—সেটা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পরিচিত মহলে। সব কাজেই তাঁর ডাক আসতো আর সানন্দেই তিনি সাড়া দিতেন। সংসারের খুঁটিনাটি, সব কিছুর তদারক করতেন, স্বামী কৃষ্ণ কৃপালনীর কাজ শুধু অধ্যাপনা নয়—এবার তাঁকে গ্রহণ করতে হলো সাহিত্য একাডেমীর দুরূহ দায়িত্ব। এখানেও নন্দিতা তাঁর সব কাজে সাহায্য করতেন। ঘরে-বাইরে সমান নিপুণতার সঙ্গে সব কাজ যে সুন্দরভাবে তিনি করতেন, তা দেখে সকলে অবাক হয়ে যেতো।

অথচ তাঁর শরীর অনেক দিন থেকে অসুস্থ হচ্ছিল—চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা দেশে-বিদেশে নেওয়া হলো, কিন্তু তবু শরীর সারবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

সবচেয়ে বড় কথা, দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থেকেও তাঁর মন ও স্বভাবের প্রসন্নতা হারান নি। শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে আসবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সেটা আর পূর্ণ হলো না। এর জন্য দুঃখ নেই, কারণ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনো সময়েই তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেনি—যখন যেখানে থাকতেন সেখানেই গড়ে উঠতো শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনের মেয়েটি—এখন খুঁজে পেয়েছে পরম শান্তিনিকেতন।

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
মূল্য : ০.৫০ পয়সা

হাতীর দল

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋
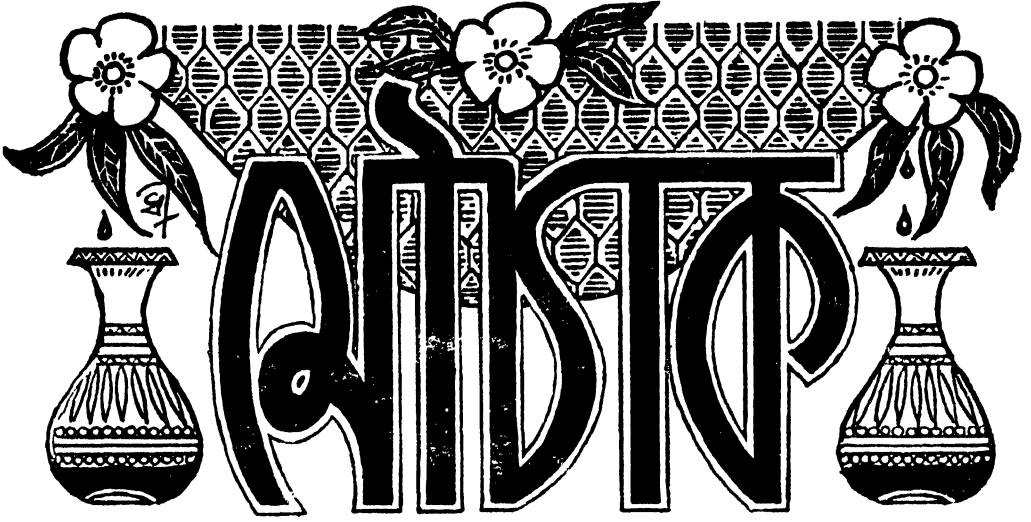
৪৮শ বর্ষ]   চৈত্র : ১৩৭৪   [১২শ সংখ্যা

শান্তারামের ঘোড়া

শ্রীসুকোমল বসু

শান্তারামের ঘোড়া হঠাৎ শান্তারামকে পিঠে নিয়ে—
ক্ষেত মাড়িয়ে—গ্রাম ছাড়িয়ে—
পৌঁছালো তারপর—
মরণেরই কোল-পাতা এই কোলকাতা শহর।
এতোগুলি মানুষ-ঠাসা শহরে তার প্রথম আসা
ট্যাক্সি, বাসের পঁক-পকানি, ট্রামের সে টং টং
গোলক ধাঁধায় প'ড়ে ঘোড়ার বদলে গেল ঢং।
ট্র্যাফিক-পুলিস হাত দেখালো—মানলো না সে বাধা,
ছুটলো খালি এদিক-ওদিক, চক্ষে লাগে ধাঁধা!
ইতিহাস তো পড়েনি সে—জানে না এই ট্রাম—
টানতো তারই পূর্বপুরুষ—ঝরতো কাল-ঘাম!
আইন-ভাঙা মিছিল আসে—কী জানি দল কাদের
জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদের শ্লোগান মুখে তাদের!
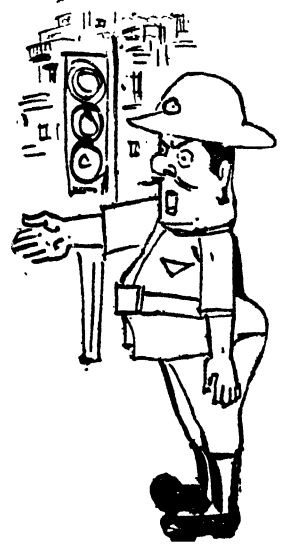
রোমান্সেরই সুড়সুড়ি যে ঘোড়ার কানে লাগে
ঠমক-ঠাটে চলতে থাকে মিছিল পুরোভাগে।

টিয়ার গ্যাসে ছত্রভঙ্গ মিছিল-কারীর দল
পুলিস এবং রিপোর্টারের অনেক কোলাহল!
ঘোড়া ছোটে উর্ধ্বশ্বাসে—টান পড়েছে নাভিশ্বাসে!
এবার আবার ছুটলো ঘোড়া শাস্তারামকে নিয়ে
থামলো শুধু একেবারে নিজের গ্রামে গিয়ে!

অনেক ছবি ছাপা হ'ল কাগজ জোড়া জোড়া:
মিছিল সাথে শাস্তারাম আর শাস্তারামের ঘোড়া!
ঘোড়া-রোগ কি একেই বলে?—ভাবছে শাস্তারাম
রোগটা যে কা'র?—তা'র-না ঘোড়ার?—
ভাবতে ঝরে ঘাম।

বয়েজ স্কাউট ও গার্ল গাইড

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জামবুরিতে একদল স্কাউট ফটো : শ্রীঅশোক ধর

কিছুদিন পূর্বে সারা ভারতের স্কাউট ও গাইডদের জামবুরি হয়ে গেল কল্যাণীতে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও তাতে যোগ দিয়ে সবায়ের উৎসাহবর্ধন করেছিলেন। খবর পেয়ে মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার কথা। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই আমরা সবাই জড় হতাম স্কাউটিং করতে। কি আগ্রহ আর আনন্দের সঙ্গে সেদিন স্কাউটদের স্লোগান আবৃত্তি করতাম সবাই একত্রে জুটে শীতের সকালে—সেই স্লোগানটি হচ্ছে :

চিঙালিঙ চিঙালিঙ চিঙ চাঙ চাঙ।
বুঙালিঙ বুঙালিঙ বুঙ বাঙ বাঙ॥
চিঙালিঙ বুঙালিঙ চিঙ বোঁ বোঁ।
বয়েজ স্কাউট বয়েজ স্কাউট রা রা রা॥

আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও যেন সেই সুর কানে বাজছে জামবুরির খবর পেয়ে।

মনে পড়ছে কি আগ্রহ নিয়েই সেদিন শুনেছিলাম বয়েজ স্কাউট কে, কি তার কাজ, কার চেষ্টায় এই ধরনের দল গড়ার প্রথম সাড়া জাগে সারা জগতে। ভারী সাধ হচ্ছে সেই কথাগুলো জানাতে সবাইকে। হয়তো নতুন করে কিছুই বলতে পারব না, তবু না বলে থাকতে পারছি না।

পড়তাম কোলকাতার কাছেই একটি গাঁয়ের ইস্কুলে। একদিন হঠাৎ আমাদের ড্রিলের মাষ্টার মশাই ছুটি থেকে ফিরে এসে আমাদের একটি ছবি দেখালেন। বললেন, "জানো এ ছবি কার?"

আমরা তো গাঁয়ের ছেলে কতটুকুই বা জানার সুযোগ পেতাম। বললাম সবাই, "না মাষ্টার মশাই আমরা জানি না। আপনি বলুন।"

তিনি বললেন "এই হচ্ছে লর্ড বেডেন পাওয়েল—ইনি হচ্ছেন ইংরেজ। ইংলণ্ডে প্রথম ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি স্কাউটিং করতে শেখান তোমাদের মত বাচ্চাদের, যাদের বয়স বারো থেকে আঠারো।"

প্রথম শুনলাম স্কাউটিং শব্দটা—জিজ্ঞেস করলাম—মাষ্টার মশাই ও কথার মানে কি?

তিনি হেসে বললেন—সেই কথাই বলবো বলে তো তোমাদের ছবিটি দেখালাম। তোমরা জানো—আমি ছুটি নিয়েছিলাম—কেন জানো? জামবুরিতে যোগ দেবার জন্যে।"

"জামবুরি কি?"

"দেশের সমস্ত স্কাউটদের মিলিত সভা। তবে সে সভা বেশ একটু অন্য ধরনের। সেখানে সব কিছুই তৈরি করে বয়েজ স্কাউটরা নিজের হাতে।"

"কিন্তু তারা তো সবাই আমাদের বয়েসের ছেলে—তারা জানবে কি করে সব কিছু তৈরি করে নিতে?"

"সেইখানেই তো স্কাউটদের বৈশিষ্ট্য। তা'হলে শোন তারা কি পারে? তোমরা গাঁয়ের বা শহরের পথে যেমন চলতে পারো, স্কাউটরা পারে জংগল ভেঙে তেমনি অনায়াসে চলতে। সে পারে ইঙ্গিতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিক বুঝিয়ে দিতে। সে জানে এমন গিঁট বাঁধতে দড়িতে যা সহজে খুলে যায় না। যে কোন গাছে উঠতে তার জুড়ি নেই। সে পুকুরে শুধু নয় নদীতেও সাঁতার দিতে জানে। সে তাঁবু খাটাতে পারে, নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়লে নিজে রিপু ক'রে নিতে পারে, সে বলে দিতে পারে কোন ফলপাকড় খাবার যোগ্য, কোনটা নয়। সে নৌকো বা ডোঙা চালাতে পারে দাঁড় টেনে, হাল ধরে বা পাল তুলে। নক্ষত্রদের নামও সে বলতে পারে আর তাদের দেখে রাত্রে দিক ঠিক করে পথ চিনে এগোতে পারে। শুধু তাই নয়, পথে যদি ইট-পাটকেল বা নড়া পাথর থাকে, সে কখনো হোঁচট খায় না বা পড়েও যায় না। পাখী বা পশুদের চেনে ভাল করেই, এমন কি তারা কোথায় বাসা বেঁধে থাকে তারও খবর রাখে।"

অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম স্কাউটদের কথা। মাষ্টার মশাই আমাদের চোখ মুখ দেখে বুঝলেন যে আমাদের খুব ভাল লাগছে শুনতে। তখন বললেন, "বেশ আরো বলি তবে শোন। স্কাউটদের চোখ ভারী তীক্ষ্ণ, কোন কিছুই তার চোখে এড়িয়ে যায় না। রাস্তার চিহ্ন দেখে সে বুঝে নেয়—তার সেই পথ দিয়ে কোন্ প্রাণী গিয়েছে বা তার স্বভাব কেমন। সে পশুপক্ষীও পোষে—তাদের বাসা থেকে ধরেও আনতে পারে। সব থেকে মজা সে সবাইকে দেখতে পায়, কিন্তু তাকে কেউ সহজে দেখতে পায় না। আবার শোন—সে জানে বনের মধ্যে বৃষ্টির দিনে কিভাবে আগুন জ্বালাতে হয়, দেশলাই যদি নাই থাকে সে কাঠে কাঠে

জামবুরিতে গার্ল গাইড দল ফটো : শ্রীঅশোক ধর

ঘ'ষে আগুন বের করতে পারে। বনে আগুন লাগালে কি কাণ্ড হয়, সে বিষয়ে সে হুঁশিয়ার। তাই এমনভাবে আগুন জ্বালায় যা ছড়িয়ে না পড়ে চারদিকে। আর খাবার? হ্যাঁ, সে একেবারে মাঠে বনে জঙ্গলে বসেও অতি অদ্ভুত খাবার তৈরি করে নিতে পারে—যা দেখে যে কোন ছেলের জিবে জল আসবে। সে মেনে চলে ক্যাম্পফায়ারের, অর্থাৎ তাঁবুতে যে আগুন জ্বালানো হয় সেই সম্বন্ধে যা কিছু আইনকানুন—যদিও তা কোন বই বা কাগজে লেখা থাকে না। লালচে নিবন্ত আগুনের দিকে চেয়ে অনেক সময় নিজের মনকেও নানা দিকে ছুটিয়ে দেয়। কেমন লাগছে শুনতে? তোমরা তো কথা কইছ না কেউ?"

আমরা যেন শুনতে শুনতে ডুবে গিয়েছিলাম, মাষ্টার মশায়ের কথায় চমক ভাঙলো, বললাম, "যত শুনছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি মাষ্টার মশাই। শুধু ভাবছি, আমাদের বয়েসের ছেলেরা এমন হয় কি করে?"

"বলছি সব বলছি,—আস্তে আস্তে আগে শোন স্কাউটরা আরো কি করতে পারে।" বলে মাষ্টার মশাই আবার বলতে লাগলেন, "স্কাউটরা কোন বিপদ দেখে পেছু হটে না। সে জানে নিজেকে সর্বভাবে রক্ষা করতে এবং অপরের রক্ষার ব্যবস্থা করতে। সে জানে কোথাও আগুন লাগলে কি করতে হয়, কেউ অকারণ ভয় পেলে কোন কারণে বা জাহাজডুবি প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটলে কি করতে হয়। যখনি দরকার যে কাজে সে সব সময়ে প্রস্তুত, সে জানে নানা উপায়, সে সর্বদা ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে, সাহসের তার অভাব নেই যেমন—তেমনি নেই বুদ্ধির অভাব। সব থেকে বড় কথা সে নিজেকে রক্ষা করার আগে অপরকে রক্ষা করতে এগিয়ে যায়। দেশে দেশে আছে তাদের দলের ছেলে—তারা সবাই জানে কোন বিশেষ চিহ্ন দেখলে অন্য দেশের ছেলেকেও চিনে নেওয়া যায় তাদেরই একজন বলে। কোন আকস্মিক বিপদের মুখে পড়ে সে অপরের সাহায্য পাবার জন্যে চেঁচায়—আগে নিজে

চেষ্টা করে সে বিপদে উদ্ধার পেতে। সে জানে প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়ম। সে জংগলে কি ভাবে চিহ্ন রেখে পথ চলতে হয় জানে, বিদেশী মানুষকে কি ভাবে সাহায্য করতে হয় জানে। সে জানে থানা কোথায়, ডাক্তারখানা কোথায়, পোষ্ট অফিস কোথায় বা সেই অঞ্চলের প্রধান মানুষ কে এবং কোন পথে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সেই সব জায়গায় পৌঁছান যায়, দরকার পড়লে। স্কাউট তার নিজের গ্রাম বা শহর সম্বন্ধে সর্বদাই গর্ববোধ করে। আর সব সময়ই মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। তার জীবনে মূল সত্য হচ্ছে, "প্রস্তুত থাকা।"

"একটি গল্প বলি শোন: ইংলণ্ডে তো ১৯০৮ খৃষ্টাব্দেই পাওয়েল সাহেব তৈরি করলেন স্কাউট দল—নিজে তাদের পরিচালনা করে—তিনি ছিলেন জগতের সমস্ত স্কাউটের প্রধান। তখনো কিন্তু আমেরিকার কেউ স্কাউটের নামও শোনেনি। হঠাৎ এক মস্ত ব্যবসায়ী এলেন আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে। তোমরা জানো হয়তো লণ্ডনে মধ্যে মধ্যে এমন কুয়াশা নামে যে রাস্তাঘাট কিছু দেখা যায় না। আমেরিকান ভদ্রলোক সেই কুয়াশার মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ফেললেন। রাস্তার একটি পুচকে ছেলে কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে বুঝলো তাঁর অবস্থা। এগিয়ে এসে তাঁকে অভিবাদন করে বললো, "আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?"

ব্যবসায়ী বললেন, "বড় উপকার হয় যদি অমুক জায়গায় আমায় পৌঁছে দাও।"

ছেলেটি বললে, "আসুন।"

তার পিছু পিছু চলে অল্পক্ষণেই ব্যবসায়ী তার যাবার জায়গায় পৌঁছে গেলেন। ছেলেটিকে উপকারের প্রতিদান হিসাবে কিছু পয়সা দিতে গেলে, ছেলেটি তাঁকে অভিবাদন করে বললে, "মাফ করবেন, আমি হচ্ছি স্কাউট। লোকের উপকার করে তার কোন প্রতিদান নেওয়া আমাদের রীতি নয়।"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি কি বলছো ঠিক বুঝলাম না?"

ছেলেটি বললো, "আপনি কি স্কাউটদের নাম শোনেন নি?"

তিনি বললেন, "কই না তো! কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে স্কাউট কাকে বলে জানতে।"

"বেশ, আসুন আমার সঙ্গে।"—ছেলেটি বললো।

ব্যবসায়ী বললেন, "যদি একটু দাঁড়াও তুমি—আমার কাজ সেরেই যাব।"

ছেলেটির কাছে অযাচিতভাবেই উপকার পেয়ে ব্যবসায়ী ভারী উৎগ্রীব হয়েছিলেন তার পরিচয় পেতে। কাজ সেরে এসে দেখলেন—ছেলেটি তার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। গেলেন ছেলেটির সঙ্গে সোজা পাওয়েল সাহেবের কাছে। তাঁর কাছে স্কাউটদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা সব শুনলেন ও পকেট ভর্তি করে নানা কাগজপত্রও নিলেন পাওয়েল

সাহেবের কাছ থেকে। দেশে ফিরে তিনি আরম্ভ করলেন পাওয়েল সাহেবের নির্দেশ মত কাজ। তাই আমেরিকতেও জাগলো বয়েজ স্কাউট দল ১৯১০ খৃষ্টাব্দে।

আজকে এই স্কাউটদের আদর্শ জগৎময় ছেয়ে গিয়েছে—তাদের আছে ব্যাজ, আছে ইউনিফর্ম আর তাদের আছে মন্ত্র 'প্রস্তুত থাকো'। প্রথম যারা বারো বছরের ছেলে—তারা যোগ দেয় 'টেণ্ডার ফুট' দলে—যত উন্নতি করে তারা নানা দিকে উত্তীর্ণ হয় নানা পরীক্ষায়, ততো তারা উপরে স্থান পায়। টেণ্ডার ফুট থেকে পায় সেকেণ্ড ক্লাসে স্থান, তারও পরে পায় ফার্ষ্ট ক্লাসে স্থান। তবে তার জন্যে মেরিট ব্যাজ লাভ করা চাই পরীক্ষা দিয়ে। সেই মেরিট ব্যাজ দেওয়া হয় নানা কাজে। যেমন ধর—জলকল সারানো, ছুতোরগিরি, লোকের প্রাণ বাঁচানো, উড়োজাহাজ ইত্যাদি চালানো, গানবাজনা, মাছধরা, স্বাস্থ্যরক্ষা অথবা যার যে বিষয়ে আগ্রহ--সে সেই বিষয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেরিট ব্যাজ পেতে পারে। যখন পাঁচটা মেরিট ব্যাজ পায় কেউ, আর তিন মাস স্কাউটের প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম ঠিক ঠিক মেনে চ'লে ফার্ষ্ট ক্লাস স্কাউট হয়—তখন তার পদবী 'ষ্টার স্কাউট'। যে দশটা মেরিট ব্যাজ পেয়ে ছ'মাস নিয়ম মেনে চলে, সে হয়ে যায় 'লাইফ ব্যাজ'। যে একুশটি মেরিট ব্যাজ পেয়ে পুরো এক বছর নিয়ম মেনে চলে—আর দল চালাবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারে—সে তখন পায় 'ঈগল ব্যাজ' যা হচ্ছে স্কাউটদের শ্রেষ্ঠ সম্মান।"

আমরা সবাই বললাম, "কিন্তু মাষ্টার মশাই স্কাউটদের প্রতিজ্ঞাটা কি তা তো কই বললেন না?"

মাষ্টার মশাই বললেন, "নিশ্চয়ই বলবো--তোমাদেরও যে স্কাউট তৈরি করতে চাই। শোন সে প্রতিজ্ঞা ইংরাজীতেই বলছি, পরে মানে বলবো যদি বুঝতে না পারো।"

প্রথম প্রতীজ্ঞা—To do my duty to God and my country and obey the Scout Law.

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—To help other people at all times.

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—To keep myself physically strong, mentally awake and morally straight.

আর নিয়ম হচ্ছে এই যে—ঐ যে মন্ত্র বলালম, "প্রস্তুত থাকো," ঐটি সব সময় মনে রাখতে হবে। আর প্রতিদিন সকালে অন্ততঃ একটি সংকাজ করতে হবে—তা রাস্তা থেকে কলার খোসা তুলে ডাষ্টবিনে ফেলে দেওয়াই হোক বা কোন অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেওয়াই হোক বা কোন পশুর কোন রকম কষ্ট নিবারণ করাই হোক!

এসো আজ থেকেই তোমাদের স্কাউটিং শেখাতে শুরু করি। তারপর মাঝে মাঝে স্কুলের ছুটির সময় তোমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বো ক্যাম্পিং করতে—দেখবে সে আরও কত মজার।"

আমরা সেইদিনই স্কাউটিং শেখা শুরু করেছিলাম। তারপর আরও ছেলে এই দলে যোগ দিয়েছিল এবং আজও দিচ্ছে। এমন বিশ্বব্যাপী ছেলেদের দল আর একটিও নেই। পাওয়েল সাহেবের বোন মিস অ্যাগনেসও তাঁর ভায়ের কথা অনুযায়ী মেয়েদের নিয়েও এমনি একটি দল গড়েন, তাদের নাম—গার্ল গাইড। সেই মেয়েদের গাইড দলও আজ বিশ্বব্যাপী। জয় হোক বয়েজ স্কাউট ও গার্ল গাইড দলের।

॥ লংকাকাণ্ড ও শান্তিপর্ব

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

বকের বিয়ে আসর মাঝে
হঠাৎ গণ্ডগোল
হচ্ছে মনে ঝাঁঝর-কাঁসর
বাজছে শতেক খোল।
ব্যাপার কি আর উঠ্‌ল গুজব
কনের পা-য়ে গোদ
বরকর্ত্তা, বরের বাপ
চাইছে প্রতিশোধ।

পানকৌড়ি কনের পিতা বলতে নারে সব,
চতুর্দিকে ঠ্যাঙাও ঠ্যাঙাও উঠছে ভীষণ রব।

চল্‌ল লড়াই, থামল শেষে
পুলিস আসার পর
হবু-জামাই ভাবছে কোথায়
বস্‌বে বাসর ঘর?
এমন সময় আস্‌ল ছুটে
সেপাই বিরিজলাল
"থামাও থামাও" চেঁচিয়ে বলে
ঝগড়া গালাগাল।

কনের পা-য়ে নয়ক গোদ কামড়ে ছিল জোঁক
কিসের ঝোঁকে আয়ুক্ষয় করছ এত লোক।

বরকর্ত্তা বকের বাপ
অবাক চোখে চায়
তাইতো বটে কোথায় গোদ
নেইকো কনের পা-য়।

ছোট্ট পাখী

শ্রীকাজল বল

—নাঃ! আচ্ছা বিপদ হলো দেখি। ছেলেগুলো যে কোথায় জলসা করছে তা তো ঠাওর করতে পারছি না। ছেলেগুলোও যেমন, কোথায় এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি, তা নয়···দুত্তোর!—

বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে চললো ব্যাঙ বাবাজী। নাদুসনুদুস মোটাসোটা চেহারা। পেটটা বড়। হাতে ছাতা। গায়ে হলুদ আর সবুজের ছাপ দেওয়া জামা। বয়েস হয়েছে। গায়ের শক্তিও কমেছে কিছু। তাই চলতে কষ্ট হয়। পায়ের চওড়া পাতাগুলো মাটিতে থপাস্ থপাস্ করে ফেলে হাঁটে। আর হাঁপাতে থাকে। এই বুড়ো বয়সে একটানা হাঁটতেও পারে না। একটা গাছের ছায়ায় বসে তাই একটু জিরোতে লাগলো। দু'হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে চারদিক দেখতে লাগলো। এদিকেই কোথায় যেন জলসাটা হবার কথা ছিল। ধুধু মাঠ, দু'একটা ডোবা, দূরে কয়েকটা ঝোপ-ঝাড় আর দু'চারটে গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।

এমনি সময়ে চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো। ঝড়ও উঠলো। বৃষ্টি দেখে ব্যাঙ বাবাজীর আনন্দ আর ধরে না। জলসার কথা ভুলেই গেল। শ্রান্তি আর রইলো না। বৃষ্টির জলে স্নান করতে করতে ঐ গাছের তলায় দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। আর গলা চড়িয়ে জলসার গান গাইতে লাগলো।

গাছের উপরে দু'টো কাক পাতার আড়ালে বসে বৃষ্টি দেখছিল এক মনে। ব্যাঙ বাবাজীর গানের ঠেলায় তাদের কানে তালা লাগার যোগাড়। একবার উসখুস করে তারা নড়েচড়ে বসলো। কিন্তু আর শান্ত হয়ে বসতে পারলো না। ব্যাঙ বাবাজীর গানের স্থর, অসুরের আকাশ-ফাটা চিৎকার বলে মনে হতে লাগলো তাদের।

তাই কাকরা গেল ভীষণ চটে। কা-কা বলে থামতে বললো অনেকবার। কিন্তু কে কার কথা শোনে! ব্যাঙ বাবাজী গানে এতই মত্ত যে তার কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। তাই দেখে কাকরা গজ গজ করতে করতে তেড়ে এলো ব্যাঙ বাবাজীকে মারতে। মাথায় এবং পেটে দু'একটা ঘা দিলও তারা। ব্যাঙ বাবাজীর তখন হুঁস হলো। বা-বা-গো, মা-গো, মেরে ফেল্লে গো—বলে চীৎকার করতে করতে পালাতে লাগলো। এদিক-ওদিক আর তাকালো না। একেবারে তার আস্তানা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর এক গলা জলে নেমে রুখে দাঁড়ালো সেই কাক দু'টোর দিকে মুখ করে। হাত পা ছুঁড়ে বলতে লাগলো,—আয় না আয়, মুরদ কত দেখাচ্ছি! এত বড় সাহস! আমার গায়ে হাত তোলা! আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো, তোরা ঐ গাছে কি করে থাকিস্!

হইচই শুনে আশপাশের ব্যাঙরা এসে হাজির। ব্যাঙ বাবাজীর চেহারা দেখে তারা হায় হায় করে উঠলো। মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে ব্যাঙ বাবাজীর! একটা ব্যাঙ ছুটে গিয়ে কোত্থেকে একটা সরু পাতা নিয়ে এলো। সেটা আচ্ছা করে ক'ষে মাথার ক্ষত জায়গায় বেঁধে দিল। তারপর সবাই জোট হয়ে মিটিং করতে বসলো। এ রকম অন্যায় তো আর সহ্য করা যায় না। কাজেই বিহিত একটা করতেই হয়। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর ঠিক হলো তাদের বন্ধু গেছো ব্যাঙকে ডেকে ঐ কাক দুটোর বাসাটা ভেঙে দিতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। তাদের মধ্যে ছুটলো একজন গেছো ব্যাঙকে ডেকে আনতে।

গেছো ব্যাঙ খবর পেয়েই ছুটে এলো। সব শুনে খুব রেগে গেল। ব্যাঙ বাবাজীকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি ছুটলো কাক দু'টোর বাসা ভাঙতে।

সেই গাছের তলায় চুপি চুপি দু'জনে এসে দেখলো গাছে কাক একটাও নেই। আশেপাশে কোথাও আছে কিনা চোখ বুলিয়ে নিল দু'একবার। তারপর গেছো ব্যাঙ তরতর করে গাছে উঠে গেল। আর নীচে ব্যাঙ বাবাজী চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো। গাছে উঠে গেছো ব্যাঙ পাখী দুটোর বাসার একটা খড় ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান দিল। টান দিতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো বাসাটা। সেখানে একটা ডিম ছিল। সেটা নীচে ঠিক ব্যাঙ বাবাজীর পায়ের কাছেই পড়লো। পড়েই গেল ভেঙে। আর সেখান থেকে কিচিরমিচির চিৎকার করে বেরিয়ে এলো একটা ছানা। ছানাটা ডিম থেকে বেরিয়েই ব্যাঙ বাবাজীর পা জড়িয়ে ধরলো। এদিকে ঐ ছানার চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল ব্যাঙ বাবাজী। গেছো ব্যাঙও তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে নেমে এলো। আর দাঁড়ানো উচিত হবে না এই ভেবে দু'জনই পালাতে লাগলো। কিন্তু বিপদ হলো ছানাটাকে নিয়ে। সে কিছুতেই ব্যাঙ বাবাজীকে ছাড়লো না। ডানা দিয়ে একটা পা ধরে রইলো। অনেক ঝাঁকুনি, কামড় দিয়েও ছাড়াতে পারলো না ছানাটাকে। সেও চললো তার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু মুশকিল হলো ছানাটাকে নিয়ে। ব্যাঙ বাবাজী তো ডেরায় ফিরবে বলে পুকুরে ঝাঁপ দিল। ছানাটা সাঁতার জানে না। তাই জলে হাবুডুবু খেতে লাগলো। এ দেখে তার করুণা হলো। সে পিঠে তুলে নিল ছানাটাকে।

এমনি করে ফিরে এলো তার ডেরায়। কিন্তু ফিরেই সমস্যায় পড়লো ব্যাঙ বাবাজী। ছানাটাকে কোথায় রাখে? সে তো আর তাদের মত জলে ডাঙায় থাকতে পারে না। তার জন্য যে একটা গাছে বাসা চাই। সে বাসা এখন পাবে কোথায়? ব্যাঙ-বউ তো

ছানাটাকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো।—নিজেদেরই থাকার ঠাঁই নেই, সাপ-খোপের তাড়ায় পালিয়ে বেড়াতে হয়, সেখানে আবার একটা পাখীর ছানা—বুড়ো বয়সে ভীমরতি আর কি!

ডানা দিয়ে একটা পা ধরে রইলো।

ব্যাঙ বাবাজী কথাগুলো কানে তুললো না। চিন্তায় পড়লো ছানাটাকে নিয়ে কি করা যায়! এখনো চোখও ফোটেনি ছানাটার। কোথাও ছেড়ে দিলে বেঘোরে প্রাণটাই খোয়াবে। তাই অনেক কষ্টে পুকুরের পানার উপরে খড়কুটো যোগাড় করে মাথা গোঁজার মত একটা বাসা তৈরী করে নিল। আর সেখানেই ছেড়ে দিল ছানাটাকে।

ছানাটা ধীরে ধীরে সেখানে বাড়তে লাগলো। চোখ ফুটলো একদিন। কিন্তু সমস্যা হলো খাওয়াদাওয়া নিয়ে। ব্যাঙরা তো মশামাছি ছোট ছোট পোকামাকড় ইত্যাদি খায়। পাখীদের যে ওতে পেটও ভরে না। তাদের গলার তলায় যে থলিটা আছে তাতেই বা রাখবে কি! ব্যাঙ-বউ তো চব্বিশ ঘণ্টা চিৎকার করছে, 'আপদটাকে বিদায় করতে।' কিন্তু ব্যাঙ বাবাজী পড়েছে মুশকিলে। ছানাটাকে ভালবেসে ফেলেছে। ব্যাঙ-বউয়ের কথা শুনলেই বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ওরকম অলুক্ষণে কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। তাই বড় বড় ফড়িং, ছোট ছোট মাছের বাচ্চা, মরা কেঁচো ইত্যাদি যোগাড় করে পাখীদের মত নিজে একটু চিবিয়ে ছানাটাকে খাওয়াতে লাগলো।

এমনি করে বাড়তে বাড়তে বড় হলো ছানাটা। ছোট্ট একটা নাদুসনুদুস পাখী। কাল তার রং, ডানাতে বেশ বড় বড় পালক গজালো। মাঝে মাঝে ডানা মেলে উড়তেও চায় পাখীটা। তাই দেখে ব্যাঙ বাবাজীর কি আনন্দ! ব্যাঙ-বউকে ডেকে দেখায় আর বলে, ব্যাঙ-বউ, তোমার আর ভয় নেই। এবার সাপরা খেতে এলেই তোমার ঐ ছেলের পিঠে চড়ে বসো। ও তখন তোমায় নিয়ে সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে এখানে এনে হাজির হবে। সাপরা তোমার নাগালও পাবে না।

—আঃ, মরণ আর কি! ওর পিঠে যেন কে উঠতে যাচ্ছে। সাপের আগেই দেখ ও না আবার আমাদের সাবাড় করে দেয়!—এই বলে জলে ঝাপ দিয়ে পুকুরের কোণের দিকে ব্যাঙ-বউয়ের ডিমগুলো কেমন আছে দেখতে গেল সে। সেখানে গিয়ে দেখলো, ডিমগুলো ফুটে ব্যাঙাচি বেরিয়েছে। মাথার সামনে ঠিক মুখের জায়গায় চোষক দিয়ে অটাকে আছে পদ্মপাতার তলায়। দেখতে অনেকটা মাছের বাচ্চার মত। এই ব্যাঙাচিদের দেখে ব্যাঙ-বউয়ের আনন্দ আর ধরে না। মহানন্দে গান গাইতে গাইতে চললো পাড়াপড়শীদের শুভ খবরটা দিতে।

এদিকে সেই ছোট্ট কাল পাখী নূতন ডানার গর্বে অনেকবার চেষ্টা করেছে ডানা মেলে শূন্যে পাড়ী দেবার। কিন্তু অনভিজ্ঞতার জন্য বার বার পড়ে যাচ্ছে। এমনি একসময় উড়তে গিয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল পদ্মফুলের উপর। দেহের ভারে প্রায় ডুবতে ডুবতেই ভেসে উঠলো ফুলটা। বড় বড় কয়েকটা ঢেউ খেলে গেল জলে। জলটা যখন স্থির হয়ে গেল, অবাক হলো জলের দিকে তাকিয়ে। পদ্মপাতার তলায় মাছের বাচ্চার মত কারা যেন জোট বেঁধে ঝুলে আছে। তাই দেখে পাখীটার খুব মজা লাগলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো সে। সামনে দুটো হাত আছে, পেছনে কিছু নেই। হাতের ঠিক আগে মাছের মত একজোড়া ফুলকা দেখতে পেলো। জীবগুলোকে দেখে

ভারী অদ্ভুত লাগলো পাখীটার। এগুলোকে দেখে তার খিদেটাও যেন হঠাৎ পেয়ে গেল। জলে ঠোঁট ডুবিয়ে টপাটপ্ সাবাড় করে ফেললো দু'একটা। কিন্তু অবাক লাগলো তার। দু'একটা সাবাড় করার পরও দলের মধ্যে হইচই পড়লো না। ভয়ে পালিয়ে গেল না কেউ। দুষ্টুমি করে পদ্মপাতাটা ঠোঁট দিয়ে জল থেকে একটু উপরে তুলে ধরলো। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার জীবগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে। তাই দেখে মিটমিট করে চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে ভাবতে লাগলো পাখীটা, নিশ্চয় এদের চোখ নেই। তা না হলে এতক্ষণে ভয়ে এরা সব পালিয়ে যেতো। পাতাটাকে জলে ছেড়ে আবার টপাটপ দু'একটা খেয়ে নিল।

ঠিক এই সময় দূর থেকে ব্যাপারটা ব্যাঙ-বউ দেখতে পেলো। সে হাউ-মাউ করে কেঁদে তেড়ে এলো। তা দেখে পালিয়ে গেল ছোট্ট পাখীটা। ব্যাঙ-বউ এসে দেখলো সর্বনাশ! প্রায় সব ব্যাঙাচিগুলোকেই ওই পাখীটা খেয়ে ফেলেছে। পদ্মপাতায় বসে বুকফাটা চিৎকারে ভেঙ্গে পড়লো ব্যাঙ-বউ। হা-হুতাশ করে কপাল চাপড়াতে লাগলো তার ব্যাঙাচিদের হারিয়ে।

ব্যাঙ-বউ তারপর থেকে ওখানেই রয়ে গেল। ওই জায়গা আর সে ছাড়লো না। এমনি করে কয়েকদিন কাটলো। ছোট্ট পাখীটা আরও বড়ো হলো। এখন সে দিব্বি পাখা মেলে আকাশে পাড়ি দেয়। সাতরাজ্য ঘুরে মাঝে মাঝেই ব্যাঙ বাবাজীর কাছে আসে। গল্প করে আবার সুযোগ বুঝে পোকামাকড় দেখলেই ছোঁ মারে।

ওদিকে ব্যাঙাচিগুলোও বড় হয়ে গেল। চোখ, কান, নাক, মুখ সবই ব্যাঙের মত। তবে ল্যাজ রয়ে গেল। সেদিকে কিন্তু ব্যাঙাচিদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বাপের মত চেহারা পেয়ে তারা জলে, ডাঙ্গায়, লাফালাফি, দাপাদাপি সুরু করে দিল। ছোট ছোট পোকামাকড় পেলেই ছোট্ট জীবটাকে উল্টো করে ছুঁড়ে ধরার চেষ্টা করে।

একদিন লেজওয়ালা এই ব্যাঙদের দেখে কাল পাখীটার খুব মজা লাগলো। তাই তাদের পিছু নিল পাখীটা। লেজওয়ালা ব্যাঙগুলো পাখীটাকে দেখে প্রাণপণে পালাতে লাগলো। কেউ জলে, কেউ নর্দমায়, কেউ ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু বিপদ হলো একটা ছোট্ট ব্যাঙের। সবে লেজ খসে সে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়েছে। সে জলে ঝাপ দিতেই একটা সাপ তার পিছু নিল। তাই দেখে পাখীটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে টপ করে ঠোঁট দিয়ে ব্যাঙটাকে জল থেকে তুলে পিঠের উপর নিয়ে উড়ে চলে গেল। সাপটা সেদিকে কটমট্ করে তাকিয়ে রইলো। পাখীটা ব্যাঙটাকে একটা ছোট্ট ডোবায় রেখে ফিরে এলো আবার পুকুরে। কিন্তু এসে সে যা দেখল তাতে তার মাথা গেল ঘুরে।

দেখলো ব্যাঙ বাবাজীকে সেই আগের সাপটা কামড়ে ধরে মাঝ পুকুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাখীটা আর স্থির থাকতে পারলো না। ছুটে এসে ঠোঁট দিয়ে গলাটা জাপটে ধরলো। সাপটা লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইলো পাখীটাকে। কিন্তু পারলো না। পাখীটা টেনে সাপটাকে নিয়ে এলো ডাঙায়। সাপের মুখ থেকে ব্যাঙ বাবাজী ফস্‌কে বেরিয়ে এলো। কিন্তু সাপের বিষে ছটফট্ করতে লাগলো সে। পাখীটা সাপটাকে আর ছেড়ে দিল না। দু'জনের যুদ্ধ বাধলো। সে ভীষণ যুদ্ধ। পাখীটার ঠোঁটের কামড়ে সাপটার সারা গা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু পাখীটা একটু বেকায়দায় পড়তেই লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরলো সাপটা। তারপর মরিয়া হয়ে চাপতে লাগলো পাখীটাকে। দম বন্ধ হয়ে এলো পাখীটার। কিন্তু সেও ছাড়লো না। শেষবারের মত সমস্ত শক্তি দিয়ে কামড়ে ধরলো সাপের গলাটা। এক সময় শিথিল হয়ে এলো তার দেহটা। সাপটার দেহও নেতিয়ে পড়লো। ওদিকে ব্যাঙ বাবাজীও ছটফট্ করতে করতে চোখ বুঝলো।

এদিকে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল ব্যাঙ-বউ তা জানতো না। সে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে যখন ফিরছিল তখন পুকুর ধারে ব্যাঙ বাবাজীর রক্তাক্ত দেহ দেখেই আঁতকে উঠলো। তার পাশেই দেখলো সাপ ও পাখীটার নিঃসাড় দেহ। দেখেই ব্যাঙ-বউ সব বুঝতে পারলো।

তারপর হায় হায় করে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। শুধু ব্যাঙ বাবাজীর জন্ম নয়, পাখীটার জন্মও।

ফুল বাগানের পাশে

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

ফুলবাগানের পাশে,
তুষ্টু ফড়িং আসে,
ধরতে গেলে যেই উড়ে যায়
অমনি খোকা হাসে!

কাছেই ঘাসের ফুল,
হাওয়ায় দোদুল দুল,
ফড়িং ভেবে ধরতে গিয়েই
খোকার ভাঙে ভুল!

অমনি খোকা হাসে,
গোলাপ গাছের পাশে,
অবাক হয়ে তাকায় চড়ুই
কিছুই বোঝে না সে!!

দৌড়ের রাণী উইলমা রুডলফ

শ্রীতরুণকুমার রায়

উইলমা রুডলফ

উইলমা রুডলফ্‌—টেনেসি রাজ্যের এক নিগ্রো পরিবারের সপ্তদশ সন্তান। মাত্র সাড়ে চার পাউণ্ড ওজনের উইলমার একটি পা জন্মের সময় থেকেই সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে যায়। এছাড়া, চার বছর বয়সে উপর্যুপরি দু'বার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর বাঁ-পাটিও অবশ হয়ে যায়; সুতরাং, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাকে হাঁটবার সামান্য শক্তিটুকুও হারাতে হয়। সেদিন, বোধহয় কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি, যে এই শীর্ণা ও খঞ্জ মেয়েটিই একদিন সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের সম্মান অর্জন করবে। কেউ না ভাবলেও, একজন কিন্তু আশা ছাড়েন নি, তিনি হলেন—উইলমার মা। তাঁর মায়ের একান্ত চেষ্টাতেই গ্র মের বাড়ী থেকে ৪৫ মাইল দূরে এক হাসপাতালে উইলমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু, প্রত্যেক দিন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা থাকায়, প্রত্যেক সপ্তাহে ছুটির দিনে উইলমা তাঁর মায়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতেন, আর অন্যান্য দিন বাড়ীতেই তাঁর পা ম্যাসাজ করা হ'ত। এইভাবেই উইলমার চিকিৎসা চলতে লাগল।

একটানা অনেক দিন চিকিৎসার পর, ১৯৫৩ সালে তেরো বছর বয়সে উইলমা Birrt High School-এ প্রবেশ করলেন, এবং সেই বৎসরেই রাজ্যের সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় ৫০, ৭০ ও ১০০ গজ স্প্রিণ্ট (Sprint) দৌড়ে সাফল্য অর্জন করে উইলমা প্রথম বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু প্রথমজীবনে, এই উইলমা একবার ৫০ গজ স্প্রিণ্ট দৌড়ে, সবার শেষে দৌড়ের ফিতা অতিক্রম করায়, স্যার এড্‌ওয়ার্ড ট্যানলি উইলমাকে Tigerbells-এর একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের অন্তর্গত করেন। সেদিন এই অসাফল্যের জন্যে তার লজ্জার অন্ত ছিল না এবং এই নিদারুণ দুঃখ ও হতাশা উইলমার চোখে জল এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই হতাশায় আপন আদর্শ ও প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত না হয়ে, উইলমা তাঁর মায়ের আশ্বাসবাণীর ওপর নির্ভর করে আরো কঠোরভাবে অনুশীলন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে, কঠোর অনুশীলনের স্বীকৃতিস্বরূপ,

যেদিন উইলমা 'Tigerbells' দলের চারজন কনিষ্ঠ (Junior) প্রতিযোগীর মধ্যে একজন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অপেশাদার অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পান, সেদিন আনন্দে অভিভূত উইলমা কিছুক্ষণের জন্য তাঁর বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি ৪৪০ গজ রিলে দৌড়ে জয়লাভ করেন এবং টেনেসি রাজ্য সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন, আর এটিই হয় উইলার জীবনে প্রথম বড় জয়।

এরপর উইলমা ক্রমশই উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে থাকেন। তাহলেও ১৯৬০ সালের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ রিলে দল Tigerbells-এর অপর তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৯ সালের নভেম্বরে উইলমা হঠাৎ গলার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হন এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। অবশ্য ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান এবং আবার পূর্ণশক্তি নিয়ে ক্রীড়াজগতে প্রবেশ করেন। ১৯৬০ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ইউনিয়ন-এর জাতীয় ক্রীড়ায় তিনি তিনটি Sprint Events-এ জয়ী হন। এ ছাড়া, Corpus-Christi-তে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় তিনি ২০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেন। টেক্সাসে আয়োজিত প্রাক্ অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় উইলমা ১০০ মিটার স্প্রিণ্ট দৌড়ে জয়লাভ করেন এবং অলিম্পিকে ৪০০ ও ২০০ মিটার রিলে দৌড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ অর্জন করেন।

অবশেষে, রোম অলিম্পিকেই উইলমা এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। তিনি মাত্র ১১ সেকেণ্ডে মহিলাদের ১০০ মিটার স্প্রিণ্ট দৌড়ে জয়ী হয়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড তৈরী করলেন। ২০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক (heat) প্রতিযোগিতায়ও অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। কিন্তু, এসব কৃতিত্ব অর্জন ব্যতীত, সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের রিলে দলটির জয়লাভে উইলমার অবদান ছিল অতুলনীয়। ঐ রিলে দলটির তৃতীয় মহিলাটি বেটন গ্রহণে অনেক সময় নেওয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই তিনি অনেক পিছিয়ে পড়েন, কিন্তু বেটন পাওয়ামাত্রই, উইলমা প্রথম থেকে ক্ষিপ্রগতিতে দৌড় আরম্ভ করেন। কিন্তু তা হলেও জার্মানীর জুটাহেনী উইলমাকে অনেকটা পেছনে রেখে ফিঁতে অতিক্রম করতে এগিয়ে যান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উইলমার ক্ষিপ্রগতি জুটাকে সামান্য পেছনে ফেলে সর্বপ্রথম ফিঁতে স্পর্শ করে। সেদিন উইলমার এই অসাধারণ কৃতিত্বে রোম অলিম্পিকে উপস্থিত ৬০,০০০ জনতার আনন্দোল্লাস সমগ্র রোমের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তোলে।

সত্যিই ভাবলে অবাক হতে হয় যে, কিভাবে উইলমার মত একজন অক্ষম ও অসহায় মহিলা বিশ্বের বৃহত্তর ক্রীড়ামঞ্চে সেদিন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। উইলমার এই কৃতিত্ব থেকে একথাই মনে হয় যে, এই পৃথিবীতে বুঝি চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই !

দাদু মামার নাচ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সাত মিনিটের বেশী আর কাউকেই দিলেন না তিনি, শুধু দু'দফায় দশ মিনিট দশ মিনিট করে মোট কুড়ি মিনিট মঞ্জুর করলেন আমাদের দাদু মামা আর মঞ্জুদির জন্য।

নরহরি দাদু হাকিম সাহেবের হাত ধরে এমনভাবে বললেন, "কবিগুরুর গান, আর সেই গানের সঙ্গে মানে আর ছন্দ মিলিয়ে নাচ, এ এক দফায় পনেরো মিনিটের কমে হওয়া শক্ত; মেরে-কেটে হয়তো বারো মিনিটে নামানো যেতে পারে, কিন্তু তার কমে কিছুতেই"... যেন হাকিম সাহেব অন্ততঃ বারো মিনিট মঞ্জুর না করলে তিনি কেঁদেই ফেলবেন।

হাকিম সাহেব নরহরি দাদুকে অনেক বলে-কয়ে দশ মিনিটে রাজি করালেন। প্রোগ্রামের খসড়ায় ইণ্টারভ্যালের এধারে লিখলেন: "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো...রবীন্দ্র-নৃত্য, রবীন্দ্র-সংগীত,...দশ মিনিট।"

ইণ্টারভ্যালের পরে দ্বিতীয় দফায় লিখলেন: "খরবায়ু বয় বেগে...রবীন্দ্র-নৃত্য, রবীন্দ্র-সংগীত...দশ মিনিট।"

তারপর দাদু মামা আর মঞ্জুদির পুরো নাম জেনে নিয়ে লিখলেন: "দানবদলন দস্তিদার। মঞ্জু মুস্তফী।"

দীনু খুড়োকে যে ভীষণ ভক্তি করেন হাকিম সাহেব, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না, আমাদের এই ব্যাপারে এমন আশ্চর্য উৎসাহ দেখালেন তিনি। বললেন, "পুরো প্রোগ্রাম ছকা হয়ে গেল। বাংলার পাশে পাশে ইংরেজী তর্জমাও করে দেবো আমি; সাহেব-সুবো আর অবাঙালীও অনেক আসবেন তো, তাঁদের জন্যে। বিজলী প্রেসকে ছাপাতে দিয়ে দেবো, ওরা ভালো কাগজে এক হাজার ছেপে ডেলিভারি দিয়ে দেবে আমার বাড়িতে। কাগজের আর ছাপার জন্যে একটি পয়সাও নেবে না, এইটেই হবে ওদের চাঁদা, অর্থাৎ কিনা ডোনেশন।"

আমরা ভীষণ খুশী। প্রোগ্রামের ছাপার ভার নিয়েছেন স্বয়ং জেলা হাকিম!

আমাদের বিদায় দেবার আগে তিনি বললেন, "নাচ-গানের আমি বড় একটা ধার ধারিনে। শুধু একবার দেখেছিলাম উদয়শংকরের নাচ, আর একবার শুনেছিলাম দক্ষিণের শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর গান। কিন্তু একসঙ্গে দুটো দেখা-শোনা কখনো হয়নি। এবার হবে তোমাদের ফাংশনে।"

আমরা পরমানন্দে নানা জায়গায় পোষ্টার লাগিয়ে দিলাম, বিচিত্র অনুষ্ঠান হবে 'চিত্রবাণী' ছবিঘরে—অমুখ তারিখে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বারোটা, সভাপতি: শ্রীযুক্ত

সিংহবিক্রম চৌধুরী, জেলা হাকিম। অগ্রিম টিকেট বিক্রি হচ্ছে চিত্রবাণীতে, অনুষ্ঠানের দিন সকাল আটটা থেকেও চিত্রবাণীতেই টিকেট পাওয়া যাবে।

আমাদের পুরো অনুষ্ঠানটা নিখুঁত হওয়া চাই, কাঁটায় কাঁটায় ছাপা প্রোগ্রামের মতো, নইলে চাব্‌কে লাল করে দেবেন বলে শাসিয়ে রেখেছেন হাকিম সাহেব। কাকে লাল করবেন তা তিনি খুলে বলেন নি, কিন্তু ভয় আমাদের সবারই মনে। দীনু খুড়োও বললেন, "তোমরা খুব ভালো করে, আর ঘড়ি দেখে সময় মিলিয়ে মিলিয়ে রিহার্শাল দাও। সিংহ যখন আমার কথা রেখে সভাপতি হয়েছে, তখন ওর মেজাজ আর মান যাতে বজায় থাকে, সেটা আমাদের দেখতে হবে।"

তাই জোর রিহার্শাল চলল—বিশেষ করে দাদু মামা আর মঞ্জুদির। নাচ আর গান একসঙ্গে কখনো দেখেন নি শোনেন নি হাকিম সাহেব, তাঁর ভালো লাগা চাইই চাই। তাছাড়া তাঁর বিদেশী বন্ধুরা আসবেন, তাঁরাও যেন খুশী হন।

রিহার্শাল দেখে শুনে দীনু খুড়ো ভারী খুশী। বললেন, "আসর মাত হয়ে যাবে। যেমন দাদুর গান, তেমনি মঞ্জুর নাচ। খুশী না হয়ে পারবে না সিংহবিক্রম। ওর বিদেশী সাহেব বন্ধুরাও খুশী হবে।"

কিন্তু বিধাতা এমন প্যাঁচ ক'ষে দিলেন যে, ভীষণ একটা জরুরী কাজে তাঁকে শুক্রবার কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হ'ল দিল্লীতে। আগামী রবিবার আমাদের অনুষ্ঠান। হাকিম সাহেব বুধবারের আগে ফিরতে পারবেন না।

আমরা ভীষণ দমে গেলাম। বেজার হয়ে দীনু খুড়ো বললেন, "তোমার না গিয়ে উপায় নেই তা বুঝি, সিংহ; তোমায় ধরে রাখতেও পারিনে। কিন্তু আমাদের ফাংশনে সভাপতি করব কাকে, সেটা তুমিই ঠিক করে দিয়ে যাও।"

সিংহবিক্রম চৌধুরী বললেন, "আপনিই সভাপতি হবেন, খুড়ো। বন্দেমাতরম গান হবার পরেই আপনি ষ্টেজে দাঁড়িয়ে বলবেন, অনিবার্য কারণে আমি হাজির থাকতে না পারায় আপনি সভাপতিত্ব করছেন।"

দীনু খুড়ো বললেন, "সেটা ভালো দেখাবে না, সিংহ। আমার পক্ষে ধৃষ্টতাও হবে। তার চাইতে বরং সভাপতি করব নরহরি দাদুকে। বয়সে এ পাড়ায় সবার বড় তিনি।"

হাকিম সাহেব তাতে সায় দিলেন।

কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে ছাপা প্রোগ্রামের বাণ্ডিলটা দীনু খুড়োর হাতে তুলে দিয়ে হাকিম সাহেব বললেন: "চমৎকার ছেপেছে। আমি নিজে দেখে দিয়েছি। খুড়ো, আবার বলছি আপনাকে। দেখবেন সব কিছু যেন হুবহু এই ছাপা প্রোগ্রামের মতো হয়।

কিছু যেন বাদ না পড়ে, কিছু যেন বাড়তি না হয়। কেউ যদি এতটুকু এদিক-ওদিক করে তো আমি ফিরে এলে পর আমার কাছে রিপোর্ট করে দেবেন, চাবকে লাল করে দেবো আমি।”

দীনু খুড়ো তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, “তোমাকে আমি কথা দিলুম সিংহ, তোমার এই ছাপা প্রোগ্রাম থেকে আমি একচুল এদিক-ওদিক হতে দেব না। তুমি ফিরে এলে পুরো রিপোর্ট দেবো তোমাকে। ধর্ম সাক্ষী রেখে কথা দিলুম।”

নরহরি দাদু সভাপতি হবেন, আর দীনু খুড়ো অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন হাকিম সাহেব।

রবিবার ‘চিত্রবাণী’ হলে সকাল সাড়ে ন’টায় আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা। আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম তিন ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ সাড়ে ছ’টায়। নানা রকম গোছ-গাছ করতে হবে, কোথাও কিছু বাদ থেকে না যায় সেদিকে দেখতে হবে, সুতরাং বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে না গেলে চলবে কেন?

ছাপা প্রোগ্রামটা আমরা কেউ খুঁটিয়ে দেখিনি, একবার চোখ বুলিয়ে গেছি মাত্র। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেন দীনু খুড়ো। কারণ তিনি নিখুঁতভাবে প্রোগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। দেখেই বললেন, “এই সেরেছে, এটা তো আগে খেয়াল করিনি। ‘ক্ষমো হে ক্ষমো’ আর ‘খরবায়ু বয় বেগে’ চটপট নতুন করে রিহার্শাল দিয়ে নিতে হবে, ঢেলে সাজতে হবে একেবারে। সময়ও তো বেশী নেই। দীনু, চটপট দু’পায়ে ঘুঙুর পরে নাও। আর মঞ্জু, তুমি হারমোনিয়াম বাজাতে জানো তো?”

শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম, বিশেষ করে দামু মামা তো গাইবেন, তাঁর পায়ে ঘুঙুর কেন? আর মঞ্জুদি তো নাচবেন, তাঁর হারমোনিয়াম বাজাতে জানবার দরকার কি? তাছাড়া হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে কখনো নাচা যায়?

কি দরকার, সেটা পরিষ্কার হ’ল ছাপা প্রোগ্রামের দিকে তাকিয়ে। দেখলাম, ‘আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো’ আর ‘খরবায়ু বয় বেগে’-র পরে ছাপা রয়েছে: সংগীত—শ্রীমতী মঞ্জু মুস্তফী নৃত্য—শ্রীদানবদলন দস্তিদার। আর ইংরেজীতে তার তর্জমা।

আমরা বললাম, “ছাপার ভুল।”

দীনু খুড়ো বললেন, “না, ছাপাখানা ভুল করেনি। এই দেখ।” আমরা দেখলাম একখানা ছাপা প্রোগ্রামের তলায় দিকে হাকিম সাহেব লিখে দিয়েছেন সব ঠিক আছে, অনুষ্ঠান কাঁটায় কাঁটায় হুবহু এই রকম হওয়া চাই। আর সেই করে দিয়েছেন সেই হাকিমী হুকুমের তলায়।

"দেখলে তো ?" বললেন দীনু খুড়ো। "সিংহ যেমনটি লিখে দিয়েছিল, বিজলী প্রেস ঠিক তেমনটি ছেপে দিয়েছে।"

আমরা বললাম, "তাহলে হাকিম সাহেবই ভুল করেছেন।"

"সিংহবিক্রম নাচ দেখেছে উদয়শংকরের, আর গান শুনেছে শুভলক্ষীর, তাই ওর মনে গেঁথে রয়েছে বেটাছেলে নাচে আর মেয়েছেলে গান গায়।" বললেন নরহরি দাদু। "তাই লিখবার সময় ভুল করে নাচ চাপিয়ে দিয়েছে দামুর ওপর, আর গান চাপিয়ে দিয়েছে মঞ্জুর ওপর।"

দীনু খুড়ো গম্ভীর মুখে বললেন, "ভুল করে, না ইচ্ছে করে, তা কি করে বুঝাব, দাদু ? হাকিমী বুদ্ধি আর হাকিমী মেজাজ, দুই আলাদা জাতের, আমাদের মতন তো নয়। এমনও হতে পারে যে, বরাবর দামু গান গায় আর মঞ্জু নাচে। তাই আজ আমাদের এই ফাংশনে নতুনত্ব দেখবার জন্তেই সিংহ দামুকে নাচিয়ে মঞ্জুকে গান গাওয়াতে চেয়েছে।"

মঞ্জুদি বললেন, "আপনার হাকিম ভাইপোর মাথা খারাপ হয়েছে ব'লে আমাদেরও মাথা খারাপ হতে হবে নাকি, খুড়ো ?"

দীনু খুড়ো বললেন, "সেনাপতি ভুল হুকুম দিলেও সে হুকুম সৈন্তদের মানতেই হয়, মঞ্জু। তেমনি সভাপতির হুকুম ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, আমাদের মানতেই হবে। দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাও দামু, চটপট নাচটা মক্‌সো করে নাও যেটুকু পারো। অনেক ভুল হবে, তাতে কিছু আসবে যাবে না। আর মঞ্জু, ভীম তোমার সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাবে'খন আর তুমি গুরুদেবের 'গীত-বিতান' খুলে দেখে দেখে সুর করে আউড়ে যাবে। আজকাল অনেক গাইয়ে তো তাই করে। সুরে তালে অনেক ভুল হবে জানি, তাতে কিচ্ছু যাবে আসবে না।"

মঞ্জুদি বেঁকে বসলেন। বললেন, "তাহলে আমি চললাম।"

দামু মামা বললেন, "আমিও চললাম।"

"তাহলে 'ক্ষমো হে ক্ষমো' আর 'খরবায়ু বয় বেগে', আজকের প্রোগ্রামের দুটো আসল জিনিসই বাদ পড়বে ?" বললেন দীনু খুড়ো। "এজন্তে সিংহবিক্রম আপনার ওপরও চটে যাবে দাদু। আপনার কথাতেই সে এই দুটো নাচ-গানের জন্তে দশ মিনিট দশ মিনিট কুড়ি মিনিট দিতে রাজি হয়েছিল। অত করে ব'লে-ক'য়ে ওর কাছ থেকে বেশী সময় আদায় করে এখন যদি দুটোই বাদ পড়ে, তাহলে সিংহ ফিরে এলে তার কাছে আমি কি কৈফিয়ত দেবো ? পুরো রিপোর্ট ওর কাছে পেশ করতেই হবে আমাকে, কিছু বাদ দিতে

পারব না। কথায় বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। এই ছাপা প্রোগ্রামে যেমন আছে তেমনি সব হবে। যোগ-বিয়োগ অদলবদল কিছু চলবে না। এক চুল এদিক-ওদিক হয়েছে জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে সিংহবিক্রম।"

"তাছাড়া আরেকটা দিকও ভেবে দেখবার আছে।" বললেন নরহরি দাদু। "সিংহবিক্রম তার বিদেশী বন্ধুদের কাছে টিকেট বিক্রি করে গেছে, তারা সবাই আসবে। ছাপা প্রোগ্রামের কোনো কিছু বাদ গেলে ওরা নিশ্চয় সিংহবিক্রমের কাছে রিপোর্ট করবে। আর ছাপা প্রোগ্রামে ভুল আছে বলে যদি দাম্লুই গান গায় আর মঞ্জুই নাচে, তাহলে ওরা সিংহকে বলবে তোমরা অপদার্থ জাত, একটা সামান্য অনুষ্ঠানও ঠিক করে করতে পারো না, প্রোগ্রামে যা ছাপা থাকে, স্টেজে হয় তার উল্টো। ওরা দেশে-বিদেশে এই কথাই বলে বেড়াবে। তার ফলে বিশ্ব-সভায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে।"

"ছাপা প্রোগ্রামে কেটে ঠিক করে দিলে হয় না?" বললেন, দাম্লু মামা। মঞ্জুদি বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ। ছাপা প্রোগ্রামে আমাদের নাম দুটো যেমন আছে তেমনি রেখে, শুধু 'নৃত্য' কেটে 'সংগীত' আর 'সংগীত' কেটে 'নৃত্য' করে দিলেই হবে।"

"তাতেও তো ঐ একই অসুবিধা, মঞ্জু।" বললেন নরহরি দাদু। "ছাপা প্রোগ্রামে কাটাকুটি দেখে বিদেশীরা ভাববে, এ জাত এমনি অপদার্থ যে একটা সাধারণ প্রোগ্রাম পর্যন্ত ঠিক করে ছাপাতে পারে না। তাতে বিশ্ব-সভায় আমাদের মাথা কতখানি হেঁট হয়ে যাবে, ভেবে দেখ একবার।"

ভেবে দেখে আমরা সবাই শিউরে উঠলাম, দাম্লু মামা আর মঞ্জুদি বাদে। ওঁরাও শিউরে উঠলেন বটে, কিন্তু তা অন্য কারণে।

দাম্লু মামার দেহটি (দেহ না বলে 'বপু' বললেই বোধ হয় বেশী ঠিক হতো) ছিল যেমন বিপুল, তেমনি মানুষটি তিনি ছিলেন বিষম ভীতু। হাকিম সিংহবিক্রমের সিংহ মার্কা মেজাজের কথা শুনেই তিনি বেশ একটু ভয় পেয়েছিলেন। তার ওপর বিশ্ব-সভায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবার কথা শুনে মঞ্জুদিও বেশ একটু দমে গেলেন। হাকিম সাহেবকে চটানো আর বিশ্ব-সভায় আমাদের জাতির মাথা হেঁট করা—এত বড় দুটো বিপদের ঝুঁকি নিতে তাঁরা কেউ ভরসা পাচ্ছেন না বলেই মনে হলো।

কিন্তু রিহার্শাল দিতে রাজি হলেন না কেউ—বিশেষ করে দাম্লু মামা। এখন রিহার্শাল দিয়ে লাভ তো কিছু হবেই না, হয়রানি সার হবে। শুরুর আগেই হয়রান হয়ে গেলে শুরুর পর দু'দফায় কুড়ি মিনিট নাচতে জান বেরিয়ে যাবে। এখন রিহার্শালের চাইতে বরং একটু বিশ্রাম করে নেওয়া ভালো।

হলের আদ্ধেকের বেশী ফাঁকা। টিকেট বেশী বিক্রী হয়নি; আমাদের সব্বার মন খারাপ। যা হোক, ঠিক সময় মতো পর্দা উঠল, অনুষ্ঠান শুরু হ'ল।

যথাকালে দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে স্টেজে এসে দাঁড়ালেন দাদু মামা। হারমোনিয়াম নিয়ে বসল ভীম, আর তার পাশে মাইকের সামনে 'গীতবিতান' খুলে বসলেন মঞ্জুদি। দীনু খুড়োর নির্দেশে মাইকে ঘোষণা করা হ'ল—এইবার কবিগুরুর নটীর পূজা থেকে 'ক্ষমো হে ক্ষমো' গান হবে; গাইবেন শ্রীমতী মঞ্জু মুস্তফী, নৃত্যরূপ দেবেন শ্রীদানবদলন দস্তিদার। সামনের সারিতে যে কয়জন বিদেশী ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তাঁরা ছাড়া হলসুদ্ধ বাকি সবাই চমকে উঠলেন—একি কাণ্ড!! মঞ্জুদির বেসুরো আর বেতালা গানে তেমন কিছু এলো গেলো না, কারণ ভীম জোরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে মঞ্জুদিকে অনেকখানি সামলে নিতে লাগল। কিন্তু বিপুল দেহ-ভার নিয়ে দু'পায়ে ঘুঙুর পরে দীনু মামা যখন 'ক্ষমো হে ক্ষমো' গানের সঙ্গে ভাব আর ছন্দ মিলিয়ে হেলে-দুলে নাচ শুরু করলেন, তখন সারা হল জুড়ে যে কি ভাবের জোয়ার খেলে গেল তা বর্ণনা করবার চেষ্টা না করাই ভালো।

পাঁচ মিনিট নেচেই হয়রান হয়ে পড়লেন দাদু মামা। কিন্তু দীনু খুড়োর হাতে ঘড়ি, আর প্রোগ্রামে ছাপা আছে দশ মিনিট। নাচতে নাচতে একবার পাশের দিকে তাকিয়ে দাদু মামা ইশারা করলেন, "আর পারছি নে, এইবার ইণ্টারভ্যালের পর্দা ফেলে দাও।" দীনু খুড়ো ডান হাতের পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দেখালেন আরো পাঁচ মিনিট বাকি। সেই 'আরো পাঁচ মিনিট' বাদে যখন দীনু খুড়োর ইশারায় পর্দা নেমে এলো, তখন দাদু মামা স্টেজের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। ওদিকে পর্দার ওধারে সারা হল জুড়ে তখন প্রচণ্ড হাততালি।

মাইকে ঘোষিত হ'ল এখন দশ মিনিটের বিরতি। তারপর আবার অনুষ্ঠান শুরু হবে। হ'ল প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল।

দাদু মামা বললেন, "সারা শরীর আমার ঝিমঝিম করছে, মাথা ঘুরছে, এবার আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দাও খুড়ো।"

দীনু খুড়ো বললেন, "পাগল, না খ্যাপা? 'খরবায়ু বয় বেগে' নাচটা বাকি আছে না? অত ঘাবড়িও না মামা, কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করো, এক পেয়ালা চা খাও, লডি একটু গা-হাত-পা টিপেও দেবে'খন, দেখবে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছ। তোমার নাচটা সবাই খুব নিয়েছে। দেখলে না কিরকম হাততালির চোট? গান গেয়ে কখনো অমন হাততালি পেয়েছ কি?"

গানের সঙ্গে তাব আর ছন্দ মিলিয়ে হেলে-দুলে নাচ শুরু করলেন দাম্মু মামা।

"না, খুড়ো। তা পাইনি বটে।" স্বীকার করতে বাধ্য হলেন দাম্মু মামা।

এমন সময় বাইরে বেশ একটা হট্টগোল সোনা গেল। আমরা চিন্তিত হয়ে বাইরে গিয়ে দেখি, বন্ধ টিকেট ঘরের বাইরে মস্ত ভিড় জমেছে, সেই ভিড় থেকে চীৎকার উঠেছে,

"টিকেট ঘর খুলতে হবে। টিকেট বিক্রি বন্ধ করা চলবে না, চলবে না। টিকেট চাই, টিকেট চাই, আমাদের টিকেট চাই।"

আর টিকেট বিক্রি হবার কোনো আশা নেই ভেবে হতাশ মনে আমরা টিকেট ঘর বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এবার এই টিকেটের দাবিতে আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। আমরা তাড়াতাড়ি টিকেট ঘর খুললাম। হুহু করে বাকি সব টিকেট বিক্রি হয়ে গেল; আমরা তারপর 'হাউস ফুল' টাঙিয়ে দিলাম।

হঠাৎ যে টিকেটের চাহিদা এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল, তার কারণ ইন্টারভ্যালের সময় যাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন তাঁদের মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল দাদু মামার নাচ আরে মঞ্জুদির গানের খবর। রটে গিয়েছিল এই বার্তা, যে দুপায়ে ঘুঙুর পরে দাদু মামার নাচ একটা দেখবার জিনিস হয়েছে, আর তাঁর আসল নাচটা হবে ইন্টারভ্যালের পর।

দাদু মামার সেই নাচ দেখবার লোভেই ছুটে এসেছেন সবাই—ঐ একটা নাচ দেখলেই তাঁদের পুরো টিকেটের দাম উশুল হয়ে যাবে।

উশুল সত্যিই হ'ল।

দাদু মামার 'খরবায়ু বয় বেগে' নাচ কখনো ভুলতে পারব না। দীনু খুড়ো বলেছিলেন, "মামা, সব ভালো যার শেষ ভালো। যেমন করে হোক শেষ রক্ষাটা কোরো, তীরের কাছে এসে নৌকোডুবি কোরো না। সিংহবিক্রমের কাছে যেন মুখ থাকে। বিশ্ব-সভায় যেন আমাদের মাথা হেঁট না হয়।" সেইজন্তেই বোধ হয় দাদু মামা মরিয়া হয়ে নেচেছিলেন, অর্থাৎ সারা স্টেজ জুড়ে উদ্দাম ছন্দে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছিলেন। উল্লাসধ্বনি আর হাততালির হুল্লোড়ে ভরে গিয়েছিল সারা হল।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর হল থেকে বেরোতে বেরোতে সবার মুখেই দাদু মামার নাচের কথা; এমন 'ফাংশন' তাঁরা অনেক দিন দেখেন নি, সে বিষয় সবাই একমত।

আমরাও সবাই মিলে ধন্য ধন্য করতে লাগলাম দাদু মামাকে, কারণ দাদু মামার নাচের জোরেই ফাঁকা হল ভরে উঠে হাউস ফুল হলো, এত টাকা উঠল ভবতারিণী বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্য তহবিলে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তারা মহাসেনাপতির দোকানে উঠল। সে ভাল ব্যবসা ফেঁদেছে। ফাঁদ পেতে ছেলে ধরে না, ধরে গাহেক। আর কথার প্যাচ মেরে তাদের কাঁচিয়ে নেয়।

সাম্‌নে দোকান। পেছনে থাকার মত তিনটা ঘর। তার দুটোই মহারাজকে ছেড়ে দিল।

রাজা পেটুক ছেলে। ট্রেনে সকলের ঘুমের সুযোগে গাঁটরি খুলে ইচ্ছা মত খাবার খেয়েছে। লুচি, মোণ্ডা, পিঠে। কিন্তু পেটে খেলে পিঠে সয় বটে,—পিঠে খেলে পেটে সয় না। খেয়ে তার পেট ঢাক হয়েছিল। এবার গুড়্‌গুড়্ করে বাজল। সেনাপতি পায়খানা দেখিয়ে দিল। ফ্লাশ পায়খানা। শেকল টেনে সাফ করতে হয়। রাজা পেট সাফ করে। তারপর পায়খানার প্যান্ সাফের জন্য শেকল ধরে টানে। সঙ্গে সঙ্গে হেন-তেন কাণ্ড কারখানা হয়। দস্তুর মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে সাপের তর্জন-গর্জন! এমন ব্যাপার রাজা দেখেনি। হয়ত তক্ষুনি প্যানের খোঁড়ল থেকে মস্ত সাপ বেরিয়ে আসবে! আর রাজা 'বাপরে' বলে পালাতে চায়। দোর ভেজান ছিল। তার চেঁচানী, কাঁদুনী শুনে সবাই এসে বার করে আনে!…

সেদিনই গঙ্গাস্নান। সবাই গঙ্গার ঘাটে যায়। গাঁটছড়া বেঁধে কাদা জলে সবাই চান করে ওঠে। আকাশের দিকে চেয়ে স্বর্গের সিড়ি খোঁজে। আকাশে সাদা মেঘ।

তার টুকরো নিচে ঝুলছে। আহ্লাদী আর জহ্লাদী বলে, "ওই স্বর্গের সিঁড়ি।" নাগাল পাবার জন্য তারা লাফায়।

বিষম ভিড়। তারা ভীরু চোখে দেখে। কে জানে তাতে কত ছেলেধরা লুকিয়ে আছে! মহারাজা বলে, "লোকের মাথা লোকে খায়।" শুনে আহ্লাদী জহ্লাদী ভয় পায়। বলে, "বাড়ী যাব।" রাজাও তাই বলে। সবার খিদে পেয়েছে। গুচ্ছের খাবারের দোকান। কিন্তু লোকে যদি মাথা খেয়ে ফেলে, কি দিয়ে তারা খাবার খাবে? তারা লোভ সাম্‌লে বাড়ী ফেরে।

পুণ্য দিন। মহারানী রেঁধে সবাইকে খাওয়াবে। আহ্লাদী জহ্লাদী রান্নার যোগাড় দেয়। মহারানী থেকে ফর্দ নিয়ে রাজা সওদা আন্‌তে যায়। মহাসেনাপতির দোকানে অনেক ভিড়। সেনাপতি সেখানে আটক পড়েছে। তাই রাজা রাস্তা পেরিয়ে ওপিঠের দোকানে একা যায়। বড় দোকান। দোকানীর বোষ্টম চেহারা। কপালে ফোঁটা তিলক, গলায় কণ্ঠী, হাতে যপের মালা। দেখে রাজার ভয় হয় না। তার সাম্‌নে ধামা ভরা বাতাসা, নকুল, প্যাড়া। রাজা ভাবে, হয়ত পুণ্য পরবে দান করবে বলে রেখেছে।

সে দোকানীকে ফর্দ দিয়ে দাঁড়ায়। জিনিস মেপে, দাম নিয়ে দোকানী রাজাকে বলে, "এসো।" ভারী মিঠে গলা। আর ভেজে বলা কাকে বলে! হাতে মিষ্টি দেবে ভেবে রাজা এগোয়। দোকানী অন্য গাহেক নিয়ে ব্যস্ত। খানিক বাদে রাজার দিকে চেয়ে আবার বলে, "এসো।"

রাজা ভাবে, তাকে হাত বাড়িয়ে পায় না বলে আরও কাছে গলে যেতে বলছে। সে আরও কাছে এগিয়ে যায়। আবার দোকানী অন্য গাহেকে মন দেয়। তারপর আবার রাজাকে দেখে। দোকানের ভিড় কমান দরকার। অথচ ছেলেটা খামোখা ভিড় বাড়াচ্ছে। এবার সে বিরক্ত হয়। ফের বলো, "এসো।" আর রাজা ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে আরও কাছে গিয়ে হাত পাতে।—

আঃ মলো! ছেলেটা কালা নাকি? দোকানী দোর দেখিয়ে, হাত নেড়ে, মুখ খিঁচিয়ে বলে, "দাঁড়িয়ে আছ কেন? এসো—"

এতক্ষণে রাজার মনে হয়, এসো মানে কাছে ঘেঁষে নয়,—চলে যাও। এবার দোকানী এতলোকের সামনে যে ভঙ্গীতে বলেছে, তার মানে, মানে মানে খসে পড়। কান সে ধরেনি, কিন্তু তা কান না ধরে অপমান করার সামিল! রাজা কাঁদো কাঁদো মুখে বেরিয়ে যায়। মিষ্টি দেখলে তার মুখে নাল ঝরে। মনে পড়ে ঝোলায় পয়সা ছিল। বুদ্ধি করে ক'পয়সার কিনে খেতে খেতে যেতে পারত। ভেবে ভেবে সে আন্‌মনা হয়ে পড়ে।

রাস্তা পেরোবার সময় হঠাৎ পেছনে মোটরের হর্ণ শুনে তার চেতনা হয়। কিন্তু ভড়কে যেয়ে এদিক-ওদিক ছোটে। তারপর মোটরের ধাক্কায় চিৎপাত্।

মোটর ব্রেক কষায় রক্ষা। বিশেষ লাগেনি। সে ধূলো ঝেড়ে ওঠে। মোটর চালক তাকে "বেকুব, কালা" বলে গালাগাল দিয়ে চলে যায়।

বাড়ী ফিরে কানমলা খাবার কথা রাজা কাউকে বলে না। শহরে এসে তার বুদ্ধি খুলেছিল!...

পরের দিন রাজা সেনাপতির সঙ্গে গড়ের মাঠ দেখতে যায়। দেখে অবাক হয়। পাড়া গেঁয়ে গরুর মাঠ নয়। মাথা উঁচু করে আছে আকাশ-চেরা একটা মঠ। পাশ দিয়ে বাঁধান পথ-ঘাট, ট্রাম লাইন, লাঠ সাহেবের বাড়ী, আর বড় বড় বাড়ীর সারি! সেনাপতি বলে, "উঁচু মঠের নাম মনুমেণ্ট।" রাজা জিজ্ঞেস করে, "মনুমেণ্ট নাম কেন রে? ও নামের দত্তির তৈরী?"

সেনাপতি যতটুকু জানে তা বলে। মনুমেণ্ট নামে কোন্ এক সাহেবের তৈরী। এস্প্লানেড, চৌরঙ্গী—সে সবও নাকি যত সব সাহেবের নামে! সেনাপতি হাত বাড়িয়ে দেখায়, "উই হ'ল কেল্লা, সৈন্যেরা থাকে। কত বন্দুক কামান আছে।"—

রাজা ভয় পায়। বলে, "যদি গুড়ুম করে ছোঁড়ে।"

সেনাপতি বলে, "আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। কেন মারবে?"

তাও তো বটে। তবু দূরে থাকা ভাল। সাবধানের মার নেই। তারা হেঁটে হেঁটে এদিক দেখে, ওদিক দেখে। সন্ধ্যা হয়। দপ্ দপ্ করে আলো জ্বলে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ আলো। আলোর রোশনাই। দলে দলে লোকের হৈ চৈ। যেন মেলা-মোচ্ছব! চোখে দেখা এ রূপের কাছে আজব রূপকথা কিছু নয়। কাছে বড় বড় হোটেল-রেষ্টুরেণ্ট। অনেক লোক সেখানে খায়। তা দেখে তাদের ক্ষুধা পায় তারা ঢোকে। কিন্তু সেখানে কাঁটা-চামচে খেতে হয়। দেখাদেখি তারা সেভাবে খেতে যায়। আর জিভে ঠোঁটে খোঁচা লেগে চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর সব পাতে ফেলে বাইরে ছোটে! দামের জন্য বেয়ারা তাড়া দেয়, আর তারা দৌড়ে পগার পার! দিনের বেলা আসতে হাঙ্গাম-হুজ্জোত হয়নি। কিন্তু তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। দূরের পথ ট্রামে-বাসে যেতে হবে। কিন্তু এখনই ছেলে-ধরার ভয় বেশী। রাজা সেনাপতির সঙ্গে গাঁটছড়া শক্ত করে দেয়। তারপর বাস ষ্টপে যেয়ে দাঁড়ায়। সেনাপতি ঠেলেঠুলে ওঠে। আর রাজা উঠতে না উঠতে বাস ছেড়ে দেয়। রাজা পড়ে যায়. আর গাঁটের টানে পড়ে সেনাপতি। লোকেরা বাঁধো বাঁধো করে বাস থামায়। তারপর তাদের ধরাধরি করে তুলতে যেয়ে গাঁটছড়া বাঁধা দেখে অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, "তোমরা দু'ছেলে গাঁটছড়া বেঁধেছ কেন গো?"

রাজা বলে, "বাঁধব না! ছেলে ধরার শহর। চারদিকে কল পাতা রয়েছে। তাই তো নাম কলকাতা। আঁট-ঘাট বেঁধে চল্‌তে হয়।

তাক্ লাগান কথা! ওরা জিজ্ঞেস করে, "তাই গাঁটছড়া ?"

প্রশ্ন শুনে রাজা ওদের চেয়েও অবাক হয়। সে ভাবে, লোকগুলো আচ্ছা হাঁদা তো! এ ছাড়া আট্‌কাবার কি পথ আছে ?—

তখন চোখ-মুখ ঘুরিয়ে রাজা কারণ বোঝায়। কিন্তু বুঝবে কি, ওরা হেসেই অস্থির। বলে, "তোফা বুদ্ধি তো! কোন দোকানের চাল খাও ?"

রাজা ঠাট্টা বোঝে না। বলে, "আমরা রাজা! কিনে খাই না। প্রজারা দেয়।"

ওরা বলে, "কিনে খাও বুঝি গাঁজা ? তা রাজত্ব কোথায় ?"

রাজা বলে, "বুড়বক রাজ্যে।"

ওরা বলে, "নৈলে অমন বুদ্ধি!"

রাজা বিষম রেগে যায়। বলে, "চল নেবে যাই।" দু'জনে বাস থামতে না থামতে এক সঙ্গে নাবে। আর গাঁটছড়ায় টান লেগে চিৎপটাং।—

বাসের লোকেরা হেসে ওঠে। কেউ কেউ চাটাং চাটাং ঠাট্টা ছোঁড়ে!

রাজা বলে, "হ'ত দেশ-গাঁ দেখিয়ে দিতেম!"

কি দেখাত, তা শোনার জন্য না থেমে বাস্ সটান চলে যায়।—

খ্যাংরাপটির ক'টি ছেলে সেনাপতির সাথী-সাঙাত হয়েছিল। পরের দিন তাদের মধ্যে ট্যাংড়া আর খ্যাংড়া এসে জানাল যে, খিদিরপুর ডকে মস্ত এক মানোয়ারি জাহাজ এসেছে।

রাজা এ নাম আর শোনেনি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কুমীর নাকি ?"

সেনাপতি আশ্বাস দিয়ে বলল, "উঁহু জাহাজ। সমুদ্রে যায়। চল দেখে আসি।"

তারা দল বেঁধে যায়। দূর থেকে দেখে রাজা বলে, "গঙ্গায় অত বড় বাড়ী! তা সমুদ্রে যায় কি করে ?"

খ্যাংড়া বলে, "চাকা চালিয়ে। ভেতরে কলকারখানা আছে।"

রাজা বলে, "দেখবো!" কিন্তু দেখা তো চাট্টিখানি কথা নয়। ওরা এ-ওর দিকে চায়। নিজেরা ফিস্‌ফিস্ করে। মনে রাখা চাই। তখন সেনাপতি বলে, "আয় দেখি। খ্যাংরা পটির ছেলে, ভয় করি না।" তারা সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। তখন জাহাজ থেকে মাল খালাস হয়ে গেছে। কাজের তাড়া নেই। নাবিকরা অনেকে শহর দেখতে বেরিয়েছে। জাহাজ প্রায় খালি। যারা ছিল, ছোট ছেলে দেখে কিছু বলল না।

তারা উঠে এদিক-ওদিক দেখে। জাহাজের কাপ্তান ডেক্-এ এসেছিল। ভাল লোক। দেশে তারও কাচ্চাবাচ্চা আছে। অনেকবার এখানে এসে হিন্দী শিখেছে। (ক্রমশঃ)

ভূতপূর্ব 'মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্র স্মরণে

সুধীরচন্দ্র সরকার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের বাংলাদেশে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলো ভারতের আর কোন রাজ্যে ঘটে না। এই সব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের মাসিক পত্রিকা 'মৌচাকের' একই সম্পাদকের পরিচালনায় আটচল্লিশ বৎসর সচল থাকা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয়ে, এই ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসেও যথারীতি প্রকাশিত হচ্ছে। কেবল তার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার এই সেদিন পরলোকগমন করেছেন। আর দুটো বছর থাকলে তিনি পত্রিকাখানির হীরক-জয়ন্তী করতেন। আমরা আশা ও কামনাও করেছিলাম তাই। কিন্তু তা পূরণ হলো না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর। তার পরেও তো অনেকে বেঁচে থাকেন। সুতরাং আমাদের আশা ও কামনা অতিরিক্ত হয়নি।

আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল পেতে চেয়েছি এই কারণে যে, তাঁর মতো হৃদয়বান, বন্ধুবৎসল, মিষ্টভাষী ও সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যরসিক মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে স্বল্পশক্তিমান সাহিত্যিকও তাঁর সঙ্গে প্রীতিতে আবদ্ধ হন। তাঁর সাহিত্যরসবোধ 'মৌচাক'কে সর্বোৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকায় পরিণত করেছিল। পত্রিকাখানিতে অনেক শাশ্বত রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

সুধীরচন্দ্র নিজেও বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলির কয়েকখানির বহুল প্রচার হয়েছে। তিনি গ্রন্থপ্রকাশ ও গ্রন্থব্যবসায়ে যেমন বিত্তসঞ্চয় করেছেন, তেমনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে তাঁর আসন ছিল সম্মানের। তাঁর সম্মানের আসন কেবল সেখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না. জনসমাজে এবং আরও নানা ক্ষেত্রে তিনি সম্মানার্হ ছিলেন। এটা সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না।

তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর অফিসে প্রায় প্রত্যহ সাহিত্যিকগণের একটি আনন্দ-সভা বসতো, যা আর কোন দিনই হবে না। তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁর শূন্য কেদারাখানি দেখে ব্যথিত মনে ফিরে যাবেন।

মধুহীন মৌচাক

সত্যবান

মৌচাকে আর নাই রে সুধীর নাই।
হায় মৌচাক মধুহীন হলো তাই॥
শূন্য আসন পড়ে আছে তাঁর
নীরবে সে বহে ব্যথা আনিবার
কোন্ প্রাণে মোরা তার পানে ফিরে চাই॥
মৌচাকে আর নাই রে সুধীর নাই॥

টুটে গিয়েছে রে এ মৌচাকের মূল।
ওরে কে বা কিসে হ'বে তার সমতুল॥
এক কোণে ব'সে সেই সে অটল
যোগাত আমোদ চির-নির্মল
পূর্ণ ক'রে সে ছিল যে রে সব ঠাঁই॥
মৌচাকে আর নাই রে সুধীর নাই॥

সুধীরচন্দ্র স্মরণে

শ্রীসুখেন্দু বসু

মনে মধু, মুখে মধু, কাজে মধু যাঁর,
মাসিক 'মৌচাক'খানি হাতে গড়া তাঁর।

সেকালের তিনি সুনিপুণ মধুকর
নানা ফুলে রচেছেন মধুর আকর।

গুনগুন আছে ধ্বনী, হুল নাই তাঁর,
গুণী, সুধী—নাম তাঁর সুধীর সরকার।

সাহিত্যিক, সদাচারি, ধামিক, সুজন,
সাহিত্য-কাননে আনে কোকিল-কূজন।

অমৃত সবারে দানে—মৃত্যু তার নাই।
তাঁরই স্মৃতিতে মোরা প্রণতি জানাই।

স্মরণে

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সুসাহিত্যিক সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

শুধুমাত্র দীর্ঘ-জীবন লাভ করলেই হয় না। জীবনের মহিমা প্রকাশ পায় কর্মের মাহাত্ম্যে ও নিষ্ঠায়। সুধীরবাবুর জীবনে সেই মহিমা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর ঐকান্তিক সাহিত্য-নিষ্ঠার মাধ্যমে।

বহুকাল যাবৎ তিনি যেরকম অনলসভাবে এবং একাগ্রচিত্তে সাহিত্যসেবা এবং একটি বৃহৎ পুস্তক-প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে গেছেন, তা যেন একটা ব্রত উদ্‌যাপন।

পুরনো দিনের 'ভারতী', 'যমুনা', 'জাহ্নবী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। তাঁরই আনুকূল্যে 'নাচঘর' কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত'-এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া গত ৪৮ বছর ধরে তাঁরই সম্পাদনায় 'মৌচাক' পত্রিকা শিশু-মনের খোরাক যুগিয়ে আসছে। তাই, বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যও তাঁর কাছে প্রভূত ঋণী।

ওঁর সাহিত্য-কীর্তি 'বিবিধার্থ অভিধান', 'জীবনী অভিধান, পৌরাণিক অভিধান', প্রভৃতিগুলি রেফারেন্স বই হিসাবে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়।

যাঁরা সুধীরবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন ও জেনেছেন, সকলের কাছেই ওঁর জীবন সহজ, সরল ও সুন্দর বলে মনে হয়েছে। সৌম্য মূর্তি—শালীনতা ও ঔদার্যের প্রতীক।

তিনি কেবল একজন ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না। সাহিত্য-সমাজে একটি প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে একটি চক্র গড়ে উঠেছিল। বর্তমান কালের নামকরা সাহিত্যিক, শিল্পী ও নানা গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ হ'ত কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের ঐ বিখ্যাত পুস্তক-প্রতিষ্ঠানটিতে (এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স)। অগ্রজ রূপেই তিনি সকলের গণ্যমান্য ছিলেন। প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে অনেক প্রতিভাবান লেখককে তিনি প্রতিষ্ঠালাভে সাহায্য করেছেন।

সুধীরবাবুর মৃত্যুতে বাংলা বইয়ের জগৎ এবং সাহিত্যিক মহল একজন মহান্ পৃষ্ঠপোষককে হারাল।

আর, ব্যক্তিগতভাবে আমি হারালাম একজন মুরুব্বি। গত ৩০ বছর ধরে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। নানা ব্যাপারে সুধীরবাবুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি, ওঁর সঙ্গে কথা বলে তৃপ্তি পেয়েছি। আজ তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

সুধীরচন্দ্র

শ্রীচিত্ত মাইতি

অবুঝ শিশুর মনের কথা
তোমার বুকে বাজত অনেক বেশী;
নিজের হাতে তাদের তুমি নিয়েছিলে
তুলে দুঃখ রাশি।
স্রষ্টা তুমি, মৌচাকেরই
আমরা সবাই জানি;
তোমার হাতের স্পর্শ পেয়ে
সার্থক তাই, তোমার সৃষ্টিখানি।

আজ তো তুমি চলে গেছ
অচেনা কোন্ লোকে;
আকাশ, পাখী, সাগর, নদী
কাঁদছে তোমার শোকে।
তারই সাথে কাঁদছে যত
কিশোর তরুণ দল;
তোমার স্নেহের পারাবারে
ওরাই ছিল যাত্রী যে সকল।

মোরা ভুলিব না

শ্রীমতী শান্তি বসু

নিদারুণ বার্তা এল
তুমি নেই ভবে,
সৃষ্টি তব সাহিত্যের
অক্ষয় যে রবে।
মৌচাকের মধুটুকু
আহরণ ক'রে
কিশোর জনের দিলে
চিত্তখানি ভ'রে।

তুমি ছিলে, সবাকার
প্রিয় হতে প্রিয়,
তোমার বিয়োগ-ব্যথা
নহে সহনীয়!
চির শান্তি, লভ স্বর্গে
করি এ প্রার্থনা
জ্ঞানদীপ জেলে গেলে
মোরা ভুলিব না।

শ্রীসম্বিৎসুন্দর দাস

লঙ্কায় ঝাল হয় কেন?—লঙ্কার ভেতর যেখানে বীজ আটকানো থাকে, সেখানে Glucoside বলিয়া একপ্রকার উদ্রুক্ত তৈল আছে। ঐ তৈল হইতে লঙ্কার ঝালের উৎপত্তি হয়।

আকাশের রং নীল কেন দেখায়?—সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে আসবার সময়ে তড়িৎ-অনুযুক্ত বায়ুস্তর এবং বাতাসের ধূলিকণা উহার নীল বর্ণের আলো বিক্ষিপ্ত করে। আর ইহারই ফলে আকাশের রঙ নীল দেখায়।

বৃষ্টির ফোঁটা কেমন করে তৈরী হয় জান?—এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস বারবারা জে টাফট। তিনি আমেরিকার মেটিরিয়োলজিক্যাল সোসাইটির এক সভায় বলেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে বাতাস উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র লবণের কণাকে কেন্দ্র করে বৃষ্টির ফোঁটা গড়ে ওঠে।

বলতে পার আমাদের চুল কাটলে কেন আমরা বেদনা অনুভব করি না?—আসল কথা আমাদের চুলের মধ্যে কোন শিরা নেই, তাই চুল কাটলে আমরা কোন প্রকার ব্যথা অনুভব করি না।

পৃথিবীটা যখন সৃষ্টি হলো তখন কেমন ছিল?—সেটা পুরু বায়বীয় পদার্থের চাদর দিয়ে মোড়া ছিল। এই চাদরের নাম কি ছিল জান?—বায়ুমণ্ডল।

জোনাকি পোকা যেরূপ আলো আপন শরীর হইতে বিকিরণ করে, ঠিক সেইরূপ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এক প্রকার মাছ আছে তাদের দেহ হইতে এক প্রকার আলো বাহির হয়। তাদের দেহে লুসিফেরিণ নামে একটা দ্রব্যের জন্যই এই আলো দেখা যায়।

যারা প্রতিদিন দাঁড়ি কামায়, তাদের বৎসরে ৪০ থেকে ৬০ ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় হয়। এক মাসে দাঁড়ি আধ ইঞ্চি বাড়ে। এবং ছয় ইঞ্চি বাড়তে দাড়ির প্রায় এক বৎসর সময় লাগে।

লক্ষ্য করে দেখবে—যে সূর্যমুখী ফুলের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এর কোন পেশী না থাকায় সূর্য যেদিকেই থাক না কেন, ফুলটি সর্বদা সেই দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। সূর্যমুখী ফুলের কাণ্ডের ছায়া বৃত্ত অংশের কোষগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং কাণ্ডে একটি বক্রতার সৃষ্টি করে। এর ফলে সূর্যমুখী ফুলের দিক পরিবর্তন করা হয় না। সূর্যের দিকে মুখ করে থাকার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'হিলিওট্রপিজম'।

হরতনের ডাক

(ডিটেকটিভ গল্প)

শ্রীনির্মল সরকার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ট্রেনের বাইরে চলমান দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সে কেসটার কথা চিন্তা করছিল। হরতনের দল যে বেশ বড় আর শক্তিশালী তা ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে অরিন্দম। ট্রাঙ্কের মধ্যে একটা মুণ্ডুবিহীন লাস ট্রেনে তুলে দেওয়ার কারণটা সে মনে মনে ভাবছিল। ট্রেনে অন্য আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না। নিরাপদেই ট্রেন এসে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌছল। এলাহাবাদে নেমে অরিন্দম একটা ছোট হোটেল বেছে নিল। হোটেলটা ছোট হোলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সামান্য কিছু খেয়েই নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সে। তারপর স্যুটকেসটা খুলে ছেঁড়া ময়লা একটা পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরে, মুখে দাড়ি আর গোঁফ লাগিয়ে একেবারে ভোল পালটিয়ে ফেলল অরিন্দম। সেই সঙ্গে পাঞ্জাবীর তলায় বেঁধে নিল তার অটোমেটিক রিভলভারটা। প্রথমেই তাকে বলবন্ত তেওয়ারীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। বলবন্ত তেওয়ারী এলাহাবাদের পুলিশ সুপার। থানায় না গিয়ে অরিন্দম তেওয়ারীজীর কোয়ার্টারেই গেল সোজা। বলবন্ত তেওয়ারী তখন চা খাচ্ছিলেন, তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, এই, তুম কৌন হ্যায়,—কেয়া কাম হ্যায় হিঁয়া ?

অরিন্দম বলল, নমস্তে তেওয়ারীজী, এরই মধ্যে ভুলে গেলে আমায়? আমি অরিন্দম মুখার্জী, কোলকাতা থেকে আসছি।

লাফিয়ে উঠলেন তেওয়ারীজী, আরে অরিন্দম তুমি। বিলকুল তোমার সুরত পাল্টে ফেলেছ। অরিন্দমকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করলেন তিনি। কোলকাতায় গত বছরের কেসটায় অরিন্দম সাহায্য না করলে তিনি শুধু বিফল মনোরথ হতেন না, চাকরী নিয়েও টানাটানি পড়ত। তেওয়ারীজী অরিন্দমকে খুবই স্নেহ করেন। শিষ্টাচার জানাবার পর তেওয়ারীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একলা কেন? তোমার এ্যাসিষ্টেণ্ট কোথায়? বাগমারীতে একটা জুয়াড়ী দল তাকে ঘায়েল করেছে, সন্তোষ এখন হাসপাতালে, উত্তর দিল অরিন্দম। তবে খবর পেলে ঠিক ছুটে আসবে। হাসলেন তেওয়ারীজী, তারপর বললেন, কোন্ কেসে এসেছ ?

ট্রাঙ্কে একটা লাস পেয়ে তার সন্ধানে এসেছি। কথাটা শুনে একটু ভেবে তেওয়ারীজী বললেন, কই ও ধরণের ঘটনা তো এখানে ঘটেনি। কোন সন্ধান পেয়েছ ?

উত্তরে হরতনের তাস আর ছোট চিঠিটা এগিয়ে দিল অরিন্দম। সেগুলো দেখেই তেওয়ারীজী যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন, মুখ পাংশু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তার ছুঁচালো কাইজারী গোঁফটা ঝুলে পড়ল। অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, এ তুমি কোথায় পেলে ?

তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে অরিন্দম আশ্চর্য হয়ে বললে, তেওয়ারীজী, আপনি যেন ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

তুমি জান না অরিন্দম 'হরতন' কি জিনিস! সারা ইউ. পি. আজ অস্থির হয়ে উঠেছে ওদের ভয়ে। ভারতের এমন কোন প্রদেশ নেই যেখানে ওদের সন্ত্রাসের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়তে বাকী আছে। আমি তোমার মঙ্গল চাই অরিন্দম, তাই তোমাকে এ রাস্তায় আসতে মানা করব। তেওয়ারীজীর কথাগুলো শুনে হাসল অরিন্দম; তারপর বলল, আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ তেওয়ারীজী, কিন্তু আপনি তো আমায় চেনেন। যখন শক্তি-পরীক্ষায় নেমেছি, তখন হয় এসপার নয় ওসপার। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বলবন্ত তেওয়ারী, তারপর গোঁফের দু'পাশটা একটু চুমরে নিয়ে বললেন, ভাল কথা, তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। যখন একবার ঠিক করেছ তখন আর টলায় কে! বুড়ো বয়সে আমিও একবার তোমার সঙ্গে হরতনের বিরুদ্ধে লড়ে দেখি।

অরিন্দমকে অনেক উপদেশ দিয়ে তেওয়ারীজী সাহায্য করার চেষ্টা করলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে অরিন্দম এগিয়ে চলল চকের দিকে। বাজার আর দোকানের লোকের ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল অরিন্দম উদ্দেশ্যহীনভাবে। তারপর চক থেকে যে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে গিয়েছে, সেইটা ধরে এগিয়ে গেল সে। কিছুদূর গিয়ে অরিন্দম কয়েকটা চায়ের দোকান দেখতে পেল। একটাতে ঢুকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সে চারিদিক দেখতে লাগল। ঠিক রাস্তার পাশেই একটা কফিখানা রয়েছে, সেখানেও বেশ ভিড়। তার সামনে একটা বুড়ো ভিখিরী বসে আছে। লোকটাকে দেখে একটু অবাক লাগল অরিন্দমের। লোকটা যদিও সর্বাঙ্গে ছেঁড়া কাপড় ঢাকা দিয়ে বসে আছে, তবুও তাকে সাধারণ ভিখিরী বলে মনে হ'ল না তার। আশপাশ দিয়ে বহু লোক যাতায়াত করছে, হয়ত কেউ সামনে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু পয়সা চাইতে তাকে দেখতে পেল না অরিন্দম। সে যেন ইঙ্গিতে লোকদের কি বলছে আর তারা চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে। চা শেষ করে উঠে পড়ল অরিন্দম। তারপর সোজা গিয়ে সে ভিখিরীর সামনে পাতা কাপড়টার ওপর একটা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দিলে। সেটা টপ্ করে তুলে নিয়ে বুড়ো বললে, সুতা না সীসা? অরিন্দম বুঝল বুড়ো তাকে জিজ্ঞেস করছে, তার গাঁজার বিড়ি চাই না মদ চাই। উত্তরে সে মাথা নাড়ল; তারপর পকেট থেকে হরতনের তাসটা বার করে তাকে দেখাল। লোকটা অবাক হয়ে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত; তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, "কালা কুর্তা, লাল মকান, বকরী আদমী সব সমান।" কথাটা বলেই মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল সে। অরিন্দম আর একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বলল, কাঁহা?

অন্যদিকে তাকিয়ে সে অস্ফুট স্বরে বলল, নৈনী।

অরিন্দম হাঁটতে স্থুরু করল হোটেলের দিকে। তার মাথার ভেতর পাক খেতে লাগল বুড়ো ভিখিরীর কথাগুলো : "কালা কুর্তা, লাল মকান, বকরী আদমী সব সমান।" হেঁয়ালীতে নিশ্চয় কিছু নির্দেশ আছে, সেটা তাকে বার করতে হবে যেমন করে হোক। নৈনী জায়গাটা সে জানে, এলাহাবাদের কাছেই ছোট একটা ষ্টেশন। হোটেলে ফিরে সে আর দেরি করল না। কিছু খেয়ে সোজা বেরিয়ে গেল ষ্টেশনের দিকে। টিকিট কিনে ট্রেনে বসে হঠাৎ তার মনে হ'ল, এখানে একলা আসা তার ঠিক হয়নি; অন্ততঃ তেওয়ারীজীকে জানিয়ে আসা তার উচিত ছিল। কিন্তু ফিরে যাবার আর উপায় ছিল না, কারণ ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে।

নৈনীতে নেমে সে একটা এক্কা ভাড়া করে কোচমানকে বলল, লাল মকান চল। সে তার দিকে কয়েকবার তাকাল; তারপর বড় রাস্তা থেকে ছোট গলি দিয়ে একটা মেঠো রাস্তায় নেমে পড়ল। কিছু দূর যাবার পরই একটা নির্জন ও ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে এক্কাটা চলতে স্থুরু করল। ধুধু করছে ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের ঝোপ আর বড় বড় নানা জাতের গাছ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ চোখে পড়ল অরিন্দমের। এতবড় গাছ সে আগে কখনও দেখেনি। এক্কাটা এই গাছের কিছু দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোচমান বললে, আর সে যেতে পারবে না।

—কেন কি হলো? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

—ওখানে গেলে কেউ ফেরে না বাবু, ওটা ভূতের বাড়ী। অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল সে।

অরিন্দম তাকে অনেক বোঝাল, বকশিশ কবুল করল, তবুও সে রাজী হ'ল না কোন মতে। অগত্যা তাকে সেখানে দাঁড়াতে বলে অরিন্দম এগিয়ে গেল নিজেই। প্রকাণ্ড লাল রং-এর বাড়ী, তার চারিদিক আগাছা আর জঙ্গলে ভরে আছে। দরজা জানলা বেশীর ভাগই ভাঙা। কেবল সদর দরজাটা মোটা কাঠের বলেই কোন রকমে বন্ধ রয়েছে। অরিন্দম লক্ষ্য করল দরজাটা বহুকাল ধরে বন্ধ রয়েছে, কারণ তার সামনেটা আগাছা, লতা-পাতা আর ঘন মাকড়সার জালে ঢাকা। কব্জাগুলো জং ধরে লোহার পাতের আকার ধারণ করেছে। বাড়ীর চারিধারে এক চক্কর ঘুরে সব দেখে নিল অরিন্দম, কিন্তু তার চোখে অস্বাভাবিক কিছু পড়ল না। পোড়ো-বাড়ী ভগ্ন অবস্থায় যেমন হয় তেমনিই, অন্য কিছু নয়। সূর্য ডুবে আসছে, স্থুতরাং আর দেরি না করে অরিন্দম ফিরতি-পথে চলতে স্থুরু করল। কিছুদূর এগিয়ে লক্ষ্য করে দেখল, বড় তেঁতুলগাছটার কাছে যে জায়গায় এক্কাটা ছিল সেটা অদৃশ্য হয়েছে। এবার বিপদে পড়ল অরিন্দম। বুঝতে পারল, ভয় পেয়ে এক্কাওয়ালা পালিয়েছে। এতখানি রাস্তা তাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে ভেবে চিন্তিত

হ'ল সে। কিন্তু উপায় নেই, তাই হাঁটতে সুরু করল সে পা চালিয়ে। মাঠ পেরিয়ে যখন সে লোকালয়ে এসে পৌঁছল তখন প্রায় রাত্রি। এক মনে হেঁটে চলেছে অরিন্দম। হঠাৎ তার মনে হ'ল কে যেন কোথায় কাঁদছে। স্ত্রীকণ্ঠে কান্নার শব্দটা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। শব্দটা আসছে একটা বাড়ী থেকে। সেটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল অরিন্দম। বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে কয়েক মুহূর্ত শুনল। হ্যাঁ, কান্নার আওয়াজটা এবারে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। দরজার কড়াটা নাড়বার জন্যে অরিন্দম হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর পিছন থেকে একটা মোটা কাপড় ফেলে কে যেন সজোরে পিছন দিকে টান মারলে। ধস্তাধস্তি করল বটে, কিন্তু অরিন্দম সহজেই কাবু হয়ে পড়ল। মুখে কাপড় চাপা দেওয়াতে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। সেটা অবশ্য সে কাটিয়ে উঠতে পারল, কারণ দম বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ থাকার মত অভ্যাস তার আছে। কিন্তু পিছন দিকে তার হাত আর পা দুটো বেঁধে যখন তাকে শূন্যে তুলে ফেলল কয়েকজন, তখন সে নিজেকে অসহায় মনে করল। অরিন্দম আন্দাজ করল অন্ততঃ পাঁচজন লোক আছে। দেহটাকে শিথিল করে দিল সে, তাতে আর কিছু না হোক অযথা মারের হাত থেকে বাঁচল।

অরিন্দমকে সেই অবস্থায় একটা টাঙ্গার ওপর চড়িয়ে সকলে মিলে নিয়ে চলল নিঃশব্দে। অরিন্দম কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল, কিন্তু স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজটা কিছুই শোনা গেল না আর। সে বুঝতে পারল, তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই এই আয়োজনটা করা হয়েছিল। টাঙ্গাটা অসমতল জমির ওপর দিয়ে চলেছে লাফাতে-লাফাতে। শুধু তাই নয়, হাওয়াটাও যেন এখানে অকস্মাৎ আরও ঠাণ্ডা হয়ে এল। আশপাশ থেকে গাছের পাতার আওয়াজে সে বুঝল যে তাকে সেই লাল পোড়ো বাড়ীতেই আবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিজের বোকামির জন্যে অরিন্দম নিজের ওপর বিরক্ত হ'ল।

বলবন্ত তেওয়ারীকে তার এই অভিযানের খবরটা দিয়ে আসা উচিত ছিল, তাহলে আর যাই হোক, তাকে এভাবে ফাঁদে পড়তে হ'ত না। সেই সঙ্গে তার সহকারী সন্তোষের কথাও মনে পড়ল অরিন্দমের। সেও যদি থাকত এই সময়ে তাহলে দু'জনে মিলে লোকগুলোর সঙ্গে যুঝতে পারত অনায়াসে। সন্তোষ তার যোগ্য সহকারী। কিন্তু এখন ওসব আকাশ-কুসুম ভেবে কোন লাভ নেই। যেটুকু সম্ভব সেটুকু তাকে একলাই চেষ্টা করতে হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল সে, আর কি উপায়ে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে তারই চিন্তা করতে লাগল মনে মনে।

কিছুক্ষণ পরেই টাঙ্গাটা দাঁড়াল। অরিন্দমকে সকলে মিলে তুলে, লাল বাড়ীর সামনে এনে একজন খুব জোরে শেয়ালের অনুকরণে ডেকে উঠল। দোতলার জানলার

'লোকটা অরিন্দমের মুখে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারল।'

কাছে একটা আলো দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ একটা জানলা খুলে গেল আর সেখান থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে এল। তারপর সকলে অরিন্দমকে নিয়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। একজন বললে, লতিফ, ওর মুখের ঢাকাটা এবার খুলে দে। অরিন্দম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘরের চতুর্দিকটা একবার দেখে নিল সে। মাঝারি ধরণের পাথরের তৈরী ঘর। দরজা বা জানলা বলতে ওই একটি। সেটা বন্ধ করে দিলে বেরুবার আর কোন পথ নেই।

—কি রে, কি দেখছিস্? পালাতে পারবি কিনা ভাবছিস্?

লোকটার দিকে তাকাল অরিন্দম। হোঁৎকা যমদূতের মত চেহারা, পরনে একটা পায়জামা আর কাল রং-এর ফতুয়া। হঠাৎ বুড়ো ভিখিরীর কথাটা মনে পড়ে গেল অরিন্দমের, "কালা কুর্তা, লাল মকান, বকরী আদমী সব সমান।" এই তাহলে কালা কুর্তা! কিন্তু পরের কথাগুলোর মানে কি!

—কিরে কি ভাবছিস? অরিন্দমের পাঁজরে সজোরে লাথি মারল লোকটা। পাশ ফিরে পড়ে গেল অরিন্দম। তোকেও জবাই করব সুন্দররামের মত আমাদের পেছনে লাগলে কি হয় দেখেছিস্। সুন্দররামকে জানিস? সে আমাদেরই লোক, তেওয়ারীর কাছে আমাদের খবর দিতে গিয়ে কি হাল হ'ল দেখেছিস। কলকাতিয়া বাবু তোর এ শখ হ'ল কেন? তোর সব খবর আমরা জানি। তুইও কিছু করতে পারবি না, তোর পুলিস বাবাও কিছু করতে পারবে না!

কথা শেষ করে লোকটা অরিন্দমের মুখে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারল। এক মুহূর্তের জন্যে অরিন্দম জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তার নাক আর মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে বুঝতে পারল সে।

—কেন ওস্তাদ, খামকা দেরি করছ, হুকুম দাও, সাবড়ে দি। লতিফ একটা প্রকাণ্ড ছোরা বার করল।

—না, এখানে নয়। যমদূতের মত লোকটা উত্তর দিল। তারপর একটা ইঙ্গিত করতে একজন তার মাথাটা চেপে ধরল আর অন্য একজন তার মুখে নাকে একটা ভিজে রুমালের মত জিনিস চেপে ধরে রইল। অরিন্দম সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে ওরা তাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে রাখতে চায়। তাই তীব্র গন্ধটা নাকে যেতেই সে দম বন্ধ করে রাখল। বেশ কয়েক মিনিট পরে অরিন্দম দেহটা একেবারে ঢিলে করে এলিয়ে দিল। সকলেই বুঝল যে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। তাকে সেই অবস্থায় রেখে তারা নিজেদের মধ্যে নানা রকমের আলোচনা করতে লাগল। অরিন্দমের অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করাটা একেবারে স্বাভাবিক বলে মনে হ'ল ওদের কাছে।

এই আলোচনা থেকে অরিন্দম কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারল। ওদের দলপতি হরতন যে কে, তা ওরাও জানে না। তাকে কেউ দেখতে পায় না। যখন ওদের সভা বসে, তখন একটা গলার স্বরই ওরা শুনতে পায় আর সে যা নির্দেশ দেয় প্রত্যেকে সেটা মেনে চলে নির্বিবাদে। দলটার কাজ হ'ল সোনা 'স্মাগ্‌ল' করা। নানা দেশ থেকে সস্তা দরে সোনা নিয়ে এসে ওরা এখানে বেশী দরে বিক্রী করে। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি ওরা ওই ভাবেই দেয়। মুণ্ডটা কেটে নিয়ে দেহটা ট্রাঙ্কে করে চালান দিয়ে দেয় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়।

কিছুক্ষণ পরে লোকগুলো সিঁড়ি লাগিয়ে নীচে নেমে গেল। অরিন্দম এতক্ষণ অসাড় হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। এবার ও চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই, সামনের দরজাটা বন্ধ। ঘরটা কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ভ্যাপসা গন্ধে ভরে গেল। ঘরের মেঝেতে একটা ইঁটের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে মিটমিট করে. অরিন্দমকে ওরা চিত করে শুইয়ে রেখেছিল। হাত দুটো বাঁধা অবস্থায় রাখার জন্যে প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। মুখ আর নাক দিয়ে ক্ষীণ ধারায় রক্ত বার হচ্ছে তখনও। আর দেরি করল না অরিন্দম। সোজা হয়ে বসল সে, তারপর বাঁধা হাত দুটো একসঙ্গে মাথার ওপর দিয়ে সামনে নিয়ে এল। দাঁড়াবার উপায় ছিল না তাই বসেই এগুতে আরম্ভ করল সে। তার লক্ষ্য মোমবাতিটা। সেটা নিবে যাবার আগেই তাকে সেখানে পৌঁছতে হবে। আলোর শিখাটা কয়েকবার দপ্‌ দপ্‌ করে উঠল। ঘষেত ঘষতে আরও জোরে এগিয়ে গেল অরিন্দম। যাক শেষ পর্যন্ত বাতিটার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারল সে। দড়ি-বাঁধা হাত দুটো সে তুলে ধরল আলোর শিখার ওপর কিন্তু সেটা ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল একটু একটু করে। অরিন্দম মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল আর কিছুক্ষণের জন্যে যেন সেটা জ্বলে। দড়ির একটা অংশ পুড়ে যাবার পরই বাতিটা নিবে গেল। অরিন্দম ধস্তাধস্তি শুরু করল দড়িটা খোলার জন্যে। প্রচণ্ড জোরে ওর হাতটা বাঁধা ছিল। অনেকক্ষণ

পরে সে কৃতকার্য হ'ল—হাতের বাঁধনটা এতক্ষণে সে খুলতে সক্ষম হয়েছে। তারপর হাত দিয়ে পায়ের বাঁধনটা খুলতে তার দেরি হ'ল না। আড়ষ্ট দেহটা সে একটু একটু করে সোজা করে নিল। এতে সে দারুণ ব্যাথা পেল বটে, কিন্তু মুক্তির আনন্দের কাছে সেটা কিছু নয়। কোমরে হাত দিয়ে অরিন্দম দেখল তার অটোমেটিক রিভলভারটা অদৃশ্য হয়েছে। একেবারে নিরস্ত্র সে। কিন্তু তাতে দমল না অরিন্দম। পকেটে হাত দিয়ে দেখল শুধু সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা পড়ে রয়েছে। একটা সিগারেট ধরাল সে। সারাদিনই প্রায় অভুক্ত রয়েছে অরিন্দম, তার ওপর শরীরে এই অত্যাচার। খিদে পেয়েছে তার, কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তার এখন একটু জলের ; তৃষ্ণায় তার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে কড় কড় করে আওয়াজ হ'ল, চকিতে দাঁড়িয়ে উঠল অরিন্দম। তারপর দেশলাই-এর একটা কাঠি জ্বেলে দেখল আততায়ী মানুষ নয়, কতকগুলো ধেড়ে ইঁদুর। মনে মনে হাসল অরিন্দম। তারপর নিশ্চিন্ত মনে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। ক্রমে ক্রমে তার একটু তন্দ্রাভাব এলো। অরিন্দমের কিন্তু ঘুম খুব পাতলা, ঘুমের মধ্যেও তার ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল তার। মনে হ'ল নীচে কয়েকজন লোক সন্তর্পণে চলা-ফেরা করছে। অরিন্দমের কাছে হাতিয়ার কিছুই নেই, তবুও এই তার শেষ সুযোগ। এটা যদি সে কাজে লাগাতে না পারে, তা'হলে সুন্দররামের মত ট্রাঙ্কের মধ্যে তার মুণ্ডুহীন লাসটাও চালান হয়ে যেতে দেরি হবে না।

নিজের জামাটা খুলে সে আগে যেখানে শুয়েছিল সেইখানে বিছিয়ে রাখল। অন্ধকারে দেখলেই মনে হবে সে যথাস্থানেই রয়েছে, দড়ির একটা টুকরো সে নিজের কোমরে জড়িয়ে, দেশলাইটা ভেঙে চ্যাপটা করে নিল। এইটাই তার অস্ত্র। শক্ত মুঠোর মধ্যে সেটা জোর করে ধরে সে জানলার পাশে অপেক্ষা করতে লাগল দূরে থেকে মুরগীর ডাক শুনে সে অনুমান করল সকাল হতে আর দেরি নেই। এবার সিঁড়িটা দেয়ালে লাগানোর আওয়াজটা কানে এল তার। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। প্রথম চোটেই শত্রুকে কাবু করে ফেলতে হবে। একটু পরেই জানলাটা নিঃশব্দে খুলে একটা লোক ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম তাকে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল। লোকটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে গেল। এবার জানলার মুখে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে। সে যেই উৎকর্ণ হয়ে গলা বাড়িয়েছে, অরিন্দম অমনি তার কোমর থেকে দড়িটা নিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে টেনে আনল। লোকটা শক্তিমান, বেশ কিছুক্ষণ সে লড়াই করল অরিন্দমের সঙ্গে।

অরিন্দম আর উপায় না দেখে যুযুৎসুর প্যাঁচে ফেলল লোকটাকে। একটা আওয়াজ হ'ল এবং লোকটার বাহুর হাড় সম্ভবত ভেঙে গেল সেই সঙ্গে। আবার একজন। এ লোকটা সব জেনে সাবধানে এসে প্রথমেই বুঝে নিল যে, অরিন্দম তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অপর দু'জনের অবস্থার কথা সে ইতিমধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে। তার পিছনে আরও দু'জন পর পর এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। প্রমাদ গুণল অরিন্দম। একসঙ্গে তিনজনের সঙ্গে লড়াই করা এরকম অবস্থায় প্রায় অসম্ভব, কিন্তু অরিন্দম তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। যে কোন প্রকারে তাকে বাঁচতে হবে। প্রথম লোকটা নামতেই তার পেটে সজোরে লাথি মারল সে—তাতেই কাজ হ'ল। লোকটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল, কিন্তু এরপর দু'জন এসে তাকে আক্রমণ করল একসঙ্গে। দু'জনেরই হাতে দুটো চকচকে ছুরি।

অরিন্দমের গলার ওপরে একজন ছুরি তুলেছে এমন সময় পুলিসের হুইসিল শোনা গেল—তার সঙ্গে রিভলভার ছোড়ার আওয়াজ। অরিন্দমকে ছেড়ে তারা পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় ধরা পড়ে গেল। একটু পরেই তেওয়ারীজী ও সিপাইরা ওপরে উঠে এল। আহত লোক দুটোকে তারা গ্রেপ্তার করে নিল সঙ্গে সঙ্গে। তেওয়ারীজী এসে অরিন্দমকে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন, তারপর বললেন, তুমি এখানে এলে কি করে?

অরিন্দম সব ঘটনা তাকে জানালে তেওয়ারীজী জিজ্ঞেস করলেন, বুড়ো ভিখিরীটা কি বলেছিল যেন? 'কালা কুর্তা, লাল মকান, বকরী আদমী সব সমান।' একটু চিন্তা করেই তেওয়ারীজী চেঁচিয়ে উঠলেন, এবার চল অরিন্দম, বড় দেরি হয়ে গেছে। দলের পাণ্ডাকে এখনও ধরতে বাকী আছে। জীপে উঠতেই অরিন্দম দেখল সন্তোষ বসে রয়েছে। তার মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে, বলল তুমি এখানে?

উত্তরে হাসল সন্তোষ। তারপর বলল, পরেশ আমাকে হাসপাতালে গিয়ে খবর দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে সেদিনই আমার ছুটি পাবার কথা, সুতরাং দেরি না করে একেবারে তেওয়ারীজীর কাছে এসে হাজির হয়েছি। তেওয়ারীজী হেসে বললেন, সন্তোষ আসার একটু পরেই এক্কাওয়ালাটা এসে তোমার 'লাল মকানে' যাবার খবর দিলে। তখন রাত্রি হয়ে গেছে, তোড়জোড় করে বেরুতে যেটুকু দেরি হ'ল।

জীপটা মাঠ পেরিয়ে হুহু করে ছুটে চলল। পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। নৈনীর লোকালয় পেরিয়ে একটা বস্তীর কাছে এসে জীপটা দাঁড়াতেই তেওয়ারীজী সিপাইদের কয়েকটা আদেশ দিয়ে অরিন্দমের হাতে একটা রিভলভার দিয়ে বললেন, চল

আর দেরি নয়। বস্তির অপরিষ্কার গলি দিয়ে সকলে দ্রুত এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পরেই একটা জায়গায় এসে তেওয়ারীজী তাদের ইশারা করে নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। গলির বাঁকটা পেরুতেই সামনে একটা কসাইখানা নজরে পড়ল সকলের। কাটা মাংস ঝোলানো রয়েছে, আর তার পিছনে বসে রয়েছে সেই কাল কুর্তা পরা যমদূতের মত লোকটা—একটা প্রকাণ্ড ছোরা নিয়ে মাংস কাটছে সে। সিপাইরা তখন আশপাশ থেকে গোটা জায়গাটাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। পাশ ফিরতেই লোকটা তেওয়ারীজীকে দেখতে পেয়ে হাতের প্রকাণ্ড ছোরাটা তাঁকে লক্ষ্য করে ছুড়তে যাবার মুখেই অরিন্দমের রিভলভার গর্জে উঠল। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। লোকটার কব্জিতে গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটা ছিটকে পড়ল অদূরে। তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর তেওয়ারীজী অরিন্দমকে ভেতরে ডাকলেন। একটা খোঁয়াড়ের মত ছোট ঘর, সেখানে কয়েকটা পাঠা বাধা রয়েছে। পাশেই একটা লোককে মুখে কাপড় আব হাতে-পায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ফেলা আছে। লোকটার বাঁধন খুলে দিতে সে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। এটা সেই বুড়ো ভিখিরীটা। কাঁচা মাটির মেঝের ওপর দিয়ে ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়িয়ে চলেছে। সেদিকে লক্ষ্য করে তেওয়ারীজী বললেন, ব্যাপারটা বুঝেছ অরিন্দম। কসাইখানাতে পাঁঠার সঙ্গে মানুষকেও হত্যা করে এরা। অনেক সুবিধে, রক্ত দেখে কেউ সন্দেহ করবে না। তারপর সময়মত মুণ্ডুটা এক জায়গায় আর ধড়টা ট্রাঙ্কে করে অন্য জায়গায় চালান করে দেয় স্বচ্ছন্দে। সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

তেওয়ারীজী ফিরতি পথে অরিন্দমকে বললেন, এবার বুড়ো ভিখিরীটার কথাগুলো মিলিয়ে দেখ, ঠিক মিলে যাবে। 'কালা কুর্তা, লাল মকান, বকরী আদমী সব সমান।' কিন্তু আসল লোক কোথায়—হরতন? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

ব্যস্ত হয়ো না চেষ্টা কর, হয়ত দেখা পেত পার; কথাটা বলে বলবন্ত তেওয়ারী হাসলেন একটু।

আগামী নতুন বছর থেকে

সুসাহিত্যিক শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

পাপিয়া কোম্বেলী

ধারাবাহিকভাবে মৌচাকে প্রাকাশিত হবে
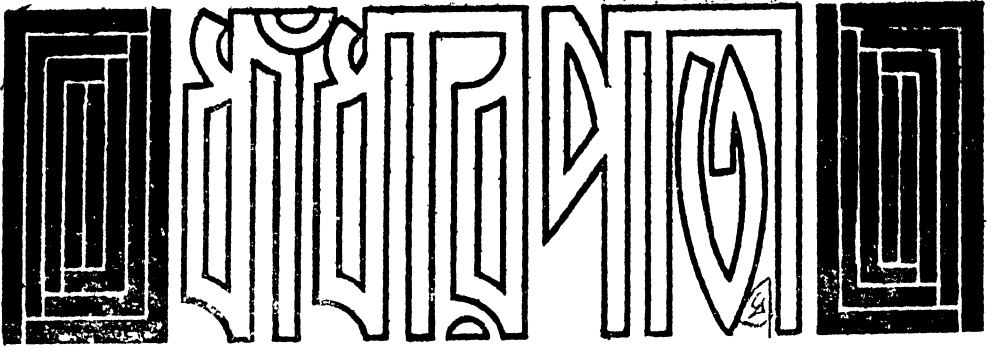
ব্যাকরণের ধাঁধা

শ্রীবিনয় বাগচী

সঙ্গতি (ছন্দ ও অর্থ) বজায় রেখে প্রতি পংক্তির শূন্য স্থান দু'টি এমন শব্দ দিয়ে পূরণ করতে হবে যাতে প্রথমটি শেষটির বিপরীত লিঙ্গ হয়।

—থাকেন বনে নেইকো— —বটে তাঁরা আর—।
—ও ভৃত্য আছে নেই তো—। —চড়ে এল কেবা সাথে এক—,
—এসেছেন সাথে তাঁর—, —সে যে সাধকের, আসেনি তো—।
—এলেন সেথা সাথেতে—, —সব দেখে তাহা আর যত—,
—এলেন এক এলেন—, —হন কেউ কেউ, কেউ হন—।
—নহেন কেউ, নহেন—। —ছিল সাধকের আর ছিল—,
—নহেন কেউ, নহেন—, —একটা নিল অপরটা—।

নীচে দুই পংক্তি নমুনা দেখান হলো, এবার তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না নিশ্চয়।

বাঘ ছিল সেই বনে সাথেতে বাঘিনী,
নাগ ও রয়েছে কাছে অদূরে নাগিনী।

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। একেবারে নীচের ডান-কোণে আয়ত ক্ষেত্র, বাঁ-কোণে বৃত্ত এবং দুয়ের মাঝামাঝি উপরে হবে ত্রিভুজ।

২। ছোট ছেলেমেয়ে পাঁচটি, বড় মানুষ ১৬টি, গাধা একটি, কুকুর দুটি, পুতুল একটি, দোলনা একটি, মই একটি, পিপে একটি, সাইকেল একটি, নানারূপ বাদ্যযন্ত্র, গাছ একটি এবং তার উপর বিড়াল একটি।

'কোন দুটি এক রকমের' উত্তর : এক আর পাঁচ এক রকমের।

বারোটি মাসকে প্রদক্ষিণ করে আবার একটি বছর শেষ হয়ে এলো। হিসাব মিলাতে গেলে দেখা যাবে—ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণই ছিল এ বছরটিতে অনেক। দেওয়া হলো অনেক, পেলাম কি? সঞ্চয়ের ঝুলিটি তো প্রায় শূন্যগর্ভ। অস্বাচ্ছন্দ, অস্বস্তি আর অসহিষ্ণুতাই আমাদের চারিপাশে ঘিরে ধরেছে। উচ্ছৃঙ্খলতারও শেষ নেই। বিদ্যায়তনগুলিকে নিয়ে, পরীক্ষাগুলি নিয়ে যা ঘটনা ঘটে চলেছে, এর শেষ কবে তাও বুদ্ধিশক্তির বাইরে চলে গেছে যেন। পরীক্ষা বন্ধ করুন—এ শব্দ একবার ধ্বনিত হলে তাকে কার্যকরী করবার জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা অসৌজন্য ও অগৌরবের পরিচয়। কিন্তু বর্তমান ছাত্র যারা, তারা কতটুকু এ-কথা ভাবছে। যুগধর্মের পরিবর্তন ঘটবে বা ঘটছে,—কিন্তু তাতে কি ইসারা থাকবে,—সৌজন্য শালীনতায় ও সকলের প্রতি সুব্যবহারের কিংবা সবটাই অসৌজন্যেই পরিপূর্ণ—মনের গতি একবার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হলে তাকে সংযত, সুপথে চালিত করতে বহু বিঘ্ন হয়। সেই কারণেই ছাত্রাবস্থার সময়টি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। তরুণরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—তাই যখন প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্র খুলে বিদ্যায়তনগুলির, শিক্ষকদের প্রতি, পাঠাভ্যাসের প্রতি অসৌজন্য ও ধৃষ্টতার ঘটনা দেখতে পাই—তখন লজ্জা ও দুঃখের অন্ত থাকে না।

চিঠির উত্তর

অনেকদিন পরে চিঠির উত্তর দিচ্ছি—মধুমিতা, নবনীতা ও অরুণীতা মজুমদার, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কোলকাতা—লিখেছ সবচেয়ে ভালো কি? তার মানে কি? কোন বিষয়ের ভালোর কথা বলছো? পড়াশুনা, খেলাধুলো, দেশ বেড়ানো এইসবের একটা কিছুর কথা জানতে চেয়েছ তো? না কি পরিষ্কার করে লিখবে—কিছু যদি বুঝতে না পারি তাহলে বলবো—সবচেয়ে ভালো পাউরুটি আর ঝোলাগুড়। অরণ্যকমল ও অর্নকী, উত্তর প্রদেশ লিখেছ—নাম দু'টি একেবারে নতুন। বেশ চমৎকার লাগছে। ওখানকার সব খবর দিয়ে ভালো করে চিঠি লিখলে তোমাদের বন্ধুদের পড়তে উপহার দিতেও পারি। লিখো কেমন? রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় বি. টি. রোড, কোলকাতা—এগার বছর স্কুলে পড়ে পরীক্ষা দিতে ভয়? এমন কথা বলতেও নেই, শুনতেও নেই, খুব ভালো পরীক্ষা হওয়া চাই-ই।

শুভেচ্ছাসহ তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

মূল্য : ০'৫০ পয়সা

মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি

এই সংখ্যার সঙ্গে মৌচাকের ৪৮শ বর্ষ শেষ হয়ে গেল। আগামী বৈশাখ (১৩৭৫) থেকে মৌচাকের নতুন বছর আরম্ভ হবে। মৌচাক ৪৯শ বর্ষে পদার্পণ করবে।

এই চৈত্র-সংখ্যার সঙ্গে যে সব গ্রাহক-গ্রাহিকার এক বছরের বা ছ'মাসের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হয়ে যাবে, তাদের আমরা নতুন বছরের চাঁদা যথাসম্ভব শীঘ্র মণিঅর্ডার যোগে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

যারা মণিঅর্ডার করে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাবে না, অথবা গ্রাহক-গ্রাহিকা না থাকার অভিপ্রায়ও জানাবে না চিঠি দিয়ে, তাদের বৈশাখ-সংখ্যা আমরা ভিঃ পিঃ করে পাঠাব। কিন্তু এই ভিঃ পিঃ-তে কাগজ নিতে হলে কিছু বেশী পড়বে। আশা করি তোমরা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

বর্তমান বৎসরে ডাকখরচ নানাভাবে বৃদ্ধি পেলেও আমরা মৌচাকের বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক মূল্য যা ছিল তাই রেখে দিলাম। আশা করি এজন্য আমরা আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অধিকতর সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হব না।

Statement about ownership and other particulars about newspaper ("Mauchak") to be published in the first issue every year after the last day of February.

1. Place of Publication : 14, Bankim Chatterjee St, Cal-12
2. Periodicity of its Publication : Monthly.
3. Printer's Name, Nationality & Address ; Sudhir Chandra Sarkar (Indian): 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12
4. Publisher's name, Nationality & Address : Sudhir Chandra Sarkar (Indian) : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12
5. Editor's Name, Nationality & Address : Sudhir Chandra Sarkar (Indian) : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12.
6. Names and addresses of the individuals who own the Newspaper and Partners or Share-holders holding more than one per cent of the total capital : (a) Sri Sudhir Chandra Sarkar : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12. (b) Sri Supriya Sarkar : 171/A, Lansdowne Road, Calcutta-26.

I, Sudhir Chandra Sarkar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Calcutta,
11th January, 1968.

Sd./ Sudhir Chandra Sarkar
Signature of Publisher.
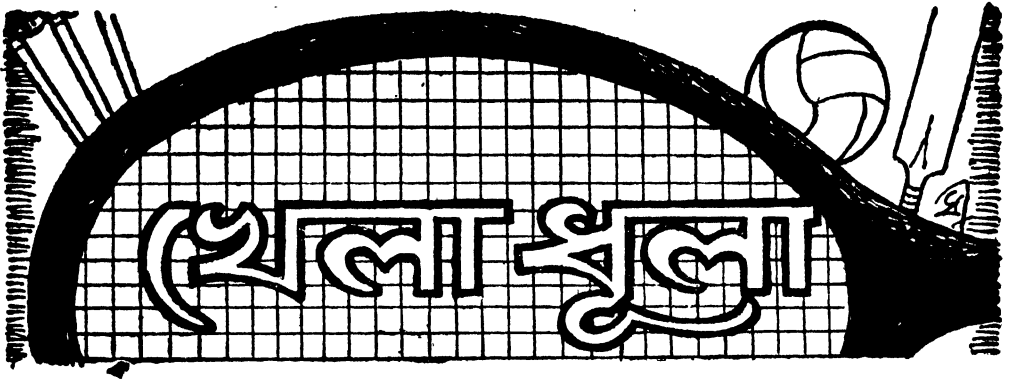
মেঠুড়ে

টেবল টেনিস

টেবল টেনিস খেলায় জাপানী খেলোয়াড়রা বিশেষ দক্ষ। গত স্টকহলমের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় তাঁরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। ইটো, নিশি, মায়েদ, তাসাকা—জাপানের যে চারজন খেলোয়াড় সম্প্রতি ভারত সফর করেছেন, এঁদের কেউই বিশ্ব ক্রমপর্যায়ের খেলোয়াড় নন। কিন্তু জাপানের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে এঁদের কাছে বিশ্ববিজয়ীরাও হার স্বীকার করেছেন।

ভারত ও জাপানের টেবল টেনিস টেস্টে জাপান পর পর তিনটে টেস্টে জয়ী হয়ে 'রাবার' পেয়েছে। বোম্বাই, বাঙ্গালোর ও কলকাতা তিন জায়গার তিনটে টেস্টই মীমাংসিত হয়েছে একই ফলাফলে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা টেস্টেই জাপান ৫—০ খেলায় ভারতকে পরাজিত করেছে।

ন-টা সিঙ্গলসের খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হবার ব্যবস্থা থাকলেও কোনো টেস্টে পাঁচটার বেশী খেলার দরকার হয়নি। কারণ জাপানের খেলোয়াড়রা একে একে সব খেলাতেই জয়ী হন। ভারতের খেলোয়াড়রা কোনো খেলায় জাপানীদের হারাতে না পারলেও তাঁদের কাছ থেকে চারটে গেম নিতে পেরেছেন। বোম্বাইতে ভারতের দু'নম্বর খেলোয়াড় মন্টি মার্চেন্ট জাপানের তোকিও তাসাকার কাছ থেকে একটা গেম নিয়েছিলেন। ভারত চ্যাম্পিয়ন ফারুক খোদাইজি বাঙ্গালোর টেস্টে মায়েদ-এর কাছ থেকে নিয়েছিলেন একটা গেম। খোদাইজির বিশেষ কৃতিত্ব—কলকাতায় জাপানের এক নম্বর খেলোয়াড় সিগোয়া ইটো এবং তিন নম্বর খেলোয়াড় তোকুয়াসু নিশির কাছ থেকেও একটা করে গেম নিয়েছেন।

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয়দের যে খেলা আমরা দেখেছি, সে খেলা আধুনিক ক্রীড়াধারারই উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে স্বভাবতই ভারতীয়

খেলোয়াড়রা দুর্বল প্রতিপক্ষ এবং সহজাত প্রতিভার পর্যাপ্ত প্রাধান্যে জাপানী খেলোয়াড়রা প্রবল ছিলেন।

কলকাতায় জাপানী খেলোয়াড়রা নিজেদের ভেতর দুটো প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেন। এ খেলাতে চাপ মারা এবং চাপ তোলার প্রতিক্রিয়াই বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল।

ক্রিকেট : রণজি প্রতিযোগিতা

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় বোম্বাই দলের পর পর দশ বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোনো দেশেই কোনো দল একাদিক্রমে দশ বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারেনি। এর আগে নিউ সাউথ ওয়েলস দল পর পর ন-বার শেফিল্ড শীল্ড জয় করে যে রেকর্ড করে, বোম্বাই দল সে রেকর্ড ভেঙে দিল।

বোম্বাইয়ে পাঁচদিনব্যাপী ফাইন্যালে বোম্বাই অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মাদ্রাজকে সরাসরি হারাতে পারেনি। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ফাইন্যাল খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে। বোম্বাইয়ের জয়ের মূলে অশোক মানকড়ের ১১২ রান এবং অধিনায়ক হারদিকারের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে হারদিকারের ৭৩ রান ছাড়াও দ্বিতীয় ইনিংসে দলের ভয়ের মুখে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তিনি শেষ রক্ষা করেন।

ক্রিকেট : ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

কিংসটনে ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। পোর্ট অব স্পেনে প্রথম টেস্টও ড্র হয়।

দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটের বীরত্বে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। মোট রান উঠেছিল ৩৭৬। এর মধ্যে ক্রাউড্রের ১০১ ও এডরিচের ৯৬। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস মাত্র ১৪৩ রানে শেষ হয়। ওর মধ্যে বলার মতো ইনিংস খেলেছেন লয়েড ৩৪ রান (অপরাজিত) করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের এই অভাবিত ব্যর্থতার কারণ ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার স্নোর স্মরণীয় ভূমিকা। স্নো ৪৯ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সাতটা উইকেট ফেলে দেন।

২৩৩ রান পেছনে থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ফলো-অন করে। তৃতীয় দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৮১ রান উঠে। চতুর্থ দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২০৪ রানের মাথায় বেসিল বুচার আউট হবার সঙ্গে দর্শকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দর্শক-পুলিসে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। শেষে পুলিসের কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

নার্সের ৭৩ রান পরবর্তী খেলোয়াড়দের সাহস যোগায়। কানহাইয়ের ৬৬ ও বুচারের ২৫ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দলপতি সোবার্স পতনোন্মুখ ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ১১৩ রানের একটা অবিস্মরণীয় ইনিংস উপহার দেন। ইংল্যাণ্ডকে ১৫৯ মিনিটে জেতার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে সোবার্স দলের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন ৯ উইকেটে ৪৯১ রানের মাথায়। বোলিং শুরু করে বিনা রানে ইংল্যাণ্ডের দু'জন খেলোয়াড়কে আউট করেন সোবার্স। পঞ্চম দিনের শেষে কাউড্রের দল যখন কোনোক্রমে পরাজয় এড়ায়, তখন স্কোর বোর্ডে ৮ উইকেটে ৬৮ রান।

ক্রিকেট: ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ড

ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্টে ভারতের জয় সত্যিই আনন্দের। নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৫০ রানের উত্তরে ভারতের খেলোয়াড়রা যদি ম্যাচ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ব্যাটিং আরম্ভ করতেন, তাহলে বোধহয় ভারতীয় দল জয়ী হতেন না। সাহসী ভূমিকাই ভারতকে জয়ী করেছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের ফলে খেলোয়াড়দের ভেতর যে সুন্দর সমন্বয় এবং সুন্দর বোঝাপড়ার ভাব গড়ে উঠেছিল, তারই পুরস্কার ডুনেডিন-এর টেস্ট জয়।

প্রথম টেস্টে ভারতের অনেকেরই সফল ভূমিকা। সবচেয়ে সফল খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার, যিনি ৮০ রান করে প্রথম ইনিংসের শক্ত ভিত গড়েছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে ৭১ রান করে জয়যাত্রার পথ সহজ করেছেন। রুসি সূর্তি এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার-এর কৃতিত্বও প্রশংসার। স্পিন বোলার প্রসন্ন, যিনি ৯৪ রানে বিপক্ষের ৬টা উইকেট নিয়েছেন, তাঁকেও ধন্যবাদ।

ডুনেডিনের প্রথম টেস্টে ভারত ৫ উইকেটে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু সে জয়ের আনন্দ বেশীদিন উপভোগ করতে না করতেই ক্রাইস্টচার্চের দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড ভারতকে ৬উইকেটে পরাজিত করে। ডুনেডিনে ভারতের জয় যেমন ছিল বিদেশের মাটিতে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়, তেমনি ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যাণ্ডের জয়ও ভারতের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম জয়।

দ্বিতীয় টেস্টে টসে জিতেও অধিনায়ক পতৌদি প্রথম ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেননি। সম্ভবত সবুজ ঘাসের তাজা উইকেটে প্রথমে তিনি নিউজিল্যাণ্ডের দুই ফাস্ট বোলার বার্টলেট ও কলিজের সম্মুখীন হতে চাননি। ফলে খেলার সূচনা থেকেই নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটিং-এ আধিপত্য বজায় রাখে। ১ উইকেটে ১২৬ রান ভারতের বিরুদ্ধে উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। দিনের শেষে ৩ উইকেটে হয় ২৭৩।

খেলার দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৫০২ রানে শেষ হবার পর, ৮ রান তুলতেই ভারত একটা উইকেট হারায়। নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক ২৩৯ রান করে আউট হন। ডাউলিং-এর এই রান শুধু তাঁর নিজের সর্বোচ্চ রানই নয়, টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড় হিসেবেও সর্বোচ্চ রান। এর আগে ১৯৫৫-৫৬ সালে সাটক্লিফ ভারতের বিরুদ্ধে যে ২৩০ (নট আউট) রান করেছিলেন, সেটাই ছিল টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানদের ব্যক্তিগত বড় রান।

খেলার তৃতীয় দিন ২৮৮ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হবার ফলে ফলো-অন করে ভারতকে চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করতে হয়। চতুর্থ দিন ভারতের ব্যাটিং-এ অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় মিললেও পরাজয়ের ভয় কাটে না, তবে ইনিংস হারার ভয় কেটে যায়। এই দিন সারাদিন ধরে ব্যাট করে ভারত সংগ্রহ করে ৮ উইকেটে ২৮৩ রান। পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলায় ৩০১ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর নিউজিল্যাণ্ড ৪ উইকেট হারিয়ে জয়লাভের মতন ৮৮ রান তুলে ৬ উইকেটে বিজয়ী হয়। এই টেস্টে উল্লেখ করার মতন একটা ঘটনা: নিউজিল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার বার্টলেটের বত্রিশটা নো-বল। টেস্ট খেলায় নো-বলের নতুন রেকর্ড।

বৃষ্টি-ভেজা পিচে অস্পষ্ট আলো ও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিন নিউজিল্যাণ্ড মাত্র ৩৮ রানের ভেতর চারটে উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আর কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৪৭ রান ওঠায়। দ্বিতীয় দিন বাকি ছ-টা উইকেটে মাত্র ৩৯ রান যোগের পর ১৮৬ রানের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। দিনের শেষে ভারত সংগ্রহ করে ৫ উইকেটে ২০০ রান। তৃতীয় দিন ৩২৭ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হবার পর ১৪৩ রানের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের চারটে উইকেট পড়ে যায়। তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতের ওয়াদেকার প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১৪৩) করেন। চতুর্থ দিনের খেলায় ১৯৯ রানে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে জয়ের জন্যে ভারতের ৫৯ রান দরকার থাকে। ২ উইকেট হারিয়ে ভারত ৬১ রান করে খেলায় ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

তৃতীয় টেস্টে ভারতের জয়ের মূলে ব্যাটসম্যান ওয়াদেকার ও বোলার প্রসন্ন ও নাদকার্নীর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। নাদকার্নী দ্বিতীয় ইনিংসে তিরিশ ওভার বল করে বারোটা মেডেন সমেত পেয়েছেন ৪৩ রানে ৬টা উইকেট। আর এই খেলায় প্রসন্ন ৮৮ রানে ৮টা উইকেট সংগ্রহ করেছেন।

ওয়েলিংটনে ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জয়ের ফলে ভারত চারটে টেস্ট সিরিজের রাবার যুদ্ধে ২—১ জয়ে এগিয়ে রইলো।